

‘প্রথম কবে এসেছিলেন মনে আছে?’

‘এজে হ্যাঁ। যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালে।’

‘যেদিন কাকা মারা গেলেন?’ মণিবাবু জোখ বড় বড় করে জিজেস করলেন।

‘এজে হ্যাঁ।’

অনুকূলের চোখে জল এসে পেছে। সে গায়ছ দিয়ে জোখ মুছে ধরা গলার বলল, ‘সে ভদ্রলোক গেলেন চলে, আর তার কিছু পরেই আমি বাবুর চানের জল গরম করে নিয়ে তেনাকে বলতে দিয়ে দেখি কি তেনার যেন ইঁশ নেই। কয়েকবার ‘বাবু বাবু’ করে ডেকে বখন সাড়া পেলাম না তখন এনার বাড়িতে গেলাম খবর দিতে।’ অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল। অবনীবাবু বললেন, ‘আমি ব্যাপার দেখেই মণিবাবুকে টেলিফোন করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে বলি। অবিশ্বাস্য কিছু করার ছিল না।’

একটা গাড়ির আওয়াজ পায়ে গেল। অনুকূল বাহিরে চলে গেল। মিনিটখালেকেই মধ্যেই ঘরে এসে চুকলেন সস্তা বুলপি, বাঁকড়া চুল, লম্বা গৌঁফ আর পুরু ত্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক। জানা গেল ইনিই সুরজিৎ দাশগুপ্ত। অবনীবাবু মণিমোহনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, ‘আপনি এর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি রাধারমণবাবুর ভাইপো।’

‘ও, আই নি। আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয়। উনি আমাকে এসে দেখা করতে—’

মণিবাবু তার কথার উপরেই বললেন, ‘কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি?’

ভদ্রলোক তাঁর কোটির ভিতরের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড ধার করে মণিবাবুর হাতে দিলেন। মণিবাবুর পড়া হলে সে চিঠি ফেলুনার হাতে গেল। অংমি বুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমণবাবু ভদ্রলোককে বিবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে নটা থেকে দশটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। কারণটা ও বলা আছে — ‘বাদ্যযন্ত্রে আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে। আপনি আসিলেই দেখিতে পাইবেন।’ উপটোচিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও ফেলুন দেখে নিল — মিনাৰ্ভা হোটেল,

সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলকাতা-১৩।

ফেলুন্দা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা সুলেখা ঝুঁঝাক কালিটার দিকে এক বলক দেখে নিল। চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা।

সুবঙ্গিংবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই খাটের একটা কোণে গিয়ে বসলেন। পরের প্রশ্নাও মণিমোহনবাবুই করলেন।

‘আঠারো তারিখে আপনার সঙ্গে কী কথা হয়?’

সুরঙ্গিংবাবু বললেন, ‘কিভুদিন আগে একটা পুরনো গীতভায়রতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সমক্ষে ওঁর একটা লেখা পড়ে আমি রাখারমণ্ডবাবু সমক্ষে জানতে পারি। এখানে এসে ওঁর কালেকশন দেখে আমি তার থেকে দুটো যত্ন কেনার ইচ্ছা প্রক্ষুস্তুরি। দাম নিয়ে কথা হয়। আমি দুটোর জন্যে দু’হাজার টাঙ্কা অফার করি। উনি বাজি হন। আমি শুধুই তেরে লিখে দিচ্ছিলাম, উনি দু’দিন পরে ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন।’ তাই বুধবার আবার আপয়েন্টমেন্ট হয়। মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন। তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই। পরতু ফিরেছি।’

মণিবাবু বললেন, ‘আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওঁর শরীর কেমন ছিল?’

‘ভালই তো। তবে ওঁর বোধহয় একটা ধারণা হয়েছিল উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। দু’একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।’

‘আপনার সঙ্গে কেনও কথা কাটাবাটি হয়নি তো?’

প্রশ্নটা শুনে সুরঙ্গিংবাবুর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেশ কালো হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় বললেন, ‘আপনি কি ভদ্রলোকের হাঁট আটাকের জন্য আমাকে দায়ী করছেন?’

মণিবাবুও যথাসন্তুর ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, ‘আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি না। তবে আপনি যারার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই...’

‘তা হতে পারে, তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ



সুস্থ ছিলেন। এনিওয়ে, আপনি আমার ব্যাপারে নিশ্চয় একটা ডিসিশন নিজে পারবেন। আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি — দু'হাজার —' ভদ্রলোক পকেট থেকে মানিবাগ বার করলেন — 'যদ্ব দুটো আজ পেলে ভাল হত। আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি। অমি থাকি ইরানেই। এখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি।'

'কোন দুটো যত্নের কথা বলছেন আপনি ?'

সুরজিদ্বাবু ঘটি থেকে উঠে দেয়ালের দিকে শিয়ে হকে বোসানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'একটা হল এটা। এর নাম থামাকে — ইরানের যত্ন। এটার নাম আনন্দাম, কিন্তু দেখিনি কখনও। বেশ পুরনো যত্ন। আর অন্যটা হল —'

সুরজিদ্বাবু ঘরের উল্টো দিকে একটা নিচ টেবিলের উপর রাখা

ছেট হারমেনিয়ামের মতো দেখতে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধারণ বাজাইল। ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটার নাম মেলোকর্ড। এটা বিলিতি যন্ত্র; আগে দেখিনি কখনও। আমার বিশ্বাস অস্ত করেকমদিনের জন্য যানুক্যাকচার হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। খুব সিম্প্ল যন্ত্র; তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার অফাৰ করেছিলাম। উনি তখন রাজি হয়েছিলেন —'

'ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না মিস্টার দাশগুপ্ত।'

সুরজিৎবাবু খনকে গেলেন। কথাটা বলেছে ফেলুদা, আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গে। 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হান'র কথাটা কোন বইয়ে যেন পড়েছি। সুরজিৎবাবু মণিবাবুর দিক থেকে বাই করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হেনে শুকনো ভারী গলায় বললেন, 'আপনি কে ?'

টুকুর দিলেন মণিবাবু।

'উনি আমার বন্ধু বুঝবে না বলে উনি ঠিকই বলেছেন। ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না। তার শাধান কারণটা আপনার বোকা উচিত। কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই।'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাতে কিছু না বলে গট্টগট্ট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদা দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সুরজিৎবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামকে বন্দোটাকে যন দিয়ে দেখল। আস্তায় যে খেলার বেহলা বিক্রি হয়, অনেকটা সেই রকম দেখতে। যদিও তার চেয়ে অনেক বড়, আর গোল অংশটায় খুব সুন্দর কাজ করা।

এবার খামকে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকর্ড যন্ত্রটার কাছে। সাদা-কালো পদ্ময় চাপ দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশান্তে টুং টাঁ শব্দ।

‘এই বাজনার আওয়াজ শুনেছিলে কি ?’ ফেলুদা সাধনকে
জিজ্ঞেস করল ।

‘হতে পারে ।’

সাধনের মতে এত অল্প বয়সে এত গভীর ছেলে আমি খুব কম
দেখেছি ।

এবার ফেলুদা আলমারিয়ে দেরাজ থেকে এক তাঢ়া পুরনো
কাগজ বার করে মণিবাবুকে বলল, ‘এগুলো আমি একটু বাড়িতে
নিয়ে যেতে পারি কি ?’

মণিবাবু বললেন, ‘নিশ্চয়ই ! আরও যদি কিছু...’

‘না, আর কিছু দরকার নেই ।’

আমরা যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখন সাধন জ্ঞানসা দিয়ে
বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অসূচি সুন্দর গুন করছে ।

সেটা কিন্তু কোনও ফিল্মের গানের সুর নয় ।

॥ ৩ ॥

ফেলুদা মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে দুদিন সময় চেয়ে
নিয়েছিল । চাইতেই হবে, কারণ রাধারমণবাবুর বাড়ি তব তব করে
শুঁজেও কেনও চাবি, বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনও বাজ
বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি । তাই ফেলুদা বলল, এক নম্বর,
ওকে চুপচাপ বসে চিন্তা করতে হবে ; দুই নম্বর, রাধারমণবাবুর
কাগজপত্র ষেটে লোকটা সমস্কে আরও কিছু জ্ঞান যায় কি না
দেখতে হবে, আর তিনি নম্বর, গান বাজনা সমস্কে আরেকটু
ওয়াকিবহাল হতে হবে ।

বামুনগাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহনবাবু বললেন, ‘কী ঋকম
বুঝছেন মিস্টার মিজির ?’

ফেলুদা তাঁর গভীর ও অনায়নক্ষ ভাষটাকে বেড়ে ফেলে দিয়ে
বলল, ‘আপনাকে কওগোলো মন তারিখের ব্যাপারে একটু হেল্প
করতে হবে ।’

‘বলুন ।’

‘আপনার খুড়তুতো দাদা — অর্থাৎ রাধারমণবাবুর ছেলে
মুরলীধর — কবে মারা গেছেন ?’

‘ফটি ফাইভে । আটাশ বছর আগে ।’

‘তখন তাঁর ছেলের বয়স কত ছিল ?’

‘ধরণীব ? ধরণীর বয়স ছিল সাত কিংবা আট ।’

‘তুরা কলকাতাতেই থাকত ?’

‘না । দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন । উনি মারা যাবার পর
বউদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে ষষ্ঠৰবাড়িতে ওঠেন ।
তখন বাবা ছিলেন আমহাস্ট স্ট্রিটে । আমহাস্ট স্ট্রিটেই বউদি মারা
যান । ধরণী তখন সিটি কলেজে পড়ছে । মা মারা যাবার পর
থেকেই তার মজিগতি বদলে যায় । সে পড়াশো ছেড়ে থিয়েটারে
চোকে । আর তার বছরখানেক পরে ক্লক্ষণ চলে গেলেন
বামুনগাছি । ওঁর বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ।—

‘ফিফটি-বাহিনে । সেটের প্রাঙ্গণে দেখা রয়েছে ।’

রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরনো চিঠি, কিছু
ক্যাশ ঘেমো, দুটো ওয়ারের প্রেসক্রিপশন, স্পীগ্লার নামে একটা
জার্মান কোম্পানির পুরনো ক্যাটালগ — তাতে নানারকম বাজনার
ছবি ও দাম — আতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের
স্বরলিপি, খবরের কাগজ থেকে নানান সময়ে কাটা পাঁচটা নাটকের
সমালোচনা — সেগুলোতে সঞ্চয় লাহিড়ী বলে একজন
অভিনেতার প্রশংসা নীল পেনিলে আস্তাবলাইন করা ।

এর মধ্যে তিনটি জিনিস নিয়ে ফেলুন। অন্তব্য করল ।
স্বরলিপিগুলো দেখে বলল, ‘সুরজিতবাবু যে পোস্টকার্ডটা দেখালেন,
তার হাতের লেখার সঙ্গে এ লেখা মিলে যাচ্ছে ।’ ক্যাটালগটা দেখে
বলল, ‘মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম এতে দেখছি না ।’ আর
থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল, ‘ফন্দুর মনে হচ্ছে, এই
সঞ্চয় লাহিড়ী আর ধরণীধর সমাদার একই লোক । আর তাই যদি
হয় তা হলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার স্বরকে
থোঁজ-খবরটা রাখতেন রাধারমণবাবু ।’

কাগজগুলো সংযুক্তে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুন। যিয়েটারের পত্রিকা 'মঞ্চলোক'-এ টেলিফোন করে সংজয় লাহিড়ী কোন যাত্রার দলে আছে জিজ্ঞেস করল। জানা গেল দলের নাম মডার্ন অপেরা। সেখানে সংজয় লাহিড়ী হিরোর পার্ট করে। তারপর মডার্ন অপেরার অফিসে কোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিনি সন্তান হল জলপাইগড়ি ট্যুরে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে আরও দিন সাতেক। এ ব্যবটা অবিশ্য মণিবাবু আসেই দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পারে আমরা বেরোলাম। একদিনে একসঙ্গে এতরকম জায়গায় অনেকদিন যাইনি। প্রথমে জাদুঘর। কেম যাচ্ছি আগে থেকে জানি না, ক্ষমতা ফেলুনোর এবন মৌনীপর্ব। তার উপরে মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে। বোঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে ভাবছে, তাই ডিস্টাৰ্ব করা চলবে না। জাদুঘরে যে একম একটা বাজনার সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না। অবিশ্য সবই দিশি বাজনা—একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত। 'গুরু' বীণার যে এতরকম হতে পারে তা আমার ধ্যানে ছিল না।

এর পরে বিলিতি বাজনার দোকান। তি সুল ট্রিটের সাল্দান্হায় কোম্পানি বলল মেলোকর্ডের নাম কথনও শোনেনি। সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে। লালবাজারের মণ্ডল কোম্পানির একটা ব্যাশমেমো রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল, তাই বোধহয় ফেলুন সেখানে গেল। দোকানের মালিক একেবারে জহর রাখের মতো দেখতে। বললেন, 'সমাদ্বার ইশাই আমাদের অনেকদিনের থেকে।' সেই আমার ফাদারের টাইপ থেকে।'

'মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম শনেছেন?' ফেলুন জিজ্ঞেস করল।

'মেলোকর্ড? কই, না তো। ঝ্যারিয়োনেট টাইপের কিছু? যু দেওয়া যাবে? ডিইড ইনস্ট্রুমেন্ট?'

ফেলুন বলল, 'না। বলতে পারেন হারয়োনিয়াম টাইপের। সাইজে অনেক ছোট। আওয়াজটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝামাঝি।'

‘ছোট সাহিজের বাজনা ? তাতে ক'টা অকটেভ পাচ্ছেন আপনি ?’

আমি জানি যে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা — এই আটটা সুরে মিলে একটা অকটেভ হয়। মণ্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়ামে দেখছি তিনি অকটেভের বেশি পর্দা ঝরেছে। ঘেলোকর্ডে মাত্র একটা অকটেভ রয়েছে শুনে মণ্ডল মাথা নেড়ে বললেন, ‘মা মশাই। এ শুনে মনে হচ্ছে খেলনা-টেলনা ধরনের কিছু হবে। আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে দেখুন।’

এর পরে ফেলুদা কলেজ ট্রিটের দাশগুপ্তের দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে তিনটে সংগীতের বই কিনল। তারপর সেখান থেকে বিধান সরণিতে মুক্তোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সংজয় লাহিড়ীর একটা দুরঘানো ছবি চেয়ে লিল। দাম দিতে হবে কি না জিজেস করাতে সম্পাদক প্রতুল হাজলা জিভ কেটে বলল, ‘দামের কথা কী বলছেন। আপনি ফেলু মিস্টির মা ?’

রাত্তির মোড়ের একটা স্লেটের থেকে ঠাণ্ডা লস্য খেয়ে ট্যাঙ্গি থবে বাড়ি ফিরতে হলুঁগেল সাড়ে সাড়টা। এসে দেখি পাড়া শুরুযুগ্মি, লোড-শেডিং চলছে। ফেলুদা তার মধ্যেই ঘোমবাতি জ্বালিয়ে গানের বইগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল। ন'টায় আলো আসার পর বলল, ‘তোপ্সে — তুই শ্রীমাথকে নিয়ে চট করে একবারটি পটুদের বাড়ি চলে যা তো—গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্যে হারমোনিয়ামটা চেয়েছে।’

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা পৰ্য পৰ্য করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

রাত্রে শপ্ত দেখলাম একটা প্রকাণ ঘরে একটা প্রকাণ লোহার দরজা, আর তাতে একটা প্রকাণ ফুটো। ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে উল্টো দিকে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তা না করে আমি, ফেলুদা আর মণিমোহনবাবু তিনজনে একসঙ্গে একটা প্রকাণ চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছি আর সুরজিত দাশগুপ্ত একটা অলঝালা পুরে তিড়ি-বিড়ি শায়গচ্ছেন আর সুব করে বলছেন, ‘এইট টু নাইল ওয়ান — এইট টু নাইল ওয়ান — এইট টু নাইট ওয়ান !’

পরদিন মঙ্গলবার। মণিয়োহনবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার অবৰ নেবেন, কিন্তু সকা঳ সাতটায় তাঁর টেলিফোন এসে হাজিৰ। ফোনটা আমিই ধৰেছিলাম; ফেলুন্দাকে ডেকে দিচ্ছি বলাতে বললেন, 'দৱকাৰ নেই। তুমি ওঁকে বলো আমি একুনি আসছি, জুৰি কথা আছে।'

পনেৱো মিনিটেও অধোই ভদ্রলোক এসে গেলেন। বললেন, 'অৰনীবাবু এই একষুষণ আগে বায়ুনগাছি থেকে গেন বলেছিলেন। কাকার শোধাৰ ঘৱে মাঘৱাত্রে লোক চুকেছিল।'

'ওই জার্মান তালাৰ সংকেত আৱ কে জানে?' ফেলুন্দা তৎক্ষণাৎ প্ৰশ্ন কৰল।

'আমাৰ ভাইপো জানত। অৱনীবাবু জানেন কি না জানি না। বোধহৱ না। তবে পাইন্দেৰ দৱজা দিয়ে চোকেনি সে লোক।'

'তবে ?'

'বাথৰমে জমাদাৰ চোকার দৱজা দিয়ে।'

'কিন্তু কাল যখন বাথৰমে গেলাম তখন তো সে দৱজা বন্ধ ছিল। আমি নিজে দেবেছি।'

'পৱে হঠতে কেউ বুলেছিল। যাই হোক — কিছু নিতে পাৱেনি। চোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুন্নত টেৱে পেয়ে গেলাম।...আপনি এখন কি আছেন? একবাব যেতে পাৱেন ?'

'নিশ্চয়ই। তবে তাৱ আগে একটা প্ৰশ্ন আছে। বাধাৰমণবাবুৰ নাড়িকে — অৰ্থাৎ আপনাৰ ভাইপো ধৰণীধৰকে — এখন দেখলে চিনতে পাৱেন ?' মণিবাবু তুকু কুঁচকে বললেন, 'অনেক কাল দেখা নেই ঠিকই তবু হাজাৰ হোক ভাইপো তো !'

ফেলুন্দা তাৱ ঘৱ থেকে একটা ছবি এনে মণিয়োহনবাবুকে দিল। মণ্ডলোকেৰ অফিস থেকে আনা সঞ্চয় লাহিড়ীৰ ছবি, তাৱ উপৰ ফেলুন্দা কালি দিয়ে একজোড়া গৌৰি আৱ একটা মোটা

ফেরের চশমা একে দিয়েছে। মণিবাবু লাক্ষিয়ে উঠে বললেন,
'আরে, এ যে দেশভু—'

'সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতো মনে হচ্ছে কি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেবল নাকের কাছটায় একটু—'

'যাই হোক, মিল একটা আছে। এটা আসলে আপনার
ভাইপোরই ছবি, আমি কেবল একটু রং চাইয়েছি।'

'আশ্চর্য। ...আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয়। ইন ফ্লাইট,
কাল আরে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে এলি। কিন্তু
প্রেমে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, ফিরতে অনেক রাত হল, তাই আর
বলা হ্যানি। অবিশ্বি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সন্তুষ্টও হত না।
ধরণীকে গত পনেরো বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে।
থিয়েটারেও না, কারণ ও বাতিকটা আমরে একদম নেই; আর ফ্লাট
তো ছেড়েই দিলাম। অথচ আপনার অনুমান যদি সত্তি হয় তা
হলে তো...

'তা হলে দুটো বাঁধাইর প্রমাণ করতে হয়। এক — সুরজিৎ
দাশগুপ্ত বলে আসলে কেউ নেই, দুই — সঞ্জয় লাহিড়ী যাত্রার দল
থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে, এবং সেটা এসেছে আপনার কাকার
মৃত্যুর আগেই। তোপ্সে — মিনার্ভা হোটেলের নম্বরটা বার কর
তো।'

হোটেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে
একজন সেখানে এসেছিলেন বটে, কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেলা তিনি
হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

মডার্ন অপেরার ফোন করে লাভ নেই, কারণ কালকেই তাদের
সঙ্গে কথা হয়েছে, আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিড়ী ট্যারে
গেছে।

বামুনগাছি পৌঁছিয়ে বেঙ্গুদা প্রথমে পাঁচিলের বাইরেটা ঘুরে
দেবল। যেই আসুক, তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হয়েছে।
আর সে গাড়ি বাড়ি থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে
পাঁচিল উপকূলতে হয়েছে। শেষের কাজটা কঠিন নয়, কারণ তিনি
জারগায় পাঁচিলের বাইরে গাছ রয়েছে, আর সে গাছের নিচু ডাপ

পাঁচিলের উপর দিয়ে কম্পাউন্ডের পিতুর চুকেছে। মুশকিল হচ্ছে কী, বর্ষায় দিন হলে মাটিতে পানোর ছাপ পড়ত, কিন্তু এ মাটি একেবারে ঝটিয়ে কেননো।

অনুকূলের শরীর ভাল নয়। সে তার ঘরে বিছানায় শয়ে কুই-কুই করে যা বলল তাতে বোৰা গেল যে ঘাথার ঘন্টগায় আর মশার কানড়ে ঝাঁকে তার ভাল ঘূর হচ্ছিল না। সে যেখানে শোয় সেখান থেকে তার খাটের পাশের জানালা দিয়ে সোজা রাধারমণবাবুর ঘরের জানালা দেখা যায়। অঙ্ককারের ঘরে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধড়মড়িয়ে উঠে 'কে কে' বলে হাক দিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমণবাবুর বাথকুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে অঙ্ককারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটা নাকি অনুকূল রাধারমণবাবুর ঘরের মেঝেতে শয়ে থাকে।

‘অঙ্ককারের ঘরে সে ক্লিনকে চিনতে পারনি বোধহয়?’
মণিবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘না বাবু। আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখি না, আর কাল আবার ছিল অমাবস্যা...’

রাধারমণবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্রের যেকল ছিল তেমনই আছে। কিন্তু তাও ফেলুন্দার গাঁটীর গজাৰ ঘরে দেশ ঘাবড়ে গেলাম।

‘মণিবাবু, বারাসত থানায় ঘৰের দিকে হবে। এ বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে। সে লোক আবার আসতে পারে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি সঞ্চাল লাহিড়ী নাও হন, তা হলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে, কারণ ওই দুটো ঘন্টের উপর তার ঘথেষ্ট লোড। পঞ্চামা দিয়ে কেন্দ্র সভাৰ না হলে অন্য উপায়ে ডগলো হাত কৱার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহ। এই সব কালেক্টরদেৱ গো বড় সাংবাদিক।’

মণিবাবু বললেন, ‘আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুনি থানায় ঘোন করে দিচ্ছি। এ-সিৱ সঙ্গে আমার আলাপ আছে।’

ভজলোক ঘন্টভাবে ঘৰ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুন্দা

ঘেলোকড়টাকে নিয়ে খাটোর উপর বসে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। দারুণ মজবুত তৈরি, দু'পাশের কাঠে সুন্দর খাজ করা। জিনিসটাকে চিত করে আলোতে ধরতে একটা ঝং চটে যাওয়া লেবেল দেখা গোল। ফেলুন্দা চোখ কুঁচকে লেখাটা পড়ে বলল, ‘স্পীগলার কোম্পানির তৈরি। মেড ইন জামানি।’

ফেলুন্দা হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই, কিন্তু কাঁচ হাতে একটা একটা করে পদ্ম টিপে ধখন জনগঞ্চন-র খানিকটা ঘেলোকড়ে বাজাল, তখন যত্নটার গুপ্ত সেটা শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। তারপর সেটাকে আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, ‘একবার ইজ্জে করে জিনিসটাকে ভেঙে ভেঙতরে কী আছে দেখি; কিন্তু যদি দেখি কিছু নেই তা হলে বাজনাটার জন্য আপসোস হবে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক হাজার টাকাগুরুফার করছিল এটার জন্যে।’

অনুধূল এই শ্রীর নিক্ষেপ শব্দত করে এনেছিল, সেটার চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমোহনবাবু ফিরে এসে বললেন, ‘যান্মায় বলে দিয়েছি। দু'জন লোক থাকবে সখ্য থেকে। অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না; সাধনকে নিয়ে কলকাতা গেছেন। ফিরবেন বিকেলে।’

ফেলুন্দা বলল, ‘যাধারামবাবুর টাকা লুকিয়ে দ্বাখার ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে?’

মণিবাবু গভীরভাবে বললেন, ‘আমি নিজে জেনেছি কাকার ঘৃত্যর পরে। টাকা যে খোঁজার্থুজি হচ্ছে সেটা অবিশ্য অবনীবাবু জানেন, কিন্তু তার অ্যামাটিন্টটা বস্ত হতে পারে সেটা জ্ঞানার কথা নয়। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি আসলে ধরণীধর হয়ে থাকে, তা হলে সে ফেরিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে। আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল। তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, তার ফলে...’

মণিবাবু কথাটা শেষ করলেন না।

ফেলুন্দা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, ‘তার ফলে আপনার কাকার হার্ট আটাক হয়। আর সেই অবস্থাতেই ধরণীধর ঘরের

মধ্যে টাকার অনুসন্ধান করে। আপনি এই ভাবছেন তো ?

‘হ্যাঁ...কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা থুঁজে পারনি।’

‘যদি পেতে তা হলে সে বাজনা কেনার অঙ্গুহাতে আবার ফিরে আসত না — এই তো ?’

‘ঠিক তাই। তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে।’

‘মেলোকর্ড।’

মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন।

‘আপনি তাই বলছেন ?’

‘আমার মন তাই বলছে’ ফেলুদা বলল। ‘তবে আমি আন্দাজে চিন মারা পছন্দ করি না। আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলোও আমি ভুলতে পারছি না। আপনার শুনতে কোনও ভুল হয়নি তো ? উনি “চাবি” কথাটাই বলেছিলেন ক্ষেত্রে ?’

মণিবাবু হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, কী জানি মশাই, চাবি বলেই তো যনে হল। অবিশ্বাসে এমন হতে পারে যে কাকা আসলে প্রলাপ বকছিলেন। চাবি কথাটার হয়তো কোনও অর্থ নেই।’

কথাটা শনে আমার মনটা বেশ দয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দমবার কোনও লক্ষণ দেখায় না। ও বলল, ‘প্রলাপই হোক আর যাই হোক, এ ধরে টাকা আছে। আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি। চাবিটা আসল কথা নয়। আসল কথা টাকা।’

‘তা হলে আপাতত কী করবেন সেটা ঠিক করুন।’

‘করেছি। আপাতত বাড়ি ফিরব। দিনের বেলা কোনও ভয় নেই। অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনও লোককে যেন চুক্তে না দেওয়া হয়। রাতে তো পাহারাই থাকবে। আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার থাটের উপর বালিশে কুক দিয়ে উপুড় হয়ে শয়ে চিন্তা করব। একটা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি, সেটা আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার। তবে একটা কথা, তেমন বুঝলে আজ যান্তে আমি এখানে কাটাতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো ?’

‘মোটেই না । অটো নামাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি ।’

‘ভাল কথা — আপনি সংখ্যাত্ত্বে বিশ্বাস করেন ।’

‘সংখ্যাত্ত্ব ?’ মণিমোহন ভ্যাবাচ্যোকা ।

ফেলুদা তার একপথে হাসি হেসে বলল, ‘আপনাদের সবাইয়ের নাম দেখছি পাঁচ অঙ্কের — রাধারমণ, মুহূর্লীধর, ধুরলীধর, মণিমোহন — তাই প্রশ্নটা মনে এল ।’

॥ ৫ ॥

‘আগে লেখ — মৃত ব্যক্তির নাম কী ছিল ।’

ফেলুদা তার খাটে বসে আছে, আমি তার পাশের চেয়ারে । আমার হাতে সে খাতা পেনসিল ধরিলে দিয়েছে । আমি লিখলাম—

‘রাধারমণ সমাদার ।’

‘তার নাতির নাম কি ?’

‘ধুরলীধর সমাদার ।’

‘নাতির ধিয়োটারি নাম ?’

‘সঞ্জয় লাহিড়ী ।’

‘দেরাদুনের বাজলা সংগ্রহকের নাম ?’

‘সুরজিৎ দাশগুপ্ত ।’

‘রাধারমণের প্রতিবেশীর নাম ?’

‘অবনী সেন ।’

‘তার ছেলের নাম ?’

‘সাধন সেন ।’

‘রাধারমণের শেষ কথা কী ছিল ?’

‘আমার নাহে...চাবি...চাবি ..’

‘গানে একটা সা থেকে তার পরের সা পর্যন্ত কটা সূর থাকে ?’

এর মধ্যে ফেলুদা তার কেনা সংগীত প্রবেশিকার প্রথম চাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে । গান নিয়ে সে কেন এত মেতে উঠেছে জানি বা । যাই হোক, আমি লিখলাম—

‘বাবোটা ।’
 ‘কী কী ?’
 ‘সাতটা শুল্ক, চারটে কোমল, একটা কড়ি ।’
 ‘শুল্ক সুর কী কী ? কীভাবে লেখে ?’
 ‘স র গ ম প ধ ন ।’
 ‘কোন-কোনটা কোমল হয় ?’
 ‘র শ স ন ।’
 ‘কীভাবে লেখে ?’
 ‘ব স দ ন ।’
 ‘আব কড়ি ?’
 ‘য ।’
 ‘কীভাবে লেখে ?’
 ‘ছ ।’
 ‘এবার দে কাগজটা ।’
 দিলাম ।

‘এবার বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বোস। দরজটি ভেজিয়ে
 দে। আমি কাজ করব।’

গেলাম বৈঠকখানায়। দরজা ভেজালাম। সোফায় বসলাম।
 চাঁদের পাহাড় বহুটা তিনবার পড়েছি, আবার পড়তে শুরু করলাম।

আঘ এক ঘণ্টা পরে ফেলুন্দার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে
 ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম। কৌতুহল সামগ্রাতে না পেরে
 দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম। ফেলুন্দার গলা পেলাম,
 ‘ডাক্তার বোস আছেন, চিকিৎসণি বোস ?’

ফেলুন্দা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করছে, যাকে মণিবাবু
 নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাকাকে দেখাতে।

ফোনটা কাকে করছে সেটাই জানতে চাইছিলাম, ধাকি কথা
 শোনার দরকার নেই। আমি আবার জায়গায় এসে বসলায়।

দশ মিনিট পরে আবার কটর কটর শব্দ। ডায়ালিং-এর।

উঠে দরজায় গেলাম। কান লাগালাম।

‘ইউরেকা বোস ? কে কথা বলছেন ?’

ঘণিমোহনবাবুর প্রেস। বাস্ — এইটুকুই যথেষ্ট ! আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বললাম।

চারটেক সময় বখন শ্রীমাতি ঢা আনল, কোনও ফেলুদা ঘর থেকে বেরোল না। শেষে বখন দেখাল ঘড়িতে দেখি চারটে পাঁয়াব্রিশ, আর আসি ভাবছি আমার ওই কটা লোখা নিয়ে ফেলুদা অত কী ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে ও দরজে খুলে হাতে একটা আধপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'মাথা ভোঁ ভোঁ করছে রে তোপাসে, একটা বিশাখি বছরের বুজ্জোর মরার মুখে বলা সামান্য তিনটে কথার মাঝে নিয়ে এত কেন ভাবতে হল সেটা ভেলে আথা ভোঁ ভোঁ করছে ! এর ভজ্যে অবিশ্য দায়ী আমাদের ধাংলা ভাবা...'

আমি অবিশ্য ফেলুদার কথাবার্তা কিছুই শুনতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলামঘ দেখতে পাই ওব মুখের চেহারা বদলে গেছে, আর কুকুকুকপারাছ যে, যে আবছা আলেটির কথা ও বলছিল সেটাক্ষেত্রে আর আবছা নেই।

'সা থা নি সা নি...সব কটা শুন্দি সুর। শুনে কিছু মনে পড়ছে ? কোনও মনে বুঝতে পারছিস ?'

আমার মাথা আরও গুলিয়ে গেল। ফেলুদা বলল, 'তোর বুঝতে পারার কথা নয়। পারলে তোতে আর ফেলু মিখিয়ে কোনও তফাত থাকত না।'

ভাগিয়ে তরফাতটা আছে ! আমি ফেলুদার স্যাটিলাইটের বেশি আর কিছু হাতে চাই না।

ফেলুদা এই অথবা সিগারেটটা ছাইদামে না ফেলে ক্যারামের স্ট্রাইকার মরার মতো করে জানালা দিয়ে বাইবে রাত্তায় খেসে দিয়ে বৈঠকখালে টেলিফোনে গিয়ে একটা নদুর ডায়াল করল। দশ সেকেন্ড পরেই কথা।

'কে — মিস্টার সমাদার ? তালে আসুন — এক্সুনি — ধানুনগাছি যেতে হবে — হ্যাঁ, হয়ে গেছে — সব পরিকার...মেলোকর্ড...হ্যাঁ, মেলোকর্ডই আমাদের রহস্যের গবিন্নাচি।'

তারপর টেলিফোনটা রেখে পঞ্জীয় গলায় বলল, 'একটা নিষ্ঠা
আছে তো তোপ্সে, কিন্তু সেটা না নিলেই নয়।'

মণিবাবুর ভ্রাইভার প্রক্রিয়ণ দেখতে খুঁজে হলেও তি আই পি
রোডে পেচাশি কিলোমিটার পৰি আওয়ার স্পিড কুলল। ফেলুদাৰ
ভাৰ দেখে মনে হল হাত্তেড়-টাত্তেড় হলে সে আৰও খুশি হও।
এয়াৰপোট্টোৱ পৰি খানিকটা রাস্তা লোকজনেৱ ভিত্তে স্পিড অনেক
কমল, কিন্তু পৰেৰ দিকে আবাৰ ঘাটে উঠল -- যদিও রাস্তা কুণ্ড
চওড়া নয়, আৱ সক্ষেও হয়ে আমছো।

ৱাধাৱমণবাবুৰ গেটেৰ কাছাকাছি এনে ফেলুদা বলল, 'পাহাৰৰে
লোক আসোৱ সময় ইয়ানি বোধহয় এখনও।'

গেট দিয়ে চুক্তেই বাগানে দেখলাম বন্দুক হাতে সাধন দাঁড়িয়ে
আছে। গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা বলল, 'কীঁফাখিনবাবু, এই সক্ষেৱ
আগোতো কী শিকাৰ হচ্ছে ?'

সাধন বলল, 'বাদুড়ু'

ৱাধাৱমণবাবুৰ কম্পাউন্ডেৰ ঠিক বাইৱে একটা অক্ষম গাছ থেকে
কায়েকটা বাদুড় ঝুলছে সেটা গাড়ি থেকে নেমেই আমাৰ চোখে
পড়েছিল।

অনুবৃন্দ গাড়িৰ আওয়াজ পেয়ে তাৰ ঘৰ থেকে বেৰিয়ে
এসেছিল; মণিবাবু তাকে লঞ্চন জ্বালতে বলে বাড়িৰ ভিতৰে
চুকলেন, আৱ আমাৰও চুকলাখ তাৰি পিছন পিছন।
এইট-টু-নাইন-ওয়ান তালাটা খুলতে খুলতে মণিবাবু বললেন,
'রহস্যোৱ কীভাৱে সমাধান হল সেটা জানতে খুব ইচ্ছে কৰছো।'
আসলে ফেলুদা সারা রাস্তা কোনও কথা বলেনি, কাজেই মণিবাবুৰ
যা অবস্থা, আমাৰও তাই।

অন্ধকাৰ ঘৰে চুকে ফেলুদা তাৰ ভীৰুৎ জোৱালো উচ্চটা ঘৰে
পশ্চিমেৰ দেয়ালেৰ নীচেৰ দিকে ফেলল। আমাৰ বুক চিপ চিপ
কৰছে। আলোটা সোজা গিয়ে টেবিলে রাখা মেলেকৰ্ডেৰ উপৰ
পড়েছে। ঝক্কখকে সাদা পৰ্দাগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাজনাটা দাঁত
বেৰ কৰে হাসছে। ফেলুদা উচ্চটা দেইভাৱেই ধৰে রেখে বলল —



‘চাবি। ইংরিজিতে Key, বাঙালির চাবি। এই মে সাদা-কালো
পর্দাত্তলো দেখছিস, তবে আর একটা নাম ইল চাবি, আর সেই চাবির
কথাই—’

চোখের পলকে এখন একটা বাপীর ঘটে গেল যেটা ভাবতে
এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মণিশাবু ইঠাঁ বাধের খতো
লাফিয়ে মেলোকর্জিতাকে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ফেলুনোর মাথায়
একটা প্রকাঞ্চ বাড়ি মেরে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে
উর্ধ্বস্থাসে দুরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুনো মার খাবার ঠিক আগেই নিজেকে বাঁচানোর জন্মা টর্চ
সমেত হাত দুটো মাথার উপর তুলেছিল। তাই হংকং তার মাথার
চোট লাগেনি। কিন্তু তা সঙ্গেও হাতের ব্যবস্থাতেই সে দেখি খাটে

বসে পড়েছে। আমি নিজে মেঝে থেকে উঠতে না উঠতেই
বুরুলাম মণিবাবু বাইরে থেকে এইটু-টু-নাইন-ওয়ান বন্ধ করে
দিয়েছেন।

আমি তাও দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়া দরজায় একটা ধাক্কা মেনেছি,
এমন সময় ফেলুদার গলা পেলাম — ‘বাখরম !’

বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ, আর তাঁরপরেই টাঁই
করে একটা আওয়াজ।

আমরা দু’জনে বাড়ের মতে বাখরমে চুকে জমাদারের দরজা
খুলে বাইরে বেরোগ্যাম। বাগানের দিক থেকে গোলমাল,
অনুকূলের গলা, অবনীবাবুর গলা। মণিবাবুর গাড়িটি বাই করে গেও
দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছে
গেছি।

ওটা কে বসে আছে কাঁকর বিজানো, জাতোর উপর ? অবনীবাবু
চেচাচ্ছেন — ‘তুমি কী ক্ষমত্ব স্থাপন ! এটা কী করলে হুমি !
ছিছিছি !’

সাধন তার সকল অথচ গান্ধীর গলায় বেশ কাঁধের সঙ্গে বলল, ‘ও
যে দাদুর বাজনা নিয়ে পালাচ্ছিল !’

এবার ফেলুদা বলল, ‘ও ঠিকই করেছে, অবনীবাবু ! অপযাধীকে
এয়ারণ্যাম দিয়ে পঙ্কু বরে ও আমাদের সাহায্যাত্তি করেছে — যদিও
ভবিষ্যতে ওকে একটু সাবধানে বন্দুক চালাতে হবে। ... আপনি
এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিন। গাড়িটাকেও যেন পালাতে না দেয়
— ওর নবর হল ডন্ট এম এ সিজ ওয়াল সিজ ফোর !’

অনুকূল আর ফেলুদা দু’জনে নিলে মণিবাবুকে ধরে তুলল।
কাঁর কপালের বাঁ দিক থেকে ছরুয়ার গুলি লেগে রক্ত পড়েছে।
ভদ্রলোক একেবারে থুম মেরে গেছেন।

মেলোকস্টো মণিবাবুর প্যাশেই কাঁকরের উপর পড়ে ছিল, আমি
সেটাকে খুব সাবধানে খুলে নিলাম।

আমরা চারজন রাধারমণবাবুর খাটের পাশে গোল হয়ে তেয়ারে
বসে চা খাচ্ছি। চারজন মানে আমি, ফেলুদা, অবনীবাবু, আর
বারাসত থানার দীনেশ শুই, ইনি বোধহয় ইনস্পেক্টর-তিনিস্পেক্টর

হলেন : ঘরের এক কোণে সিন্দুকটীর সামনে আরও দু'জন লোক রয়েছে। একজন দাঁড়িয়ে, সে বোধহয় কনস্টেবল, আর আরেকজন চেয়ারে ধাপটি মেরে খসে। ইনি হলেন অপরাধী মণিমোহন সমান্দার, আর কপালে এখন ব্যান্ডেজ বাঁধা। এ ছাড়া সাধারণও রয়েছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের অঙ্ককারের দিকে দেখছে। আমাদের পাঁচজনের মাঝখনে টেবিলের উপর রাখা রয়েছে মেলোকর্ড। এইবার বোধহয় ফেলুদা একটা রহস্য উদ্ঘাটন করবে। ফেলুদার ধড়ির কাচ ডেঙে গেছে, আর বাঁ হাতের ক্যাঞ্জিল খানিকটা ভাল উঠে গেছে। রাধারমণবাবুর বাথরুম থেকে ডেটল নিয়ে লাগিয়ে সেখানে সে কম্বল বেঁধে রেখেছে।

হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলতে আরম্ভ করল — ‘মণিমোহন সমান্দারকে আট্টিঃসন্দেহ করতে আরম্ভ করি আজ দুপুর থেকে। কিন্তু তিনি, কেনও একটা বেচাল না চাললে তাঁকে বাগে আনা যাচ্ছুক্ষম না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব। আমি তাই প্রটিকট রিস্ক নিয়েই তাঁকে প্রশ্ন দিচ্ছিলাম। আমাকে আচরণ আচরণ করে বাজলা নিয়ে পানানেটাই হল তাঁর ভুল চাল। শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি সারেন্ড হলেন তার জন্য অবিশ্বিত দাবী সাধনের এয়ারগান।

‘মণিমোহনবাবুর একটা কথায় প্রথম ঘটক লাগে। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন লাগেনি, পরে লাগে। উনি বলেছিলেন পরত ওর প্রেসে ডেভারটাইথ কাজ হচ্ছিল, তাই ওর বাড়ি ফিরতে অনেক বাত হয়েছিল। পরশ ছিল সোমবার। আমি জানি যে-পাড়ায় মণিবাবুর প্রেস, সে-পাড়ায় সম্মান নিয়মিত লোড-শেডিং হয়; আমার এক প্রোফেসর বন্ধু সেই একই পাড়ায় থাকে। আজ ইউরোকা প্রেসে ফোন করে জানতে পারি যে প্রথমত, সোমবার বিকেল থেকে লোড-শেডিং-এর জন্য কাজ বন্ধ ছিল, আর দ্বিতীয়ত, মণিমোহনবাবু দুপুরের পর আর শেদিন প্রেসেই থাননি। এই শিথে কথাটাতেই আমার মনে ভীষণ ঘটক লাগে। আর তার পরেই সন্দেহ হয় — উনি রাধারমণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন

সেটা সত্তি তো ? রাধারমণের মৃত্যুর সময় মণিধারু ছাড়াও একজন লোক সেখানে ছিলেন । তিনি হলেন ডাঙুর চিনামণি বোস । তাঁকে ফোন করে জানতে পারি যে মণিধারু পুরোপুরি সত্তি কখন বলেননি --- রাধারমণের একটা কথা তিনি গোপন করেছিলেন । রাধারমণ আসলে বলেছিলেন — “ধরণী...আমার নামে...চাবি...চাবি...” । ধরণী হল রাধারমণবাবুর নামি । মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁর নাতিকেই কিছু বলার কথা মনে এসেছিল, ভাইপোকে নয় । ভাইপোকে হয়তো সেই অবস্থায় তিনি চিনতেই পারেননি । আসলে নাতির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমণবাবুর মেহ বাধনি । তার অভিনরের প্রশংসা কাগজে বেরোলে তিনি তা কেটে রাখতেন ; কিন্তু যে কথাটা তিনি নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেটা শুনে ফেলল তাঁর ভাইপো । ‘চাবি’ কথাটা শুনে মণিমোহন ঝুঁকলেন যে টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শেষটায় ঝুঁকিন্তে কিছুই বেরোল না । তখন মণিধারুকে গোরেন্দা ঝেঝে মিতিরের কাছে আসতে হল । মতলব এই যে আমি টাকার সম্মান দেব, আর উনি সুযোগ দুঁরে সোচি আসুসাং করবেন । উইল আছে কি না জানা নেই । না থাকলে টাকা নাতি পাবে । আর থাকলে মণিধারুর পাবল সজ্ঞাবনা কম, কারণ আমার বিশ্বাস রাধারমণবাবু তাঁর ভাইপোকে পছন্দ করতেন না ।

‘এখন কথা হচ্ছে, আমার কাছ থেকে কিছু একটা জুকোবার জন্যই নিশ্চয়ই মণিধারুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল । তাঁর মাথায় কি সেদিন কোনও কুর অভিসংক্ষি খেজছিল, যে কারণে তাঁর পক্ষে প্রেসে ধাওয়া স্তুব হয়নি ? সেইদিনই মাঝরাতে যে-লোক রাধারমণবাবুর ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তা হলে মণিমোহন সমাদার ? এটা আমার কাছে শুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ সেদিনই সকালে আমি যখন রাধারমণবাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি, তখন জমাদারের দরজা ভিতর থেকে বক্ষ ছিল । সে দরজা খুলবে কে, এবং কেন ? বাথরুমটা তো আর ব্যবহারই হচ্ছে না । আসলে যে লোক তুকেছে সে সামনের দরজা দিয়ে জার্মনি

তাজা খুলে চুকেছে, সে তাজার সংকেত তার জানা, ঘরে চুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জার্মান তাজা বন্ধ করে, আবার বাথরুম দিয়ে চুকেছে। এই লোক যে মণিমোহন সমাদুর্ব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি বোধহয় বাকি কথাটার মানে বুঝে ফেলে মেলোকর্ড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিতে এসেছিলেন, তাই না ?

আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিবাবুর দিকে গেছে। মাথা হেঁট অবস্থাতেই তিনি আবছা অঙ্ককরে দু'বার মাথা মেঢ়ে হাঁ বললেন।

ফেলুদা বলল, 'চাবি যে বাজনার চাবি সেটা বুবলেও মণিবাবু বোধহয় রাধারমণের ধাকি সংকেতটা ধরতে পারেনি। কারণ অঙ্গটা বুদ্ধি ওঁৰ নেই। এই বাকি সংকেতটা আমি বুবাতে প্যারি আজ বিকেলে, আর সেটার জন্মও দায়ী শ্রীমান সাধন !'

এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে পাখুগুলির দিকে চাইলাম। সেও দেখি বড় বড় চোখ করে কেল্পনার দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, 'তোমার দাদু সুরের ঘন্টায় কী বলেছিলেন সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন !'

সাধন প্রায় ফিস্ক ফিস্ক করে বলল, 'যার নামে সুর থাকে, তার গলাতেও সুর থাকে।'

ফেলুদা বলল, 'ভেরি গুড়। এবার রাধারমণবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা কমে বোঝা যাবে। ষাঁর নামে সুর থাকে। বেশি। সাধনের নামটাই ধরা যাক। সাধন মেন। এবার অ-কার এ-কার বাদ দিয়ে কী দাঁড়ায় দেখা যাক। স, ধ, ন, স, ন। অর্থাৎ গানের সুরের ভাষায় সা ধা নি সা নি। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল। "আমার নামে...চাবি।" রাধারমণবাবু কি এখানে নিজের নামের কঢ়াটাই বোঝাতে চাচ্ছেন ? রাধারমণ সমাদুর রে ধা রে মা নি সা মা দা দা রে ! কী সহজ, অথচ কী ক্লেভার, কী চতুর ! ধরণীধরণ কিন্তু গাইতে পারত, আর তার নামেও দেখছি সুর — ধা রে নি ধা রে সা মা দা দা রে !

'এইটে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম যে ওই মেলোকর্ডেই রাধারমণের ব্যাপ্তি। যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে

রাধারমণবাবুর যে একটা বৌক ছিল সেটা ওই জার্মানি তালা থেকে
বোঝা যায়। এই মেলোকর্ডও জার্মানিতেই তৈরি। স্পীগুলার
কোম্পানি নামে একটি বিখ্যাত বাজনা প্রস্তুতক্ষণক রাধারমণবাবুর
বিশের নির্দেশ অনুযায়ী এই মেলোকর্ড তৈরি করে। কী ভাবিয়ে
এটি সুরজিৎ দাশগুপ্তের হাতে চলে যাওয়া। অবিশ্বিত দেশের
আগে রাধারমণ তার ভিতরের জিনিস নিশ্চয়ই বার করে নিয়েন।
বোধহয় ব্যাকেও আর প্রয়োজন বোধ করছিলেন না তিনি। হয়তো
তাঁর আর বেশিদিন বাঁচা হবে না এটা তিনি সত্তিই বুঝতে
পেরেছিলেন। সুরজিৎ ভদ্রলোকটিকে আমরা মিছিমিছি সন্দেহ
করছিলাম, তা বছিলাম উনি ছাপুবেশী ধরণীধর। আসলে সুরজিৎবাবু
সত্তিই একজন বাজনা পাগল সংগীতজ্ঞ লোক। তার উল্লেখ আমি
গানের বইয়েতে পেয়েছি। আর ধরণীধর সত্তিই তার যাত্রার দলের
সঙ্গে টুরে বেরিয়েছে। এখন জ্যানা দুরক্তির স্বর্ণে তার ভাগো সত্তিই
কোনও অর্ধপ্রাণি আছে কি নাহি। তার অনেক দিন থেকেই একটা
নিজের যাত্রা দল করার প্রস্তুতি; মন্ত্রলোকের একটা ইন্টারভিউতে সে
তাই বলেছে। তোপ্সে — লঠনটা কাছে এনে ধর তো।'

আমি লঠনটা খাটের পাশের টেবিল থেকে তুলে মেলোকর্ডের
পাশে এনে ধরলাম।

ফেলুদা বলল, 'অনেক ধক্কা গেছে এটার উপর দিয়ে। তবে
জার্মানি জিনিস তো --- দেখো যাক রাধারমণের বুদ্ধি আর স্পীগুলার
কোম্পানির কারিগরি মিলে কী জিনিস দাঁড়িয়েছে।'

রাধারমণ সমাদূরের নামের অংশের ধরে ধরে ফেলুদা চাবি
চিপতে আবস্ত করে দিল। টুং টুং টুং টাঁ করে একটা অস্তুত সুর
বেঝোভে মেলোকর্ড থেকে। শেষ সুরটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা
চাবুকের মতো শব্দ করে সকলকে চমকে দিয়ে মেলোকর্ডের ভান
পাশের কাঠটা দরজার মতো খুলে গোল। আমরা ঝুকে পড়ে
দেখলাম সেই দরজাটার পিছনে রয়েছে লাজ ফরমলের লাইনিং
দেওয়া একটা খুপরি, আর সেই খুপরিতে ঠাসা রয়েছে তাড়া তাড়া
একশো টাকার নেট।

নেটগুলো টেনে ধার করে ফেলুদা বলল, 'কমপক্ষে পঞ্চাশ

হাজার । আসুন অবনীবাবু, গোনা যাক ।'

ফেলুদার চোখ লঠনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে । আমি জানি
সেটা লোভ নয় । সেটা তার শান দেওয়া বুকির খানিকটা অংশ
যাটিয়ে ঘনধৰ্মধানো জটিল রহস্য সমাধান করার আনন্দ ।

ମୁଦ୍ରଣ ବିଭାଗ

ଶୁରୁଶୁଟିଆର ଘଟନା ସତ୍ୟଜିତ ରାଯ়



ঝুরঘুটিয়ার ঘটনা

গ্রাম—ঝুরঘুটিয়া

পোঁঁ—পলাশী

জেলা—সন্দীয়া

তরা নতুনের ১৯৭৪

শ্রী প্রদোষচন্দ্র মিত্র মহাশয় সমীক্ষে

সর্বিলয় সিবেদন,

আপনার কীর্তিকলাপের বিষয় অবগত হইয়া আপনার সহিত একটিবার সাক্ষতের বাসনা জাপিয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্য। সেটি আপনি আসিলে আসিতে পারিবেন। আপনি যদি ত্রিয়ান্তৰ বৎসরের বৃক্ষের এই অনুরোধ রুক্ষ করিতে সক্ষম হন, তবে অবিলম্বে পজ মারফত জানাইলে বাধিত হইব।

ঝুরঘুটিয়া আসিতে হইলে পলাশী টেশনে নামিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যাইতে হচ্ছে। শিয়ালদহ হইতে একাধিক ট্রেন আছে; তন্মধ্যে ৩৬৫ আপ আলগোলা প্যাসেজার দুপুর একটা আটান্ন মিনিটে ছাড়িয়া সক্ষা ছাটা এগারো মিনিটে পলাশী পৌছাব। টেশনে আমার গাড়ি থেকিবে। আপনি করে আমারই গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে সাড়ে দশটার একই ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন।

ইতি আশীর্বাদিক
শ্রীকান্তীকিঙ্কৰ মজুমদার

চিঠিটা পড়ে কেলুদাকে ফেরত দিয়ে বললাম, 'পলাশী মানে কি সেই ঝুক্কের পলাশী?'

'আর কটা পলাশী আছে ভাবছিস বাংলাদেশে?' বলল কেলুদা। 'তবে তুই যদি তাবিদ যে সেবালে এখনও অনেক ঐতিহ্যবিহীন চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, তা হলে খুব ভুল করবি। কিন্তু নেই। এমন কী সিরাজদৌলার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশীর নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।'

‘ভুমি কি যাবে?’

ফেনুদা চিঠিটার দিকে কিছুক্ষণ তেমে থেকে বলল, ‘বুড়ো মানুষ ভাকছে এভাবে!—জ্য ছাড়া উদ্দেশ্যটা কী সেটা আনারও একটা কৌতুহল হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—পাড়াগাঁয়ে পীতকাশের সকাল-সন্ধেতে মাঠের উপর কেমন ধোয়া জমে থাকে দেখেছিস? গাছগুলোর খড়ি আর ধার্যার উপরটা খালি দেখা যায়। আর সঙ্কেটা নামে বাপ্ত করে, আর তারপরেই কল্পনে ঠাণ্ডা, আর—নাঃ, এ সব কল্পনা দেখিনি। তোপুসে, দে তো একটা পোষ্টকার্ড।’

চিঠি পৌছাতে তিন-চার দিন লেপে দেতে পারে হিসেব করেই ফেনুদা ধারার তারিখটা অনিয়েছিস কালীকিন্তুর মজুমদারকে। আমরা সেই অনুযায়ী ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্চারে তেপে পলাশী পৌছলায় বাবোই সন্তোষৰ রানিবার সম্প্রদায় সাড়ে ছটায়। ট্রেনের কামরা থেকেই ধান ক্ষেত্রের উপর বাপ্ত করে সঙ্গে নামা দেখছি। স্টেশনে বর্থন পৌছলায় তথন চারিদিকে বাড়িটাতি ঝুলে গেছে, যদিও আকাশ পুরোপুরি অঙ্গকার হয়নি। কালোটুরবাবুর কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যে গাড়িটা চোখে পড়স সেটাই যে মজুমদার মশাইয়ের গাড়ি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরকম গাড়ি আমি কখনও দেখিনি; ফেনুদা বলল ছেলেবেলায় এক-আঁকটা দেখে থাকতে পারে, তবে নাহটা শোলা এটুকু বলতে পারে। কাপড়ের ছড়ওয়ালা, আবাসাভূতের তেমে দেড়া লহা আমেরিকান গাড়ি, নাম হাপমেবিল। গাড়ের পাঢ় লাল রং এখানে ওখানে চটে গেছে, হজের কাপড়ে তিন জায়গায় ভাঙ্গি, তাও কেন জানি গাড়িটাকে দেখলে বেশ সমীহ হয়।

এফন গাড়ির সঙ্গে উর্দিপুরা ছাইভাব থাকলে মানাত তান; যিনি রয়েছেন তিনি পরে অছেন সাধারণ মুত্তি আর সানা শার্ট। তিনি গাড়িতে হেসান দিয়ে বিগারেট খাচ্ছিলেন, আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মজুমদার বাড়িতে আপনাবা?’

‘আজ্জে হ্যাঁ’, বলল ফেনুদা, ‘ঘুরঘুটিয়া।’

‘আসুন।’

ড্রাইভার দরজা খুলে দিলেন, আমরা চাহিশ বছরের পুরনো গাড়ির ডিতর ত্বকে সাফলের দিকে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলায়: ড্রাইভার হ্যান্ড মেরে টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরঘুটিয়ার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

রাত্তা ভাল ময়, গাড়ির প্রথম পুরনো, তাই আরাম বেশিক্ষণ টিকল না। তবুও, পলাশীর বাজার ছাড়িয়ে গাড়ি আমের খোলা রাজ্যের পড়াতেই চোখ আর মন এক সঙ্গে জুড়িয়ে গেল। ফেনুদা ঠিকই বলেছিল; ধানে ভরা ক্ষেত্রে ওপরে গাছপালায় মেরা হোট হোট আম দেখা ধানে, আর তারই আশেপাশে জমাটবাঁধা ধোয়া ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে মেঘের মতো মঝটি থেকে আট-দশ হাত উপরে। চারিদিক দেখে মনে হচ্ছিল একেই বোধ হয় বলে ছবির মতো সুলুব।

এবরকম একটা জ্ঞান্যায় যে আবার একটা পুরনো জমিদার বাড়ি দুর্বলতে পারে সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না; কিন্তু মিনিট দশক চলার পর রাস্তার দুপাশের গাছপালা দেখে বুঝতে পারলাম আম জাম কঁঠাল ভরা একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছি। তারপর রাস্তাটা ভান দিকে ঘুরে একটা পোড়ো মনির পেরোতেই সামনে দেখতে পেলাম নহবৎক্ষনা সমেত একটা শেওলাধরা প্রকাণ সাদা ফটক। আমাদের গাড়িটা তিনবার হর্ন দিয়ে ফটকের ভিতরে চুকতেই সামনে বিশাল বাড়িটা বেরিয়ে পড়ল।

পিছনে সক্ষার আকাশ থেকে লালচাল উবে গিয়ে এখন শুধু একটা গাঢ় বেগুনি ভাব রয়েছে। অন্ধকার বাড়িটা আকারে সামনে একটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা অবস্থা যে প্রায় যান্ত্রিক রাখার মতো সেটা কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম। দেয়ালে সং্যাতা ধরেছে, সর্বাঙ্গে পেলেন্তরা খসে গিয়ে ইট বেরিয়ে পড়েছে, সেই ইটের মধ্যেও আবার ঘণ্টল ধরে তার ভিতর থেকে গাছপালা গজিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ফেলুন্দা প্রশ্ন করল, 'এদিকে ইশেক্ট্রিসিটি নেই বোধহয়?' 'আজ্ঞে না; বলল জ্বাইভার, 'তিনি বছর থেকে অমনি আসবে আসবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে উপর দিকে চাইলে দোতলার অনেকগুলো ঘরের জন্মালা দেখা যায়; কিন্তু তার একটাতেও আলো আছে বলে অনেক হল না। ভান দিকে কিছু দূরে ঘোপঝাড়ের ঢাক দিয়ে একটা ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে, যাতে টিমাটিম করে একটা লঞ্চন জুলছে। বোধহয় মালি বা দারোয়ান না। ওইরকম কেউ থাকে ঘৰটাতে। ঘনে ঘনে বগলাম, ফেলুন্দা ভাল করে ঘোঝবৰ না নিয়ে এ কেখার এসে হাজির হল কে জানে।

একটা লঞ্চনের আলো এসে পড়ল বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাইরের জমিতে। তারপরেই একজন বুড়ো চাকর এসে দরজার মুখটাতে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে জ্বাইভার গাড়িটাকে নিয়ে গেছে বোধহয় গ্যারেজের দিকে। চাকরটা ভুক্ত কুঁচকে একবার আমাদের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ভিতরে আসুন।' আমরা দুজনে তার পিছন পিছন বাড়ির ভিতর চুকলাম।

শঙ্গায়-চওড়ায় বাড়িটা যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আর সবই কেমন হেন ছোট ছোট। দরজাগুলো বেঁটে বেঁটে, ঘোনালাগুলো কলকাতার যে কেলও সাধাৰণ বাড়ির জন্মালাব অর্ধেক, ছাতটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ফেলুন্দাকে জিজ্ঞেস করতে বলল দেড়শো-মুশো বছর আগের বাংলা দেশের জমিদার বাড়িগুলোর বেশির ভাগই নাকি এই ইকমই ছিল।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ভান দিকে দূরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই একটা আশৰ্ব সতুন জিনিস দেখলাম। ফেলুন্দা বলল, 'একে বলে চাপা-দরজা।

ভাকাতদের আটকাবাবু জন্য এরকম দরজা তৈরি হত । এ দরজা বন্ধ করলে আর খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে না তাঁজ হয়ে মাথার উপরে সিলিং-এর মতো টেরচাতাৰে অন্দে পড়ে । দরজার পায়ে বে ফুটোওলো দেখছিস, সেওলো দিয়ে বন্ধ চুক্তিৰে ডাকাতদের ঝুঁটিয়ে ভাড়ানো হত ।

দরজা পেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা, তাৰ শেষ মাথায় কুলাপিতে একটা প্রদীপ ঢুলছে । তাৰই পাশে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে চুক্তাম আমুৱা তিনজনে ।

এ ঘৰটা বেশ বড় । আৱণ বড় মনে হত যদি এত জিনিসপত্র না থাকত । একটা প্রকাষ ঘাট ঘরেৰ প্রায় অর্ধেকটা দখল কৰে আছে । তাৰ মাথার দিকে নীচে পাশে একটা টেবিল, তাৰ পাশে একটা সিন্দুক । এ ছাড়া চেয়াৰ রয়েছে তিনটে, একটা এমনি আলমারি, আৱ মেঝে থেকে ছাত অৰ্ধধি বইয়ে ঠাসা বী পাশে একটা টেবিল, তাৰ পাশে একটা সিন্দুক । এ ছাড়া চেয়াৰ রয়েছে আৱ রয়েছে খাটেন উপৰ কফল মুড়ি দিয়ে শোয়া একজন বৃক্ষ উদ্ভোক । টেবিলৰ উপৰ রাখা একটা মোমধাতিৰ আলো তাৰ মুখে পড়েছে, আৱ সেই আলোতে বুৰাতে পঞ্জি সাদা দাঢ়ি গোকেৰ ফাঁক দিয়ে উদ্ভোক আমাদেৱ দিকে চেয়ে হসছেন :

‘বসুন’, বললেন কালীকিন্দৰ মজুমদাৰ । ‘নাকি বোসো বলব? তুমি তো দেখছি বয়সে আমাৰ চেয়ে অৰ্ধেকেৰও বেশি ছোট । তুমিই বলি, কী বলো?’

‘নিশ্চয়ই।’



ফেলুদা আমার কগা চিঠিতেই লিখে সিঁড়েছিল, এখন আলাপ করিয়ে দিন। একটা জিনিস নক্ষ করলাম যে আমাদের দুজনেরই নম্বকারীর উপরে উনি কেবল ধারা গাড়লেন।

‘বাটের সামনেই দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসলাম আমরা দুজনে।

‘চিঠিটা পেয়ে কৌতুহল হয়েছিল নিঃচ্ছবি’, অন্দরোক হালকা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

‘না হলে আর অ্যান্দুর আসি?’

‘বেশ, বেশ।’ ফেলুদা খশাই সত্ত্বাই খুঁতি হয়েছে, এটা বেশ বোজ যাচ্ছিল। ‘না এসে আমি দুখে পেতাম। মনে করতাম তুমি দাঙ্গিক। আর তা ছাড়া তুমিও একটা পাঞ্চায়া থেকে বাঞ্ছিত হতে। অবিশ্বাসি আমি না এ সব বই তোমার আছে কি না।’

অন্দরোকের দৃষ্টি টেবিলের দিকে মুরে গেল। চারটে মোটা মোটা বই রাখা রয়েছে ঘোমবাতির পাসেই। ফেলুদা উঠে শিয়ে বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বলল, ‘সর্বনাশ, এ যে দেখছি সবই দুশ্প্রাপ্য বই। আর অন্তেকটা আমার পেশা সম্পর্কে। আপনি নিজে কি কোনওকালে—?’

‘না’, অন্দরোক হেসে বললেন, ‘আমি নিজে কোনওদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার শুধুবরণসের একটা শব্দ বা “হবি”। আজ থেকে বাহ্যিক নভৰ আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুনিষ লাগানো হয়। য্যালক্ষ বলে এক সাহেব-গোয়েন্দা খুনি ধরে দেয়। সেই য্যালক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতুহল হয়। তখনই এইসব বই কিনি। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস পোয়েন্দা কাহিনী পড়ারও খুব শখ হয়। এমিল প্যারেরিও-র নাম উন্মেছু।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎসাহের সঙে বলে উঠল ফেলুদা, ‘ধরানি লেখক, প্রথম ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখেন।’

‘হ্যাঁ, যাত্রা মেডে খশশেন কাশীবিক্ষর মজুমদার, ‘তার সব কটা বই আমার আছে। আর তা ছাড়া এডগার অ্যালেন পো, কোনান ডয়েল, এ সো আছেই। বই যা কিনেছি তার সবই চতুর্প বছর বা তারও বেশি আগে। তার চেয়ে বেশি আধুনিক কিছু নেই আমাত্র কাছে। আজকাল অবিশ্বাসি এ সাইনের কাজ অনেক দেশি অংসুর হয়েছে, অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে, তবে তোমার বিষয় যেটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় তুমি আরও সরলভাবে, প্রধানত ঘণ্টিকের উপর নির্ভর করে কাজ করছ। আর বেশ সাজেসংকুলি করছ।—কখন্টা ঠিক দাঢ়েছি তি?’

‘সাজেসের কথা জানি না, তবে পক্ষতি সহকে যেটা বললেন সেটা ঠিক।’

‘সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।’

অন্দরোক একটু থামলেন। ফেলুদা নিজের জায়গায় হিঁরে এসেছে।

মোহবরাটির হৃত শিখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'আমার যে তধু সম্মেরের উপর বরস হয়েছে। তা নয়, আমার শরীরও আল নেই। আমি চলে গেলে এ সব বইয়ের কী দশা হবে জানি না; তাই ভাবলাম অন্তত এই কটা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে এগোৱাৰ ধন্দ হবে, কদম্ব হবে।'

ফেনুদা অবাক হয়ে তাকের বইগুলোর দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সবই কি আপনার নিজের বই?'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইয়ের শব্দ যন্ত্রমদার বৎশে একমাত্র আমারই। আর নানা বিষয়ে যে উৎসাহ হিল আমার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

'তা তো বটেই। আর্কিয়লজির বই রয়েছে, আর্টের বই, বাগান সমস্যে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী...এমন কী খিয়েটারের বইও তো দেখছি। তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে যানে হচ্ছে। এখনও বই কেলেন নাকি?'

'তা কিনি বইকী। রাজেন বলে আমার একটি মানেজার গোছের লোক আছে, তাকে যাসে দু'তিমিনির করে কলকাতায় বেতে হয়, তখন লিস্ট করে দিই, ও কলেজ ছাত্র থেকে নিয়ে আসে।'

ফেনুদা টেবিলের উপর রাখা বইগুলোর দিকে দেখে বলল, 'আপনাকে যে কী বলে ধন্বাদ দেব বুঝতে পারছি না।'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইগুলো নিজের হাতে করে তোমার হাতে শুলে দিতে পারলে আরও বেশি বুশি হতাম, কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে।'

আমরা দুজনেই একটু অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। উনি হ্যাত দুটো কম্বলের তলায় চুকিয়ে রেখেছে টিকই, কিন্তু সেটার যে কেন্দ্রও বিশেষ কারণ আছে সেটা বুঝতে প্যারিনি।

'আরপ্রাইটিস জানো তো? যাকে সোজা বাংলায় এলে গেঁটে বাত। হ্যাতের আঙুলগুলো আর ধ্যাবহার করতে পারি না। এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে, নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়ে-টাইয়ে দেয়।'

'আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?'

'না, ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষ্ণবিক ধ্যাপারগুলো এই দেখে। তাহার ভাবার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহুবস্তুর থেকে। পশাশীতে ভাল ভাঙ্গার নেই।'

পক্ষ্য করছিপাম কেনুদার দৃষ্টি ধ্যাকে চলে যাচ্ছে যারের কোণায় রাখা সিন্দুকটার দিকে। ও বলল, 'আপনার সিন্দুকটার একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। তালা-চাবির দ্বিতীয় নেই দেখছি। কখিনেশনে খোলে বুঝি!'

কালীকিঙ্করবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। একটা বিশেষ সংখ্যা আছে;

মেই অনুযায়ী নবটা ঘোরালে তবে সোলে । এ সব অঞ্চলে এককালে ভাকাতদের শূন্য উপদ্রব ছিল, জানো তো । অম্মার পূর্বপুরুষই তো ভাকাতি করে জমিদার হয়েছে । তারপর আবার আম্মাই ভাকাতের হ্যতে লাঙ্গনা ভোগ করেছি । তাই মনে হয়েছিল তালার বদলে কঁথিমেশন করলে হ্যতো আর একটু নিরাপদ হবে ।



কথাটা শেষ করে জ্বর্দ্দলোক তুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন । তারপর তাঁর ৮ কর্তৃর নাম ধরে একটা হাত দিলেন । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো গোকুল এসে পাইর হল । কালীকিছিরবাবু বললেন, 'একবার খাচটা আম তো গোকুল । এন্দের দেশৰ ।'

গোকুল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা খাচায় একটা টিয়া নিয়ে এসে আসিয়ে । মোমবাতির আলোয় টিয়ার চোখ দুটো জুলজুল করছে ।

কালীকিছিরবাবু পাখিটার দিকে চেয়ে বললেন, 'তলো তো মা,—ত্রিময়ন, ত্রিময়ন—তলো তো ।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ । তারপর আচর্য পরিকার গলায় পাখি বলে উঠল, 'ত্রিময়ন, ও ত্রিময়ন !'

আমি তো থ । পাখিকে এত পরিকার কথা বলতে কথনও উনিনি । কিছু ক্ষানেই শেষ না । সঙ্গে আরও দুটো কথা কুড়ে দিল টিয়া—'একটু জিজ্ঞো !'

তারপর আবার পুরো কথাটা পরিকার করে বলে উঠল টিয়া—'ত্রিময়ন, ও ত্রিময়ন—একটু জিজ্ঞো !'

ফেনুদার তুরু কুঁচকে গোছে । বলল, 'ত্রিময়ন কে ?'

কালীকিঙ্করবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'সেটি বলব না তোমাকে। তবু এইটুকু বলব যে যেটা বলছে সেটা হল একটা সংকেত। বাবো ষষ্ঠি সময় আছে তোমার। দেখো তে তুমি সংকেতটা বাব করতে পার কি না। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে বলে দিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না সেটা জানতে পারি কি?'

'বিশ্বাস পার', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের স্বরূপজী কমে আসে সেটা জানো তো? বজ্র তিনেক আগে একদিন সকালে হঠাতে দেখি সিন্দুকের সংকেতটা ঘনে আসছে না। বিশ্বাস করবে?—সাধারণে চেষ্টা করেও নমুনটা ঘনে করতে পারিনি। শেষটায় ঘনে পড়ল মাঝরাত্রি। নমুনটা লিখে রাখিনি কোথাও, কারণ কখন যে কার কী অতিসর্কি হয় সেটা তো বলা যাব না। তাই মনে হয়েছিল ওটা মাঝায় রাখছি ভাল। এক আমার ছেলে জ্ঞানজ, কিন্তু সে থাকে বাইরে বাইরে। তাই পরদিনই একটা টিক্কা সংগ্রহ করে নমুনটা একটা সাধকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটাকে পড়িয়ে দিই। এখন ও মাঝে মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে—অন্য পারি যেমন বলে "রাধাকিষণ" বা "ঠাকুর জাত দাও"।'

ফেলুদা সিন্দুকটার দিকে দেখছিল। হঠাতে জ্ঞানটি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। তারপর ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে যোমবাতিটা তুমে নিয়ে আবার গেল সিন্দুকটার দিকে।

'কী দেখছ তাই?' বললেন কালীকিঙ্করবাবু। 'কোম্বার ডিটেকটিভের চোখে কিন্তু ধো পড়ল নাবি?'

ফেলুদা সিন্দুকের সামনেটা পরীক্ষা করে বলল, 'আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে ঘনে হয়। বোধহয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।'

কালীকিঙ্করবাবু গভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি এ বিষয়ে নিষ্ঠিত?'

ফেলুদা মোমবাতিটা আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'ঝাড়পেছ করতে গিকে এরকম দাগ পড়বে বলে ঘনে হয় না। কিন্তু এ খরলের ঘটনার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই জাল বল্পাত পারবেন।'

কালীকিঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'বাড়িতে লোক বলতে তো আমি, গোকুল, বাজেন, আমার জ্ঞানভাব মণিলাল ঠাকুর আর ঘালি। আমার ছেলে বিশ্বাস দিন পাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবাবে এসেছে—ওই যা বললাম—আমার অসুবিধের খবর পেয়ে। গত সোমবার সকালে আমার বাগানের বেঁকিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্দরুন দেখে আবার বেঁকিতেই পড়ে যাই।

রাজেন পলাশী থেকে বিশ্বনাথকে কোন করে দেবৰ ; ও পৰদিন ডাক্তার নিষে চলে আসে ; অন্মে হচ্ছে একটা ছোটখাটো হার্ট আটাক হয়ে গেল । যাই হোক— আমার এমনিতেও আৱ বেশিদিন নেই সেটা আমি জানি । এই শেষ কটা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে ; আমার ঘৰে চুকে ডাকাত আমার সিন্দুৰ ভাঙবে ?

ফেলুদা কালীকিঙ্কৰবাবুকে আশ্বাস দিল ।

‘আমাৰ সন্দেহ নিৰ্ভুল নাও হতে পাৰে ; হয়তো সিন্দুৰটা যখন প্ৰথম বসানো হয়োছল তখন ঘৰাটা লেগেছিল । দাগতোলা টাটকা না পুৱনো সেটা এই মোমবাতিৰ অলোচনে বোৰা যাবে না । কাল সবালৈ আৱ একবাৰ দেখোৰ । আপনাৰ চাকুৰটি বিশ্বাসী তো ?’

‘গোকুল আছে প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰ ।’

‘আৱ রাজেনবাবু !’

‘রাজেনও পুৱনো লোক । মনে তো হয় বিশ্বাসী । তবে ব্যাপৰটা কী জান— অজ্ঞ যে বিশ্বাসী, কাল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা কৰবে না এমন তো কোনও গ্ৰহণান্তি নেই ।’

ফেলুদা যাদা নেড়ে কথাটোৱ সাব দিয়ে বলল, ‘যাই হোক, গোকুলকে বলকেন একটু দৃষ্টি ব্যৱতৈ । আমাৰ মনে হয় না চিন্তাৰ কোনও কাৰণ আছে ।’

‘যাক !’

কালীকিঙ্কৰবাবুকে খানিকটা আশ্বস্ত বলে মনে হল ; আমৰা উঠে পড়লাম । অনুশোক বললেন, ‘গোকুল তোমাদেৱ ঘৰ দেখিয়ে দেবে । লেপ কৰল তোশক বালিশ মশারি—সব কিছুই ব্যৱস্থা আছে । বিশ্বনাথ একটু বহুমুৰে গেছে— এই ফিরল বল্দে । ও এলে তোমৰা থাওয়া-দাওয়া কৰে নিয়ো । কাল সকালে ঘৰাব আগে যদি চাও তো আমাৰ গাড়িতে কৰে আশেপাশে একটু ঘূৰে দেখে নিয়ো । যদিও দুটো বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নহ ।’

ফেলুদা টেবিলের উপৰ পেকে বইগুলো নিয়ে এল । গুড নাইট কৰাৱ আগে কালীকিঙ্কৰবাবু আৱ একবাৰ হেয়ালিং কথাটো মনে কৰিয়ে দিলেন ।—

‘গুটোৱ সমাধান কৰতে পাৱলে তোমাকে আমাৰ প্ৰাৰ্বদ্ধিত সেটো উপহাৰ দেব ।’

গোকুল আমাদেৱ সঙ্গে নিয়ে দুটো বাগানৰ পেৱিয়ে আমাদেৱ ঘৰ দেখিয়ে দিল ।

আগে থেকেই ঘৰে একটা শৰ্টন বাবা ছিল । সুটকেশ আৱ হোল্ডঅলও দেখলাখ ঘৰেৱ এক কোপে বোৰা বয়েছে । কালীকিঙ্কৰবাবুৰ ঘৰেৱ জেয়ে এ ঘৰটা ছোট হলেও, জিলিসপত্ৰ কম খাকাতে হাঁটাচলাৰ জায়গা এটাতে একটু বেশিই । ফৰসা চানৰ পাতা খাটেৱ উপৰ বাসে ফেলুদা বলল, সংকেতটা মনে পড়ছে, তোপসে ?’

এইরে! তিনঘন মাসটা মনে আছে, কিন্তু সমস্ত সংকেতটা জিজ্ঞেস করে ফেলুন প্যাচে কেলে দিয়েছে।

‘পারলি না তো? বোলা থেকে আবার খাতাটা বার করে সংকেতটা শিখে কেস। গ্যাবেগিওর বইগুলোর ওপর বেজায় শেষ হচ্ছে।’

বাত্তা পেমসিল নিয়ে বসর পর ফেলুন বলল, আর আমি গোটা গোটা অস্তরে লিখে ফেললাম—

‘তিনঘন, ও তিনঘন... একটু জিরো।’

লিখে নিজেরই মনে হল এ আবার কীরকম সংকেত। এর তো মাথা মুড় কিছুই বোকা যায় না। ফেলুন এর সমাধান করবে কী করে?

ফেলুন এদিকে বিছানা হেঢ়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে দেখছে। জ্যোত্তা রাত। বোধহয় পূর্ণিমা। আমি ফেলুনোর পাশে গিয়ে দাঢ়ালাম। এটা বাড়ির পিছন দিক। ফেলুন বলল, ‘একটা মৃত্যু-টুকুর পোছের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে তান দিকটায়।’ ঘন গাছগালার ফাঁক দিয়ে দূরে জল চিব্মিক করছে সেটা আধিও দেখেছি।

একটানা কিংবি ডেকে চলেছে। তার সঙ্গে এই অজ্ঞ ঘোগ হল শ্রেণীরের ভাক। আমার মনে হল এত নির্জন জায়গায় এর আগে কখনও আসিনি।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, ফেলুন পানা দুটো বক্স করতেই একটা হটেটের আওধার্জ পেলাম। এটা অন্য গাড়ি, সেই বিশাল প্রাচীন আমেরিকান গাড়ি নয়।

‘বিশ্বাস মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্ছে’, ফেলুন মন্দ্ব্যা করল। তার মানে এবার খেতে ভাকবে। সত্ত্ব বলতে কী, বেশ বিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটায় ত্রিন ধরব বসে সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। পথে রাণাঘাট টেক্সনে অবিশ্বিয় মিঠি আর টা খেয়ে শিয়েছিলাম। হয়তো এমনিতে বিদে পেত না, কারণ ঘড়িতে বলছে সবেমাত্র আটটা বেজেছে, কিন্তু এখানে তো আর কিছু করার নেই—এমন কী লঠনের আলোতে বইও পড়া যাবে না—তাই মনে হচ্ছিল খেয়ে-দেয়ে কস্তুর তলায় চুক্তে পারলে মন হয় না।

জ্বরক্ষণ খেয়াল করিনি, এবার দেখলাম আমাদের ধরের দেওয়ালে একটা ছবি রয়েছে, আর ফেলুন সেটার দিকে চেয়ে আছে। কেটো নয়; আঁকা ছবি আর বেশ বড়। সেটা যে কালীকিঙ্করণাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কেনেও সন্দেহ নেই। খলি গায়ে বসে আছেন ধারু চেয়ারের উপর; পাকানো গোকুল, কাঁধ অবধি লম্বা চুল, টানাটানা চোখ, আর বিস্তার চওড়া কাঁধ।

‘মুত্তো ভাণ্ডা কুণ্ঠি করা শরীর’, ফিল ফিল করে বলল ফেলুন। ‘মনে হচ্ছে ইনিই সেই অথম ভাকাত জৰিদার।’

বাইরে পায়ের শব্দ। আমরা দুজনেই দুরজাব দিকে চাইলাম। গোকুল বাইরে একটা লঠন রেখে গিয়েছিল, তার আলোটা চেকে প্রথমে একটা ছায়া

বরের হেকেতে পড়ল, আর তারপর একটা অচেনা আনুষ চৌকাটের কাছিয়ে এনে দাঁড়াল ।

ইনিই কি বিশ্বনাথ অজ্ঞিনীর না, হচ্ছেই পারে না ! খাটো করে পরা ধূতি, গায়ে ছাই রঙের পাঞ্জাবি, ঝুঁপো গৌক আর চোখে পুরু চশমা । অদ্বিতীয় গলা বাড়িয়ে কূকু কুচকে বোধহৱ আমাদের পুঁজিহেন ।

‘কিছু বলবেন রাজেনবাবু?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল ।

অদ্বিতীয় খেল একঙ্গে আমাদের দেখতে গেলেন । এবার সর্দি-বসা গলার কথা এলৈ—

‘ছোটবাবু কিরেছেন । তাঁত দিতে বলেছি; গোকুল আপনাদের খবর দেবে ।

রাজেনবাবু চলে গেলেন ।

‘কীসের গুরু বলো তো?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে ।

‘বুঝতে পারছিস নাই ন্যায়থ্যালিন । গরম পাঞ্জাবিটা সবেমাত্র বার করেছে ট্রাক থেকে ।’

রাজেনবাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝতে পারলাম আমরা কী আচর্য থমথমে পরিবেশের মধ্যে রয়েছি । এরকম জায়গায় দিনের পর দিন আনুষ থাকে কী করেই ফেলুদা! পাশে থাকলে সাইনের অভাব হবে না জানি, বিস্তু না থাকলে এই অদ্বিতীয়ের পোড়ো ঝন্মিনার বাড়িতে পাঁচ মিনিটও থাকার সাধ্য হত না আমার । কালীকিঙ্করবাবু আবার নিজেই বললেন এ বাড়িতে নাকি এককালে বুন হয়েছিল । কোন্ত ঘরে কে জানে!

ফেলুদা এর মধ্যে নষ্টন সমেত টেবিলটাকে কাছে টেনে এনে খাটো বসে খাজা খুলে সংকেত দিয়ে ডাবা শুরু করে দিয়েছে । ১-একবার যেন ত্রিনয়ন বলে বিড়বিড় করতেও শনলাম । আমি আবার কী করি, দুরজ্জা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের বারান্দার গিয়ে দাঁড়ায় ।

ওটা কী! বুকটা ধড়াস করে উঠল । কী জানি একটা নড়ে উঠেছে বারান্দার এনিকটা—যেখানে লাঠনের আস্য অঙ্ককারে খিশে গেছে ।

দাঁত দাঁতে চেপে রইলাম অঙ্ককারের দিকে । এবার বুঝলাম ওটা একটা বেড়াল । ঠিক সাধারণ সাদা বা কালো বেড়াল নয়; এটার গায়ে বাসের মতো ডোরা । বেড়ালটা কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃঢ়ে চেঝো থেকে একটা হাই তুল উলটো দিকে ফিরে হেলতে দুলতে অঙ্ককারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । তার কিছু পরেই শনলাম কর্কশ গলায় চিরার ডাক । তারপরেই আবার সব চুপচাপ । বিশ্বনাথ বাবুর ঘরটা কোথায় কে জানে । তিনি কি দোতলায় থাকেন না একঙ্গায়! রাজেনবাবুই বা কোথায় থাকেন? আমাদের এখন কী দিয়েছে কেন যেখান থেকে কারূর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না!

আমি ঘরে ফিরে এলাম । ফেলুদা খাটোর উপর পা তুলে দিখে খাজো হাতে নিয়ে ভাবছে । আব নাই পেরে বললাম, ‘এবা এত দেরি করছে খেল বলো তো?’

ফেলুন্দা বড়ি দেখে বলল, 'তা মন্দ বলিসনি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল।' বলেই আবার কাজার দিকে মন দিল।

আমি ফেলুন্দার পাওয়া বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলাম; একটা বই অঙ্গুলের ছাপ সংযোগে, একটার নাম 'ক্রিমিলজি', আর একটা 'জাইম অ্যান্ড ইঁটস ডিটেকশন'। তার নথির বইটার নামের মানেই বুকতে পারলাম না। তবে এটার অনেক জুবি রয়েছে, তার মধ্যে পর পর দশ পাতায় তধু বিভিন্ন রকমের পিণ্ডল আর বন্দুক। ফেলুন্দা রিভলভারটা সঙ্গে এনেছে কি?

প্রশ্নটা হাতায় আসতেই মনে পড়ল ফেলুন্দা তো গোয়েন্দাপিলি করতে আসেনি; আর সেটার কোনও প্রয়োজনও নেই। কাজেই রিভলভারেরই ব্য দরকার হবে কেন?

বইগুলো সুটকেলে রেখে খাটো বসতে যাব, এমন সময় আচমকা অচেনা গলায় আওয়াজ পেরে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল।

এবারের সোকটিকে চেনায় কোনও অসুবিধা নেই। ইনি গোকুল নন, রাজেনবানু নন; গাড়ির ড্রাইভার নন, আর রান্নার ঠাকুর তো ননই। কাজেই ইনি বিশ্বনাথবু ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

'আপনাকে অনেক দেরি করিয়ে দিলাম', অন্দরোক ফেলুন্দাকে নমস্কার করে বললেন। 'আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।'

সেটা আর বলে দিতে হয় না। বাপের সঙ্গে বেশ যিল আছে, চেহারায়। বিশেষ করে চোখ আর নাকে। বরস চাহিশ-পঁজাট্টিশ হবে, মাথার চুল এখনও সবই ঝঁঁচা, পোক-দাঢ়ি নেই, ঠোট সুটো অসম্ভব রকম পাতলা। অন্দরোককে আমার ভাল লাগল না। কেন ভাল লাগল না সেটা অবিশ্য বলা যুক্তিল। একটা করবৎ বোধহয় উনি আমাদের এতক্ষণ খসিয়ে রেখেছেন, আর আবেকটা কারণ— যদিও এটা চুল হতে পারে—অন্দরোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেও সে হাসিটা কেন জানি খাটি বলে মনে হল না। যেন আসলে সজি করে আমাদের দেবে ঝুশি হননি; সেটা হবেন আমরা চলে গেলে পর।

ফেলুন্দা আর আমি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে নীচে দেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম খাবার ঘরে। আমি ভেবেছিলাম যাটিতে বসে বেতে হবে—এখন দেখছি বেশ বড় একটা জাইনিং টেবিল রয়েছে, আর তার উপরে কুপোর ধালা বাটি শেলাস সাজানো ইমেছে।

যে-যাব জায়গায় বসার পর বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'আমার আবার কি শীত কি শ্রীম দুর্বেলা তান করার অভ্যাস, তাই এজু দেরি হয়ে গেল।'

অন্দরোকের গা থেকে দাঢ়ি সাধারণের গুঁজ পেয়েছি আগেই; এখন মনে হচ্ছে যোধহয় সেন্টও মেরে এনেছেন। বেশ শৌখিন সোক সন্দেহ নেই। সাদা সিকের পাটের উপর গাচ সরুজ রঙের হাত কাটা কার্ডিগ্যান, আর তার সঙ্গে ছাই রঞ্জের টেরিলিনের প্যাস্ট।

বাটি চাপা ভাত ভেঙে মোচার ঘট দিয়ে খাওয়া গুরু করে দিলাম। ধালার চারপাশে গোল করে সাজালে বাটিতে রায়েছে আরও তিনি লকমের তরকারি, সোনা মুগের ডাল, আর কই মাছের কোলে।

‘বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

‘হ্যাঁ, বলল ফেলুন। উনি আমাকে ভীৰুৎ লজ্জায় হেলে দিয়েছেন।

‘বই উপহার দিয়ে?’

‘হ্যাঁ। আজকের বাজারে ওই বই ষদি পাওয়াও থেকে তা হলে দাদ পড়ত কমপক্ষে পাঁচ-সাত শো টাকা।’

বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন, ‘আপনাকে ভেকে পুঁটিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ এখনু ধৰকই দিয়েছিলাম। শহরে লোকদের এই অজ পাড়াগাঁৰে ভেকে এনে কষ্ট দেবাব কোনও মানে ইয়ে না।’

ফেলুন কথটার প্রতিবাদ কৱল,

‘কী বলছেন মিষ্টার মজুমদার। আমির তো এখানে এসে দানুৎ লাভ হজেছে। কষ্টের কোনও কথাই অন্তে না।’

বিশ্বনাথবাবু ফেলুনুর কথায় তেমন আগল না দিয়ে বললেন, ‘আমির তো এই চার দিনেই আপ ইংগিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানি না।’

‘বাইরে এলাবাবেই যান না?’

‘তবু তাই না। বেশির ভাগ নমুনাই ওঁর এই অক্ষমতা দ্বারে খাটের উপর পড়া ধাকেন। দিনে কেবল দুৰ্বার কিছুক্ষণেও জন্ম বাগানে গিয়ে বসেন। এখন অবিশ্বিত শয়ীরের জন্ম সেটাও বুক।’

‘আপনি আর ক’দিন আছেন?’

‘আমি? আমি কাজই যাব। বাবার এখন ইমিভিয়েট কোনও তেজার নেই। আপনারা তো বোধহয় সাড়ে খটটার ত্রৈনে ফিরছেন?’

‘আজ্জে হ্যাঁ।’

‘তা হলে আপনারাও ধাবেন, আর আমিও বেরোব।’

ফেলুনো ভাতে ডাল তেলে বলল, ‘আপনার বাবার তো নানারকম শখ দেখলাম; আপনি নিজে কি একেবাবে সেট পাসেট ব্যবসাদার।’

‘হ্যাঁ মশাই। কাজকষ করে আৱ অনা কিছু কৰাৰ প্ৰয়ুতি থাকে না।’

বিশ্বনাথবাবু কষ্ট থেকে বিদায় নিয়ে আনুৱ যখন যাবে ফিরে এলাম তখন বেজেছে প্রায় সাড়ে নটা; এয়ানে খড়িৰ টাইমের আৱ কোনও মানে নেই আমাৰ কাছে, কাৰণ সাতটা থেকেই হলে হচ্ছে মাৰুৱান্ডিৰ।

ফেলুনোকে বললাম, ‘বালিশওলোকে উশটো দিকে কৱে শলে তোমাৰ কোনও অ্যপন্তি আছে?’

‘কেন বলু তো।’

‘তা হলে আর চোখ খুললেই ডাকাতবাবুটিকে দেখতে হবে না।’

ফেলুন্দা হেসে বলল, ‘ঠিক আছে। আমার কোমও আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের চাহনিটা যে আমারও খুব ভাল সাগরিল তা বলতে পারি না।’

শোবার আগে ফেলুন্দা লঞ্চনের আলোটাকে কমিয়ে দিল, আর তার ফলে ঘরটাও বেন আরও ছোট হয়ে গেল।

চোখ যখন প্রায় দুজু এসেছে, তখন হঠাতে ফেলুন্দাৰ খুঁকে ইঞ্জিনিয়ে কথা জনে অবাক হয়ে এক ধাক্কার খুম ছুটে গেল। স্পষ্ট বসলাম ফেলুন্দা বলল—

‘দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন গো।’

আমি কনুইয়ের ভর করে উঠে বসলাম, ব্রাউন ক্রেগ। কাক আবার ব্রাউন ইয়ে নাকি? এ সব কী আবোল-তাবোল ধকছ ফেলুন্দা?’

‘গ্যাবোরিন্স বইতলো বেধহজ পেয়ে গেলাম তে তোপসে।’

‘সে কী? সমাধান হয়ে গেল?’

‘খুব সহজ।...এদেশে এসে সাহেবকা যখন গোড়ার দিকে হিন্দি শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতগুলো কায়দা বার করেছিল। দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন কেো—এই কথাটার সঙ্গে কিছু বাদামি কাকের কোমও সম্পর্ক নেই। এটা আসল সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে—দরওজাজা বন্ধ করো। এই জিনয়নের ব্যাপারটাখ কতকটা সেই রকম। গোড়াত্ত জিনয়নকে তিন ভেবে আর বার হেঁচু খালিলাম।’

‘সে কী? ওটা তিন নয় বুঝি? আমিও তো ওটা তিন ভাবছিলাম।’

‘উহ। তিন নয়। জিনয়নের প্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে থিলে প্রি-নাইন। “জিনথন ও জিনয়ন হল প্রি-নাইন-ও-প্রি-নাইন। এখালে “ও” জানে “জিরো” অর্থাৎ শূন্য।’

আমি লাইসেন্স উঠলাম।

‘তা হলে একটু জিরো মানে—’

‘এইট-টু-জিরো; জলের মতো সোজা।—সুতরাং পুরো সংখ্যা হচ্ছে—প্রি-নাইন-জিরো-প্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। কেমন, চুক্তি মাথার? এবার ঘুমো।’

মনে ঘনে ফেলুন্দাৰ বুঝিৰ তাৰিখ কৰে আবার বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুঝতে যাব, এমন সময় আবার বারাদায় পায়েৰ আওয়াজ।

বাজেনবাবু।

এত রাত্রি ভদ্রলোকের কী দৰকাৰ?

আবার ফেলুন্দাকে জিজ্ঞেস কৰতে হল, ‘কিছু বলবেন বাজেনবাবু?’

‘ছোটবাবু জিজ্ঞেস কৰলেন আপনাদেৱ আৱ কিছু দৰকাত সাপৰে কি না।’

‘না না, কিছু না। সব ঠিক আছে।’

ভদ্রলোক যেবাবে এসেছিলেন সেইভাৱেই আবার চলে গেলেন।

চোখ বন্ধ কৰার আগে খুবতে পারলাম জানালার থড়খড়ি দিয়ে আসা চাঁদেৱ

আলোটা হঠাৎ কিকে হয়ে গেল আর মেই সঙ্গে শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গর্জন। তারপর কেড়ালটা কোথেকে জানি দুবার ম্যাও ম্যাও করে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সকালে উঠে দেখি ফেনুদা ঘরের জানালাগুলো বুলছে। বলল, 'রাত্তির বৃষ্টি হয়েছিল টেব পাসনি!'

বায়ে থাই হোক, এখন যে মেঘ কেটে গিয়ে বলমলে বোন বেরিয়েছে সেটা আটে শোয়া অবস্থাতেও বাইরের গাছের পাতা দেখে বুঝতে পারছি।

আমরা ওঠার আধ ঘটার মধ্যে চা এনে দিল বুড়ো পোকুল। দিনের আলোতে তাল করে শুর মুখ দেখে মনে হল গোকুল যে তখ বুড়ো হয়েছে তা নয়; তার মতো এমন ক্ষেত্রে গড়া দৃঢ়ী ভাব আমি শুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি।

'কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন!' ফেনুদা জিজ্ঞেস করল।

গোকুল কানে কম শোনে কি না জানি না; সে প্রশ্নটা শনে কেবল হেন ফ্যাল-ফ্যাল শুধ করে ফেনুদার দিকে দেখল; তারপর ছিটীয়বার জিজ্ঞেস করতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ধর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে সাতটা নাগাত আমরা কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

অদ্বীলোক ঠিক কালকেরই মতো বিহুনায় শুয়ে আছেন কথলের তলায়। তাঁর পাশের জানালাটা দিয়ে ঝোস আসে বলেই বোধহয় উনি সেটাকে ধক্ক করে রেখেছেন। যন্তা তাই সকাল বেলাতেও বেশ অক্ষকার। যেটুকু আলো আছে সেটা আসছে বারান্দার দরজাটি দিয়ে। আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম ঘরের দেরাকে কালীকিঙ্করবাবুর একটা বীধানে ফোটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিটা বেশ কিছুদিন আগে তোলা, কারণ তখনও সন্দেশকের গোক-দাঢ়ি পাকতে শুরু হয়েছিল।

অদ্বীলোক বললেন, 'গ্যাবোটিওর বইগুলো আগে থেকেই বার করে রেখেছি, কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।'

ফেনুদা ধূল, 'হয়েছি কি না সেটা আপনি বলবেন। শ্রি-মাইন-জিরো-শ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো।—ঠিক আছে।'

'সাবাশ শোয়েন্দা!' হেসে বলে উঠলেন কালীকিঙ্কর খজুমদার। 'নাও, বইগুলো নিয়ে তোমার ধমির মধ্যে পুরো ফেলো। আর দিনের আলোতে একবার শিন্দুকের গায়ের দাগগুলো দেখো দেখি। আমার তো দেখে মনে হচ্ছে না ওটা নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণ আছে।'

ফেনুদা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।'

ফেনুদা আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রথম ডিটেকটিভ প্রপন্যাসিকের সেখা বই চারখানা তার খোপার মধ্যে পুরে নিল।

'তোমরা চা খেয়েছ তো?' কালীকিঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্জে হ্যাঁ।'

‘ড্রাইভারকে খলা আছে। গাড়ি বাঁর করেই রেখেছে। তোমাদের টেশনে পৌছে দেবে। বিশ্বনাথ খুব তোমে বেরিয়ে গেছে। বলল তুর দশটার মধ্যে কস্কাতায় পৌছতে পারলে সুবিধে হয়। বাঁজেন গেছে বাজারে। গোকুল তোমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেবে।...তোমরা কি টেশনে যাবার আগে একটু আশেপাশে ঘূরে দেখতে চাও?’

ফেলুদা বলল, ‘আমি ভাবছিলাম সাড়ে দশটার ট্রেনটাৰ জন্য অপেক্ষা না করে এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।’

‘তা বেশতো, তোমাদের মতো শহরে স্নোকেদের প্রদীপ্তামে বাসি করে যাবতে চাই না আমি। তবে তুমি আসতে আমি যে খুবই খুশি হয়েছি—সেটা আমার একেবারে অভ্যর্থনা কথা।’

কাল রাত্তিরের মৃষ্টিতে তেজো খাণ্ডা দিয়ে গাড়িতে করে পলাশী টেশনের দিকে ঘেতে আমি সবাপ বেলার রোদে তেজো খান ক্ষেত্রে দৃশ্য দেখছি, এমন সময় অনলায় ফেলুদা ড্রাইভারকে একটা প্রশ্ন করল।

‘টেশনে যাবার কি এ ছাড়া আর অন্য কোনও রাজ্ঞি আছে?’

‘আজ্জে না বাবু’, বলল মণিলাল ড্রাইভার।

ফেলুদার মুখ গতীর। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি শু কী ভাবছে, কোনও সন্দেহের কারণ ঘটেছে কি না; কিন্তু সাহস হল না।

রাত্তির কানা ছিল বলে দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট লাগল টেশনে পৌছতে। মাল নামিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ফেলুদা কিন্তু টিকিট ঘরের দিকে গেল না। মালেতে টেশনমাটারের জিন্যায় রেখে আবার বাইরের রাত্তির রাত্তায় বেরিয়ে এল।

রাত্তায় সাইকেল রিকশার লাইন। সবচেয়ে নাহন্দের রিকশার মালিকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, ‘এখানকার থানাটা কোথায় আনেন?’

‘জানি, বাবু।’

‘চলুন তো। তাড়া আছে।’

গ্রাচক্ষতাবে প্র্যাক প্র্যাক করে হর্ন দিতে দিতে ভিড় কাটিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে থানায় পৌছে গেলাম। ফেলুদার ধ্যাতি যে এখান পর্যন্ত পৌছে গেছে সেটা বুবালাম যখন সাব-ইন্সপেক্টর মিস্টার সরকার ওর পরিচয় দিতে চিনে ফেললেন। ফেলুদা বলল, ‘চুরঁচুটিয়ার কালীকিঙ্কুর মজুমদার সহকে কী আনেন বসুন তো।’

‘কালীকিঙ্কুর মজুমদার?’ সরকার তুক্ক কুচকোলেন। ‘তিনি তো ভাল লোক থলেই জানি মশাই। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তাঁর সহকে তো কোনওদিন কোনও বদনয়ে অনিনি।’

‘আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ?’ তিনি কি এখানেই থাকেন?’

‘সম্ভবত কলকাতায়। কেন, কী ব্যাপার, মিঠার মিঠির?’

‘আপনার জিপটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? যোরুতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।’

বাদা রাত্তা দিয়ে লাকাতে লাকাতে জিপ ছুটে চলল বুরহুটিয়ার দিকে: ফেলুদা প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মধ্যে ওধু একটিবার খুব খুঁত, ধৰ্দিও তার কথা আমি হাজা কেউ উন্নতে পেল না।

‘আরব্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিমারে বিলহ, রাজেনথাবুর পলা ধরা, ন্যাফথ্যালিন—সব ছকে পড়ে গেছে রে তোপসে। কেশু মিঠির হাজাও যে অনেক লোকে অনেক বৃক্ষি রাবে সেটা সব সবস খেয়াল থাকে না।’

মজুমদার-বাড়ি পৌছে প্রথম যে জিনিসটা দেখে অবাক লাগল সেটা হল একটা কালো রঙের অ্যাম্বাজর পাড়ি। ফটকের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বনাথকাবুর গাড়ি। জিপ থেকে নামতে নামতে ফেলুদা বশল, ‘চক্ষ! কর গাড়িটাতে কাদাই লাগেনি। এ গাড়ি সবেমাত্র রাত্তাৰ বেৱোল।’

বিশ্বনাথকাবুর জ্বাইভারই বোধহয়—কারণ এ লোকটাকে আগে দেখিনি—আমাদের দেখে বীতিমতো ধাবড়ে গিয়ে মুখ ক্যাকাশে করে গেটের ধারে পাথরের ঘতো দাঁড়িয়ে রইল।

‘তুমি এ গাড়ির জ্বাইভার?’ ফেলুদা পন্থ করল।

‘আ-আজ্জে হ্যাঁ—’

‘বিশ্বনাথকাবু আছেন।’

লোকটা ইতুত করছে দেখে ফেলুদা আর অপেক্ষা না করে সেঙ্গে গিয়ে চুকল বাড়ির ভিতর—তার পিছনে দারোগা, আমি, আর একজন কলচেট।

আবার সেই প্যানেজ নিয়ে গিয়ে সেই সিঁড়ি নিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে ফেলুদা এবং আমরা তিসজন সোজা চুকলাম কালীকিঙ্গৱাবুর ধরে।

ঘর খালি বিছানায় কঁপলটা পড়ে আছে। আর যা ছিল সব ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু মালিক নেই।

‘সর্বনাশ!’ বলে উঠল ফেলুদা।

সে সিন্দুকটার দিকে চেয়ে আছে। সেটা হ্যাঁ করে খোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছে তার থেকে অনেক কিছু ধার করে নেওয়া হয়েছে।

সরঞ্জার বাইরে গোকুল এসে দাঁড়িয়েছে। সে ধৰুণ্ড করে কাঁপছে। তার জেখে জল। দেখে মনে হয় যেন তার শেষ অবস্থা।

তার উপর হিমড়ি দিয়ে পড়ে ফেলুদা বশল, ‘বিশ্বনাথকাবু কোথায়?’

‘তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।’

‘দেখুন তো মিঠার সরকার।’

দারোগা আবু কলচেট অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেল।

‘শোনো গোকুল’—ফেলুদা দুহাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ দুটোকে শক করে

ধরে ঝৌকুনি দিয়ে বলল—‘একটিও মিথ্যে কথা বললে তোমায় হাজতে যেতে হবে।—কাশীকিঙ্করবাবু কেনথার?’

গোকুলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

‘আজে—আজে—তাকে শুন করেছেন।’

‘কে?’

‘ছেটবাবু।’

‘কবে?’

‘যেদিন ছেটবাবু এলেন। সেদিনই রাত্রির বেলা। বাপ-বেটার কথা কাট্টাকাটি হল। ছেটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন, কর্তব্যবাবু বললেন—আমার তিথা জানে, তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো, আমি বশ না। আরপরে—তারপরে—তার কিছুক্ষণ পরে—ছেটবাবু আর তেনার পাড়ির ডেরাইভাববাবু, দুজনে মিলে—’

গোকুলের গলা ধরে এল। বাকিটা তাকে শুব কষ্ট করে বলতে হল—

‘দুজনে মিলে কর্তব্যবাবুর লাশ লিয়ে গিয়ে ফেলল ওই পিছনের দিঘির জলে—গলার পাথর বেঁধে। আমার মুখ বক্ষ করেছেন ছেটবাবু—আপের ভয় দেখিয়ে।’

‘বুঝেছি।—আর রাজেনবাবু বলে তো কোনও শোকই নেই, তাই না?’

‘ছিলেন, তবে তিনি আরা গেছেন আজ দুরছুর হয়ে গেল।’

আগি আর ফেলুনা এবার ছুটলাম নীচে। সিডি দিয়ে নেমে বাঁয়ে সুরলেই পিছনের বাগানে যাবার দ্বন্দ্ব। বাইরে বেরোনো যাত্র মিষ্টার সরকারের চিংকার শুল্পাম—

‘পালাদার চেষ্টা করবেন না মিষ্টার মজুমদার—আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে।’

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল একটা জলে ঝাপিয়ে পড়ার শব্দ আর একটা পিস্তলের আওয়াজ।

আমরা দুজনে দৌড়ে পাছ-গাছড়া ঝোপ-ঝাড় ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ তেতুল গাছের নীচে যি, সরকার হাতে রিভলভার নিয়ে আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। তেতুল গাছের পরেই কাশকের দেখা পুরুষটা—তার জন্মের বেশির ভাগই সবুজ পলায় ঢাকা।

‘লোকটা আগেই শাফ দিয়েছে।’ বললেন যি, সরকার। ‘সাতার জানে না!—গিরিশ, দেখো তো দেখি টেনে তুলতে পার কি না।’

কনটেকল বিশ্ববাসবাবুকে শেষ পর্যন্ত টেনে তুলেছিল। এখন ছেটবাবুর দশা ওই টিয়াপাখির মতো; ধীঢ়ায় বন্দি। সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি গয়নাপাটি যা নিয়েছিলেন সবই উকাব পেয়েছে। লোকটা ব্যবসা করত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জুয়া ইত্যাদি অনেক বদ-অভ্যাস ছিল, যার ফলে ইদানীঁ ধার-দেনায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

ফেন্দু বলল, 'কালীকিক্ষরবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর
রাজেনবাবু হাজির হল, আর রাজেনবাবু চলে যাবার প্রায় আধ ঘণ্টা পর
বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যাইনি। এটা
ভবতে তাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে—তিনটে লোকই আছে তো! নাকি
একজনেই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে? তখন অ্যাকটিং-এর
বইগুলোর কথা মনে হল। তা হলে কি বিশ্বনাথবাবুর এককালে শৰ ছিল
গিয়েটারেরা? তিনি যদি ছয়বেশে ওস্তাদ হয়ে থাকেন, অঙ্গুষ্ঠ জেনে থাকেন তা



হলে এইভাবে এই অক্ষকার বাড়িতে আমাদের বোকা বান্দানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। হাতটা তাঁকে কঁপলের মীচে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল কারণ নিজের হাতকে মেক-জাপ করে কী করে ডিয়াত্তর বহুরে বুড়ো হাত করতে হয় সে বিদ্যো তাঁর জ্ঞান ছিল না। সন্দেহ একেবারে পাকা হল মধ্যন সকালে দেশলাভ কানার উপরে বিশ্বাসবাবুর গাড়ির টায়াবেত ছাপ পড়েনি।

আমি কথার ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, ‘তোমাকে এখানে আসতে লিবেছিল কে?’

ফেলুনা বলল, ‘সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিবেছিলেন তাঁতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বাসবাবু সেটা জেনেছিলেন। তিনি আসতে বাধা দেননি কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর সংকেতটি জ্ঞান প্রয়োজন হয়েছিল।’

শেষ পর্যন্ত আমাদের দশটার ট্রেনই ধরতে হল।

রওনা হবার আগে ফেলুনা তাঁর সুটকেস আর খোলা খেকে আটখানা বই বাম করে আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘খুমির হাত পেতে উপহার নেবার বাসনা নেই আমার। তোপ্সে, বুকশেলফের ফাঁকগুলো ডরিয়ে দিয়ে আয় তো।’

আমি যখন বই দেখে কালীকিঙ্করবাবুর ঘর থেকে বেরোত্বি, তখনও টিয়া বলছে, ‘ত্রিময়ন, ও ত্রিময়ন—‘একটু জিবো।’

গোলোকথাম রহস্য

Pradosh C. Mitter
Private Investigator



গোলোকধাম রহস্য

৪৯

‘জী যজ্ঞ কে ছিল ?’
 ‘দুর্যোধনের শোন দৃশ্যমান কামী ।

‘আর জয়াসন্ধ ?’

‘অগ্নের রাজা ।’

‘ধৃষ্টিদুষ্প ?’

‘ক্রোপদীপ দাদা ।’

‘অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের শীরের নাম কী ?’

‘অর্জুনের দেবদস, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয় ।’

‘কোন অনু হৃত্তলে শত্রুয়া মাথা গুলিয়ে সেৱসাইত করে বাসে ?’

‘আন্তি ।’

‘ভেরি শুড় ।’

যাক বাবা, পাশ করে গেছি ! ইন্দনীঁ রামায়ণ-মহাভারত হল ফেলুদার যাকে
 বলে স্টেপ্ল রীতিং ! সেই সঙ্গে অবিশ্ব আধিও পড়ছি ! আর তাতে কেনেৰ
 আপসোস নেই ! এ তো ওষুধ গেলা না, এ হল একধর থেকে ন্যস্টপ
 ভূরিভোজ ! গজের পর গজের পর গজ ! ফেলুদা বাসে ইংলিজিতে বইয়ের
 বাজারে আজকাল একটা বিশেখণ চালু হয়েছে—আলপ্টিভাউন্টেল ! যে বই
 একবার পড়ব বলে পিকআপ করলে আর পৃষ্ঠ ডাউন করবার জো দেই !
 রামায়ণ-মহাভারত হল সেইকেম আলপ্টিভাউন্টেল ! ফেলুদার হাতে এখন
 কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড ! আমারটা অবিশ্ব কিশোর
 সংক্ষেপ ! জালমোহনব্যাপু বলেম ওঁৰ জাকি কৃষ্ণবাসী, রামায়ণের অনেকধানি
 মুখছু ; ওঁৰ ঠাকুমা পড়তেন, সেই ওনে শুনে মুখছু হয়ে গেছে ! আমাদেৱ
 বাকিতে কৃষ্ণবাসীৰ রামায়ণ সেই : ভাৰছি একটা ভোগাড় কৰে জটায়ুৰ

শ্বরণশক্তিটা পরীক্ষা করে দেখব। ভদ্রলোক আপাতত ঘরবন্দী অবস্থায় পুঁজোর উপন্যাস লিখছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎকাৰটা একটু কম।

বই থেকে মুখ ভুলে রাস্তাৰ দৱজাটোৱ দিকে চাইতে হল ফেলুদাকে। কলিং বেল বেজে উঠেছে। হিজলীতে একটা শুনেৱ রহস্য সমাধান কৰে গত শতাব্দীৰ ফিলেছে ফেলুদা। এখন আয়োশেৱ মেজাৰ্জ, তাই বোধহয় বেলেৱ শক্ত ভেজন আগত দেখাই না। ও যা পারিশ্রমিক নেয় তাতে আসে একটা কৰে কেস পেলেই ওৱ দিবি চলে যায়। জটায়ুৱ ভাষায় ফেলুদার জীবনবাত্রা 'সেক্ট পাসেন্ট অনাড়ম্বৰ'। এখালে বলে রাখি, জটায়ুৱ জিভেৱ সাধনে জড়ত্বাৰ জন্য 'অনাড়ম্বৰ'টা মাৰে মাৰে 'অনাবস্থা' হয়ে যায়। সেটা শোধৱাবাৰ জন্য ফেলুদা ওঁকে একটা সেলটেল গড়গড় কৰে বলা অভ্যেস কৰতে বজেছিল; সেটা হল—'বারো হাঁড়ি রাবড়ি বড় বাড়াবাড়ি।' ভদ্রলোক একবাৱ থলতে গিয়েই চাৱব্যৱ হোচ্চি খেয়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে, 'মতুন চৰিত্ৰ ইখন আসবে, তখন গোড়াতেই তাৰ একটা যোতায়ুটি বৰ্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিসে পাঠক নিজেই একটা চেহাৰা কৰিবা কৰিবা কৰে নেবে; তাৰপৰ হয়তো দেখবে যে তোৱ বৰ্ণনাৰ মঙ্গে তাৰ কৰিবাৰ অনেক তক্ষণত।' তাই বলছি, ঘৰে বিনি চুকন্দেন তাৰ রং ফৰ্সা, হাইট আন্দাজ পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, বয়স পঞ্চাশ-টৱ্বাশ, কানেৱ দু'পাশেৱ চুল পাকা, থুতনিৰ মাকখালে একটা আঁচিল, পৱনে ছাই বঞ্চেৱ সাফাৰি সৃষ্টি। ঘৰে চুকে যেভাবে গজ্জ খীকৰালেন তাতে একটা ইতস্তত তাৰ বুঠো ওঠে, তাৰ খীকৰানিৰ সময় তান হাতটা মুখেৱ কাছে উঠে আসতে মনে হল ভদ্রলোক একটু সাহেবীভাৱাপন্ন।

সবি, আপয়েন্টমেন্ট কৰে আসতে পাৰিনি।' সোফাৰ এক পাশে বসে বলিলেন আগস্টক—'আমাদেৱ ওদিকে রাস্তা খৌড়াখুড়িতে লাইনগুলো সব ডেড।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল। খৌড়াখুড়িতে শহুটা কী? অবস্থা সেটা আমাদেৱ সকলেৱই জীবন আছে।

'আমাৰ নাম সুবীৰ দত্ত।'—গলার স্বরে মনে হয় লিবি টেলিভিশনে ঘৰৱ পড়তে পাৱেন।—'ইয়ে, আপলিই তো প্রাইভেট ইনভেস্—'

'আজে হ্যাঁ।'

'আমি এসেছি আমাৰ দাদাৰ ব্যাপকৰে।'

ফেলুদা চুপ। মহাভাৱত বঞ্চ অবস্থায় তাৰ কোলেৱ উপৰে, তৰে একটা বিশেষ জয়গায় আঙুল গৌজা রায়েছে।

'অবিশ্বি' তাৰ আগে আমাৰ পৱিচয়টা একটু দেওয়া দৰকাৰ। আমি কৱিবেটি আভ নৱিস কোম্পানিতে সেলস এগক্টিকিউটিভ। কাম্পক শীটেৱ পীমেশ টোকুৰীকে বোধহয় আপনি চেজেন; উনি আমাৰ কসেক্ষেৱ সহপাঠী ছিলেন।'

দীনেশ টৌধুরী ফেলুদার একজন মকেল সেটা জানতাম ।

‘আই সী’—ভীষণ সাহেবী কারদায় গন্তীর গলায় কলন ফেলুদা । ভদ্রলোক এবার তাঁর দাদার কথায় চলে গেলেন—

‘দাদা এককালে বায়োকেনিস্টিতে সুব নাম করেছিলেন । নীহার দত্ত । ভাইয়াস নিয়ে রিসার্চ করেছিলেন । এখানে নয়, আমেরিকায় । মিলিগান ইউনিভার্সিটিতে । ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে একটা এক্সপ্রেশন হয় । দাদার প্রাণ নিয়ে টানটানি হয় ; কিন্তু শেষে খোনকারই হসপাতালের এক ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তোলে । তবে চোখ দুটোকে বাঁচানো যাবানি ।’

‘অক্ষ হয়ে যান ?’

‘অক্ষ । সেই অবস্থায় ননা দেশে ফিরে আসেন । ওখানে থাকতেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেন ; আব্রিডেন্টের পর মহিলা দাদাকে ছেড়ে চলে যান । তারপর আর দাদা বিয়ে করেননি ।’

‘তাঁর গবেষণাও তো তাহলে শেষ হয়েলি ?’

‘না । সেই দুঃখেই হ্যাতো দাদা প্রায় মাস ছয়েক ক্যারোর সঙ্গে কথা বলেননি । আমরা ভেবেছিলাম হ্যাতো মাথা শারাপ হয়ে গেছে । শেষে ক্ষয়ে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন ।’

‘এখন কী অবস্থা ?’

‘বিজ্ঞানে এখনো উৎসাহ আছে সেটা বোঝা যায় । একটি ছেলেকে রেখেছেন—ওর হেল্পার বা সেক্রেটারি বলতে প্যারেন—সেও বায়োকেনিস্টির হাতে ছিল—তাঁর একটা কাজ হচ্ছে সায়েন্স ম্যাগাজিন থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো । এমনিতে যে ননা একেবারে হেল্পলেস তা নন ; বিকেলে আমাদের বাড়ির হাতে একাই লাগ্নি হাতে পায়চারি করেন । এমন-কি বাড়ির বাইরেও রাস্তার মোড় পর্যন্ত একাই মাঝে মাঝে হেঁটে আসেন । বাড়িতে এবর ওঁর কয়ার সময় ওর কোনো সাহায্যের সরকার হয় না ।’

‘ইনকাম আছে কিছু ?’

‘বায়োকেনিস্টির উপর দাদার একটা বই বেরিয়েছিল আমেরিকা থেকে, তাঁর থেকে একটা গ্রোজগার আছে ।’

‘ঘটনাটা কী ?’

‘আজে ?’

‘মানে, আপনার এখানে আসার কারণটা...’

‘বলছি ।’

পকেট থেকে একটা চুরুটি বের করে ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, বললেন সুবীর দত্ত—

‘দাদার ঘরে কাল গাঁওয়ে চোর এসেছিল ।’

‘সেটা কী করে বুবলেন ?’

ফেলুন এতক্ষণে হাত থেকে যত্নভাবত নামিয়ে সামনের টেবিলের ওপর
রেখে প্রস্তাৱ কৰল :

‘দাদা নিজে বোকেলনি । ওৱা চাকুটাত যে খুব বুদ্ধিমান তা নয় । ন'টাৱ
সময় ওৱা সেক্ষেটারি এসে ঘৰেৱ চেহৰা দেখে ব্যাপারটা বুবলতে পাৱে । ভেন্সেৱ
দুটো দেৱাঞ্জলি আধখোসা, কাগজপত্ৰ কিছু মেৰেতে ছড়ানো, ভেন্সেৱ উপৰেৱ
জিলিসপত্ৰ ওলটপালট, এমন-কি গোদৱৰেজেৱ আলমারিয়ে চাবিৱ চাবপাশে
ঘষটানোৱ দাগ ; বোবাই যয় কেউ আলমারিটা খোলাৱ চেষ্টা কৰেছে ।’

‘আপনাদেৱ পাড়ায় চুৰি হয়েছে ইন্দনীঁঁ ?’

‘হয়েছে । আমাদেৱ বাড়িৱ দুটো বাড়ি পৱে । পাড়ায় এখন দুটো পুলিশেৱ
লোক টিহল দেৱ । পাড়া বপনতে বালিগঞ্জ পাৰ্ক । আমাদেৱ বাড়িটা আৱ আশি
বছৰেৱ পুৰানো । ঠাকুৰদার তৈৰি । খুলনায় জমিদারী ছিল আমাদেৱ । ঠাকুৰদা
চলে আসেন কলকাতায় এইটিন নাইনটিতে । রাসায়নিক যন্ত্ৰপাতি
ম্যালুক্যাকচাৰিঁ-এৱং ব্যবসা শুৱ কৰেন । কলেজ স্ট্ৰীটে বড় দোকান ছিল
আমাদেৱ । বাবাত চালিয়েছিলেন বিশুদ্ধিন ব্যবসা । বছৰ ত্ৰিশেক আগে উঠে
যায় ।’

‘আপনাৰ বাড়িতে এখন লোক ক'জন ?’

‘আগেৱ তুলনায় অনেক কম । শাবা-ৰা দু'জনেই মাৰা গেছেন । আমাৰ
স্ত্ৰীও, সেক্ষেটাটি ফাইভ । আমাৰ দুটি মেয়েৱ বিয়ে হয়ে গেছে, বড় ছেলে
জামানিতে । এখন মেঘাই ধৰাত আৰি, দাদা, আৱ আমাৰ ছোট ছেলে । দুটি
চকৰ আৱ একটি রায়াৱ লোক আছে । আবৰা দোতলায় থাকি । একতলাটা
কুলুক কৰে ভাড়া দিয়াছি ।’

‘কাৰা থাকে সেপাতু ?’

‘সামনেৱ ফ্লাটটাতে থাকেন, মিঃ দন্তু । ইলেকট্ৰিকাল গুড়াসেৱ ব্যবসা ।
পিছনে ধাকেন মিঃ সুখওয়ালি, অ্যাটিকেৱ দোকান আছে লিভাসে স্ট্ৰীটে ।’

‘গৰ্দেৱ ঘৰে চোৱ চোকেনি ? খন তো বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয় ।’

‘প্যাসা তো আছেই । ফ্লাটগুলোৱ ভাড়া আড়াই হাজাৰ কৰে । সুখওয়ালিৰ
ভৱে কাহী জিলিস আছে বলে ত সুবজা বক কৰৱ শোয় । দন্তুৰ বলে বজ্জ ঘৰে
ওে সাফোকেশন হয় ।’

‘চোৱ আগন্তুৱ দাদাৰ ঘৰে চুকেছিল কী বিত্তে অনুমান কৰাত পাৱেন ।’

‘মেধুন, দাদাৰ অসমাঞ্ছ গৱেষণাব কাগজপত্ৰ দাদাৰ আসমারিতেই থাকে, আৱ
সেগুলো যে অভ্যন্তৰ মূল্যবান ভাবত কোনো সন্দেহ নেই । অবিশ্বিত সাধাৱণ চোৱ

আর তার মূল্য কী বুঝবে । আমার ধারণা তোর টাকা নিতেই ঢুকেছিল । অঙ্ক সোকের ঘরে ঢুরিয় একটা সুবিধে আছে সেটা তো বুকতেই পারেন ।'

'বুকেছি', বলল জেলুনা, 'অঙ্ক মানে বোধহয় ব্যাক আকাউন্ট দেহি কারণ চেক সহি করা তো...'

'ঠিক বলেছেন । বই বাবদ দাদা যা টাকা পান সব আমার নামে আসে । আমার আকাউন্টে জমা পড়ে । তারপর আমি চেক কেটে টাকা তুলে দাদাকে দিয়ে দিই । সেই বাবকের টাকা সব ওই গোদরেজের আলমারিতেই থাকে । আমার আলাজ হ্যাঙার ত্রিশেক টাকা ওই আলমারিতে রয়েছে ।'

'চাবি কোথায় থাকে ?'

'হত্তুর জানি, দাদার বালিশের নীচে । বুকতেই পারছেন, দাদা অঙ্ক বলেই মুশিজ্জা । রাতিরে দরজা খুলে শোন, চৌকাটের বাইয়ে শোক চাকর কোমুদী—ফাতে মাবরাহিরে প্রয়োজনে ডাক দিলে আসতে পারে । ধরল যদি তেমন বেপরোয়া তোর হয়, আর চাকরের ঘুম না ভাঙে, তাহলে তো দাদার আস্তরক্ষার কোনো উপায় থাকে না । অথচ পুলিশে উনি থবর দেবেন না । বলেন ওরা কেবল জানে জ্বেরা করতে, কাজের বেলায় ঢুক, সব ব্যাটা ঘূরখের ইত্যাদি । তাই আপনার কথা বলতে উনি রাজি হলেন । আপনি যদি একবারটি আমাদের কাড়িতে আসেন, তাহলে অস্ত প্রিন্টেনশনের ব্যাপারে কী করা যায় সেটা একটু ভেবে দেখতে পারেন । এমন-কি বাহিরের তোর না ভেতরের তোর সেটাও একবার—'

'ভেতরের তোর ?'

আমি আর জেলুনা দু'জনেই উৎকর্ষ মানে কল খাড়া ।

ভদ্রলোক চুক্তের ছাই আশাট্টেতে ফেলে গলাটা হতটা পারা যায় থানে নামিয়ে এনে বললেন, 'দেখুন যশাই, আমি স্পষ্টিবক্তা । আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন জানি তেকেয়কে কথা বললেন আপনার কোনো সুবিধে হবে না । প্রথমত আমাদের দু'জন ভাড়াটের একটিকেও আমার খুব পছন্দ না । সুখওয়ানি এসেছে বছর তিনিক হল । আমি নিজে জানি না, কিন্তু যারা পুরানো আটের জিনিস-টিনিস কেনে, তেমন সোকের কাছে শুনেছি সুখওয়ানি লোকটা সিধে নষ্ট । পুলিশের নজর আছে ওর ওপর ।'

'আর অন্য ভাড়াটে ?'

'দ্বন্দ্ব এসেছে যাস চারেক হল । ও ঘরটায় আমার বড় হেলে প্লাকত, সে প্লাম্বিনেটলি দেশের বাইরে । ডুসেলডুর্ফে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে, জার্মানি মেয়ে বিয়ে করেছে । দ্বন্দ্ব সোকটা সম্ভবে বদনাম শুনিনি, তবে সে এত অতিরিক্ত রকম চাপা যে সেটাই সম্ভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । আর, ইয়ে—'

ভূমিলোক থামলেন। তারপর কাকি কথাটা বললেন মুখ নামিয়ে, দৃষ্টি রাইসনির দিকে ঝুঁকে রেখে।

‘শঙ্কর, আমার ছেটি ছেলে, একেবারে সংকারের বাইরে চলে গেছে।’

ভূমিলোক আবার চূপ। ফেলুদা বলল, ‘কত বড় ছেলে?’

‘তেইশ বছর বয়স। গত মাসে জন্মতিথি গেল, যদিও তার মুখ দেখিনি সেদিন।’

‘কী করে?’

‘নেশা, জুয়া, ছিনতাই, ওগুগিরি কোনোটাই বাদ নেই। পুলিশের বক্সের পড়েছে তিনবার। আমাকেই গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের একটা খাতি আছে সেটা তো বুঝতেই পারছেন, তাই নাম করলে এখনো কিছুটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে নাম আর কদিন টিকবে জানি না।’

‘চোর যেদিন আসে সেদিন ও বাড়িতে ছিল?’

‘যাত্রির খেতে এসেছিল—সেটাও ত্রোজ্জ আসে না—তারপর আর দেখিনি।’

ঠিক হল আজই বিকেসে জায়গা একবার যাব বালিগঞ্জ পার্কে। কেসটাকে এখনো ঠিক কেন বঁপা যায় না, কিন্তু আমি জানি বিশ্বেরখণ্ডে অঙ্গ হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিকের লাপারটা ফেলুদার হন টেনেছে। তার মাথায় নিশ্চয়ই ঘূরছে ধূজরাটি।

থবরের কাগজের কাটিং-এর বাইশ নম্বর খাতা থেকে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিশ্বেরখণ্ডে উদীয়মান কান্টালী জীববাসায়নিক নীহারুঞ্জন সন্তুষ্ট চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘবরাটা খুঁজে বার করে দিতে সিধু জ্যাঠার সাগল সাড়ে তিনি মিনিট। তার মধ্যে অবিশ্বিত দুঃখিনিটি গেল ফেলুদা অ্যাসিন ডুব মেরে থাকার জন্ম তাকে ধরকানিতে। সিধু জ্যাঠা আমাদের সঙ্গে জ্যাঠা না হসেও আইসোয়ের বাড়া। কোনো অতীচৰে ঘটনার বিষয় জানতে হলে ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধু জ্যাঠার কচে যায়। তাতে কাঞ্চ হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আর অনেক বেশি কুর্জিতে।

ফেলুদা প্রসঙ্গটা তৃপ্তি সিধু জ্যাঠা ডুর কুচকে বললেন, ‘নীহারু দুর? যে ডাইরিস মিয়ে রিসার্চ করছিল? এবাপ্পেশানে চোখ হারায়?’

‘বাপ্প!—কী স্মৃতিশক্তি! বাবা বলেন শুভিধা। ফেলুদা বলে জোটোগ্রাফিক যোগারি; একবার বোম্বে ইঞ্টারেস্টিং থবর পড়লে বা শনলে তৎক্ষণাত যগজে চিরকালের ঘড়ো ছাপা হয়ে যায়।’—কিন্তু সে তো একা ছিল না।’

এ খবরটা নতুন ।

‘একা ছিল না মানে ?’ ফেলুনা প্রশ্ন করল ।

‘তার মনে, যদ্দুর মনে পড়েছে—’ সিধু জ্যাঠা ইতিমধ্যে তাঁর বৃকশেলক্ষের সামনে গিয়ে খবরের কাটিং-এর খাতা টেনে বাঁর করেছেন—‘এই গবেষণায় তাঁর একজন পার্টিয়ার ছিল—হ্যাঁ এই যে ।’

বাইশ নম্বর খাতার একটা পাতা খুলে সিধু জ্যাঠা খবরটা পড়লেন। ১৯৬২-র খবর। তাতে জানা গেল যে নীহার দলের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন আরেকটি বাঙালি বায়োকেমিস্ট, নাম মুক্তকাশ চৌধুরী। আরিভেটে চৌধুরীর কোনো ফতি হ্যানি, কারণ সে ছিল দরের অন্য দিকে। এই চৌধুরীর জন্মই নাকি নীহার দল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কারণ আশুল মেবানো ও তৎক্ষণাত নীহার দলকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা চৌধুরীই করেন।

‘এই চৌধুরী এখন— ?’

‘তা জানি না; বললেন সিধু জ্যাঠা। ‘সে খবর আমার কাছে পাবে না। এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে যদি সেটা খবরের কাগজে স্থান পায় তবেই সেটা আমার নজরে আসে। আমি যেচে কারো খবর নিই না। কী দরকার ? আমার খবর ক’ভন নেব যে ওদের খবর আমি নেব ? তবে এটা ঠিক যে, এই চৌধুরী যদি বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো একটা কিছু করত, তাহলে সে খবর আমি নিশ্চয়ই পেতাম।’

॥ ২ ॥

সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে যে নয়দের হাপ পড়েছে সেটা আর বলে দিতে হয় না। এটাও ঠিক যে বাড়ির ফালিকের যদি সে হাপ ঢাকনার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঢাকা পড়ত নিশ্চয়ই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দল পরিবারের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। বাগানটা বেধহয় বাড়ির পিছন দিকে। সামনে একটা গোল ঘাসের ঢাকন্তির উপর একটা অকেজো ফোয়ালা, সেই গোলের নুঁপুর দিয়ে নুড়িবেছালো রাখা হলে গেছে গাড়িবারাম্বার দিকে। গেটের গারে রেতপাথারের কলকে ‘গোলোকধাম’ দেবে ফেলুনা কৌতুহল অকাশ করাতে সুবীরবাবু বললেন যে তের ঠকুরদান্ড নাম ছিল গোলোকবিহারী দান্ড। বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন।

গোলোকধাম যে এককালে সরকার বাড়ি ছিল সেটা এখনে দেখলে বোঝ যায়। গাড়িবারাম্বা থেকে তিনি খাপ সিঁড়ি উঠে রেতপাথারের বাঁধানো

লাভিং-এর বাঁ দিয়ে খেতপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনে একটা দরজা দিয়ে ভিতরে করিডর দেখা যাচ্ছে, তার ডান দিকে নাকি পুর পর দুটো ফ্লাট। বাঁ দিকে একটা প্রকাশ ইলিম, যেটা দ্বরো ভাড়া দেননি। এই ঘরে নাকি এককালে অনেক থানাপিলা গানবাজনা হচ্ছে।

হস্যরের ঠিক ওপরেই হল দোতলার বৈঠকখানা। আমরা সেখানেই গিয়ে বসলাই। যাথার ওপর কাপড় ঘোড়া চিরকালের মতো অক্ষেজা আড়পঞ্চম, তার যে কত ডালপালা তার ঠিক নেই। একদিকে দেয়ালে গিল্ট-করা ফ্রেমে বিশাল আয়না, সুবীরবাবু বললেন সেটা বেঙ্গলিয়াখ থেকে আনানো। মেঘেতে পুরু গালিচার এখানে ওখানে খুললে গিয়ে নবাব ছকের মতো সাদা-কালো খেতপাথরের মেঝেটা বেরিয়ে পড়েছে।

সুবীরবাবু সুইচ টিপে একটা স্টার্ভার্জ ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিতে ঘরের অঙ্কুর বালিকটা দৃঢ় হচ্ছে। আমরা সোফায় বসতে যাব, এমন সময় বাইরের করিডর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল—ঘটু ঘটু ঘটু ঘটু।

লাঠি আর চাটি ফেশালো শব্দ।

শব্দটা চৌকাঠের বাইরে এসে ফুরুরের কলা থামল, আর তার পরেই লাঠির মালিকের অবেশ। সেই সঙ্গে আমরা ডিলজনেই দণ্ডযান।

‘অচেনা গলার আওয়াজ পেলাম—এরা এলেন বুঝি?’

গাঢ়ীর গলা, ছফুট লম্বা তেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানবসই। এমার চুল সব পাকা, কিছুটা এলোমেলো, চোখে কালো চশমা, পরনে আপ্পিচ পাঞ্জাবি আর সিকের পায়জামা। বিশেষণ যে শুধু চোখই নষ্ট করেনি, মুখের অন্যন্য অংশেও যে তার ছাপ রেখে গেছে, সেটা ন্যাস্পের চাপা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

সুবীরবাবু দাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছেন। —‘বোস, দাদা।’

‘বসছি। আগে এলের বসাও।’

‘মহসুরে,’ ফেল্দুদা বলল, ‘আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমার বাঁ পাশে আমার কাজিন তপেশ।’

আমিও খাট্টো গলায় একটা মহসুর বলে দিলাম। শুধু হাত ঝোড় করাটা জো অন্ধ লোকের কাছে যাতে যারা যাবে।

‘আমারই মতো হাইট বলে মনে হচ্ছে মিত্রির মশাইয়ের, আর কাজিন বোধ করি পৌঁচ সাত কি সাতড় সাত।’

‘আমি পাঁচ সাত,’ বলে ফেলসেন তপেশরঞ্জন ছিল।

মনে মনে ডগ্রলোকের আদ্দাজের কারিগৰ না করে পারলাম না।

‘বসুন এবং বোস’ বলে ভাইয়ের সাহায্য না নিয়েই আমাদের সামনেই সোফায়



বসে পড়লেন মীহার দত্ত। —'চায়ের কথা বলোছ ?'

'বলেছি,' বললেন সুবীর দত্ত।

ফেলুন অঙ্গামধন্তো ভনিতা না করে সোজা কাজের কথায় বলে গেল।

'আপনি যে বিশাখ করছিলেন, সে বাপারে কেব হয় আপনার একজন

পাটিনার ছিল, তাই না ?'

সুবীরবাবুর উসখুসে ভাব দেখে বুঝলাম যে এ ব্যাপারটা তিনিও জানতেন, এবং আমাদের না বলার জন্য অপ্রস্তুত ব্যৱ করেছেন ।

‘পাটিনার নয়,’ বললেন নীহারু দত্ত—‘আসিলটান্টে ! সুপ্রকাশ টেন্ডুরী ! সে আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল । পাটিনার বললে বেশি বলা হবে । আমাকে ছাড়া তার এগোনোর পথ ছিল না ।’

‘তিনি এখন কোথায় বা কী করছেন সে খবর জানেন ?’

‘না ।’

‘আঞ্জিলিঙ্গেটের পর তিনি আপনার সঙ্গে যেগায়েগা রাখেননি ?’

‘না । এটুকু বলতে পারি যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল । বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্য পাঁচ বর্ষ ব্যাপারে তার ইন্টারেন্স ছিল ।’

‘বিশ্বেগারণটা কি অসাবধানতার জন্য হয় ?’

‘আমি নিজে সজ্ঞানে কখনো অসাবধান হইনি ।’

চা এল । ঘরটা কেমন যেন থমথম করছে । সুবীরবাবুর দিকে আড়তেখে দেখলাম । তাঁরও যেন তটসৃ ভাব । ফেলুন একদৃষ্টি চেয়ে আছে কালো চশমাটার দিকে ।

চায়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত আর রাজন্তেগ । আমি প্রেটিটা হতে তুলে নিলাম । ফেলুন যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই । ও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বসল—

‘আপনি যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা তাহলে অসমাপ্তই রয়ে গেছে !’

‘সে দিকে কেউ অগ্রসর হলে খবর পেতাম নিশ্চই ।’

‘সুপ্রকাশবাবু সে নিয়ে আর কোনো কাজ করেননি সেটা আপনি জানেন ?’

‘এটুকু জানি যে আমার নোটস ছাড়া তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না । গবেষণার শেষ পর্বের নোটস আমার কাছে ছিল আমার ব্যক্তিগত লকারে । তার নাগাল পাওয়া বাইরের কারোর সাধ্য ছিল না । সেসব কাগজপত্র আমার সঙ্গে দেশে ফিরে আসে, আমার কাছেই আছে । এটা জানি যে গবেষণা সফল হলে সেবেল প্রাইভ এসে যেত আমার হাতের মুঠোয় । ক্যানসারের চিকিৎসার একটা রাস্তা খুলে ফেলে ।’

ফেলুন চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছে । আমিও ইতিমধ্যে চুমুক দিয়ে বুঝেছি এ চা ফেলুন মতো পুতুলতে লোকলেও খুশি করবে । কিন্তু চুমুক দিয়ে তার মুখের অবস্থা কী হয় সেটা আর দেখা হল না ।

ঘরের বাতি নিজে গেছে । লোড শেডিং ।

‘ক’দিন থেকে ঠিক এই সময়টাতেই যাচ্ছে’ সোজা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন সুবীরবাবু। —‘কৌমুদী !

বাইরে এখনো অস্ত আলো রয়েছে ; সেই আলোতেই সুবীরবাবু চাকরের বেঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

‘বাতি গেল বুঝি ?’ প্রশ্ন করলেন নীহার দস্ত। আরপর একটা দীর্ঘসাম ফেলে বললেন, ‘তাতে আমার কিছু এসে যায় না।’

গ্র্যান্ডফানার ব্র্লকটা ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে বেঁজে উঠল—ংং ডং ডং ডং ডং। ছ’টা।

সুবীরবাবু ফিরলেন, পিছনে মোমবাতি হাতে চাকর কৌমুদী।

শব্দের টেবিলে মোমবাতি রাখায় সকলের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে। নীহারবাবুর কালো চশমার দুই কাচে দুটি কম্পমান হলদে বিস্তু। মোমবাতির শিখার ছায়া।

ফেলুন্দা চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে আবার চশমার দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনার গবেষণার নোটস যদি আলা কোনো বায়োকেমিস্টের হাতে পড়ে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা লাভজনক হবে কি ?’

‘নোবেল প্রাইজটা যদি লাভ বলে মনে করেন তাহলে হতে পারে বৈকি।’

‘আপনার কি মনে হয় এই কাগজপত্র চুরি করার জন্য তোর আপনার ঘরে চুকেছিল ?’

‘সেরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।’

‘আরেকটা প্রশ্ন। আপনার এই নোটসের কথা আর কে জানে ?’

‘বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই এটার অঙ্গত অনুমান করতে পারে। আর তানে আমার বাড়ির লোকেরা আর আমার সেক্রেটারির রণজিৎ।’

‘বাড়ির লোক বলতে কি একতলার দুই ফ্লাটের বাসিন্দাদের কথাও বলছেন ?’

‘তাঁরা কী জানে না-জানে তা আমি জানি না। এরা ব্যবসায়ির লোক। জানলেও কোনো ইন্টারেস্ট হ্যার কথা না। অবিশ্বা আজকাল তো সব জিনিস নিয়েই ব্যবসা চলে ; এ ধরনের কাগজপত্র নিয়েই বা চলবে না কেম। বিজ্ঞানী হলেই তো আর ধর্মপূর্ত যুধিষ্ঠির হয় না।’

নীহারবাবু উঠে পড়লেন ; সেই সঙ্গে আঘরাও।

‘আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি ?’ ফেলুন্দা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক চোকাটের মুখে থেমে গিয়ে বললেন, ‘দেখবেন বৈকি। সুবীর দেখিয়ে দেবে। আমি হাতে সাজ্জান্মণটা লেবে আসি।’

করিউরে বেরিয়ে এসে চারকানে। অক্ষকর আঘো ঘনিয়ে গেছে।

করিডরের ডাইনে বায়ে ঘরগুলোর ভিতর থেকে মোমবাতির কীণ আলো বাইরে এসে পড়েছে। নীহারবাবু লাঠি ঠক ঠক করে ছাতের সিডির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'স্টেপ গোনা আছে। সতের স্টেপ গিয়ে বায়ে ঘুরে সিডি। সেভেন প্লাস এইট—পনেরো ধাপ উঠে ছাত। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন...'

॥ ৩ ॥

নীহারবাবুর বেশ বড় ঘরের একপাশে অনেকখানি জুড়ে পুরানো আমলের ঘাট। ঘাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। তাতে ঢাকনি-চাপা গেলাসে জল, আবৃ তার পাশে রাঙ্গুলির মোড়া গোটা দশেক বাড়ি। বোমহয় ঘুমের ওষুধ।

এই টেবিলের পাশে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারা। তার পিছে অনেক দিনের বাবহারের ফল বেতের বুনুনিতে কালসিটে পড়ে গেছে। অনেক হল এই আরাম কেদারাতেই বেশির ভাগ সময় কঢ়িম নীহারবাবু।

এছাড়া আছে একটা কাজের টেবিল—ধার উপর এখন একটা মোমবাতি চিমটির করছে—একটা স্টোলের চেয়ার, টেবিলের উপর লেখার সরঞ্জাম, চিঠির রায়ক, একটা পুরানো টাইপরাইটার আর এক তাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

এই টেবিলের পাশেই, দ্বিতীয় ঠিক বায়ে, রয়েছে গোদরেভের আলমারিটা।

ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ দুলিয়ে নিয়ে ফেলুন। তার মিনি টর্চ দিয়ে আলমারির চাবির গাঁত্তি ভালো করে দেখে বলল, 'খোলার চেষ্টার অভাব হয়নি। গর্তের চারপাশে দাগ।' তারপর এগিয়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে বড়ির পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, 'সোনেরিল। ...মুঁজেছিসাম নীহারবাবু বেশ কড়া ওষুধ থান। না হলে ঘুম ভেঙে যাবার কথা।'

তারপর চৌকাসের বাইরে দাঁড়ান। চাকর কৌমুদীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ঘুম ভাঙল না ? তুমি কীরকম পাহনো দাও বাবুকে ?'

কৌমুদীর মুখ হেটে হয়ে গেল। সুবীরবাবু বললেন, 'ও বেজায় ঘুমকাতুরে। এমনিতেই তিমবার না ভাকলে ওঠে না।'

বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ পেঁজেছিসাম আগেই; এবার একটি বহুর ত্রিশেকের তত্ত্বাবধার এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, চেথে চশমা, চুল কোঁকড়া। সুবীরবাবু আসাপ করিয়ে দিতে বুকলাম ইন্হি নীহারবাবুর সোফটেরি, নাম রংগজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কে জিজ্ঞেস ?'

ফেলুনার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, করা হয়েছে সেক্ষেত্রে মশাইকে। কণ্ঠিখোবুর

ফালক্যালে তার দেশে ফেলুন হেসে বলল, 'আপনার পাতলা টেরিলিনের শার্টের পকেটে স্পষ্ট দেখছি খেলার টিকিটের কাউন্টারফলে। তার উপর রোদে মুখ ঘলসানো—লীগের বড় খেলা দেখে এলেন সেটা অনুমান করাটা কি খুব কঠিন ?'

'ইস্টবেঙ্গল,' হেসে বললেন রণজিৎবাবু। সুবীরবাবুর মুখেও তারিফ আর বিশ্বাস মেশানো হাসি।

'আপনি এখানে কলিন কাজ করছেন ?'

'চার বছর।'

'নীহারবাবু তার বিশ্বাসগের ঘটনার বিষয় কথনো কিছু বলেছেন ?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,' বললেন রণজিৎবাবু, 'কিন্তু উনি খুলে কিছু বলতে চাননি। তবে চোখ গিয়ে যে সাংবাদিক ক্ষতি হয়েছে সেটা উনি যারে মাঝে নিজের অজানতেই বলে ফেলেন।'

'আর কিছু বলেন ?'

রণজিৎবাবু একটু ভেবে বললেন, 'একটা কথা বলতে প্রয়োজন যে, উনি যে এখনো বেঁচে আছেন তার কারণ হল যে উঁর একটা কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটা কী কাজ আমি জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। মনে হয় উনি এখনো আশা রাখেন যে উর গবেষণাটা শেষ করবেন।'

'নিজে তো আর পারবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন এটাই হয়তো ভেবেছেন। তাই নয় কি ?'

'তাই বোধহয়।'

'আপনার এখানে ডিউটি করছেন ?'

'নটায় আসি, ছটায় যাই। আজ খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি চেয়েছিলাম, তাই আপত্তি করেননি। তবে বাইরে গেলেও সক্ষেপে একবার এখানে হয়ে যাই। যদি উর কোনো...'

'গোদরোজের চাবি কোথায় থাকে ?' ফেলুন হঠাত প্রশ্ন করল। —'টাকা আর গবেষণার সোটিস কী অবস্থায় থাকে সেটা একবার দেখে নিতে চাই।'

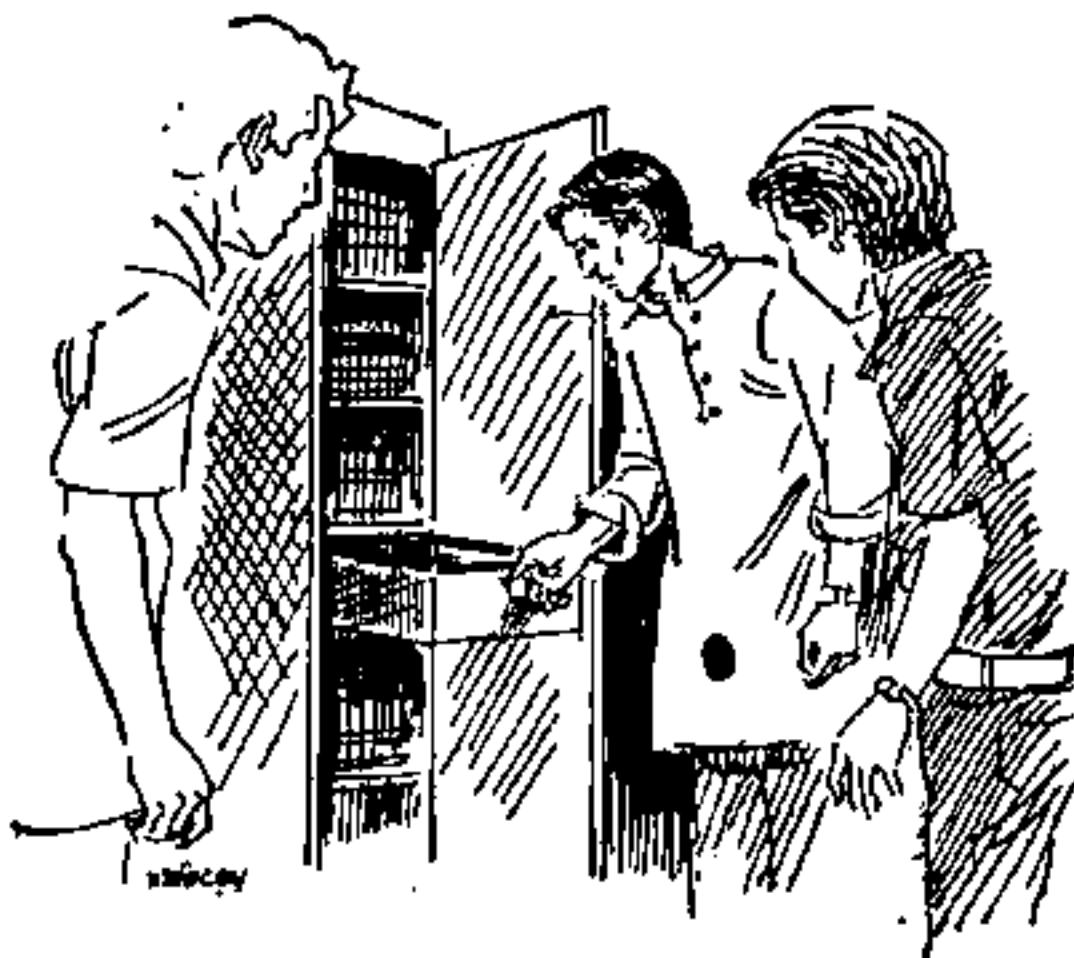
'ওই বালিশের নীচে।'

ফেলুন এগিয়ে শিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা চাবি সমেত একটা রিং বার করে আলো। ত্যারপর তা থেকে প্রয়োজনীয় চাবিটা বেছে নিয়ে আঙুমারি খুলল।

'টাকা কোথায় থাকে ?'

'ওই সেরাজে।' —রণজিৎবাবু আঙুল দেখালেন।

ফেলুন দেরাজটা টেনে খুলল।



‘সে কী !’

রঞ্জিতবাবুর চোখ কপালে। মোমবাতির আলোতেই বুঝলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

দেরাজের ঘরে একটা পাকানো কাগজ—খুলে দেখা গেল সেটা কুঠী—আর একটা কাশীরী কাঠের বালো কিছু পুরানো চিঠিপত্র। আর কিছু নেই।

‘কী করে হয় ?’—রঞ্জিতবাবুর গলায় দিয়ে যেন আওয়াজে বেরোতে চাইছে না।—‘সিটে বাণিল করা একশেষ জাকার নোট...সব মিলিয়ে প্রায় তেক্ষিণ হাজার...’

‘গবেষণার কাগজপত্র কি এই অন্য মেরাজটায় ?’

রঞ্জিতবাবু মাথা নাড়েন। মেজুনা ছিলীয়া মেরাজটা ঘুলঙ্গ।

এটা একবারেই ঘালি।

বাইরে পায়ের শব্দ—খট খট খট খট। মীহারবাবু ছান্ত থেকে নামছেন।

‘মিশিগান ইউনিভার্সিটির একটা শৰ্ষা সীলনোহর লাগানো থামে ছিল গবেষণার সেটিস...’ রঞ্জিতবাবুর গলা খটখটে শুকনো।

‘আজ সকালে ছিল টাকা আৰ কাগজপত্র ?’

‘আমি নিজে দেখেছি,’ বললেন সুবীরবাবু। —‘একশো টাকার নোটের অস্বরগুলো সব মোট কৰা আছে। দাজনই এ ব্যাপারে ইনসিস্ট কৰতেন।’

ফেলুনা থমথমে ভাব করে বলল, ‘তাৰ মানে গত মিনিট পনেৱেৰ অধো—অথাৎ লোড শেডিং হৰাৰ পৰেই—ব্যাপারটা ঘটেছে। আমৰা যখন বৈষ্টকথানায় ছিলাম তখন।’

নীহারবাবু চুকলেন ঘৰে। তাৰ মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বাইৱে থেকে সব শুনেছেন।

আমৰা পথ করে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাৰ আৱাম কেদারায় বসলেন। তাৱপৰ দীৰ্ঘস্থাপ মেলে বললেন, ‘বোঝো!—গোয়েন্দাৰ মাকেৰ সামনে দিয়ে দিয়ে শেল।’

‘সামনেৰ সিডি ছাড়া দোতলায় ওঠাৰ অনা সিডি আছে ?’ নীহারবাবুৰ ঘৰ থেকে কৱিডৰে বেৱিয়ে এসে সুবীরবাবুকে জিজেস কৰল ফেলুন।

সুবীরবাবু বললেন, ‘জমাদারেৰ সিডি আছে পিছন দিকে।’

‘লোড শেডিং কি রোজই এই সময় হয় ?’

‘তা দিন দশেক হল হচ্ছে। অনেকে তো ঘড়ি মেলাতে শুক কৰেছে। ছাঁটায় যায়, আসে দশটায়।’

ভাবতে চেষ্টা কৰলাম ফেলুনাৰ গোয়েন্দা কীৰলে এৱকম অস্তুত ঘটনা আৰ ঘটেছে কিম। একটাও ঘনে পড়ল না।

‘নীচেৰ বাসিন্দারা কেউ ফিরেছেন কি ?’ সিডিৰ মুখটায় এসে ফেলুন প্ৰশ্ন কৰল।

‘সেটা একবাৰ খৌজ কৰা যেতে পাৰে,’ বললেন সুবীরবাবু, ‘মোটামুটি এই সময়টাতেই আসে।’

নীচে লাইডিং-এ সিডিৰ উপ্টোডিকে যিঃ সন্তুৰেৰ ঘৰেৰ দৱজা। সেটা এখন বজ, আৰ ঘৰ যে অজ্ঞকাৰ সেটা বাইৱে থেকেই বোৰা যায়।

‘সুখওয়ানিৰ ঘৰে যেতে হলে পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে,’ বললেন সুবীরবাবু।

কড়িৰ পুৰ দিক দিয়ে গিয়ে বাগানেৰ পাশেৰ পথ দিয়ে সুখওয়ানিৰ ঘৰেৰ দিকে এগোলাম আমৰা। ঘৰে ফুণ্ডেসেন্ট আলো ছুলছে, খাটোৰি লাইট, যেমন আঞ্জকাল চালু হয়েছে।

পাশৰ আওয়াজ কৰে ভদ্রলোক বাবান্দায় বেৱিয়ে এলেন। ফেলুনাৰ উচ্চে আলো দেখতে পাচ্ছেন, অথচ মানুষগুলো কে বোঝাৰ উপায় নেই। সুবীরবাবু ইংৰেজিতে প্ৰশ্ন কৰলেন—

‘একটু আসতে পারি কি ?’

গলা চিনতে পেরে ভদ্রলোকের চাহনি পাত্রে গেল ।

‘সার্টিলি, সার্টিলি !’

ফেন্দুদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক বাস্ত হয়ে উঠলেন ।

‘ইউ সী, মিস্টার মিটার—আমার ঘরভর্তি ভ্যালুয়েব্ল জিনিস । চুরির কথা কখনলৈ আমার হৃৎক্ষম হয় । আজ সকালে যখন শুনোম যে বাত্রে ঢোর এসেছিল, বুঝতেই পারেন তখন আমার কী মনের অবস্থা !’

সত্ত্ব, এত দায়ী জিনিস যে একটা ঘরে বাকতে পারে সে আমার ধারণাই ছিল না । তাওয়ামূর্তি, তৈরবৃত্তি, বৃক্ষমূর্তি ইত্যাদি পাথর, পেতল আর ত্রঞ্জের স্ট্যাচুয়েটের সংখ্যাই অন্তত গোটা তিরিশ । তাছাড়া ছবি, বই, পুঁজানো ম্যাপ, নানারকম পাত্র, ঢাল-তলোয়ার, পিকদান, গড়গড়া, আডরনান এসব তো আছেই । ফেন্দু পরে বলেছিল, ‘টাকা আকলে অন্তত বই আর প্রিন্টগুলো সব কিনে বেলতাম রে তোপশে !’

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে বললেন তিনি নাকি লোড শেডিং-এর ঠিক দশ মিনিট আগে ফিরেছেন ।

‘এই দশ মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকটা এসেছিল কি ? দোতলায় যাবার একটা শিড়ি রয়েছে আপনার ঘরের পিছনেই ; শিক্ক থেকে কোনো আওয়াজ পেয়েছিলেন ?’

ভদ্রলোক বললেন উনি এসেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন । —‘আর তাছাড়া এই অকরারে দেখার প্রস্তা আর উঠাচে কী করে ? আর ইয়ে, ভালো কথা, আপনারা কি বাহিরের লোককে সন্দেহ করছেন ?’

‘কেন বলুন তো ?’

‘আপনারা মিঃ দস্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন ?’

তাবটা যেন, আমরা দস্তরের সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাব যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলতে পারে না ।

ফেন্দু কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, ‘হি ইজ এ মোস্ট পিকিউলিয়ার ক্যারেক্টাৰ । আমি জানি আমার প্রতিবেশী সমস্কে এৱকম করে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমি ওকে কিছুদিন থেকেই ওয়চ কৰিছি । গোড়ায় আলাপ হ্বার আগে শুধু ওৱ মাকড়াকার শব্দ পেতাম ওৱ জ্বালালা দিয়ে । আমার বিশ্বাস সে শব্দ দোতলা অবধি পৌছে যায় ।’

সুবীরবাবুর ঠোটের কোণে হাসি দেখে মনে হল সুখওয়ানি খুব বাড়িয়ে বলেনি ।

‘তারপৰ আলাপ হয়, যখন একদিন সকালে ও আমার টাইপোটাইটার ধার নিতে

আসে। আমার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে ঘেরকম সোজুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল স্টো আমার মেটেই ভালো লাগেনি। সাধারণ কৌতুহলবশে জিজ্ঞেস করলাম ও কী করে। বলল ইলেক্ট্রিক্যাল গুডনের ব্যবসা। আরে বাপু, তাই যদি হবে, তাহলে এই সোড শেভিং-এর বাজারে ঘরে একটা ব্যাটারি লাইট আর পাথার ব্যবস্থা করেনি কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।'

ভদ্রলোক থামলেন, আর আমরা সেই ফাঁকে উঠে পড়লাম। ফেলুদা বেঝেবার আগে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মিঃ দন্তকে জানালে আমাদের কাজের বুব সুবিধা হবে।'

পুরের গলিটা দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোনোর সময়ই একটা ট্যাক্সির হ্রস্পেয়েছিলাম, এবার দেখলাম একটি ভদ্রলোক নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে গাড়িবায়ান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। অবছ আলোতেও দেখতে পাইছি ভদ্রলোক মাঝারি হাইটের এবং মোটা, পরনে খয়েরি টেরিলিনের সুট, পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা কাচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকাট দাঢ়ি। রংটা বোধহ্য বেশ ফরসাই। হাতের ব্রীফকেসটা দেখে নতুন বাল মনে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরতেই সুবীরবাবু তাঁকে গুড ইভিনিং জানালেন। তাতে উনি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বুকলাম এ বাড়িতে কারুর মুখ থেকে গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং শুনতে অভ্যন্ত নন।

'গুড ইভিনিং, মিঃ ডাট।'

অন্ত খ্যালধ্যানে গলার স্বর। কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, মেলুদা চাপা ফিসফিসে গলায় সুবীরবাবুকে বললেন, 'ওকে থামান।'

সুবীরবাবু তৎক্ষণাত আদেশ পালন করলেন।

'ইয়ে, মিঃ দন্তর।'

দন্তর থামলেন। সুবীরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

সুবীরবাবু সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'এই ঘাজি কয়েক মিনিটের মধ্যে এত ঘটল ঘটে গেল? ইতো ব্রাদার ঘাস্টি বি টেরিব্লি আপসেট!'

ফেলুদা বলেছিল যে অস্বাভাবিক ঘটনাক অবস্থায় মদুষের গলার স্বর এত বদলে যেতে পারে যে অনেক সময় চেলাই যায় না। মিঃ দন্তর ইংরেজিতে আতঙ্ক ও বিশ্বায় মেশানো ঘরে এই কথাঙ্গলো বলার সময় লক্ষ করলাম যে খ্যালধ্যানে ভাবটা একেবারেই নেই। প্রায় অনে হয় যেন জারেকজন মানুষ কথাটা বলল।

'আপনি যখন এজেন্স শখন কংগুকে বেরোতে দেখলেন এ বাড়ি থেকে?'

ফেলুদা প্রশ্ন করল ।

‘কই না তো ?’ বললেন মিঃ দক্ষর । ‘অবিশ্য এমনও হতে পারে যে অঙ্ককারে দেখতে পাইনি । থ্যাঙ্ক গড় যে আমার ঘরে কোনো মৃক্ষবান জিনিস নেই !’

‘কে ?’

প্রশ্নটা এল দেতলাই লাভিং থেকে । নীহারবাবুর গলা । আমরা সবাই গাড়িবাবান্দার সিঁড়ির কাছটায় দাঢ়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার ভিতরে চুক্কে উপরে চেয়ে দেখলাম অঙ্ককারেও নীহারবাবুর কালো চশমাটা চকচক করছে ।

‘হটস মী, মিস্টার ডাট’, দৃষ্টি উপরে করে বললেন দক্ষর—‘আপনার ভাই এই মাত্র আপনার লস্-এর কথাটা বলল । আমি আপনাকে আমার সহানুভূতি ভালাচ্ছি ।’

চশমাটা সরে গেল । আর তার পরেই বিলিয়ে এস চটি আর লাঠির শব্দ ।

‘আপনারা একটু বসে যাবেন না আমার ঘরে !’ বললেন মিঃ দক্ষর । —‘নারামিন কাজের পরে একটু সঙ্গ পেলে ভালো সামে ।’

ফেলুদা আপন্তি করল না । তার কানুণ অবিশ্য আছি জানি । যে বাড়িতে জাইয়ে ঘটেছে, সে বাড়ির সোকেদের চিনে রাখা গোয়েন্দার গোড়াব কাজ ।

সুখওয়ানির ঘরের পর মিঃ দক্ষরের বৈঠকখালের নেড়া ভাবটা সভিয়াই দেখবার মতো । অসবাব বলতে একটা সেফা, দৃঢ়া কাউচ, একটা রাইটিং ডেস্ক আর একটা বুকশেল্ফ । সেফার সামনে একটা নীচু টেবিল আছে বটে, তবে সেটা নেহাতই ছোট । তারই উপর একটা মোমবাতি রাখা ছিল । ফেলুদা সেটা ওর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল ; এখন দেখলাম দেয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই ।

ভদ্রলোক ভিতর দিকে গিয়েছিলেন শোধহয় চাকরকে ডাকতে ; যিনির আসতে ফেলুদা তাঁকে একটা সিগারেট অফার করল ।

‘নো, প্যাকস্ । ক্যানসারের ভয়ে ধূমপানটা বছর তিনেক হল হেড়ে দিয়েছি ।’

‘অনের ধূমপানে আশা করি আপনি নেই । আপনার আশত্বেতে অলরেডি একটা আঘাতয়া সিগারেট পড়ে আছে ।’

ফেলুদা টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, ‘আমারই ঝ্যাঙ । চারমিনারের টুকরো আঘাত দূর থেকেই চিনতে পারি ।’

দক্ষর বলল, ‘অনেকবার ভেবেছি সুখওয়ানির মতো আছিও আলো-পাখার একটা ব্যবস্থা করে নিই । তারপর দখনই মনে হয়েছে যে কলকাতার শতবর্যা-নবাই ভাগ সোককে গুরম আর অঙ্ককার দ্রোগ করতে হচ্ছে, তখনই মন্টা খারাপ

হৃতে যায় : সেই কারণে আমিও...’

‘আপনার তো ইলেক্ট্রিকাল কন্স-এর ব্যবসা ?’

‘ইলেক্ট্রিকাল ?’

‘সুখওয়ানি হে বললেন—’

‘সুখওয়ানি ওই রকমই বলে। ইলেক্ট্রিকাল নয়, ইলেক্ট্রনিক্স।
বছরখনেক হল শুরু করেছি।’

‘আপনি নিজেই ?’

‘না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে। আমি বোস্টন-এর লোক, তবে
অনেকদিন দেশের বাহিরে। জামানিতে একটা কম্পিউটার মাল্কাকচারিং ফার্মে
কাজ করতাম। বন্ধু কলকাতা হেকে সিখল এখানে চলে আসতে। পরস্ত ওর,
আমি যোগাচ্ছি অভিজ্ঞতা।’

‘কবে এলেন কলকাতায় ?’

‘গত নভেম্বরে। বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম প্রায় তিনিশ ; এই ফ্ল্যাটের বররটা
পেয়ে এখানে চলে আসি।’

চাকর কোষ্ট ড্রিফ্স নিয়ে এল। থার্মস আপ। যিঃ দক্ষর ফেলুদার পরিচয়
আগেই পেয়েছেন, এবার গলাটা নামিয়ে বললেন, ‘যিঃ মিটুর, আমার ঘরে
মূল্যবান ভিনিস লেই ঠিকই, কিন্তু একটা কঢ়া আপনাকে না বসে পারছি না।
আমার প্রতিবেশীটি কিন্তু খুব সিখে কেকে নন। তার ঘরে নানারকম গোপন
কারণার চলে। গার্হিত ব্যাপার।’

‘আপনি জানলেন কী করে ?’

‘আমার খানের ধর আর ওর খানের ধর লাগোয়া। দুটোর মাঝখানে একটা
বক দরজা আছে। সে দরজায় কান লাগালে যাবে যাবে ওর শোবার ধর থেকে
কথাবার্তা শোনা যায়।’

ফেলুদা গলা ধীকৰিয়ে বলল, ‘এই ভাবে কান লাগানোও একটা গার্হিত ব্যাপার
নয় কি ?’

যিঃ দক্ষর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, ‘সেটা করতাম না। যখন
দেখলাম যে আমার চিঠি ভুল করে ওর হাতে পড়লে ও জল দিয়ে ধাম খুলে
তারপর আবার আঠা দিয়ে সেটা মেল্লত দেয়, তখন একটা পাঁচটা দুটুমি করার
লোভ সামলাতে পারলাম না, আমি নির্বিজ্ঞাটি যানুব। কিন্তু উনি যদি আমার
পিছনে সাগেন তাহলে আমিও তাকে ছাড়ব না, এই বলে দিলাম।’

কোষ্ট ড্রিফ্সের জন্য ধনাবাদ আমিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

গোটোর কাছে এসে ফেলুদা মারোয়াদকে জিজ্ঞেস করল গত আধ ঘণ্টার মধ্যে
কাউকে চুক্তে বা বেরোতে দেখেছে কিনা। সে বলল সুখওয়ানি আর দক্ষরকে

ছাড়া কাউকে দেখেনি। এটা আশ্চর্য না। সাতের এক বাণিগঞ্জ পার্কের কম্পাউন্ড ওয়াল রয়েছে বাড়ির চারদিক ঘিরে। পিছন দিকের একটা বাড়ি নাকি খালি পড়ে আছে আজ কটেক ঘাস যাবৎ। কোয়ান চোর হলে পাঁচিল টপকে আসার কোনো অসুবিধা নেই—যদিও আমাদের সকলেরই মন বলছে এ কাজ বাড়ির লোকেই করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলছে—ভেতরের লোকই যে বাইরের মোকাবেক দিয়ে কাজটা করায়নি তারই না যিষ্যাস কী?

আমাদের গাড়ি নেই। সুবীরবাবু বলেছিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌছে দেবার কথা, কিন্তু ফেলুন। বলল হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

‘পুলিশ একটা খবর দিলে ভালো করতেন কিন্তু।’

ফেলুন এ প্রত্যাবটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সুবীরবাবুও দেশ একটু অবাক হলেন। বললেন, ‘কেন বলতেন বঙ্গুন তো!'

‘পুলিশ সহজে আপনার বাসার ধরণ যাই হোক না কেন পসাতক চোর ধরার যে সব উপায় পুনিশের আছে কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের তো নেই। বিশেষ করে যখন এতকালো টাঙ্কা, তখন পুলিশকে বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নোটের নম্বর দেখা আছে বলতেন। কাজটা এমনিতেই অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।’

সুবীরবাবু বললেন, ‘আপনাকে যখন আসতে বলেছি, এবং দুর্ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন আপনাকে বাস দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। পুলিশ আসুক, কিন্তু তার পাশে আপনিও থাকলে শুধু অফিসি নিশ্চিন্ত হব না, দাম ও হবেন। অবিশ্বি, সত্যি বলতে কি, তোর যে কে সেটা কাজের সাহায্য ছাড়াই আমি বলতে পারি।’

‘আপনার ছেলের কথা বলতেন কি?’

সুবীরবাবু একটা নীর্ঘন্ধাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় বিলেন। —‘এ শক্তির ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে জানে এ পাড়ায় ছটায় বাতি লিঙ্গে যায়। ডানপিটে ছেলে, পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়। তার পর পিছনের সিডি দিয়ে উঠে এসে জ্যাঠার ধারে চুকে আস্তারি খেলা—গ্রসবই তো তার কাছে নিশ্চ্য।’

‘কিন্তু মীহারবাবুর গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে সে কী করবে? বৈজ্ঞানিক মহলে কি তার পুর যাত্তায়ত আছে?’

‘সেটা সরকার কি বলুন! সে তো সেই কাগজপত্রের বিলিমায়ে তার জ্যাঠার কাছ থেকেই টাঙ্কা আদায় করতে পারে। এই কাগজপত্রের দাম যে দামের কাছে কতখানি সেটা তো সে খুব ভালোভাবেই জানে।’

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রুক্ষ ঘটনা ঘটায় ফলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তার পরেও একই দিনে যে আরো কিছু ঘটিতে পারে সেটা ভাবতেই প্রাপ্তি। অবিশ্বিত সেটার কথা বলার আগে বাড়ি ফিরে এসে ফেলুন আর আমার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুনোর ঘরে গিয়ে দেখি সে খাটে চিত হয়ে শয়ে পিলিং-এর দিকে চেয়ে পান চিরোচ্ছ আর চারমিনার ফুকছে। আমিও গিয়ে খাটে বসলাম। যে প্রশ্নটা গোলোকথাক থেকেই আমি বোঁচ দিচ্ছিল সেটা না বলে পারলাম না।

‘তুমি কেসেটা ছেড়ে দিতে চাইছিলে কেম ফেলুন?’

ফেলুন পর পর দুটো মোক্ষম রিং ছেড়ে থলশ, ‘কারণ আছে রে, কারণ আছে।’

‘কারণ তো বললেই তুমি—পালালো চোর ধরা পুলিশের পক্ষে আরো সহজ—বিশেষ করে যদি অনেক টাকা নিয়ে পালায়।’

‘সুবীরবাবুর হেলেই নিয়েছে বলে তোর মনে হয়?’

‘আর কে নেবে বল। বাড়ির লোক নিয়োছে সে তো বোঝাই থাক্কে। দস্তুর তো ছিলেনই না। সুখওয়ালি চুরি করে মিলি ঘরে বসে থাকবেন সেটাও যেন কেমন কেমন লাগে। বণজিবাবুও এলেন চুরির পক্ষে। আর আছে চাকরবাবুর...’

‘কিন্তু ধর যদি মাজেল নিজেই কিছু করে থাকেন?’

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ফেলুনোর দিকে।

‘সুবীরবাবু।’

‘একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চুরি আবিকারের ঠিক আগের ঘটনাগুলো ভেবে দেখ।’

আমি চোখ বুজে কলমা কলমা আমরা চারজনে বৈঠকখনায় বসে আছি। চা এল। আমরা চা খাচ্ছি। ফেলুনোর হাতে কাপ। ঘরের বাতি নিভল। তারপর—ধী করে একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেপে উঠল।

‘লোড শেডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে সুবীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফেলুন—চাকরকে ডাকতে।’

‘তবে!—ভেবে দেখ আমার পেজিশনটা কী হবে যদি বেরোয় যে সুবীরবাবুই আলমারি খুলেছিলেন। এটা অসম্ভব ময় এই কারণেই যে ওই একটি লোক সহজে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চাকরের কথা যেটা বলেছেন সেটা অবিশ্বিত অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ধর যদি শেয়ার বাজারে বা রেসের মাঠে বা স্কুলের আভ্যাস কলমাকের অনেক টাকা খেয়া গিয়ে থাকে,



বাজারে একগাল ধারয়েন্দ্র থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে টিকাটা নেওয়া খুব আশ্চর্য কী ?

‘কিন্তু উনি তো নিজেই এলেন তোমার কাছে । উনিই তো তোমায় গোয়েলা আপয়েট করলেন !’

‘উনি যদি খুব উচ্চস্থারের ধূর্ত বাজি হয়ে থাকেন তাহলে নিজের উপর যাতে সদেহ না পড়ে তাঁর জন্মে ঠিক ওই কাজটাই করা কিন্তুই আশ্চর্য নয় ।’

এর পরে আর কোনো কথা বলা যায় না ।

ফেলুদা কালী সিংহের মহাভারতটা হাতে নিয়ে রিডিং স্ল্যাপটা জ্বালিয়েছে দেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়লাম ।

বসবার ঘরে আসতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ পেলাম । কুটুর । একটা নয়, একটার বেশি ।

মিঞ্জন নিজের পাড়াটাকে কাঁপিয়ে যেন আমাদের বাড়ির সাথেই এসে থামল । আর তার পরেই আমাদের দরজায় 'কলিং বেল' বেজে উঠল ।

দিনকাল ভালো নয়, আর তাহাতা আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেটাইছে জোক এলেও কুটুরে আসে না ।

আমি দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফেলুদার ঘরের প্রদত্তি ফাঁক করে একবার উকি দিলাম । ফেলুদা বই রেখে খাট থেকে উঠে পড়েছে । বলল—'দাড়া ।' অথবা তুই খুলিস না, আমি খুলছি ।

দরজা খুলতেই যিনি প্রক্রে করলেন তিনি যে শয়তানের অবসার সেটা বুকতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না । বসবারও দরকার নেই ; ঘরে চুক্তে পিঠ নিয়ে দরজাটা ধস্ত করে ফেলুদার দিকে দোজাটে চোখ করে তাকিয়ে কথার চাবুক আছড়াতে শুরু করলেন সুবীর দ্বন্দ্ব হলে শক্তর দণ্ড ।

'শুনুন মশাই, আমার থাবা আমায় বিশয়ে কী বলেছেন জানি না, কিন্তু গেস করতে পারি । এইটুকু শুধু বলে দিচ্ছি আপনাকে—আমার পেছনে তিকটিকি লাগিয়ে করুর বাপের সাধা নেই কিছু করে । আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি ; আমি একা নই । আমাদের গ্যাং আছে । বেশি ওস্তাদী করলে প্রস্তাবেন । বাপের নাম ডুলিয়ে ছাড়ল এই বলে দিলাম ।'

শক্তর দণ্ড যেরকম নাটকীয় ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন স্পীচ বাড়া শেব করে । তারপরই আওয়াজ পেলাম তিনটে কুটুর স্টার নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ।

ফেলুদা এতক্ষণ ছির হয়ে ছিল । স্বামুর উপর অসাধারণ দরজ আছে বলেই এত অপমানেও ও পাথর । ও বলে প্রচণ্ড রাগে যে ফেন্টে পড়ে তার চেয়ে সেই রাগ যে দমিয়ে রাখতে পারে তার মনের জোর বেশি ।

কুটুরের শব্দ যিলিয়ে থাবার আগেই কিন্তু ফেলুদা বাড়ুর বেগে গাঢ়ে একটা পাঞ্চাবি চাপিয়ে পকেটে তার মানিক্যাগটা নিয়ে নিয়েছে ।

'চ তোপশে—ট্যাঙ্গি...'

তিনি মিনিটের মধ্যে সার্লি এভিনিউতে একটা চলঙ্গ ট্যাঙ্গি থামিয়ে উঠে পড়লাম দু'জনে । উভয় দিকে গেছে কুটুরগুলো এটা জানি ।

‘স্যানসডার্টন ব্রুক,’ বলল ফেলুন। বড় রাস্তায় খৌড়াখুড়ি, তাই ল্যানসডার্টন রোড ধরেই যাবে ওরা এটা আমারও মনে হয়েছিল।

পৌনে এগারোটা। সাদর্ন এভিনিউ প্রায় ফৈকা। ট্যাঙ্কিচালক বাঙালী, আমাদের মুখ চেনে, বলসেন, ‘কাউকে ফলো করবেন, স্থার?’

‘তিনটে স্কুটার,’ চাপা গলায় বলল ফেলুন।

আন্দাজে ভুল নেই। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে এসে স্কুটার তিনটের দেখা পাওয়া গেল। শকের একাই বসেছে একটায়, অন্য দুটোয় দুজন করে লোক। এরা সব মার্কিয়ার মন্ত্রন সেটা আর বলে দিতে হচ্ছে না। আমাদের ট্যাঙ্কি ওদের সেজ ধরে চলতে লাগল।

লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট পেরিয়ে স্কুটারগুলো পার্ক স্ট্রিটে পড়ে বা দিকে ঘূরঙ্গ। একেবৰকে সাপের মতো চালানোর বোৰা যাচ্ছে এসের বেপরোয়া ফুর্তির ভাবটা। ফেলুন রাস্তার অবলো বাঁচিয়ে ভিতর দিকে চেপে বসেছে, তার মাথায় কী খেলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিরজা গালিব স্ট্রিট দিয়ে কিছুনুর গিয়ে স্কুটারগুলো আবার বাঁয়ে ঘূরল। মানুষিস স্ট্রিট। রাস্তা সরু হয়ে আসছে, পাড়া অক্ষকার, বাস্তিগুলো টিমটিমে। যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই ফেলুনার আদেশে আমাদের ড্রাইভার ট্যাঙ্কির স্পীড কমিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে নিল।

আগো দুটো মোড় ঘুরে দেখলাম স্কুটারগুলো একটা বাড়ির নামনে দাঢ়িয়েছে।

‘চালিয়ে বেরিয়ে বান,’ বলল ফেলুন।

বাড়ি না। এক ধরনের হোটেল। নাম নিউ কেরিনথিয়ান লজ। নিউ পাড়ির বয়ন কম করে একশো বছর।

ফেলুনার কাজ শেষ। বুকলাম এদের ডেরাটা জানার সরকার ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারটা চারিশ। ভাড়া উঠেছে উনিশ পঁচাত্তর।

প্রদিন তোরে নিখু জ্যাঠার অবিভিবিটা একেবারে আন্তর্জ্ঞপেক্টেড। উনি সকালে হাঁটতে বেরোন ‘জানি, কিন্তু সেটা সেকের দিকে। আমাদের বাড়িতে আসার মনেই কোনো একটা বিশেষ কারণ আছে।

‘যাতার ওজন অনেক, তাই খবরটা কপি করে এনেছি,’ বললেন নিখু জ্যাঠা। —‘সুপ্রকাশ কিমা জানি না, তবে এস. চৌধুরী বলে লিখেছে, আর বায়োকেমিস্ট সেটাও লিখেছে।’

‘কবেকার খবর?’

‘উনিশশো একাত্তর। মেলিকোতে একটা জ্বাগ কোম্পানির উপর পুলিশের

হামলায় একটি বাঙালী বায়োকেন্ট ধরা পড়ে, নাম এম. চৌধুরী। ভেজাল
ভ্রাগের ক্যাবসা চাল্যাছিল; তার ফলে সব মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল।
লোকটার জেন হয়। এইটুকুই ব্যর আসলে মাথার ঘুরছে সুপ্রকাশ, তাই
এস. চৌধুরীর সঙ্গে নামটা ঠিক কানেক্ট করতে পারিনি। অবিশ্য এ সেই একই
এস. চৌধুরী বিলা—'

‘একই’ গভীর ভাবে বগল ফেলুন।

সিধু জ্যাঠা উঠে পড়লেন। তাঁর আজ চুল কাটার দিন, নাপিত এসে বসে
থাকবে। ফেলুনার পিঠ চাপড়ে, আমার কান ধরে একটা মোচড় দিয়ে,
আলকৌচটা একটু ভালো করে ঝঁজে নিয়ে গাত্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ফেলুনা বাজা বুলে হিজিবিজি লেখা শুরু করেছে দেখে আমি পাশে গিয়ে
দাঁড়ালাম। পর পর তিনটে প্রশ্ন লেখা রয়েছে খাতায়—

১) চাবির গর্তের ধারে আঁচড়ের বাড়াবাড়ি কেন ?

২) ‘কে’-র অর্থ কী ?

৩) অসমণ্ড কাজটা কী ?

গ্রন্থালো পড়ে সে সমস্তে আমিও ধানিকটা না ভেবে পারলাম না।

আলমারির চাবির গর্তের চারিখারে আঁচড় কালই ফেলুনার টিচের আলোয়
দেখেছিলাম। এটার ঘটকা লাগার একটা কারণ থাকতে পারে। বীভিমতো
জোরে ঘষা না লাগলে ইঞ্পাতের ওপর ওরকম দাগ পড়তে পারে না।
নীহারবাবুর ঘূম কি এতই গভীর যে এত ধৰ্মাধিতেও ঘূম ভাঙবে না ?

‘কে’-র বাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর মনে পড়ল যে মিঠ
দস্তারের গজা শুনে দোতপার লাভিং থেকে নীহারবাবু ‘কে’ বলে উঠেছিলেন।
ফেলুনা এই ‘কে’ প্রশ্নে ঘটকার কারণ কী দেখল সেটা বুঝলাম না।

অসমণ্ড কাজের কথাটাও নীহারবাবুই বলেছেন। অন্তত রণজিৎবাবু তাই
বলেন। সেটা যে উনি খুর গবেষণার বিষয় বলছিলেন সেটা কি ফেলুনা বিশ্বাস
করে না ?

ফেলুনা আরো কী সব লিখতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে
উঠল। ওর ঘরেই এক্সেন্টেনশন ফেল—বিহানা থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের
উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

‘হ্যালো।’

নুঁচারবাবু ঈ ঈ করে এবং শেষে ‘আমি এক্সুনি আসছি’ বলে ফেনটা রেখে
ফেলুনা আলনা থেকে শাট ও ট্রাউজার সমেত হ্যাস্টারটা একটানে নামিয়ে নিয়ে
বলল, ‘তৈরি হয়ে নে। গোলোকধামে খুন।’

আমার বুক ধড়াস।

‘কে খুন হল ?’

‘মিঃ নজর !’

বড় রাস্তা থেকে বালিগঙ্গ পার্কে চুক্তেই দূরে সাতের একের সাথে সেখলাম পুলিশের ভ্যান আর লোকের জটলা । তাও সাহেবী পাড়া বলে রক্ষে, রইলে ভিড় আরো অনেক বেশি হত ।

কলকাতার পুলিশ মহলে ফেলুদাকে চেনে না এমন লোক সেই । গোলোকধায়ে চুক্তেই ওকে দেখে ইস্পেষ্টের বকশী হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, ‘এসে পড়েছো ? গাঁথে গাঁথে ছাঁজিব ?’

ফেলুদা ওর একপেশে হাসিটা হেসে বলল, ‘সুবীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্পত্তি ; ফোন করেছিলেন, তাই চলে এসাম । আপনাদের কাজে কোনো ব্যাপার করব না গ্যারান্টি দিচ্ছি । খুনটা হল কী ভাবে ?’

‘মাথায় বাড়ি । একটা নয়, তিনটে । ঘূর্ণন্ত অবস্থায় । লাশ নিয়ে যাবে এইবার পোস্টমর্টেমের জন্য । ডাঃ সরকার একবার এসে দেখে গেছেন । আন্দাজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে ।’

‘লোকটার সংস্করে কিন্তু জানতে পারলেন ?’

‘ঘূর গুণগোজ । স্টাকেস গুচ্ছেতে শুরু করেছিল । স্টকবার তালে ছিল ।’

‘টাকাবড়ি গেছে কিন্তু ?’

‘মনে তো হয় না । খাটের পাশের টেবিলে ওয়লেটে খ'তিনেক টাকা রয়েছে । বাড়িতে ক্যাশ বেশি বালে মনে হয় না । অথচ ব্যাকের জমার খাতা, চেক বই এসব কিছু পাওয়া যাচ্ছে না । একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে বালিশের পাশে । এখনো তালো করে সার্চ করা হয়নি ; এবার করবে । এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে লোকটার সঠিক পরিচয় কিছু পাওয়া যায়নি ।’

সুবীরবাবু মিনিটখালেক হল এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন । মিঃ বকশীকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘সুবীরবাবু বেজায় কর্তৃ করছে । বলছে তার নাকি একটা জরুরী আপয়েন্টমেন্ট আছে ভালহাউসিতে । আমি বালেছি জেরা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না ।’

‘ঠিকই বলেছেন ।’ বললেন মিঃ বকশী । ‘অবিশ্বি জেরাতে আপনি ও বাদ যাবেন না ।’

শেষের কথাটা হালকা হেসে বললেন মিঃ বকশী । সুবীরবাবু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা তিনি জানেন ।

‘তবে আমার দাসাকে যত অজ্ঞের উপর দিয়ে সারতে পারেন ততই ভালো ।’

‘ন্যাচারেলি ।’

‘বরটা একবার সেখতে পারি কি ?’ ফেলুদা ভিজেস করল ।

নিষ্ঠয়ই !

বকশীও ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, পিছনে আমি । ঘরে ঢোকার আগে ফেলুদা সুবীরবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, আপনার ছেলে কাল আমার বাড়িতে এসেছিল ।'

'কখন ? —সুবীরবাবু অবাক ।

ফেলুদা সংক্ষেপে কাজ রাস্তারের ঘটনাটা বলে বলল, 'সে কি কাজ ফিরেছিল ?'

'কিরে থাকলেও তোর পাইনি,' বললেন সুবীরবাবু। 'সকালে উঠে তাকে দেখিবি ।'

'ঘার, তাহলে আপনার ছেলের ডেরার একটা সকাল পাওয়া গেল,' বললেন মিঃ বকশী, 'তে হোটেলটা গোটেই সুবিধের নয় । বার দুয়েক রেড হংগে গেছে ওখানে অপরোড়ি ।'

কালকের দেখা ঘরের চেহরা আজ একেবারে পাল্টে গেছে। কাল ছিল অঙ্ককার, আর আজ পুরের দুটো জালালা দিয়ে ঝল্মলে রোদ এসে সোফা আর মেবের উপর পড়েছে। আচর্য জাগল দেখে যে কালকের দেখা চারমিনারের টুকরোটা এখনে আশ্পত্রুতে পড়ে আছে। ঘরে দু'জন পুলিশের লোক রয়েছে, আর পুলিশের কোটোগ্রাফার তাঁর কাজ শেষ করে সরঞ্জাম বাগে পুরছেন।

খুনটা অবিশ্বি হয়েছে পাশের শোবার ঘরে। ফেলুদা বকশীর সঙ্গে সেই ঘরেই গিয়ে চুকল। আমি টৌকাঠ অবধি গিয়ে একবার বিষ্ণুনার দিকে চেয়ে চান্দের ঢাকা লাশটা দেখে নিলাম। একজন পুলিশের লোক ঝানাঝানাদী চালিয়ে যাচ্ছে। মেবেতে একটা খোজা সুটকেসের মধ্যে দেখলাম কিছু জামাকাপড় ভৌজ করে রাখা রয়েছে। তার পাশে মাটিতে দাঢ় করানো রয়েছে গতকাল দন্তরের হাতে দেখা নতুন ঝীফকেসটি।

আমি আরো মিনিট তিনেক বসবার ঘরে ভিনিসপ্ত দেখে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া চলবে না এটা জানি, তার উপর দুটো পুলিশই আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

'চ তোপশে ।'

ফেলুদা বেরিয়ে এসেছে শোবার ঘর থেকে। 'আপনি আছেন কিছুক্ষণ ।' বকশী প্রশ্ন করল।

'একবার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাব,' বলল ফেলুদা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু শেলে থাকবেন ।'

সুবীরবাবু দোতলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে ছাতির হলাম।

ভদ্রলোক তাঁর আবাস কেদারার চিত হয়ে উঠে আছেন। কোথে কালো চশমা, হাতের লাঠি পাশে থাটের উপর শোয়ানো। অ্যাদিন লাঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দেখেছি, তাই সেটার অথা হে কাপো বিয়ে বাধানো সেটা বুঝতে পারিনি। মাথার নকশার মধ্যে খোদাই করা জি বি ডি দেখে বুঝলাম লাঠিটা হিল নীহারবাবুর ঠাকুরদা গোলোকবিহারী। দক্ষের।

আমরা এসেছি সে খবরটা দেওয়াতে নীহারবাবু কান করা ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বললেন, 'শব্দ পোয়েছি। পায়ের শব্দ। শব্দ আর স্পর্শ—এই দুই মিয়েই তো কাটিয়ে দিলাম বিশ বছর। আর স্মৃতি...কী হতে পারত, কী হল না। সেকে বলে দুর্ভাগ্য। আমি তো জানি এটা ভাগা-টাগা কিন্তু নয়। আপনি সেদিন ডিজেন্স করলেন বিশেষণটা অসাধারণভাবে ভল্য হয়েছিল বিল্লা; আজ আপনাকে বলছি মিঃ মিলির—সমস্ত ব্যাপারটা করা হয়েছিল আমার প্রথম পক্ষ করার জন্য। দীর্ঘ হে মানুষকে কত মীঢ়ে নামাতে পারে সেটা আপনি গোয়েন্দা হয়ে নিশ্চয়ই বোবেন।'

ভদ্রলোক একটু খামলেন। ফেলুদা বলল, 'তার মানে আপনার ধারণা সুপ্রকাশ চৌধুরীই বিশেষণের জন্য দায়ী ?'

'বাঞ্ছলী বে বাঞ্ছলীর সবচেয়ে বড় শক্ত সেটা আপনি মানেন কি ?'

ফেলুদা একদমই চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে। নীহারবাবুও থেন উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন যে কথাটা যে ভাবে আমাদের বলছেন, সেটা এর আগে কাউকে বলেছেন কি ?'

'না, বলিনি। কোনোদিন না। হাসপাতালে জ্ঞান হ্রাস পর আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু বলিনি। বলে কী করব ? আমার সর্বনাশ যা হ্রাস তা তো হয়েই গেছে। যে এটার জন্য দায়ী, তার শাস্তি হলে তো আর আমি দৃষ্টি ফিরে পাব না, বা আমার গবেষণাও শেষ করতে পারব না।'

'কিন্তু আপনাকে চিরকালের মতো অসহায় করে চৌধুরীরই বা কী লাভ হল বলুন। সে কি ভেবেছিল যে আপনার ক্ষমতাপ্রদর্শনে হ্যাত করে সে-ই গবেষণা চালিয়ে নিজে নাম কিনবে ?'

'নিশ্চয়ই তাই। তবে তার দে ধারণা ভুল। আমি তো বলেইছি আপনাকে। আমাকে ছাড়া এগোনোর পথ ছিল না তার।'

আমরা দু'জনেই খাটে বসেছি। ফেলুদাকে সেখে দুঃখতে পারছি সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে ঘরে এসে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সৃষ্টিরবাবু কোনো কাজে বাইরে গেছেন।

ফেলুদা বলল, 'টাকার কথা জানি না, সেটা ইয়তো পুলিশের পক্ষে উক্তার

কলা আরো সহজ, কিন্তু আপনার এতে মূলাবান কাগজপত্র আমি এ বাড়িতে উপস্থিত থাকতে চুরি হয়ে গেল, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওগুলো উজ্জ্বার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।'

'আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

আমরা আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। পুলিশ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বকলী ফেলুন্দাকে বলে দিলেন যে তাদের জেরা আর খনাতল্লাসীর কী ফল হব সেটা খোনে জানিয়ে দেবেন।

'আর নিউ কোরিনথিয়ান লজের প্রবরটাও জানাতে ভুলবেন না,' বলে দিল ফেলুন্দা।

আমরা বাড়ি যাইয়েছি সাড়ে দশটায়। তখন থেকে শুরু করে দুপুরের বাঁওয়ার আগে পর্যন্ত ফেলুন্দা পায়চারি করে, খেয়ে, শুয়ে-বসে, চোখ খুলে, চোখ বুজে, দ্রুকুটি করে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধিয়ে দিচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন সন্দেহ ঝটকা স্বত্ব ইত্যাদির ঝটোপাটি চলছিল। একবার ইঠাং আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'গোলোকধারের একতলার প্লান্টা তোর মোটাবুটি মনে পড়ছে ?'

আমি একটু ডেবে বললাম, 'মোটাবুটি।'

'সুখওয়ানিয়ার ঘর থেকে দক্ষতার ঘরে কীভাবে যাওয়া যায় বল তো ?'

আমি আবার একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, দুটো ঝ্যাটের পাশ লিয়ে বাড়ির ভিতরে যে বাইবেন্টা গেছে, তার মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, আর সে দরজাটা বোধ হয় বন্ধ থাকে। সেটা খোলা থাকলে সেই বাইবেন্টা দিয়েই সোজা এক ঝ্যাট থেকে আরেক ঝ্যাটে চলে যাওয়া যেত।'

'ঠিক বলেছিস। তার মনে সুখওয়ানিকে যনি দক্ষতার ঝ্যাটে আনতে হয় তাহলে বাগান ঘুরে বাড়ি আর ক্ষপ্তাই-ওয়াসের মধ্যের গলি দিয়ে একেবারে সামনে এসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।'

'কিন্তু সামনের কোল্যাপ্সিবল গেট কি মাঝারিতে খেলা থাকবে ?'

'নিশ্চয়ই না।'

তারপর আবার পায়চারি শুরু করে বলতে জাগল—

'X. Y. Z...X. Y. Z...X হস গবেষণার কাগজ, Y হল টাকা, আর Z হল খুন। এখন কথা হচ্ছে—X. Y. Z. কি একই সূত্রে গাঁথা, না তিনটে আলাদা...'

আমি এক ফাঁকে বলে ফেললাম, 'ফেলুন্দা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে সুয়াকাশ টৌধূরী দক্ষতা সেজে নীচারবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম সেখে যে ফেলুন্দা মোটাই আমার কঠটা উড়িয়ে দিল

না । বরং আমার পিছে দুটো চাপড় বেরে বঙলে, 'যদিও এ ধারণাটি আমার মাঝায় আগেই এসেছে, তবুও বলতেই হয় আজকাল তোর চিন্তায় মাঝে মাঝে বেশ বিলিক দিচ্ছে । কিন্তু দন্তের যদি সুপ্রকাশ হয়, তাহলে মরো করা যেতে পারে সে গবেষণার নেটুনের লোভেই ওখানে আস্তানা নিয়েছিল । এখন প্রয় হচ্ছে, সেই যদি খামটা চুরি করে থাকে তাহলে সেটা গেল কোথায় ? আর তার পাশে নিজে চুরি করাটা সম্ভবই বা হয় কী করে ? সে তো দোতলায় কোনোদিন যাবইনি । '

আমার সত্ত্বেই মাথা খুলে গেছে । ব্যাপারটা তো জানের মতো সোজা । বললাম, 'উনি যাবেন কেন ? ধর যদি ওর সঙ্গে শক্তির নতুর ঘড় হয়ে থাকে ? শক্তিরই কাগজটা চুরি করে ওঁকে এনে দিয়েছে, আর তার জন্ম কিছু টাকাও পেয়ে গেছে । '

'এক্সেলেন্ট', বলল ফেলুন । 'আদিমে বল্ল যাই তুই আমার উপযুক্ত আমিস্টাস্ট হলি । কিন্তু এতে তো খুনের রহস্যের সমাধান হচ্ছে না । '

'ধর যদি বণজিঁৎবাবু বুঝে থাকল যে দন্তের আসলে সুপ্রকাশ । বণজিঁৎবাবু তো নীহারবাবুর সব ব্যাপারই জানে, আর সেই সঙ্গে নীহারবাবুকে দাক্ষণ ভক্তিও করেন । যে লোক নীহারবাবুর ভবিধাং অঙ্ককার করে দিয়েছিল, তার উপর প্রচণ্ড আক্রান্তে খুন করতে পারেন না বণজিঁৎবাবু ?'

ফেলুন মাথা মাড়ুল ।

'খুন ক্লিনিস্টা অত সহজ নয় রে তোপশে । বণজিঁতের মোটিভটাকে মোটেই জেরামে বঙ্গা চলে না । আসল আপসোনের ব্যাপার হচ্ছে যে দন্তের লোকটার ঘরে সার্চ করে এখন অবধি কিছু পাওয়া গেল না । অতস্তু সাবধানী লোক ছিলেন এই দন্তে । '

'আমার কী ঘনে হয় জান ফেলুন ?'

ফেলুন পায়চারি খামিরে আমার দিকে চাইল । আমি বললাম, 'পুলিশের বদলে তুমি যদি সার্চ করতে তাহলে অনেক বকম কু পেতে । '

'বলছিস ?'

ফেলুন নিজের ওপর কলফিল্ডেস হারাস্টে এটা স্থানেও ভাবতে পারি না ; কিন্তু ওর ওই 'বলছিস' কথাটাতে যেন ওটারই একটা আভাস পেলাম । আর তারপর যে কথাটা বঙল তাতে শমটা আরো দয়ে গেল ।

'এই গরম আর এই লোড শেডিং-এ অইলস্টাইনেরও মাথা খুজান কিনা সন্দেহ । '

দুটো নাগাদ ইনস্পেক্টর বকশীর ফেন এল । দন্তেরে একটা ঝুতোর গোড়ালির মধ্যে একটা চোরা খুপরিতে আমেরিকান ডলার আর জার্মন মার্ক

। প্রায় সতের হাজার টাকা পাওয়া গেছে । কিন্তু এমন কোনো কাগজ বা ম পাওয়া যায়নি যা থেকে লোকটার বিষয় কিছু জানা যাবে । কাটুনিক্স-এর নতুন কোনো দেৱকানের হাদিস মেলেনি, দস্তরের কোনো বাস্তুরও ন পাওয়া যায়নি । চিঠিপত্র প্রায় ছিল না বলালেই চলে । একটি মাত্র তৎপত্র চিঠি, আর্জুনটিমা থেকে লেখা, যা থেকে বোকা যায় যে সে সক্ষিপ্ত মুরিকায় কিছুসিন কাটিয়েছিল ।

বকশীর বিত্তীয় খনন হচ্ছে এই যে, নিউ কোরিন্থিয়ান লাজের ন্যানেজারকে হবি দেখাতে সে শক্তরকে চিনেছে ; কাল সারারাত নাকি শক্তর কয়েকজন বাস্তু সম্মত হোটেলের একটা ঘর তাড়া করে সেখানে নেশা করেছে আর জুয়া খেলেছে । সকাল হতে তারা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যায় । বকশী বললেন এবার শক্তরকে ধরা নাকি 'এ যাটার অফ মিনিস্ট্রি' ।

ফেলুন্দা সব শুনেটানে ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'শক্তরবাবু সাদি হোটেলের পেন্সিনটা চুরির টাকায় করতেন তাহলে তুম সুবিধে হত । ফাই হোক, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনটা সে করেনি, কারণ সেই সময়টা তার আলিবাই ছিল ।'

আলিবাই কথাটার মানে অবিশ্য আমি অনেকদিন থেকেই জানি, কিন্তু যারা জানে না তাদের বাঙলায় কীভাবে বোঝানো যায় জিঞ্জুস করাতে ফেলুন্দা বললে, 'ডিকশনারিয়ে যা লেখা আছে তাই লিখে দে । তাই বলছি, আলিবাই খানে হল—'আপরাধের অনুষ্ঠানকালে অন্যত্র থাকার অঙ্গুহাতে রেহাই পাইবার দাবি ।' তার মানে 'আমার বাড়িতে যখন খুন হয় তখন আমি কোরিন্থিয়ান লাজে থেকে জুয়া খেলছিলাম'—এটাই হবে শক্তরের আলিবাই ।

টেলিফোনটা পেরেও ফেলুন্দার ডিস্কুন ভাব গেল না । তিনটে নামাদ দেখি ও পায়জামা ছেড়ে ট্রাইজারস পরেছে । বলল কতগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাই বেরোচ্ছে । ফিরল প্রায় সাড়ে চারটোর আমি এই দেড় ঘণ্টা একটানা মহাভারত পড়ে শেখ করে ফেলেছি ।

মহাপ্রস্থানের পথে স্রোপনী নতুন সহস্রে সবাই একে একে মরে গিয়ে ঠিক যখন অর্জুনের পাতন হব-হব, তখন ক্রিং করে ফোনটা বেঞ্জে উঠল । আমিই ধরলাম । ফেলুন্দার ফোন, গোলোকশাম থেকে সুবীরবাবু কথা বলতে চাইছেন ।

ফেলুন্দা তার ঘরেই ফেন ধরল ; আমি বসবাবু ঘরের যেমনে কান লাগিয়ে দু' তরফের কথাই কলে লিপাখ ।

'হ্যালো ।'

'কে যিঃ মিতির ৷'

'বলুন মিঃ মস্ত ।'

'দাদার গবেষণার নেটস সম্মত সীল করা যায়টা পাওয়া গেছে ।'

‘দস্তরের ঘরে ছিল কি ?’

‘ঠিক বলেছেন। খাটের পাটাতনের জলায় সেলোটেপ দিয়ে অটকে রেখেছিল। একদিকের সেলোটেপ খুলে গিয়ে খাটা ঝুলছিল। পেয়েছে আমাদের চাকর ভগীরথ।’

‘আপনার দাদা জানেন ব্যবরটা ?’

‘তা জানেন। তবে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা হাল-ছেড়-দেওয়া ভাব এসেছে। কোনো ব্যাপারেই যেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আজ সাতার্দিন চেয়ার ছেড়ে উঠেননি। আমি আমাদের ডাক্তারকে আসতে বলেছি।’

‘আপনার ছেলের কোনো ব্যবর আছে ?’

‘আছে। তি টি রেডে ওদের পুরো দলটাই ধরা পড়েছে।’

‘আর চোরাই টাকা ?’

‘সেটা নিসেও অন্ত কোথাও সবিয়ে রেখেছে। অবিশ্বাস চুরির ব্যাপারটা শক্তর সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করছে।’

‘বুনের ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে ?’

‘ধরা সুখওয়ানিকেই সন্দেহ করছে। তাছাড়া একটা নতুন ঝু-ও পাওয়া গেছে। দস্তরের জানলার বাইরে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো কাগজ।’

‘কী লেখা আছে তাতে ?’

‘ইংরিজিতে এক লাইন ল্যাম্বকি—“অভিযোগ কৌতুহলের পরিণাম কী জান তো” ?’

‘নুরওয়ানি কী বলে ?’

‘সে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করছে। তার ঘর থেকে যে দস্তরের ঘরে যাবার কোনো উপায় নেই সেটা ঠিকই, কিন্তু একটা ভাড়াটে ওভা পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেওয়ে এসে অনায়াসেই সে কাজটা করতে পারে।’

‘হ্যাঁ...ঠিক আছে, আমি একব্যাপ আসছি।’

মেলুজ জেনটা রেখে দিয়ে প্রথমে আপন ঘরে বিড়বিড় করে বলল, ‘X আর Y তাহলে একই স্লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Z-কে নিয়ে।’ তারপর আগার দিকে ক্ষিরে বলল, ‘ডেসটিনেশন গোলোকধার। তৈরি হয়ে নে তোপশে।’

‘আপনি চললেন নাকি ?’

গোলোকধারের গেটি দিয়ে চুক্তে দেখি রঞ্জিতবানু আসছেন। বাইরে পুলিশ

দেখে বুঝেছি বাড়িটার উপর নজর রাখা হয়েছে।

‘আজ্জে হ্যাঁ’ বললেন রণজিৎবাবু, ‘নীহারবাবু বললেন আজ আর আমাকে প্রয়োজন হবে না।’

‘উনি আছেন কেমন?’

‘ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাতে শুরু হয়েছেন। প্রেশুরটা ওঠানামা করছে।’

‘কথা বলছেন কি?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আ বলছেন,’ আশাসের সুরে বললেন রণজিৎবাবু।

‘হে খামটা পাওয়া গেছে মন্ত্রের ঘর থেকে সেটা একবার দেখব। আপনার শুরু ভাড়া না থাকলে আর একবারটি চলুন শুপরে। অলমারিতে আছে তো ওটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না কথা দিচ্ছি। এ বাড়িতে তো আর বিশেষ অসা-টাসা হবে না।’

‘কিন্তু খাম তো নীল করা,’ কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন রণজিৎবাবু।

‘তাহলেও আমি ডিনিসটা একবার শুধু হতে নিয়ে দেখতে চাই।’

রণজিৎবাবু আর আপত্তি করলেন না।

আজও বাড়ি অঙ্ককার, দশটির আগে আলো আনবে না, এখন বেজেছে মাত্র সোয়া ছাঁটা। দোতলার বারান্দায় আর ল্যাভী-এ কেঝোসিন ল্যাম্প ছুলদেও অনাচে-কানাচে অঙ্ককর।

রণজিৎবাবু আবাদের বৈঠকখানার বসিয়ে সুবীরবাবুকে খবর দিতে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে নীহারবাবু যদি খামটা অলমারি থেকে বার করার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তাহলে কিন্তু সেটা দেখানো ন্তর হবে না।

‘সেটা থলাই বাহল্য,’ বলল ফেনুমা।

সুবীরবাবুকে দেখে বেশ ক্রমে বলে যানে হল। বললেন সারাদিন নাকি থবরের কাগজের রিপোর্টসের টেকিয়ে রাখতেই কেটে গেছে। —‘তবে একটা জালো এই যে, দাদার লামটা লোকে ভুলতে বসেছিল, এই সুবাদে আবার মনে পড়ছে।’

মিনিটখানেকের মধ্যেই রণজিৎবাবু এলেন, হাতে লম্বা সাদা খাম। বললেন, ‘নীহারবাবু আপনার নাম শনেই বোধ হয় আপত্তি করলেন না। এমনিতেই কাউকে দেখতে দিলেন না।’

‘আশ্চর্য,’ ফেনুমা খামটা হাতে নিয়ে ল্যাম্পের তলায় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল। আমার চোখে মনে হচ্ছে সাধারণ লম্বা খাম, পিছনে লাল

গঙ্গার সীমা, সামনের দিকে উপরের বাঁ কোণে ছাপার হুরফে লেখা “ডিপার্টমেন্ট অব বায়োকেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, মিশিগান, ইউ এস এ”। এতে যে আশ্চর্যের কী আছে জানি না। সুবীরবাবু আর রণজিৎবাবু বসে আছেন আবহা অঙ্ককারে, তাঁদেরও মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আমারই মতো।

ফেলুদা সোফায় এসে বসল, তার দৃষ্টি তখনো পাহটার দিকে। তারপর সুই ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অগ্রহ্য করে, শুধু আমাকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল। ভাবটা স্কুলমাস্টারের। এই মেজাজে অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছে ফেলুদা আমাকে।

‘বুবেছিস তোপশে, আশ্চর্য জিনিস এই ইংরেজি হুরফ। বাংলায় সব মিলিয়ে গোটা দশ বারো ধীরে হুরফ আছে, আর ইংরেজিতে আছে কম পক্ষে হাজার দুয়েক। একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাকে এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছিল। হুরফের শ্রেণী আছে, জাত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর আলাদা নাম আছে। যেমন এই বিশেষ ডিজাইনের হুরফের নাম হল গ্যারাম্বন।’—ফেলুদা থামের উপর ছাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল—

‘এই গ্যারাম্বন টাইপের উভয় ঘোড়শ শতাব্দীতে, জালে। তারপর ক্রমে এই টাইপ সরা বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে। ইংলান্ড, জামানি, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুধু যে এই টাইপের প্রচলন হয় তা নয়, ক্রমে এই সব দেশের নিজস্ব কারখানায় এই টাইপের ছাঁচ তৈরি করা শুরু হয়। এমন-কি সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এটা হচ্ছে। মজা এই যে, সুবীরবাবু করে দেখলে দেখা যায় যে এক দেশের গ্যারাম্বনের সঙ্গে অন্য দেশের গ্যারাম্বনের সূক্ষ্ম ভিন্নতা রয়েছে। করেকটা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের গড়নে এই ভিন্নতা ধরা পড়ে। যেমন এই থামের উপরের হুরফটা হওয়া উচিত আমেরিকান গ্যারাম্বন, কিন্তু তা না হয়ে এটা হয়ে গেছে ইঞ্জিয়ান গ্যারাম্বন। এমন-কি ক্যালকাটা গ্যারাম্বনও বলতে পারিস।’

ঘরে থমথমে শুক্তা। ফেলুদার দৃষ্টি থাম থেকে চলে গেছে রণজিৎবাবুর দিকে। লক্ষনে মাদাম ত্যসোর মিউজিয়ামে মোমের তৈরি বিশাত লোকের মৃত্তির ছবি সেখেছি; তার সব কিছু অবিকল মানুষের মতো হলেও, শুধু কাচের চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে হনুষটা জ্যান্ত নয়। রণজিৎবাবু জ্যান্ত হলেও, তার দৃষ্টিশীল চোখ দুটো দেখাচ্ছে অনেকটা সেই মোমের মৃত্তির চোখের মতো।

‘কিছু মনে করবেন না রণজিৎবাবু, আমি এই খামটা খুলতে বাধা হচ্ছি।’

রণজিৎবাবু তাঁর ডান হাতটা তুলে একটা বাধা দেওয়ার প্রতির মাঝপথে

বেঁধে গেলেন ।

একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে ফেলুদার দু' আঙুলের এক টানে খামের পাশটা ছিড়ে গেল । তারপর সেই দু' আঙুলেরই আবেকটা টানে খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক তাড়া ফুলস্বাপ কাগজ ।

তুল টানা ফুলস্বাপ ।

তাতে শুধু কলাই আছে, সেখা নেই । অর্থাৎ যাকে বলে ঝাক পেপার ।

কানের চোখ এখন বক্স, যাথা হেট, দু' হাতের কলাই হাঁটির উপর, হাতের তেজোয় মুখ ঢাকা ।

‘রঞ্জিতবাবু’—ফেলুদার গলা গঁটীয়—‘আপনি গতকাল সকালে এসে যে চোর আসার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা একেবারে ধাঙ্গা, তাই না ?’

রঞ্জিতবাবুর মুখ দিয়ে উত্তরের বদলে বেরোল শুধু একটা গোঙানির শব্দ ।
ফেলুদা বলে চলল—

‘আমলে রাস্তিরে চোর এসেছে এমন একটা ধারণা প্রচার করার দরকার ছিল আপনার । কারণ আপনি নিজেই চুরির ভনা তৈরি হচ্ছিলেন, এবং সান্দেহটা যাতে আপনার উপর না পড়ে সেদিকটা সেখা দরকার ছিল । আমার বিশ্বাস সকালে চোর আসার ধাঙ্গাটা দিয়ে দুপুরের দিকে সুযোগ বুকে আপনিই আলয়াড়ি যোগেন এবং শুলে দুটি কাজ সাবেন—তেক্রিশ হাঙ্গার টাকা এবং নীহারবাবুর গবেষণার সোটাস হস্তগত করা । আমার বিশ্বাস এই জাল খামটা কাল তৈরি ছিল না ; এটা আপনি রাতায়াতি ছাপিয়ে নিয়েছেন । এটার ইঠাং প্রয়োজন হল কেন সেটা জানতে পারি কি ?’

রঞ্জিতবাবু এবার ফেলুদার দিকে চোখ তুললেন । তারপর ধরা গলায় বললেন, ‘কাল বিকেলে দস্তরের গলা শুনে নীহারবাবু ওকে সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে চিনতে পেরেছিলেন ! আমাকে বললেন, “বিশ বছর পরে সোকটার লোভ আবার যাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । আমার কাগজপত্র ওই সরিয়েছে ।” শুধু...’

‘বুঝেছি । তখন আপনি ভাবলেন চুরিটা সন্তুরের ঘাড়ে চাপানোর এই সুযোগ । আপনিই তো পুলিশ চলে যাবার পর সেলোটেপ দিকে খাটোকে খাটের তলায় আটকে বুলিয়ে বেথেছিলেন—ঠিক এমন ভাবে যাতে নীচু হলেই সেটা চোখে পড়ে, তাই না ?’

রঞ্জিতবাবু প্রায় ডুকরে কেবে উঠলেন ।

‘আমায় মাপ করবেন ! আমি ফেরত দিয়ে দেব । টাকা আর কাগজপত্র আমি কালই ফেরত দিয়ে দেব, মিঃ মিনির ! আঘ...আমি সোভ সামলাতে পারিনি । সত্তি বলছি, আমি সোভ সামলাতে পারিনি !’

‘ফেরত আপনাকে দিতেই হবে । না হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে

“...”
দেব সেটী বুঝতেই পারছেন।

‘আমি জানি,’ বললেন রণজিৎবাবু। —‘তবে একটা অনুরোধ। নীহারবাবু ফেন জানতে না পারেন। তিনি আমাকে অঙ্গস্ত মেহ করেন। তিনি এ শক্ত সহ্য করতে পারবেন না।’

‘বেশ। তিনি জানবেন না এটা কথা দিছি। কিন্তু আপনি এত ভালো হাত্ত হয়ে এটা কী করলেন?’

রণজিৎবাবু ফাস্ফাল করে ফেলুন্দার দিকে চাইলেন। ফেলুন্দা বলে চলল—

‘আমি আপনার প্রোফেসর বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার উপর আমার সন্দেহ পড়ে চাকির গর্তের পাশের দাগ দেখে। চোর অঠ অসাধানে কাজ করে না। বিশেষত যেখানে ঘরে শোক রয়েছে, দরজার বাইরে চাকর রয়েছে। যাই হোক, আপনার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ছিল সেটো উনি বললেন। পরীক্ষা দিলে আপনি ফাস্ট ক্লাস পেতেন এ বিশ্বাস তোর ছিল। হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে সেজেটারির চাকরিটা নেওয়া কি শট কাটে নোবেল প্রাইজের লোভ?’

রণজিৎবাবু ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আর কথাই বলতে পারছেন না। ওর অবস্থা দেখে আমার মতো ফেলুন্দারও যে মাঝা হচ্ছিল সেটী ওর পরের কথা দেকেই বুকলাম।

‘আপনি এবাব বাড়ি যেতে চান যেতে পারেন। কালকের জন্য আর অপেক্ষা করব না আমরা। আপনি আজই আসল কাগজপত্র আর টাকা নিয়ে চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করলে, আপনার সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করে দিছি। এতগুলো টাকা নিয়ে যান্তায়াত করাটা মোটেই বুজিযানের কাজ হবে না।’

সুবোধ বালকের মতো মাঝা নাড়লেন রণজিৎ ব্যানার্জি।

সুবীরবাবু তাঁর ছেলে সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না বেল, সে যে চুরি করেনি, সেটা জেনে তাঁর নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। অস্তত তাঁর চেহারা দেখে আর গলার স্বরে তাই মনে হল। বললেন, ‘একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কি?’

‘নিশ্চয়ই,’ বলল ফেলুন্দা, ‘সেটোই তো আসল কাজ।’

সুবীরবাবুর পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

‘আপনারা এসেছেন?’ চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ,’ বলল ফেলুন্দা। ‘আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিত বোধ করছেন?’

‘ওগুলোর আর বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।’ নিচু গলায় ঝান্সি ভাবে বললেন নীহারবাবু। এক দিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভুঁলোক বীতিমত্তো শক্তি।

‘আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে।’ বলল ফেলুদা।
‘বিশেষ অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।’

‘সে আপনারা বুঝবেন।’

‘আপনাকে শখ একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি এব পরে আর বিবরণ করব না।’

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা প্রান হাসি দেখা দিল। বললেন, ‘বিবরণ আর করবাবেন কী করে ? বিবরণিক অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি !’

‘তাহলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি দশটা। আপনি কি কাল তাহলে ঘুমের ওষুধ খাননি ?’

‘না, খাইনি। আজ খাব।’

‘তাহলে আসি আমরা !’

‘বাঁড়ান।’

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দু’জনের হাত গিলজ। ভুঁলোক ফেলুদার হাতটা বেশ ভাসো করে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—
‘আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।’

বাড়িতে এসেও ফেলুদা গল্পীর। কিন্তু তা বলে আমি অত রহস্য বরবাসী করব কেন ? চেপে ধরে বললাম, ‘ঢাক ঢাক গুড় গুড় চুবাবে না। সব খুলে বল।’

ফেলুদা উত্তরে রাখায়গে চলে গেল। ওর সাসগৈক বাড়ানের কিছু কায়দা আমি সত্ত্বাই বুঝে উঠতে পারি না।

‘ব্যাঘকে বনলাসে পাঠানোর ছ’দিন পর দশবাহের হঠাতে মনে পড়েছিল যে তিনি যুবরাজ অবস্থায় একটা সাংঘাতিক কুকীভিত্তি করে ফেলেছিলেন, আর সেই কারণেই আজ তাঁকে পুত্রশোক ভোগ করতে হচ্ছে। তোর মন আছে সে কুকীভিত্তি কী ?’

রাখায়গটা টাটকা পড়া ছিল না, কিন্তু এ টাটকা মনে ছিল। বললাম, ‘অক্ষয়নির হেলে রাখে নবীতে জল তৃপ্তিহিল কলসীতে। দশবাহে অক্ষকারে শপ্ত শনে ভাবাক্ষেন বুঝি হাতি জল খাচ্ছে। উনি শব্দভেদী বাণ হেরে হেলেটিকে যেরে ফেলেছিলেন।’

‘গুড়। অঙ্ককারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার এই ক্ষমতাটা হিল দশুরথের। নীহারবাবুরও হিল।’

‘নীহারবাবু!—আমি আব চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

‘ইয়েস সার,’ বলল ফেলুদা।—‘রাত জাগতে হবে বলে চুম্বের ওষুধ খালনি। সবাই যখন ঘুমে আচ্ছেদন, তখন খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নোমে চালে ঘন দস্তুর সুপ্রকাশের ঘরে।’ এই ঘরে এক কালে ওঁর ভাইপো থাকত। ঘর ওঁর চেনা। হাতে ছিল অঙ্গ—কপো দিয়ে বাঁধানো জাদুরেল লাঠি। থাটের কাছে শিয়ে লাঠি দিয়ে মোক্ষ ঘা। একবার নয়, তিনবার।’

‘কিন্তু...কিন্তু...’

আমার এখনো সাংঘাতিক গোলমাল লাগছে। এসব কী বলছে ফেলুদা? লোকটা তো অদ্ব।

‘একটা কথা কি মনে পড়ছে না তোর?’ অসহিকুভাবে বলল ফেলুদা। ‘সুখওয়ালি কী বলেছে দস্তুর সম্পর্কে?’

বিদ্যুতের বন্দকের মতো কথাটা মনে পড়ে গেল।

‘দস্তুরের নাক ডাকত!?’

‘গোজ্যাট্টলি! বলল ফেলুদা।—‘তার মানে বালিশের কোমরখানে মাথা, কেন পাশে ফিরে রাখেছে, এ সবই বুবুতে পেরেছিলেন নীহারবাবু। তার আর এর চেয়ে বেশি জানার কী দরকার? এক ঘায়ে ঘুমি না হয়, তিন ঘায়ে তো হবেই।’

আমি কিছুক্ষণ হতভয় হয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘এই অসমাপ্ত কাজটার কথাই কি বলেছিলেন নীহারবাবু? প্রতিশোধ?’

‘প্রতিশোধ,’ বলল ফেলুদা, ‘জিয়াৎসা। অঙ্গেরও মেহমনে প্রচণ্ড শক্তির সংগ্রাম করতে পারে এই প্রবৃত্তি। এই জিয়াৎসাই তাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি মৃত্যুশ্বার্য। আর দেই কারণেই তিনি আইনের নাগাদের বাহরে।’

আরো সতের দিন বেঁচে ছিলেন নীহারবাবু দস্ত। মারা যাবার ঠিক আগে তিনি উইল করে তাঁর গন্তব্যস্থান কাগজপত্র আর জমানো টাকা দিয়ে গেছিলেন তাঁর বিস্তৃত মেধাবী সেক্রেটারি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

নেপোলিয়নের চিঠি

Pradosh C. Mitter
Private Investigator



নেপোলিয়নের চিঠি

‘তুমি কি ফেলুন্দা ?’

প্রপ্তা এল ফেলুন্দার কোমরের কাছ থেকে । একটি বছর ছয়েকের ছেলে ফেলুন্দার পাশেই দাঁড়িয়ে মাথাটাকে চিত করে তার দিকে চেয়ে আছে । এই সে দিনই একটা বাংলা কাগজে ফেলুন্দার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, তার সঙ্গে তুতে চারমিনার নিয়ে একটা ছবি । তার ফলে ফেলুন্দুর চেহারাটা আজকাল রাস্তাঘাটে লোকে ফিল্মস্টারের মতোই চিনে ফেলছে । আমরা এসেছি পার্ক স্ট্রিট আর রাসেল স্ট্রিটের মোড়ে খেলনা আর লাল মাছের দোকান হবি সেন্টারে । সিধু জ্যাঠার সন্দৰ বছরের জন্মদিনে তাঁকে একটা ভাল দাবার সেট উপহার দিতে চায় ফেলুন্দা ।

হেলেটির মাথায় আলতো করে হাত রেখে ফেলুন্দা বলল, ‘ঠিক ধরেছ তুমি ।’

‘আমার পাখিটা কে নিয়েছে বলে দিতে পারো ?’ বেশ একটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল হেলেটি । ততক্ষণে ফেলুন্দারই বয়সী এক ভদ্রলোক ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা লম্বা প্যাকেট নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখে খুশির সঙ্গে একটা অপ্রস্তুত ভাব মেশালো ।

‘তোমার নিজের নামটাও বলে দাও ফেলুন্দাকে’, বললেন ভদ্রলোক ।

‘অনিলক হালদার’, গভীর মেজাজে বলল হেলেটা ।

‘ইনি আপনার যুদ্ধ ভুক্তদের একজন’, বললেন ভদ্রলোক । ‘আপনার সব গল্প ওর ঘার কাছ থেকে শোনা ।’

‘পাখির কথা কী বলছিল ?’

‘ও কিছু না’, ভদ্রলোক হালকা হেসে বললেন, ‘পৃথিবী পোষার শব্দ হয়েছিল, তাই ওকে একটা চলনা কিনে দিয়েছিলাম। যে দিন আসে সে দিনই কে খাঁচা থেকে পাখিটা ধার করে নিয়ে যায়।’

‘খালি একটা পালক পড়ে আছে’, বলল ফেলুদার শুদ্ধ ভঙ্গ।

‘তাই বুঝি ?’

‘রাত্তিরে ছিল পাখিটা, সকালবেলা নেই। রহস্য।’

‘তাই তো মনে হচ্ছে। তা অনিয়ন্ত্রিত হালদার এই রহস্যের ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না।’

‘আমি বুঝি গোয়েন্দা ? আমি তো ক্লাস টু-তে গড়ি।’

ছেলের বাবা আর বেশিদুর কথা এগোতে দিলেন না।

‘চলো অনু। আমাদের আবার নিউ মার্কেট যেতে হবে। তুমি বরং ফেলুদাকে একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলো।’

ছেলে ধাবার অনুরোধ চালান করে দিল। এবার ভদ্রলোক একটা কার্ড বের করে বেশ্যামুক্তি-থাতে দিয়ে বললেন, ‘আমার নাম অমিতাব হালদার।’

ফেলুদা কাউটার একধার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘বারাসতে থাকেন দেখছি।’

‘আপনি হয়তো আমার ধাবার নাম শনে থাকতে পারেন। পাবলিচরণ হালদার।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর লেখা-টেখাও তো পড়েছি। ওরই সব নানারকম জিনিসের কালেকশন আছে না ?’

‘ওটা ধাবার নেশ্বা। ব্যারিস্টারি ছেড়ে এখন ওসবই করেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন ওই সবের পিছনে। আপনার তো অনেক ব্যাপারে ইয়ে আছে, আমার মনে হয় আপনি দেখলে আনন্দ পাবেন। আদিকালের গ্রামোফোন, মুগল আমদ্দের দাবা বড়, গুয়ারেন হেস্টিংসের নস্যির কৌটো, মেপোলিয়নের চিঠি...। তা ছাড়া আমাদের বাড়িটাও খুব ইন্টারেন্সিং। দেড়শো বছরের পুরনো। এক দিন যদি ত্রি থাকেন, একটা ফোন করে দিলে—রোববার-টোববার...। আমি বরং একটা ফোন করব। ডাইরেকটরিতে তো আপনার— ?’

‘আজ্জে হ্যাঁ, আমার নামেই আছে। এই যে।’

ফেলুদাও তার একটা কার্ড ভদ্রলোককে দিয়ে দিল।

কথা হয়ে গেল আমরা এই মাসেই এক দিন বারাসত গিয়ে হাজির হব। লালমোহনবাবুর গাড়ি আছে, যাবার কোনও অসুবিধে নেই। এখানে বলে রাখি, লালমোহনবাবু বহাল ভবিষ্যতে এবং ঘোশঘোষণাজ্ঞে আছেন, কারণ এই পুজোয় জটামুর জায়ান্ট আমনিবাস বেরিয়েছে, তাতে বাছাই করা দশটা মেরা বহস্য রোমান্স উপন্যাস। দাম পঁচিশ টাকা এবং লালমোহনবাবুর ভাষায় ‘সেলিং লাইক হট ক্লুবিজ।’

সঙ্গ্রহেসা ফেলুদার মুখ শুকলো দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। ও বলল, ‘খুদে মক্কেলের আরজিটা মাথায় ঘুরছে রে।’

‘সেই চন্দনার ব্যাপারটা ই?'

‘খাচা থেকে পাখি চুরি যায় শুভেচ্ছিচ্ছিক কথনও?’

তা শুনিনি সেটা স্বীকৃত-শুরুতেই হল। —‘তুমি কি এর মধ্যেও বহস্যের গুরু পাছ ন্যুক্তি?’

‘ব্যাপারটা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। চন্দনা তো আর বার্ড অফ প্যারাডাইজ নয়। এক যদি না কারও নেগলিজেসে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গিয়ে থাকে।’

‘কিন্তু সেটা তো আর জ্ঞানবার কোনও উপায় নেই।’

‘তা থাকবে না কেন? ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। আসলো বুঝতে পারছি এ ব্যাপারটা ও-বাড়ির কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি। ঘটনটা যে অস্বাভাবিক সেটা কারুর মাথায় ঢেকেনি। অথচ ছেলের ঘনটা যে খচ খচ করছে সেটা বুঝতে পারছি, না হলে আমার দেখে ও কথাটা বলত না। অন্তত একবার যদি গিয়ে দেখা যেত...’

‘তা ভদ্রলোক তো বললেনই যেতে।’

‘হ্যাঁ—কিন্তু সেটাও হয়তো আমাকে সামনা-সামনি দেখলেন বলে। বাড়ি যিয়ে সে কথা আর মনে নাও থাকতে পারে। ছেটি ছেলের অনুরোধ বলেই মনে হচ্ছে সেটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।’

ক্রিসমাসের যথন আর পাঁচ দিন বাকি তখনই এক শিলিবারের সকালে এসে গেল অমিতাভবাবুর ঘোন। আমি কলটা ফেলুন্দার ঘরে ট্রান্সফার করে বসবার ঘরের মেন টেলিফোনে কান লাগিয়ে শুনলাম।

‘মিচ মিডির ?’

‘বলুন কী খবর।’

‘আমার ছেলে তো মাথা খেরে ফেলল। কবে আসছেন ?’

‘পাখির কেনও সন্ধান পেলেন ?’

‘নাঃ—সে আর পাওয়া যাবে না।’

‘ভয হয়, আপনার ছেলে যদি ধরে যাসে থাকে তার পাখি উদ্ধার করে দেব, তখন সেটা না পাওয়া গেলে তো বেঁজুকের ব্যাপার হবে।’

‘মে নিয়ে আপমি চিন্তা করবেন না। ছেলেকে খানিকটা সময় দিলেই সে খুশি হয়ে যাবে। আলিলে আমার বাবার সঙ্গে একবার আপনার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। আজ তো আমার ছুটি আপনি কী করছেন ?’

‘তেমন কিছুই না। আজ দশটা নাগাদ হলে হবে ?’

‘নিশ্চয়ই।’

শনি রাতি দু’ দিনই আমাদের বাড়িতে সকাল ন’টায় লালমোহনবাবুর আসাটা একেবারে হাত্তেড় পারসেন্ট শিওর। বড়ির কাটিয় কাটিয় আসাটা কলকাতা শহরে আজকাল আর সন্তুষ নয়, তবে দশ মিনিট এদিক ওদিকের বেশি হয় না কোনও দিনই। আজও হল না। ঠিক ন’টা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘরে চুকে ধপ্ত করে সোফায় বসে পড়ে বললেন, ‘কালি কলম হন, লেখে তিমজন। অশাই, পুজোর লেখার ধককের পর শীতকালটা এলে লেখার চিনাটা থাউজ্যান্ড মাইলস দূরে চলে যায়—কালি কলম খাতার দিকে আর চাইতেই ইচ্ছা করে না।’

লালমোহনবাবু ইদানীং প্রবাদ নিয়ে ভীষণ ঘেতে উঠেছেন। সাড়ে তিনশো প্রবাদ নাকি উনি মুখ্য করেছেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে লাগসাই প্রবাদ গুঁজে দিতে পারলে সাহিত্যের রস নাকি

ঘনীভূত হয়। তিনি অবিশ্য শুধু সেখায় নয়, কথাতেও যখন-তখন প্রবাদ লাগাচ্ছেন। আজ ভদ্রলোকের পরমে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট আর সবুজ সোয়েটার, আর হাতে এক চাঙাড়ি কচুরি। কচুরির ক্ষয়ণ আর কিছুই না—হট কচুরির আজকাল আর তেমন ডিম্বন্ত আছে কি না ফেলুদার এই প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বলেন, ‘ঘশাই, বাগবাজারের মোহন ময়রার দোকানে কচুরির জন্য কিউ দেখলে মনে হবে সেখানে কোনও বোৰ্হাই-মার্ক হিন্দি হিট ছবি চলছে। আপনাকে খাওয়ালে বুঝবেন উপরাটা কত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।’

সঙ্গে এক ঝাস্ক জল আর কচুরির চাঙাড়িটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবু পাহতী হালদারের নাম শোনেননি। তবে নেপোলিয়নের চিঠি ঝুঁটি, ভয়ানক ইম্প্রেস্ড হলেন। বললেন ইঙ্গুলি থাক্কুড়ে কুর হিরো নাকি ছিল নেপোলিয়ন। ‘যেটি যুক্ত জানাপাটি’ কথাটা বাবু তিনেক চাপা গলায় বললেন ঘাবারগুঁথে।

তি আই পি রোডের আগে স্পিড ভুলতে পারলেন না লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপুরবাবু। বারাসতে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

অমিতাভবাবুদের বাড়িটা মেন রোডের উপরেই, তবে গাছপালায় ঘেরা বলে আসল বাড়িটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। গেট দিয়ে চুকে শুড়ি ফেলা রাস্তার খালিকটা গিয়ে তবে থামওয়ালা দালানটা দেখা যায়। একেবারে সাহেবি উঙ্গের বাড়ি, বয়সের ছাপ বক্টা থাকার কথা ততটা নেই; মনে হয় বছরখানেকের মধ্যেই অন্তর সামনের অংশটায় চুনকাম ও রিপেয়ার দুই-ই ইয়েছে। বাড়ির সামনে একটা বাঁধালো পুরুরের চারিপাশে সুপুরি গাছের সারি।

অমিতাভবাবু নীচেই অপেক্ষা করছিলেন আমদের জন্য, ফেলুদা লালমোহনবাবুর সঙ্গে আলাপ করানোতে বললেন, ‘আমি নিজে আপনার লেখা পড়িনি বটে, তবে আমার শ্রী রহস্য-ঝোমাঝ সিরিজের ভীষণ ভক্ত।’

আমরা শ্বেত পাথরের সিডি দিয়ে দোতলায় উঠলাম।

পার্বতীবাবুর কালেকশনের জিনিস নাকি সবই দোতলায় ।

‘বাবার আগে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিন’, বললেন অমিতাভবাবু । ‘বাবার কাছে এখন লোক আছে । উনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত্কালো সকালেই করেন ।’

‘অ্যাদুরেও লোক এসে উৎপাত করে ?’

‘বাবার মতো কিছু কালেক্টর আছেন, তাঁরা প্রায়ই আসেন । তা ছাড়া সম্পত্তি বাবা একজন সেক্রেটারির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন । তার জন্ম কিছু লোক দেখা করতে আসছে ।’

‘তুমার সেক্রেটারি নেই ?’

‘আছে, তবে তিনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন সামনের সপ্তাহে একটা ভাল কাজ পেয়ে । লোকটি বেশ কাজের ছিল । আসলে সেক্রেটারির ব্যাপারে বাবার ল্যাক্টাই খারাপ । ক্ষুণ্ড দশ বছরে চারটি সেক্রেটারি এল গেল । একটি তে ক্ষেত্রবানেক কাজ করার পর মেনিনজাইটিসে মারা গেলেচ । আরেকটি কথা নেই বার্তা নেই, সাইবাবার তত্ত্ব হয়ে বিবাটী হয়ে গেলেন । এখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাবা কথা বলছেন, তাকে সাত বছর আগে তাড়িয়ে দেন । সেও ছিল সেক্রেটারি ।’

‘কেন, তাড়ান কেন ?’

‘ভদ্রলোক কাজ খুব ভালই করতেন, তবে অসন্তুষ্ট কুসংস্কারী । বাবা সেটা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না । একবার ইজিপ্ট থেকে একটা জেড পাথরের মূর্তি আনার পর কলকাতায় এসে বাবার অসুখ করে । সাধনবাবু বাবাকে সিরিয়াসলি বলেন যে, মূর্তিটি যে দেবীর, তাঁর অভিশাপ পড়েছে বাবার ওপর । এই এক কথাতেই বাবা তাঁকে একরকম খাড় ধরে বার করে দেন ।’

‘এই সাধনবাবু যদি আবার এসে থাকেন তা হলে তাঁকে খুবই অপার্টিমিস্টিক বলতে হবে, এবং আপনার বাবাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল বলতে হয় ।’

‘আসলে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবার পর বাবার একটু অনুশোচনা হয়েছিল । কারণ ভদ্রলোকের অবস্থা মেটেই ভাল ছিল না । আর বাবা তাঁকে সার্টিফিকেটও দেননি ।’

বাড়িটা বাইরে থেকে বিলিতি খাঁচের হলেও, ভিতরটা বাংলা জমিদারি বাড়ির মতোই। মাঝখানের নটমন্ডিরকে ঘিরে দোতলার বারান্দার এক পাশে শাবি সাবি ঘর। বৈঠকখানা, আর পারভীচরণের স্টাডি বা কাজের ঘর সামনের দিকে, আর ভিতর দিকে সব শোবার ঘর। ফেলুদার খুদে মক্কেল বারান্দায় তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাব, এমন সময় দুটোর শব্দ শুনে বৈঠকখানার দিকে চেয়ে দেখি, নীল কোটি পরা হাতে ব্রিফকেসওয়ালা একজন সোক গটগটিয়ে ঘরটা পেরিয়ে সিডির দিকে চলে গেল। অমিতাভবাবু বললেন, 'এই সেই প্রাক্তন সেক্রেটারি সাধনবাবু। ভদ্রলোককে খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না।'

'এই যে আমার পাখির খাঁচা', ফেলুদা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল অনিকৃষ্ট।

'আমি তো সেটাই দেখতে এলাম না।'

খাঁচাটা একটা ছুক থেকে বুজছে বারান্দায় রেলিং-এর উপরে। বাকঝকে ভাবটা দেখে ঝোঁঝা ঘায় খাঁচাটাও কেনা হয়েছিল পাখির সঙ্গেই। ফেলুদা সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা এখনও খোলাই রয়েছে।

'আপনার বাড়ির কোনও চাকরের পাখিতে অ্যালার্জি আছে বলে জানেন ?'

অমিতাভবাবু হেসে উঠলেন।

'সেটা ভাববার তো কোনও কারণ দেখি না। আমাদের বাড়ির কোনও চাকরই কুড়ি বছরের কম পুরনো নয়। তা ছাড়া এক কালো এ বাড়িতে একসঙ্গে দুটো প্রে প্যারট ছিল। বাবা নিজেই এনেছিলেন। অনেক দিন ছিল তারপর মারা যায়।'

'এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি ?'

ফেলুদা বেশ কিছুক্ষণ হাত দিয়ে খাঁচাটাকে নেড়ে-চেড়ে প্রস্তা করল।

অমিতাভবাবুর সঙ্গে আমরা দুজনও এগিয়ে গেলাম।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটার একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ছেট একটা লালের ছেপ বলে মনে হচ্ছে ?' বললেন

অমিতাভবাবু । 'তার মানে কি— ?'

'যা ভাবছেন তাই । আড় ।'

'চন্দনা শার্ডারি ?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু ।

ফেলুন খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'পাখির রক্ত না মানুষের রক্ত সেটা কেমিক্যাল আনালিসিস না করে বোঝা যাবে না । তবে একটা স্ট্রাগ্রল হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই । অবিশ্য সেটা কেখন অস্বাভাবিক কিছু নয় । এটা বোঝাই যাচ্ছে যে খাঁচার দরজা খেলা রাখার জন্য প্যায়ি পালায়নি ; দরজা খুলে পাখিকে কার করে নেওয়া হয়েছে । আপনারা কেখেকে কিনেছিলেন পাখিটা ?'

'নিউ মার্কেট,' বলে উঠল অনিকন্ত ।

অমিতাভবাবু বললেন, 'নিউ মার্কেটের তিনকড়িবাবুর পাখির দোকান খুব পুরনো দোকান । অমাদের জালাশোনা অনেকেই ওখান থেকে পাখি কিনেছে ।'

অনিকন্ত ইচ্ছ্য ছিল তার 'কুল' কেনা খেলনাগুলো আমাদের দেখায়, বিশেষ করে মেট্রোগান্টা, কিন্তু অমিতাভবাবু বললেন, 'এরা আবার তোমাক কাছে আসবেন । তখন তোমার খেলনা দেখবেন, তোমার মা-র সঙ্গে আলাপ করবেন, তা যাবেন—সব হবে । আগে দানুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন ?'

আমরা পার্টীবাবুর স্টাডির উদ্দেশ্যে রাওনা দিলাম ।

কিন্তু দানুর সঙ্গে আর আলাপ হল না । লালমোহনবাবু পরে বসেছিলেন, এক-একটা ঘটনার শব্দ-এর একেকট নাকি সারা জীবন থাকে । এটা সেইরকম একটা ঘটনা ।

বৈঠকখানায় চুক্তে বুঝেছিলাম চারিদিকে দেখবার জিনিস গিজগিজ করছে । সে সব দেখার সময় জের আছে মনে করে আমরা এগিয়ে গেলাম ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পরদা দেওয়া স্টাডির দরজার দিকে ।

'আসুন' বলে অমিতাভবাবু গিয়ে চুক্তেন ঘরের মধ্যে । আর দোকামাত্র এক অঙ্গুটি চিংকার দিয়ে উঠলেন—

'বাবা !'



কেলুদার অমিতাভবাবুকে দু' হাত দিয়ে ধরতে হল, কারণ ভদ্রলোক প্রায় পড়েই ঘাঁষিলেন।

তত্ত্বপূর্ণে আমরা দুজনেও ঘরে ঢুকেছি।

বিহাট মেহগানি টেবিলের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন প্রাবৃত্তিচরণ হালদার। তাঁর মাথাটা চিত, দুটো পাথরের মতো চোখ চেয়ে আছে সিলিং-এর দিকে, হাত দুটো ঝুলে রয়েছে চেয়ারের দুটো হাতলের পাশে।

কেলুদা এক দৌড়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের পাশে। নাড়ীটা দেখার জন্য হাতটা বাড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, ‘তোরা দৌড়ে গিয়ে এই সাধন লোকটাকে আটকা...দারোয়ানকে বল। দরকার হল বাইরে রাস্তায় দ্যাখ—’

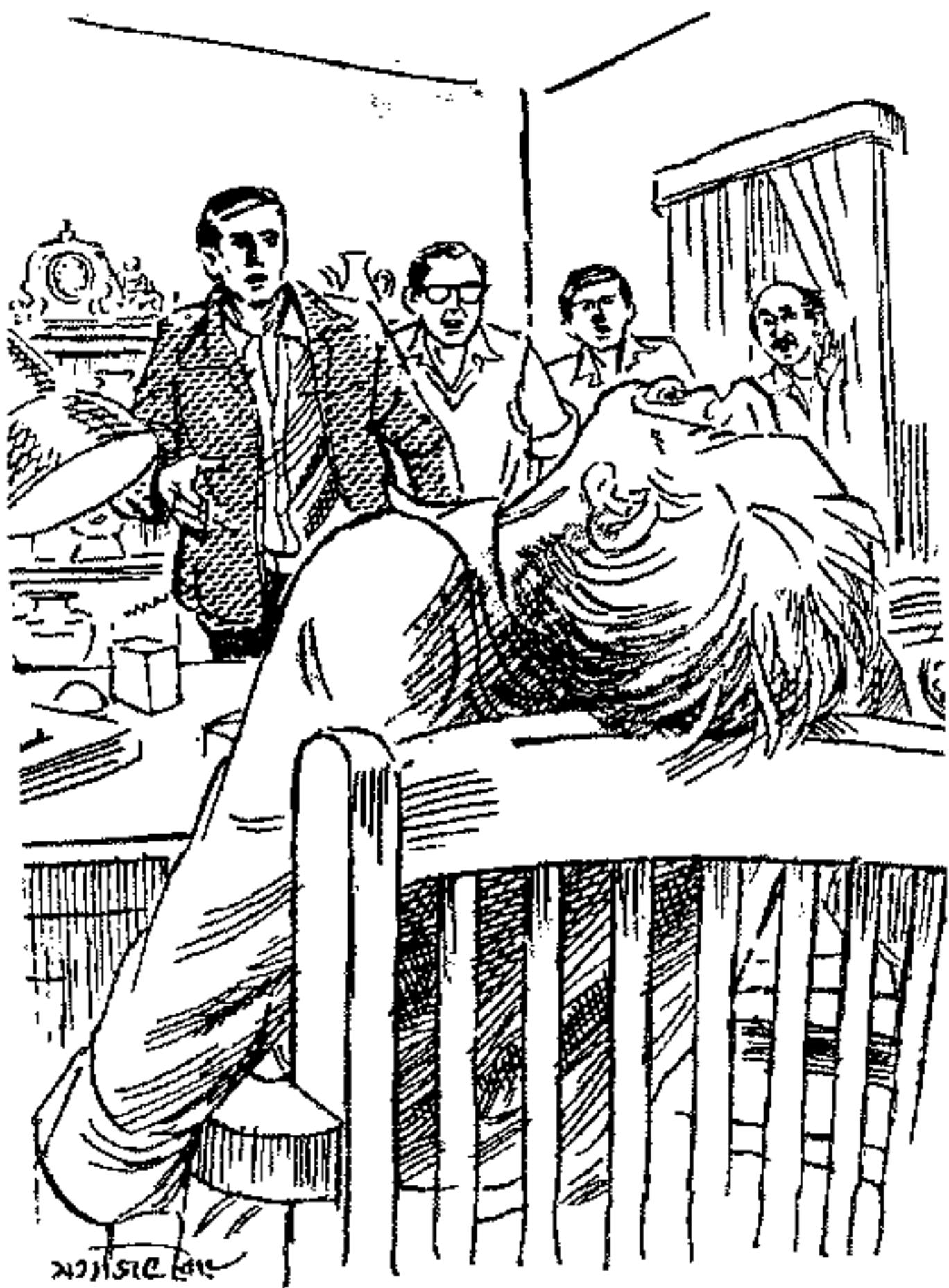
আমার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও ছুট দিলেন। মন বলছিল, দশ মিনিট চলে গেছে, সে সোককে আর পাওয়া যাবে না—বিশেষ করে যদি সে খুন করে থাকে।

সিডি দিয়ে নামবার সময় ক্লক্ট-ক্লক্টলোকের সঙ্গে প্রায় কোলিশন হয়েছিল। পরে জেনেহিলাম উনি প্রাবৃত্তিচরণের বর্তমান সেক্রেটারি হ্রবীকেশবাবু। দুজন অচেনা লোককে এইভাবে ডিক্রিয়ডি নামতে দেখে তিনি কী ভাবলেন সেটা আর তখন ভাবার সময় ছিল না।

বাইরে কেউ নেই, রাস্তায়ও না, কারের থাকার কথাও নয়। যেটা সবচেয়ে অস্তুত লাগল সেটা হল এই যে দারোয়ান জোর গলায় বলল গত দশ মিনিটের মধ্যে কেউ গেট দিয়ে বাইরে যায়নি। বাবুর কাছে লোক আসবে বলে সে সকাল থেকে ডিউচিতে রয়েছে, তার তুল হতেই পারে না।

‘চলো বাগানের দিকটা দেখি’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।’

তাহি করলাম। দক্ষিণের পুকুরের ধার, পশ্চিমের গোলাপ বাগান, কম্পাউন্ড ওয়ালের পাশটা, চাকরদের ঘরের আশেপাশে, কোথাও বাদ দিলাম না। পাঁচিল টপকানোও সহজ নয়, কারণ প্রায় আট ফুট উচু। হাল ছাড়তে হল। সাধনবাবু উধাও।



॥ ২ ॥

পাবত্তীবাবুকে মাথার উপরের একটা ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত মেরে খুন করা হয়েছে। এদের বাড়ির ভাঙ্গার সৌরীন সোম বললেন, ঘৃত্যাটা হয়েছে আরার সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্রলোকের রক্ষের চাপ ওঠা-নামা করত, হার্টেরও গোলমাল ছিল।

ইতিমধ্যে পুলিশও এসে গেছে। ইসপেস্টার হাজরা ফেলুদাকে চেনেন। মোটামুটি খাতিরণ করেন। সাধারণ পুলিশের লোক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে যে রূক্ষ অবজ্ঞার চোখে দেখে, সে রূক্ষ নয়। বললেন, 'আমাদের যা কুটিন কাজ তা করে যাচ্ছি আমরা, যদি কিছু তথ্য বেরোয় তো আপনাকে জানাব।'

ফেলুদা বলল, 'যে ভারী জিনিসটা দ্বিতীয়খন করা হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া কুরুক্ষেম।'

হাজরা বললেন, 'তেমনি তো কিছু দেখছি না আশেপাশে। খুনি সেই জিনিসটা নিয়েই ভেগেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'পেপারওয়েট।'

'পেপারওয়েট ?'

'একবার আসুন আমার সঙ্গে।'

হাজরা ও ফেলুদার পিছন আমরাও চুকলাম ঘরের মধ্যে।

ফেলুদা টেবিলের একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সবুজ ফেপেটের উপর মিহি ধুলো জয়ে আছে। তারই একটা অংশে একটা খুলেছীন গোল ঢাকতি। খুব ভাল করে জন্ম না করলে বোঝা যায় না।

'অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম', বলল ফেলুদা, 'একটা বেশ বড় এবং ভারী ভিক্টোরীয় আমলের কাচের পেপারওয়েট থাকত এই টেবিলের উপর। এখন নেই।'

'তারেল ডান, মিস্টার মিত্রি !'

'কিন্তু আসল লোক তো বেমালুম হ্যাওয়া হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা।'

হাজরা বললেন, 'নাম আর ডেস্ক্রিপশন খন্দন পাওয়া গেছে, তখন তাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া সে তো অ্যাপ্লিকেশন করেছিল; সেটা থেকে থাবনলে তো তার ঠিকানাই পাওয়া যাবে। আমার মনে হর দারোয়ান সত্ত্ব কথা বলছে না। একটা সময় সে গেটের কাছে ছিল না; তখনই লোকটা পালিয়েছে। যেন রোডের উপর থাড়ি, হয়তো বেরিয়েই বাস পেয়ে গেছে। অবিশ্য সে ছাড়াও তো আরও লোক এসেছিল সকালে। সাধনবাবু আসার ঠিক আগেই আরেকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। খুন্টা ভিনিও করে থাকতে পারেন।'

'কিন্তু পার্বতীবাবুকে মৃত দেখলে সাধনবাবু আর থাকবেন কেন?' ।

'আপনি তো দেখেছেন ঘরটা, তাঁর তো কিউরিরে দোকান মশাই। একজন লোক খঁজিক্ষসৎ হৈ, ও ঘরে চুক্তে মালিক মৃত দেখলে তো তার পেঁয়াজ্যারো!'

'আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কোনও জিনিস গেছে কি না?'

ফেলুন্দা প্রশ্নটা করল বর্তমান সেক্রেটারি হ্যাঁকেশ দত্তকে। ভদ্রলোক দশটার ঠিক আগে বেরিয়েছিলেন পোস্ট অপিসে দুটো জরুরি বিদেশি টেলিগ্রাফ করতে। ফেরার পরেই আমাদের সঙ্গে পিড়িতে দেখা হয়।

'তা হয়তো পারতে পারি', বললেন হ্যাঁকেশবাবু। 'বাইরের যা জিনিস তা মোটামুটি সবই আমার জানা। ভিতরে আলমারিবিন্দি জিনিসেরও একটা তালিকা একবার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন মিঃ হালদার। তার কিছু জিনিস বোধ হয় আজ পেস্টনজীকে দেখাবার জন্য বার করেছিলেন। পেস্টনজী আসেন সাড়ে ম'টায়।'

'এই পেস্টনজীর সঙ্গে কি আগেই আলাপ ছিল পার্বতীবাবুর?'

'খুব। প্রায় দশ বছরের আলাপ। মাসে অন্তত দুবার করে আসতেন। উনিও একজন কালেক্টর। মিঃ হালদারের সংগ্রহে

একটা চিঠি ছিল, সেটা দেখতেই ভদ্রলোক আসেন।'

'এটা কি সেই নেপোলিয়নের চিঠি ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি মিঃ হালদার বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন ?'

'মোটেই না। পেস্টনজীর খুব লোভ ছিল ওটার উপর। তিনি মোটা টাকা অফার করবেন, আর মিঃ হালদার রিফিউজ করবেন—তাতে পেস্টনজীর মুখের ভাবটা কেমন হবে সেটা দেখেই মিঃ হালদারের আনন্দ। এ ব্যাপারে ওঁর একটা জিদও ছিল। এই চিঠিটা কেনার জন্য একবার এক আমেরিকান দাম চড়াতে চড়াতে বিশ হাজার ডলারে উঠেছিল। মিঃ হালদার ক্রমাগত মাথা নেড়ে গেলেন। সাহেবের মুখ সাল, শেষ পর্যন্ত মুখ খারাপ করতে আরও করল, আর সমস্ত ব্যাপারটা বসে বসে উপরের করলেন মিঃ হালদার। আজও পেস্টনজী গলা চড়াতে শুরু করেছিলেন সেটা আমি বাইরে থেকেই বুঝতে প্রয়োজনাম।'

'কীসের মধ্যে থাকত পুলিসটা ?'

'একটা অ্যালক্যাথিনের থামে।'

'তা হলে বোধ হয় যায়নি চিঠিটা। কারণ যামটা টেবিলের উপরই রয়েছে। আর তার মধ্যে একটা সাদা ভাঁজ করা কাগজও দেখলাম।'

'না গেলেই ভাল। ও চিঠির মর্ম সকলে বুঝবে না।'

চুরি হয়েছে কি না সেটা এখন জানা যাবে না, কারণ পুলিশ ও ঘরে কাজ করছে; তা ছাড়ি পুলিশের ভাঙ্গার এইমাত্র এসেছেন, তিনি লাশ পরীক্ষা করছেন।

হ্রীকেশবাবু বললেন, 'আশচর্য। যে সব্য সাধনবাবু গেলেন, আমি সে সময়ই আমি ফিরেছি। অথচ লোকটার সঙ্গে দেখা ইল না।'

'আপনি বেরিয়েছেন ক'টায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক সশ্রাটি বাজতে পাঁচ। এখাম থেকে পাঁচ মিনিট লাগে পোস্টাপিস বেতে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফগুলো দিতে চেয়েছিলাম।'

‘সে তো পাঁচ মিনিটের কাজ, তা হলে কিরকে এত দেরি হল
কেন?’

হ্যাঁকেশবাবু মাথা নাড়ালেন। —‘আর বলবেন না ইশাই! ঘড়ির ব্যাকের খোক করছিলুম স্টেশনারি দোকানগোতে। দেখছেন না ডান হাতে ঘড়ি পরেছি। ব্যাস্তা ঢিল হয়ে গেছে। বাঁ কব্জি আমার ডান কব্জিতে চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি সরু। ব্যাস্ত চলচল করে। বোনও স্বাস্থ হল না। সেই নিউ মাকেট ছাড়া গতি
নেই।’

ভদ্রলোক ডান হাতে ঘড়ি পরেন সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

‘আপনি এ বাড়িতেই থাকেন?’ ফেলুদা জিজেস করল। অমিতাভবাবু ভিতরে সামলাচ্ছেন, তা ছাড়া উনি নিজেও বেশ ভেঙে পড়েছেন, তাই ফেলুদা হ্যাঁকেশবাবুর কাছ থেকে যা তথা
পাওয়া যায় বার করে নিজে।

‘হ্যাঁ, এ বাড়িতেই, প্লেজেন হ্যাঁকেশবাবু, ‘একত্রায়। ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেচুরাল মিঃ হালদার বলালেন এখানেই থাকতে; ঘরের তো অভাব নেই। সাধনবাবুও শুনেছি এ বাড়িতেই
থাকতেন।’

‘এ কাজ তো ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আপনি। ভাল লাগছিল না
বুঝি?’

‘প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল মশাই। তা ছাড়া উন্নতির সুযোগ
আঁকড়ের দিনে কে ছাড়ে বলুন। মিঃ হালদার অবিশ্য এমপ্লায়ার
হিসেবে ভালই ছিলেন। তাঁর বিকল্পে কিন্তু বলার নেই আমার।’

আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে, যদিও
কথা হয়নি। তিনি হলেন অমিতাভবাবুর ছেট ভাই অচিন্ত্যবাবু।
ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন, তাই বেধ হয় পুলিশ এখন তাঁকে জেরা
করছে। ফেলুদা হ্যাঁকেশবাবুকেই জিজেস করলেন ছেট ভাইয়ের
কথা।

‘অচিন্ত্যবাবু কী করেন?’

‘থিয়েটার।’

‘থিয়েটার?’

আমরা তিনজনেই অলাক।

‘পেশ্যদারি থিয়েটার ? মানে থিয়েটার করেই খুর রোজগার ?’

হায়ীকেশবাবুকে উন্নতী দিতে বেল বেশ একটু ভীবতে হল।
বললেন, ‘এ সব ভেতরের বাপার। আর সত্ত্ব আমার পক্ষে
কলাটা বোধ হয় খুব শোভা পাব না। এ ফ্যামিলিতে থিয়েটার
কর্তৃতা বে়োনান তাতে সন্দেহ নেই, তবে আমার একটা সন্দেহ
হয়েছে যে অচিন্ত্যবাবুর মনে একটা বড় বক্সমের অভিভাব ছিল।
চার ভাইয়ের মধ্যে উনিই একমাত্র বিস্তৃত ধারণি পড়াশুনো
করতে। আসলে বড় ফ্যামিলিতে হ্রেট ভাই অনেক সময় একটু
নেগেলকটেড হয়। তার ক্ষেত্রে মনে হয় সেটাই হয়েছে। আমার
সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথাবাত্তা থেকেও সেটাই মনে হয়েছে। চাকরি
একটা করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হলদারই, কিন্তু অচিন্ত্যবাবু সেটা
ছেড়ে দেন। থিয়েটারের শর্খটা বোধ হয় এমনিতেই ছিল।
ব্যরাসতে একটা ড্রামাটিক প্রাব হিলেন্স ইমেন্ট উঠেন, কিন্তু তাতে
মন ভার না। এখন নর্মানিজমের ঘোরাঘুরি করেছেন। দু’-একটা
হিয়োর পাটও নাকি ঝারিছেন। কালও দেখছিলাম পাট মুখৎ
করছেন।’

এবাবে ইলস্পেক্টর হাজরা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।
অচিন্ত্যবাবুর জেরা শেষ। তিনি গোমড়া মুরে ঘর থেকে বেরিয়ে
গেলেন। হাজরা বললেন, ‘খুনটা হয়েছে দশটা থেকে সাড়ে দশটার
মধ্যে। পেস্টনজী ছিলেন সাড়ে স্টা থেকে দশটার কিছু পর
অবধি। সাধারণ দস্তিদার এসেছেন সোয়া দশটায়, গেছেন সাড়ে
দশটায়। ছেটি ছেলের ঘর থেকে বাইবের বারান্দা দিয়ে সোজা
বাপের ঘরে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরের লোক দেখতে পাবে
না। দশটা পাঁচ থেকে সোয়া দশটার মধ্যে অচিন্ত্যবাবু বাপের ঘরে
এসে থাকতে পারেন। উনি বলছেন সাজা সকাল পাট মুখৎ
করেছেন, কেবল সাড়ে দশটা নাগাদ একবার ভাইসো অনিকৃদ্ধর
ভাব পেরে তার কাজে যান তার খেলার মেশিনগানটা দেখতে।
তখনও তিনি বাপের মৃত্যু-সংবাদ পাইনি। যাই হোক, ঘোটাঘুটি
তিনি জনেরই ঘোটিত ছিল। ছেলের সঙ্গে বাপের বনত না,



পেস্টনজী ছিলেন মিঃ হালদারের রাইভ্যাল, আর সাধান দক্ষিদারের ছিল পুরনো আক্রেশ। এই হল ব্যাপার। এবার আপনি এসে একটু দেখে বলুন তো কিছু চুরি গেছে কি না।'

শেষ অনুরোধটা করা হল হ্রষীকেশবাবুকে। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন স্টাডিও দিকে, আমরা তাঁর পিছনে।

ঘরটায় ঢুকে হ্রষীকেশবাবু একবার চারিদিকে তোখ বুলিয়ে নিলেন। যেক্যানিক্যাল জিনিসে পাবলীবাবুর খুব শৰ ছিল, কারণ বৈঠকখানায় দেখেছি একটা অর্থম যুগের সিলিভার আম্বোফোন, আর এ ঘরে দেখেছি একটা আদিকালের ম্যাজিক ল্যান্টার্ন। তা ছাড়া ছেট ছেট মূর্তি, পাত্র, দোয়াত, কলম, পিস্তল, পুরনো ছবি, ম্যাপ, বই—এ সব তো আছেই। বাইরের জিনিসপত্র দেখে, চাবি দিয়ে আলমারি, বাস্ত দেৱাঙ্গ ইত্যাদি খুলে দেখে অবশ্যেই হ্রষীকেশবাবু জানালেন যে কোনও জিনিস গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ফেলুদা বলল, 'আপনি অ্যালবামের খামটা একবার দেখলেন না ?'

'ওতে তো চিঠিটা রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে ।'

'তবু একবার দেখে নেওয়া উচিত ।'

হৃষীকেশবাবুকে খামটা খুলে ভেতরের কাগজটা টেনে বার করতে হল। কাগজের রংটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; পুরনো কাগজ কি এত সাদা হয় ? ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলেই ভদ্রলোক চেচিয়ে উঠলেন।

'এ কী ! এ তো প্যাড থেকে ছেড়া হালদার মশাইয়ের নিজের চিঠির কাগজ ?'

অর্থাৎ নেপোলিয়নের চিঠি উধাও ।

৩ ॥

আরও আধ ঘণ্টা ছিলাম আমরা হালদারবাড়িতে। সেই সময়টা ফেলুদা বাড়ির কম্পাউন্ডটা ঘুরে দেখল। বাগানটা দেখা শেষ করে, কম্পাউন্ড ওয়ালের কোনও অংশ নিচু বা ভাঙা আছে কি না দেখে আমরা পুরুরের কাছে এলাম। ফেলুদার দৃষ্টি মাটির দিকে, জানি ও পায়ের ছাপ বুঝছে। কুকনো মাটি, পায়ের ছাপের সজ্ঞাবনা কর, তবে পুরুরের পূর্ব পাড়ে একটা অংশ ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে থেমে গেল।

একটা ছেটি বুনো ফুলের গাছ যেন কীসের চাপে পিষে গেছে। আর সেটা হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই।

ফেলুদা ফুলের আশপাশটা দেখে পুরুরের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এ পুরুর ব্যবহার হয় না, তাই জলটা পানার আবরণে চেকে গেছে। আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে হাত পাঁচেক দূরে বেশ খালিকটা জায়গা জুড়ে পানা করে গিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কিছু ফেলা হয়েছে কি জলের মধ্যে ? তাই তো মনে হয় ।

কিন্তু ফেলুদা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করল না। যা দেখবার ও দেখে নিয়েছে।

বাড়ি ফেরার সময় লালমোহনবাবু হঠাতে বললেন, ‘বাগানে একটা চন্দনা দেখলুম বলে মনে হল। একটা পেয়ারা পাছ থেকে উড়ে একটা সজনে গাছে গিয়ে বসল।’

‘সেটা আমাদের বললেন না কেন?’ ধমকের সুরে বলল ফেলুদা।

‘কী জানি, যদি বেরিয়ে যায় টিয়া। দুটো পাখি এত কাছাকাছি। তবে এ পাখিটা কথা বলে।’

‘আপনি কী বললেন কথা?’

‘কুনকুম বইকী। আপনারা তখন বাগানের উপরে দিকে। আমি আরেকটু হলেই একটা তেঁতুলে বিছের উপরে পা ফেলেছি, এমন সময় কুনকুম, “বাবু, সাবধান।” অন্ত মুখ তুলে দেখি পাখি।’

‘পাখি বলল কাবু সাবধান?’

‘তাই তো স্পষ্ট কুনকুম। আপনারা বিশ্বাস করবেন না বলেই থিলিনি।’

বিশ্বাস করাটা সত্যিই কঠিন, তাই কথা আর এগোল না।

তবে এটা ঠিক যে এ রকম একটা খুন আর এ রকম চুরির পরেও ফেলুদার মন থেকে চন্দনার ব্যাপারটা যাজে না। খুনের দু’ দিন পর, সোমবার সকালে তা খাওয়ার পর ফেলুদার কথায় সেটা বুঝতে পারলাম। ও বলল, ‘পাবতীবাবুর খুন আর নেপোলিয়নের চিঠি চুরি—এই দুটো ঘটনাই গতানুগতিক। কিন্তু আমাকে একেবারে বোকা বালিয়ে দিয়েছে এই পাখি চুরির ব্যাপারটা।’

গতকাল অঙ্গিতাভবাবু ফোন করেছিলেন; ফেলুদা জানিয়ে দিয়েছে যে নেহাত দরকার না পড়লে এই অবস্থায় ও আর ওঁদের বিরক্ত করবে না, বিশেষ করে পুলিশ যখন তদন্ত চালাচ্ছে। লালমোহনবাবু বলেছেন সোমবার হঞ্জেও আজ একবার আসবেন, কারণ কী ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানার ওর বিশেষ আগ্রহ।

আমি বললাম, 'পাখির খাঁচার গায়ে বক্তৃতা পাখির না মানুষের সেটা তো এখনও জানা গেল না।'

'ওটা যে মানুষের সেটা, অ্যানালিসিস না করেই বলা যায়', বলল ফেলুন। 'কেউ যদি পাখিকে খাঁচা থেকে বার করতে যায় তা হলে সেটা সাধানেই করবে, কিন্তু পাখি ছটফট করতে পারে, খামচাতে পারে, ঠোক্রাতে পারে। অর্থাৎ যে সোকে পাখিটাকে বার করেছে, তার হাতে জবমের চিহ্ন থাকা উচিত।'

'সে জিনিস ও বাড়ির কারুর হাতে দেখলে ?'

'উহ। সেটার দিকে আমি চোখ রেখেছিলাম। বাবু, চাকর কারুর হাতেই দেখিনি। অথচ টাট্কা জবম। অমিতাভবাবু বললেন পার্ক ট্রিটে আমাদের সঙ্গে দেখা হবার দু' দিন আগে পাখিটা কিনেছিলেন। তার মানে ১৩ ডিসেম্বর খুনটা হয় ১৯ ডিসেম্বর। ...এই পাখির জন্য আমি হাঁচ্যা-ব্যাপারগুলোতে পুরোপুরি মনও দিতে পারছি না।'

'খুনের সুযোগ কার কাঁচির ছিল তার একটা লিস্ট করছিসে না তুমি কাজ বাতিলে ?'

'শুধু সুযোগ নয়, ঘোটিভও।'

ফেলুনোর পাশেই সোফায় পড়েছিল খাতাটা। সে ওটা খুলে বলল, 'সাধান দক্ষিণার সংগ্রহে নতুন কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। রহস্যটা হচ্ছে তার অন্তর্ধান। এটা সম্ভব হয় একমাত্র যদি দারোয়ান মিথ্যে কথা বলে থাকে। সাধান তাকে ভালবাস ঘূষ দিয়ে থাকলে এটা হতে পারে। সেটা পুলিশে বার করব। মিথ্যেবাদীকে সত্যি বলানোর রাজ্ঞি তাদের জানা আছে।

'তৃতীয় সামস্পেষ্ট—পেস্টনজী। তবে পেস্টনজীর সত্ত্বে বছর বয়স ; কুড়ো মানুষের পক্ষে এ খুন সম্ভব কি না সেটা ভাবতে হবে। আঘাতটা করা হয়েছিল বীভিমতো জোরে। অবিশ্য সত্ত্বেও অনেকের খাঁচ্য দিয়ে ভাল থাকে। সেটা জনসেবককে চাকুর না দেখা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।'

'তৃতীয়—অচিত্ত হালদার। বাপের উপর ছেলের টান না থাকলেও খুন করার মতো আঙ্গোশ ছিল কিনা সেটা ভাবার কথা।'

তবে নেপোলিয়নের চিঠি হাতাতে পারলে ওর আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটে ঠিকই । আর কেউ না হোক, পেস্টনজী যে সে চিঠি কিনতে রাজি হতেন, সেটা বোধহয় অনুমান করা যায় । চতুর্থ—'

‘আবার আরও একজন আছে নাকি ?’

তাকে সাসপেন্ট বলে বলছি না, কিন্তু অমিতাভবাবু সে সময়টা কী করছিলেন, সেটা জানা দরকার থাইলৈ । তাঁর জবানিতে তিনি বলেছেন সকালে তিনি বাগানে থাকেন । ওর খুব ফুলের শব্দ । সে দিন দশটা পর্যন্ত তিনি বাগানে ছিলেন । মাঝে একবার আমাদের ফোন করতে নটার সময় তাঁকে নীচের বৈঠকখানায় আসতে হয় । তারপর আমরা আসার আগে আর দোতলায় যাননি । চাকর তাঁকে চা দিয়ে যায় দশটার সময় একতলায় বাগানের দিকের খোলা বারান্দায় । আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেঁচে তিনি সামনের দিকে চলে আসেন । দোতলায় যান তিনি অক্ষেবারে আমাদের নিয়ে, তাঁর আগে নয় ।

সব শেষে হলেন হ্রষীকেশবাবু । ইনি দশটা বাজতে পাঁচে বেরিয়েছেন সেটা দারোয়ান দেখেছে, কিন্তু যিন্তে দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না । দারোয়ানের কথাবার্তা খুব ডিলায়েবল বলে মনে হয় না । চলিশ বছর চাকরি করছে বটে হাজদার বাড়িতে, হয়তো এমনিতে বিশ্বস্ত, কিন্তু বয়স হয়েছে সতরের উপর, কাঞ্জেই স্মরণশক্তি শ্রীণ হয়ে আসা অস্থাভাবিক নয় । হ্রষীকেশবাবু স্টেশনারি দেখানে অতটা সহজ কাটিয়েছেন কিনা সেটা জানা দরকার । যদি সে ব্যাপারে মিথ্যেও বলে থাকেন, তার খুনের সুযোগ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায় । একমাত্র নেপোলিয়নের চিঠি হাত করা ছাড়া মোটিভও খুঁজে পাওয়া যায় না ।’

ফেলুন খাতটা বন্ধ করল । আমি বললাম, ‘চাকর-বাকরদের বোধহয় সব কটাকেই বাদ দেওয়া যায় ।’

‘শুনলিই তো চাকর সব কটাই পুরনো । তাদের মধ্যে বেয়ারা মুকুল পার্বতীচরণের ঘরে কফি নিয়ে যায় পেস্টনজী ও পার্বতীবাবুর জন্য । পার্বতীচরণ একা থাকলেও রোজ দশটায় কফি খেতেন । এ ছাড়া আর কেবলও চাকর নটার পর পার্বতীচরণের ঘরে যায়নি ।

বাড়িতে সোক বলতে আর আছে অমিতাভবাবুর স্ত্রী, অনিকুম্ভ, পার্বতীবাবুর আশি বছরের বুড়ি মা, মালি, মালির এক ছেলে, ড্রাইভার ও দারোয়ান। অচিন্ত্যবাবু বিয়ে করেননি।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধনাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোন বেজে উঠল। ইনস্পেক্টর হাজরা।

‘কী খবর বলুন স্যার’, বলল ফেলুদা।

‘সাধান দাতিদারের ঠিকানা পাওয়া গেছে।’

‘ভেরি শুভ।’

‘ভেরি ব্যাড, কারণ সে ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না।’

‘বটে?’

‘এবং কোনও দিন ছিলও না।’

‘তা হলে?’

‘তা হলে আর কী—যে তিনিলো মেই তিনিলো। যহা ফিচেল লোক বলে ঘনে হচ্ছে।’

‘আর হৃষীকেশবাবুরঞ্জালিবাই ঠিক আছে?’

‘উনি পোস্টাপিসে গিয়েছিলেন দশটায় এবং টেলিগ্রামগুলো করেছেন এটা ঠিক। তারপর স্টেশনারি দোকানে থাকার কথা যেটা বললেন সেটা ভেরিফাই করা গেল না, কারণ দোকানে কেউ ঘনে করতে পারল না।’

‘আর পেস্টম্যাজী?’

‘অসম্ভব ডি঱িক্সি মেজাজের লোক। প্রচণ্ড ধনী। দেড়শো বছর কলকাতায় আছে এই পার্শ্ব ফ্যামিলি। এমনিতে বেশ শক্ত সমর্থ লোক, তবে কাবু হয়ে আছেন আরথাইটিসে, ডান হাত কাঁধের উপর ওঠে না। ওর পক্ষে এই খুন প্রায় ইমপসিবল। লর্ড সিন্হা রোডে গিয়ে রোজ সকালে ফিজিওথেরাপি করান। চেক করে দেবেছি; কথাটা সত্ত্ব।’

‘তা হলে তো সাধান দাতিদারের সকানেই লেগে থাকতে হয়।’

‘আমার ধারণা লোকটা বারাসতেই থাকে, কারণ ওর অ্যাপ্লিকেশনের খামে বারাসতের পোস্টমার্ক রয়েছে।’

‘সে কী, এ তো খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।’

‘আমরা থেজি করছি। এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। ও, ভাল কথা, খোকার ঘরে চোর এসেছিল।’

‘আবার ?’

‘আবার মানে ?’

হাজরা পাখির কথটি জানেন না। ফেলুদা সেটা চেপে গিয়ে বলল, ‘না, বলছিলাম—একটা চুরি তো হস্ত বাড়িতে, আবার চোর !’

‘থাই হোক, কিছু লেয়নি।’

‘খোকা টের পেল কী করে ?’

‘সে বাবা-মাত্রের পাশের ঘরে একা শোয়। ধিনিতি কাহাদা আর কী ! তা কাল মাঝে রাস্তিরে নাকি খুটখুট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ছেলের সাহস আছে। “কে” বলে চেঁচিয়ে ওঠে, আর তাতেই নাকি চোর পালিয়ে যায়। আমি খোকাকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমার ডয় করল না ? তাতে সে বললেন যে বাড়িতে খুন হবার পর থেকে নাকি সে বালিশের তলায় মেশিনগান নিয়ে শোয়, আর সেই কাবণ্ডেই নাকি তার ডয় নেই।’

দশটার সময় লালমোহনবাবু এসে হাজির। ফেলুদাকে গন্তব্যের দেখে ভদ্রলোক তারী ব্যন্ত হয়ে উঠলেন।—‘সে কী মশাই, আপনি এখনও অঙ্গুকারে নাকি ?’

‘কী করি বলুন—রোজ যদি একটা করে নতুন রহস্যের উত্তব হয়, তা হলে ফেলু মিতির কী করে ?’

‘আবার রহস্য ?’

‘খোকার ঘরে চোর চুকেছিল কাল রাস্তিরে।’

‘বলেন কী ? চোরের কি কোনও বাছবিচার নেই ? মুড়ি-মিছরি এক দর !’

‘এখন আপনার উপর ভদ্রসা !’

‘হ্যাঁ—চন্দ্র-সূর্য অঙ্গ গেল, জোনাক ধরে বাতি—ভীম প্রেশ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী ! ওবে হ্যাঁ—চন্দনার ব্যাপ্তারটা কিন্তু আমায় হন্ত করছে। ওটা নিয়ে একটা আলাদা তদন্ত করা উচিত। আপনার সময় না থাকলে আমি করতে রাজি আছি। তিনকড়িধাবুর

দোকানে আমার খুব যাতায়াত ছিল এককালে ।'

‘সে কী, এটা তো বলেননি আগে ।’

‘আরে মশাই, এককালে খুব পাখির শব্দ ছিল আমার । একটা ময়না ছিল, সেটাকে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলাম ।’

‘জল পড়ে পাতা নড়ে দিয়ে শক্ত করা উচিত ছিল আপনার ।’

তত্ত্বালোক ফেলুদার খোঁচাটা অগ্রহ্য করে আমার দিকে ফিরে বলাজন, ‘কী হে তপেশবাবু, যাবে নিউমার্কেট ?’

ফেলুদা বলল, ‘ফেরে হয় তো বেরিয়ে পড়ুন । আমি অন্টার্যানেক পরে আপনাদের মিট করব ।

‘কোথায় ?’

‘নিউ মার্কেটের মধ্যিথানে, কামানটার পাশে । বিস্তর ঘোরাঘুরি আছে, বাইরে যাওয়া আছে ।’

সপ্তাহে এক দিন রেন্টারটার্মে যাওয়াটা আমাদের গোপন্যায় ব্যাপার ।

লালমোহনবাবুর গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম ।

নিউ মার্কেটের পাখির বাজারের জবাব নেই । তবে তিনকড়িবাবু যে জটায়ুকে চিনবেন না তাতে অশ্রু হবার কিছু নেই, কারণ তত্ত্বালোক এ দোকানে শেখ এসেছেন ‘সিক্স্টি এইটে । লালমোহনবাবু এক গাল হেসে ‘চিনতে পারছেন ?’ কিজেস করাতে তিনকড়িবাবু তাঁর মোটা চশমার উপর দিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ‘চেনা মূল তো ভুলি না চট করে । নাকু বাবু তো ! আপনি কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে থাকেন না ?’

লালমোহনবাবুর চুপসানো ভাব মেঝে আমিই কাজের কথাটা পার্তলাম ।

‘আপনার এখান থেকে গত দিন দশেকের মধ্যে কি কেউ একটা চন্দনা কিনে নিয়ে গেছে ? বারাসতের এক তত্ত্বালোক ?’

‘বারাসতে কিনা জানি না, তবে দু’খানা চন্দনা বিক্রি হয়েছে দিন দশেকের মধ্যে । একটা নিল জয়শক্তি ফিলিম কোম্পানির নেপোনবাবু । বলল চিয়ারী মা না মৃচ্যুরী মা কি একটা বইয়ের

গুটিং-এ লাগবে। ভাড়ায় চাইছিল—আমি বললুম সে দিন আর নেই। নিশে ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যান, কাজ হয়ে গেলে পর আপনাদের হিরোইনকে দিয়ে দেবেন।’

‘আর অন্যটা যে বেচলেন, সেটা কোথেকে এসেছিল আপনার দোকানে মনে অঘে ?’

‘কেম মশাই, আত ইমফ্রমেশনে কী দরকার ?’

ভদ্রলোক একটু সন্দিক্ষ বলে মনে হল।

‘সেই পাখিটা খাঁচ থেকে চুরি গেছে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে, বললেন লালমোহনবাবু, ‘সেটা ফিরে পাওয়া দরকার।’

‘ফিরে পেতে চান তো কাগজে অ্যাডভারটাইজ দিন।’

‘তা না হয় দেব, কিন্তু আপনার দোকানে কোথেকে এসেছিল সেটা—’

‘অতশ্চ বলতে পারব না। আপনি অ্যাডভারটাইজ দিন।’

‘পাখিটা কথা বলত কি ?’

‘তা বলবে না কেবলও তবে কী বলত জিজেস করবেন না। সতেরোটা টকিং বার্ড আছে আমার দোকানে। কেউ বলে গুড হর্নিং, কেউ বলে ঠাকুর ভাত দাও, কেউ বলে জয় গুরু, কেউ বলে রাধাকেষ্ট—কোনটা কোন পাখি বলে সেটা ফস্ক করে জিজেস করলে বলতে পারব না।’

আধ ঘণ্টা সময় ছিল হাতে, তার মধ্যে লালমোহনবাবু একটা নখ কঢ়ার ক্লিপ, আধ ডজন দেশবন্ধু প্রিলিসের গেজি আর একটা সিগন্যাল টুথপেস্ট কিনলেন। তারপর চীনে ভুতোর দোকানে গিয়ে একটা শ্বেকাসিনের দাম করতে করতে আমাদের অ্যাপয়ন্টমেন্টের সময় এসে গেল। অ্যামরা কামানের কাছে যাবার তিন মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা হাজির।

‘এবার কোথায় যাওয়া ?’ মার্কেট থেকে বাইরে এসে জিজেস করলেন লালমোহনবাবু।

‘পার্শ্বিয়া প্রায় দুশো বছর ধরে কলকাতায় আছে, সেটা জানতেন ?’

‘বলেন কী ? সেই সিরাজগুলীর আমল থেকে ?’

‘সেই বকম একটি প্রাচীন পার্শি বাড়িতে এখন যাব আমরা।
ঠিকানা হচ্ছে’—ফেলুদা পকেট থেকে খাতা বার করল—
‘একশো তেক্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রিট।’

॥ ৪ ॥

একশো তেক্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রিট দেড়শো বছরের পুরনো
বাড়ি কি না জানি না। তবে এত পুরনো বাড়িতে এর আগে আমি
কখনও যাইনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুটো দোকানের
মাঝখানে একটা বিশেনের মধ্যে দিয়ে প্যাসেজ প্রেরিয়ে কাটের
সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় গিয়ে ডান দিকে ঘুরে সামনেই
দরজার উপর পিঞ্জলের ফলকে লেখা ‘আর. ডি. পেস্টনজী’।
কলিং বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এসে পুরঙ্গা খুলল। ফেলুদা
তার হাতে তার নিজের নাম অক্ষয়প্রশা লেখা একটা কার্ড দিয়ে
দিল।

মিনিট তিনেক পর বেয়ারা এসে থলল, ‘পাঁচ মিনিটের খেলি
সময় দিতে পারবেন না বাবু।’

তাই সই। আমরা তিনজন বেয়ারার সঙ্গে গিয়ে একটা ঘরে
চুকলাম।

বিশাল অঙ্গকার বৈঠকখালা, তারই এক পাশে দেওয়ালের সামনে
সোফায় বসে আছেন ভদ্রলোক। সামনে টেবিলে রাখা বোতলে
পানীয় ও গেলাস। গায়ের ঝঁঝ যথাকাণ্ড। নাকটা ডিয়া পাথির
মতো ঝাঁকা, চওড়া কপাল জুড়ে মেচেতা।

সোনার চশমায় মধ্যে দিয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে চেয়ে
কর্কশ গলায় বললেন, ‘বাট ইউ আর নট ওয়ান মান, ইউ আর এ
জাউড়।’

ফেলুদা ক্ষয়া চেয়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিল যে তিনজন হলেও,
সে একাই কথা বলবে; বাকি দুজনকে ভদ্রলোক অনায়াসে অগ্রাহ্য
করতে পারেন।

‘ওয়েল, হোয়াট চু ইউ ওয়েন্ট?’

‘আপনি পাবতী হালদারকে চিনতেন বোধহয় ?’

‘হাই গড়, এগেন !’

ফেলুদা হাত তুলে ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে বলল, ‘আমি পুলিশের লোক নই সেটা আমার কার্ড দেখেই নিশ্চয় বুঝেছুন। তবে ঘটনাচক্রে আমি এই খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি; আমি শুধু জানতে চাইছিলাম—এই যে নেপোলিয়নের চিঠিটা চুবি হয়েছে, সেটা সমস্তে আপনার কী মত।’

পেস্টনজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘তুমি দেখেছ চিঠিটা ?’

ফেলুদা বলল, ‘কী করে দেখব, যে দিন ভদ্রলোকের মৃত্যু, সে দিনেই তো আমি প্রথম গেলাম তার বাড়িতে।’

পেস্টনজী বললেন, ‘নেপোলিয়নের বিষয় পড়েছ তো তুমি ?’

‘আ কিছু পড়েছি।’

ফেলুদা ‘গত দু’ দিনে নেপোলিয়নের সমস্তে আর পুরনো আর্টিস্টিক জিনিস সমস্তে সিধু জ্ঞানকাছ থেকে বেশ কিছু বই ধার করে এনে পড়েছে সেটা আমি জানি।’

‘সেট হেলেনার তার শেষ নির্বাসনের বিষ্য জানো তো ?’

‘তা জানি।’

‘কোন সালে সেটা হয়েছিল মনে আছে ?’

‘১৮১৫।’

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুবলাম তিনি ইম্প্রেস্ড হয়েছেন। বললেন, ‘এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। সেট হেলেনার যে ছ’ বছর বেঁচেছিলেন নেপোলিয়ন, সেই সময়টা তাঁকে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়নি। তার মানে এই চিঠিটা তাঁর শেষ চিঠিগুলির মধ্যে একটা। কাকে লেখা সেটা জানা যায়নি—শুধু ‘মঁশেরামী’—অর্থাৎ “আমার প্রিয় বন্ধু।” চিঠির ভাব ও ভাষা অপূর্ব। সব হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি এক বিন্দু আদর্শচূড় হননি। এ চিঠি লাখে এক। জুরিখ শহরে এক সর্বস্বাস্ত মাতালের কাছ থেকে জলের দরে এ চিঠি কিনেছিলেন পাবতী হালদার। আর সে জিনিস আমার হাতে চলে আসত মাত্র বিশ

হাজার টাকায় ।'

'কী রকম?'—আমরা সকলেই অবাক—'মাত্র বিশ হাজার টাকায় এ চিঠি আপনাকে বিত্রি করতে রাজি ছিলেন হিং হালদার ?'

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন।—'নো নো। হি ডিভন্ট ওয়েন্ট টু সেল ইট। হালদারের গৌ ছিল সাংঘাতিক। ওঁর এন্ডিকট আমি খুব শুর্দ্ধ করতাম।'

'তা হলে ?'

পেস্টনজী গেলাসটা তুলে মুখে খানিকটা পানীয় চেলে বললেন, 'তোমাদের কিছু অফার করতে পারি ? চা, বিয়ার— ?'

'না না, আমরা এখুনি উঠবি।'

'ব্যাপারটা আর কিছুই না' বললেন পেস্টনজী, 'এটা পুলিশকে বলিনি। ওদের জেরার ঠেলায় আমার ইড প্রেশার চড়িয়ে দিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। ইউ লুক লাইক এ জেন্টেলম্যান, তাই তোমাকে বলছি। কাল সকালে একটা বেনামি টেলিফোন আসে। শোকটা সরাসরি আমায় জিজেন্স করে, আমি বিশ হাজার টাকায় নেপোলিয়নের চিঠিটা কিনতে রাজি আছি কি না। আমি তাকে গতকাল রাত্রে আসতে বলি। সে বলে সে নিজে আসবে না, লোক পাঠিয়ে দেবে, আমি যেন তার হাতে টাকাটা দিই। সে এও বলে যে, আমি যদি পুলিশে ঘৰে দিই তা হলে আমারও দশা হবে পাবতী হালদারের মতো।'

'এমেছিল সে লোক ?'—আমরা তিনজনেই যাকে বলে উদ্বীব, উৎকর্ষ।

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন।—'নো। নোবডি কেম।'

আমরা তখনই উঠে পড়তাম, কিন্তু ফেনুদার হঠাৎ পেস্টনজীর পিছনের তাকের উপর রাখা একটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি গেছে।

'ওটা হিং যুগের পোর্সিলেন বলে মনে হচ্ছে ?'

তদ্দেশোকের দৃষ্টি উত্তুসিত।

'বাঁ, তুমি তো এ সব জানোটানো দেখছি। এঙ্গুইভিট জিনিস।'

'একবার যদি...'



‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হাতে নিয়ে না দেখলে কুষাতে পারবে না।’

তত্ত্বালোক উঠে গিয়ে জিনিসটার দিকে হাত বাড়িয়েই ‘আউচ !’
বলে যত্নশার কুঁচকে গেলেন।

‘কী হল ?’ ফেলুনা পতীর উৎকষ্টার সুরে বলল।

‘আর বোলো না ! বুড়ো বয়সের যত বিদ্যুটে ব্যারাম।
আরপ্রাইটিস। হাতটা কাঁধের উপর তুলতেই পারি না।’

শেষকালে ফেলুনা নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাক থেকে চীমেমাটির
পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বার দু’-এক
‘সুপার্ব’ বলে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

‘তত্ত্বালোকের সত্ত্বাই হাত ওঠে কি না সেটা যাচাই করা দরকার
ছিল’, রাস্তায় এসে বশল ফেলুন।

‘খন্তি মশাই আপনার মন্ত্রিক ! বলুন, এবার কেন্দ্রিকে ?’

‘খলতে সংকোচ হচ্ছে। এবার এক্রেমাঞ্জি-কর্নওয়ালিস ট্রিট।’

‘কেন, সংকোচের কী আছে ?’

‘যা দাম হয়েছে আজক্ষণ্য পেট্রোলের।’

‘আরে মশাই, দাম তো সব কিছুরই বেশি। আমার যে বই ছিল
পাঁচ টাকা, সেটা এখন এইট কুপিজ। অথচ সেল একেবারে
স্টেডি। আপনি ওসব সংকোচ-টংকোচের কথা বলবেন না।’

কর্নওয়ালিস ট্রিটের নতুন থিয়েটার নবরংশমতে গিয়ে হাজির
হলাম। প্রোপ্রাইটারের নাম অভিলাষ পোদ্দার। ফেলুনা কার্ড
পাঠাতেই তৎক্ষণাত আমাদের ডাক পড়ল। দোতলার আপিস ঘরে
চুক্তিম গিয়ে।

‘আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার, অনামধন্য লোকের পায়ের
ধূলো পড়ল এই গরিবের ঘরে !’

নাদুস-বুদুস বার্নিশ করা চেহারাটার সঙ্গে এই বাড়িয়ে কথা বলাটা
বেশ মানানসই। হাতে সোনার ঘড়ি, তোট দুটো টুকুটুকে
লাল—এই সবে এক খিলি পান পুরেছেন মুখে, গা থেকে ভুরভুরে
আতরের গন্ধ।

ফেলুনা লালমোহনবাবুকে আলাপ করিয়ে দিল ‘গ্রেট প্রিলার
রাইটার’ বলে।

‘বটে ?’ বললেন পোদ্দারমশাই ।

‘একটা হিন্দি ফিল্ম হয়ে গেছে আমার গুরু থেকে, বললেন জটায়ু । ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে । নাটকও হয়েছে একটা গুরু থেকে । গড়পারের রিক্রিয়েশন ত্রাব করেছিল সেভেনটি এইটে ।’

কেন্দুনা বললে, ‘আপনার জায়ান্ট অমনিবাস একটা পাঠিয়ে দেবেন না মিস্টার পোদ্দারকে ।’

‘স্টেইনলি, স্টেইনলি’, বললেন মিঃ পোদ্দার । ‘আমি নিজে অবিশ্য বইটাই পড়ি না, তবে আমার মাইনে করা লোক আছে । তারা পড়ে ওপিনিয়ন দেয় আমাকে । তা বলুন মিঃ মিত্রি, আপনার কী কাজে সাগতে পারি ।’

‘আপনাদের একটি হিরো সহস্রে ইনক্রিয়েশন চাই ।’

‘হিরো ? মানস ব্যানার্জি ?’

‘অচিন্ত্য হালদার ।’

‘অচিন্ত্য হালদার ? কষ্টে ক্ষেত্রকর্ম নাথে তো—ও হো, হাঁ হ্যাঁ, ওই নামে একটি ছেলে থোরাঘুরি করছে বটে । একটা বইয়ে একটা পার্টি করেছিল । চেহুরা যোটাযুটি ভাল, তবে ভয়েসে গণগোপ । ধরং সিনেমা লাইনে কিছু হতে পারে । আমি সেই কথাই বলেছি তাকে । ইন ফ্যান্টি, ছেলেটি আমাকে টাকা অফার করেছে ।’

‘মানে ? হিরোর পার্ট পাবার জন্য ?’

‘আপনি আকাশ থেকে পড়লেন যে । এ রকম হয় মিঃ মিত্রি ।’

‘আপনি আমল দেননি ?’

‘নো মিঃ মিত্রি । আমাদের নতুন কোম্পানি, এ সব ব্যাপার স্বীকৃতি । এ প্রস্তাবে রাজি হবার কোনও প্রশ্নই উঠে না । ইয়ে—চা, কফি... ?’

‘নো, থ্যাক্স ।’

আমরা উঠে পড়লাম । দেড়টা বাজে, পেটে বেশ চল্চনে বিদে ।

রয়েল হোটেসে খাবারের অর্ডার দিয়ে কেন্দুনা চস্মা চুরির ব্যাপারে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করে ফেলল । তার চেনা আছে

খবরের কাগজের আপিসে ; সম্ভব হলে কালকে না হয় লেটেস্ট প্রক্ষেত্র কাগজে বেরিয়ে যাবে। গত দশ দিনের মধ্যে নিউ মার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে কেউ যদি একটা চন্দন বিক্রি করে থাকেন, তা হলে তিনি যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়, ইত্যাদি।

বিরিয়ানি খেতে খেতে একটা নলী হাড় কামড় দিয়ে ভেঙে যারো-টা মুখে পুরে ফেলুন বলল, 'রহস্য যে রুকম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, দেবি গোস্ব করতে পারি কি না', বললেন লালমোহনবাবু, 'এই নতুন রহস্য হচ্ছে—সেই লোক চিঠি নিয়ে আসবে বলে এল না কেন, এই তো ?'

'ঠিক ধরেছেন ! আমার মতে এর মানে একটাই। সে লোক চিঠিটা পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি।'

আমি বললাম, 'তার মানে যে টুর্নি ফরেছে সে নয়, অন্য লোক !'

'তাই তো মনে হচ্ছে তুম !'

'ওরেক্ষাস', বললেন লালমোহনবাবু, 'তার মানে তো একজন ক্রিমিন্যাল বাড়ুল !'

'আচ্ছা ফেলুন'—এ প্রশ্নটা ক' দিন থেকেই আমার মাথায় ঘূরছে—'পেপারওয়েট দিয়ে মাথায় মারালে লোক মরবেই এমন কোনও গ্যারান্টি আছে কি ?'

'গুড কোয়েশন', বলল ফেলুন। 'উভয় হচ্ছে, না নেই। তবে এ ক্ষেত্রে যে মেরেছে তার হয়তো ধারণা ছিল মরবেই।'

'কিংবা অজ্ঞান করে জিনিসটা নিতে চেয়েছিল ; মরে যাবে ভাবেনি !'

'রয়েলের খাওয়া যে ব্রেন টনিকের কাজ করে, সেটা তো জানতাম না। তুই ঠিক বলেছিস তোপ্সে। সেটাও একটা পসিব্ল ব্যাপার। কিন্তু সেওলো জানলেও যে এ ব্যাপারে বুব হেল্প হচ্ছে তা তো নয়। যে লোকটাকে দরকার সে এমন আশ্চর্য ভাবে গাঢ়কা দিয়েছে যে, ঘটনাটা আয় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।'

অবিশ্বিত ভ্যানিশ যে করেনি সে লোক সেটা সঙ্গেবেলা জানতে

পারদাম, আর সেটা ঘটল বেশ নাটকীয় ভাবে ।

সেটা বশার আগে জানালো দরকার বে সাড়ে চারটের সময় হাজরা যেগুন করে জানালেন বারাসতে সাধন দক্ষিদারের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি ।

লালমোহনবাবু হোটেল থেকে আর বাড়ি কেরেননি । আমাদের পৌঁছে দিয়ে আমাদের এখানেই রায়ে গিয়েছিলেন । সাড়ে সাতটার সময় শ্রীনাথ আমাদের কফি এনে দিয়েছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল । শীতকালের সঙ্গে, পাড়টা এর মধ্যেই নিমুম, তাই বেলের শব্দে বেশ চমকে উঠেছিলাম ।

দরজা খুলে আরও এক চমক ।

এসেছেন হ্রীকেশবাবু ।

‘কিছু মনে করবেন না—অসময়ে খুলু না দিয়ে এসে পড়লাম—আমাদের টেলিফোনটা খাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না যিঃ হাঙ্গদারের মৃত্যুর পর থেকেই

শ্রীনাথকে বলতে ছিল না, সে নতুন লোকের গলা পেয়েই আরেক কাপ কফি দিয়ে গেল ।

ফেলুন বলল, ‘আপনাকে বেশ উন্নেজিত মনে হচ্ছে । বসে ঠাণ্ডা হয়ে কী ঘটনা বলুন ।’

হ্রীকেশবাবু কফিতে একটা চুমুক দিয়ে দম নিয়ে বললেন, ‘আপনি আমার একতলার ঘরটা দেখেননি, তবে আমি বলতে পারি ও ঘরটায় থাকতে বেশ সাহসের দরকার হয় । অত বড় বাড়ির একতলায় আমি একমাত্র বাসিন্দা । চাকরদের আলাদা কোয়ার্টারিস আছে । এ ক’ বছরে অভেস খানিকটা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি হয় না । সঙ্গে থেকে গাটা কেবল ছমছম করে । যাই হোক, কাল রাত্তিরে, তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি খাওয়া সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ঘশায়িটা ফেলেছি সবে, এমন সময় দরজায় টেকা পড়ল । সত্যি বলতে কী, নকু করার লোক ও বাড়িতে কেউ নেই । ষাঠা আমাকে চায় তারা বাইরে থেকে হাঁক দেয়—এমন কী চাকর-বাকরও । কাজেই বুরতে পারছেন, আমার মনে বেশ একটু খট্কা লাগল । খোলার আগে জিজেস করলুম,

কে ? উভয়ের বদলে আবার টোকা পড়ল । একবার ভাবলুম খুলব না । কিন্তু সারারাত যদি শুই ভাবে ঘট্টব্যট চলে তা হলে তো আবজ গঙ্গোল । তাই কোনওরকমে সাহস সংবয় করে যা থাকে কপালে করে দরজাটা খুললুম ; যোলামাত্র একটি লোক চুকে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল । তখনও মুখ দেখিনি ; তারপর আমার দিকে ফিরতে চাপ-দাঢ়ি দেখে আসাজ করলুম কে । ভবলেক আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে সোজা গড়গড় করে তাঁর কথা বলে গেলেন এবং ঘতক্ষণ বললেন ততক্ষণ তাঁর ডান হাতে একটি ছোরা সোজা আমার দিয়ে পরেন্ট করা ।'

বর্ণনা শুনে আমারই ভয় করছিল । লালমোহনবাবুর দেবলাম মুখ হী হয়ে গেছে ।

‘কী বললেন সাধন দক্ষিদার ?’ প্রশ্ন করল পঞ্জুদা ।

‘সাংঘাতিক কথা’, বললেন হালদারেশ্বরবাবু । ‘মিঃ হালদারের কালেকশনে কী জিনিস ভাস্তুজো যেমন মেটামুটি আমি জানি, তেমনি ইনিও জানেন । বললেন বাহাদুর শা-র যে পাইৱ বসানো সোনার জর্দিৰ কৌটোটা মিঃ হালদারের সংগ্রহে রয়েছে, সেটাৱ একজন ভাঙ খদেৱ পাওয়া গেছে, সেটা তাৱ চাই । আমি যেন আজ রাত্তিৱে এগৱেটাৱ সময় ষণ্মুহুৰ্বলীৰ দিঘিৰ ধাৰে ভাঙ নীলকুঠিৰ পাশে শ্যাওড়া গাছটাৱ নীচে ওয়েট কৰি—ও এসে নিয়ে যাবে ।’

‘এই যে কাজটা কৰতে বলেছে তাৱ জন্য আপনাৱ পারিশ্রমিক কী ?’

‘কুচ পোড়া । এ তো হমকিৰ ব্যাপার । বললে যদি পুলিশে খবৰ দিই, তা হলে নিয়তি মৃত্যু ।’

‘রাত্তিৱে দারোয়ান গেটে থাকে না ?’

‘থাকে বইকী, কিন্তু আমাৱ ধাৰণা হয়েছে পোকটা পাঁচিল টপকে আসে ।’

‘আপনাৱ ঘৱ চিনল কী কৱে ?’

‘সাধু দক্ষিদারও তো শুই ঘৱেই থাকত—চিনবে না কেন ?’

‘ভবলোকেৱ ডাক নাম সাধু ছিল বুঝি ?’

‘মিঃ হালদারকে তো সেই নামই বলতে শুনেছি !’

‘আপনি তাকে কী বললেন ?’ জিঞ্জেস করল ফেলুদা।

‘আমি বললুম, এখন মিঃ হালদারের জিনিসপত্রে কড়া পাহাড়া, সে কৌটো আমি নেব কী করে ? সে বললে, চেষ্টা করলেই পারবে। তুমি মিঃ হালদারের সেক্রেটারি ছিলে ; জরুরি কাগজপত্র দেখার জন্য তোমার সে ঘরে তোকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ; ব্যস—এই বলেই সে চলে গেল। আমি জানি, আপনি ছি ছি করবেন, বলবেন পুলিশে থবর দেওয়া উচিত ছিল, অস্তত বাড়ির লোককে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু প্রাপ্তের ভয়ের ঘৰ্তা ভয় আর কী আছে বলুন ! আপনার কথাটাই মনে হল। আপনিও ষে তদন্ত করছেন সেটা আমার মনে হয় সাধু জানে না।’

‘আপনি তা হলে কৌটো বাব করেননি ?’

‘পাগল !’

‘আপনি কি প্রস্তাব করছুন খ্যে, আমরা সেখানে যাই ?’

‘আপনারা যদি একটু আগে গিয়ে পা ঢাকা দিয়ে থাকেন—আমি গোলাম এগারোটার—তারপর সে এলে বা করার দরকার সে তো আপনিই ভাল বুবেন। এইভাবে হাতেন্তে লোকটাকে ধরার সুযোগ তো আর পাবেন না।’

‘পুলিশকে থবর দেব না বলছেন ?’

‘আমন সর্বনাশের কথা উচ্চারণ করবেন না, দোহাই। আপনি আসুন, সঙ্গে এঁদেরও নিতে পাবেন। তবে সশস্ত্র অবস্থায় যাবেন, কারণ লোকটা ডেঙ্গারাস।’

‘সেগো পড়ুন, বিনা ক্ষিপ্তি বললেন লালমোহনবাবু। ‘য়াজহানের ডাকাত যখন আমাদের পেছু হটাতে পারেনি, তখন এর জন্য কী ভয় ? এ তো নিষ্পী মশাই।’

‘আমি অবিশ্য জায়গাটা দেখিয়ে দেব, কলপেন হৃষীকেশবাবু ; ‘মেন রোড হেডে আনিকটা ভেতর দিকে যেতে হয়। স্টেশন থেকে মাইল চারেক।’

ফেলুদা রাজি হয়ে গেল। হৃষীকেশবাবু কফি শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, ‘মশটা নাগাদ তা হলে আপনারা মিট করছেন

আমাকে ।'

'কোথায় ?'

'আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে দু' ফার্সং গেলেই একটা তেমাথার মোড়
পাবেন। সেখানে দেখবেন একটা মিটির দোকান। সেই
দোকানের সামনে থাকব আমি।'

॥ ৫ ॥

রাতে বিশেষ ট্রাফিক নেই, তাও এক ঘন্টা হাতে নিয়ে আমরা
বেরিয়ে পড়লাম। খাওয়াটি বাড়িতেই সেরে লিসাম। এত
তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যন্তর নেই আমাদের; লালমোহনবাবু বললেন,
'থিদে পেজে ওই মিটির দোকানে চুক্তি পড়া যাবে। কচুরি আর
আলুর তরকারি নিষ্ঠাতি পাওয়া যাবে।'

একটা সুবিধে এই যে লালমোহনবাবুর ভাইভাইর হরিপুরবাবু
ফেলুদার ভীষণ ডক্ট। তার উপর যোদ্ধাই ম্যার্ক ফাইটিং-এর ছবি
দেখার সুযোগ ছাড়েন না কখনও। এ রকম না হলে রাতবিত্রেতে
বারাসতে ঠাণ্ডাতে অনেক ভাইভাইই গজগজ করত; ইনি যেন
নতুন লাইক পেলেন।

ডি আই পি রোডে পড়ে লালমোহনবাবু গাম
ধরেছিলেন—'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে', কিন্তু ফেলুদা তাঁর
দিকে চাইতে অমাবস্যার গান্টা বেমোনান হচ্ছে বুঝতে পেরে থেকে
গেলেন।

আকাশে এক টুকরো মেঝ নেই। তারার আসো বলে একটা
জিনিস আছে, সেটা হয়তো আমাদের কিছুটা হেল্প করতে পাও।
ফেলুদার ফরমাশ অনুযায়ী গাঢ় ঝঙ্কের আমা পরেছি।
লালমোহনবাবুর পুলোভারটা ছিল হলদে, তাই তার উপর ফেলুদার
য়েনকোটটা চাপিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক এখন গাড়িতে বসা;
যখন হাঁটবেন তখন একটা পকেট ভীষণ ঝুলে থাকবে, কারণ তাতে
ভরা আছে একটা হ্যান্দিস্তার লোহার ডাঙ। ওয়েপন হিসেবে

ব্যবহার করার জন্য ভদ্রলোক ওটা চেয়ে নিয়েছেন শ্রীনাথের কাছে। ফেন্ডুদার পকেটে অবশ্য রয়েছে তার কোল্ট রিভলভার।

আমাদের আনন্দজ ভুল হয়নি ; দশটার কিছু আগে আমরা তেমন্থায় পৌছে গেলাম। মিটির দোকানের পাশেই একটা গানের দোকান—তার সামনে থেকে হৃষীকেশবাবু এগিয়ে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে হরিপুরবাবুকে বললেন, 'ডাইনের রাস্তা নিন।'

বানিক দূর যেতেই বাড়ি করে এল। আলোও বেশি নেই ; বাস্তায় যা আলো ছিল তাও ফুরিয়ে গেল বাঁয়ে ঘোড় নিয়ে। বুবলাম এটা প্রায় পল্লীগ্রাম অঞ্চল। 'বারাসতেই ছিল প্রথম মীলকুঠি।' বললেন হৃষীকেশবাবু। 'এ দিকটাতে এককালে অনেক সাহেব থাকত ; দিনের আলোয় তাদের সব ভাঙা বাগানবাড়ি দেখতে পেতেন।'

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা জুড়েজায় এসে গাড়ি দাঁড়ি করাতে বললেন হৃষীকেশবাবু।

‘আসুন।’

গাড়ি থেকে নামলাম চার জনে। 'গাড়িটা এখানেই ওয়েট করুক', বললেন হৃষীকেশবাবু, 'আমি আপনাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি, তারপরে এই গাড়িটি আমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আবার ফিরে আসবে। আমি সাইকেল রিকশা করে ঠিক এগারোটার সময় চলে আসব।'

কালমোহনবাবু হরিপুরবাবুকে টাকা দিয়ে বললেন, 'তুমি একে পৌছে দিয়ে যেরার সময় কোনও দোকান-টোকান থেকে খাওয়াটা সেরে নিও। ফিরতে রাত হবে আমাদের।'

ঘাসের উপর দিয়ে মিনিট পাঁচেক হাটতে একটা জংলা জায়গা এসে পড়ল।

‘এখানেই ছিল মধুমুরগীর দিঘি’, বললেন হৃষীকেশবাবু। 'আমাদের যেতে হবে ওখানটায়।'

শুবই কম আলো, কিন্তু তাও বুঝাতে পারছি যে গাছপালা ছাড়াও এ দিকে একটা দালানের ভঁজতুপ রয়েছে। শীতকাল বলে রক্তে, না হলে এ জায়গাটা হত সাপ ব্যাঙের ডিপো !

‘এখন টর্চের আলোটা বোধ হয় তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়, বলল ফেলুন।

‘মনে তো হয় না’, বললেন হৃষীকেশবাবু।

ছেট্টি পকেট টর্চের আলোতে ঘোপঘোড় খানাখন্দ বাঁচিয়ে আমরা পৌছে গেলাম নীলকুঠির ভগ্নস্তুপের পাশে।

‘ওই যে দেখুন শ্যামড়া গাছ’, বললেন হৃষীকেশবাবু। ফেলুন সে দিকে একবার টর্চ ফেলে সেটা নিবিয়ে পকেটে পুরল।

‘আমি তাঁ হলে আসি।’

‘আসুন।’

‘তিন কোষ্টাটির আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।’

আমরা যে দিক দিয়ে এসেছিলাম সে দিক দিয়েই চলে গেলেন হৃষীকেশবাবু। এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পাত্রে আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

‘ওড়োমস্টা লাগিয়ে নিনঃ’

ফেলুন পকেট থেক্স্টিউব বার করে লালয়েহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

‘যা বলেছেন মশাই। শ্যালেরিয়া শুমছি আবার যুব বেড়েছে।’

আমরা তিন জনেই ওড়োমস লাগিয়ে নিয়ে একটা বড় রকম দম নিয়ে অপেক্ষার জন্য তৈরি হলাম। আমাদের কাউকেই দাঁড়াতে হবে না, কারণ ভগ্নস্তুপে নানান হাইটের ইটের পাঁজা রয়েছে, তাতে চেয়ার টোকি মোড়া সব কিছুরই ক্যাজ হয়। কথা বলতে হলে ফিস্ফিস ছাড়া গতি নেই, তাও প্রথম দিকটাব। পরের দিকে কমপ্লিক ঘোনী। অঙ্ককারে চোখ সবে গেছে, এখন চারিদিকে চাইলে বট, অশ্বথ, আমগাছ, বাঁশঘোড়—এসব বেশ ভঙ্গাত করা যায়। বিভিন্ন শব্দ ছাড়াও যে অন্য শব্দ আছে সেটা বেশ বুবাতে পাইছি। টেনের আওয়াজ, সাইকেল রিকশার চড়া হর্ণ, বাঞ্জার বুকুলের ঘেঁট ঘেঁট, এমন কী দূরের বেগলও বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারের গান পর্যন্ত; ফেলুন্দার ঘড়িতে রেডিয়াম জায়াল, তাই অঙ্ককারেও টাইম দেখতে পারে।

শীত যেন মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। শহরের চেয়ে নিষ্পত্তি

পাঁচ-স্নাত ডিপ্লি কর । সালমোহনবাবু তার টুপি আনেমনি, কুমাল সাদা, তাই সেটা বাঁধলেও চলে না ; নিরূপায় হয়ে দু' হাতের তেলো দিয়ে টাক ঢেকেছেন । একবার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করাতে ফেলুন বলল, 'কিছু বললেন ?' তাতে ভদ্রলোক ফিস্ফিস্ করে জন্মাব দিলেন, 'শ্যাওড়া গাছেই বোধহয় পেত্রি না শীকচুনি কী যেন থাকে ।'

'শ্যাওড়া গাছের নামই গুনেছি', ফিস্ফিসিয়ে বলল ফেলুন, 'চোখে এই প্রথম দেখলাম ।'

আকাশে তারাগুলো সরছে । একটু আগে একটা তারাকে দেখেছিলাম নারকোল গাছের মাধ্যার উপরে, এখন দেখছি গাছটায় ঢাকা পড়ে গেছে । কোনও চেলা কনস্টেলেশন আছে কি না দেখার জন্য মাথাটা উপর দিকে তুলেছি, এমন সম্মত একটা শব্দ কানে এল । পায়ের শব্দ ।

এগারোটা বাজেনি এন্ডেক্ট । ফেলুন দু' মিনিট আগে ঘড়ি দেখে ফিস্ফিস্ করে বলেছে, 'গৌণে ।'

আমরা পাথরের মতো হির ।

যে দিক দিয়ে এসেছি, সে দিক দিয়েই আসছে শব্দটা । ঘাসের উপর মাঝে মাঝে ইট-পাটিকেল রয়েছে, তার জন্যই শব্দ । তাও কান না পাতলে, আর অন্য শব্দ না কমলে শোনা যায় না । এখন বিবির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই ।

এবার লোকটাকে দেখা গেল । সে এগিয়ে এসেছে শ্যাওড়া গাছটাকে জরুর করে ।

এবারে তার হাঁটার গতি কমাল । আমরা খাটিতে ঘাপটি মেরে যসা, সামনে একটা ভাঙ্গা পাঁচিল আমাদের শরীরের নীচের অংশটা ঢেকে রেখেছে । আমরা তার উপর দিয়ে দেখছি ।

'হৃষীকেশবাবু—'

শোকটা চাপা গলায় ভাক দিয়েছে । হাঁটা থামিয়ে । তার দৃষ্টি যে শ্যাওড়া গাছটার দিকে সেটা মাঘাটা দেখে আসাজ করতে পারছি, যদিও মানুষ চেনার কোনও প্রশ্ন ওঠে না ।

'হৃষীকেশবাবু—'

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি । তার শরীর টান সেটা বেশ বুঝতে পারছি ।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল ।

লালমোহনবাবুর ডান কনুইটা উচিয়ে উঠেছে । উনি পকেট হাতড়াঙ্গেন হামানদিঙ্গির ডাঙটির জন্য ।

লোকটা এখন দশ হাতের মধ্যে ।

‘হৰীকেশ—’

ফেলুদা বাবের মতো লাফিয়ে উঠতেই একটা রঞ্জ জল করা ব্যাপার ঘটে গেল ।

আমাদের পিছন থেকে দুটো লোক এসে তার উপর হমড়ি খেয়ে পড়েছে ।

ফেলুদার সঙ্গে থেকেই বোধ হয় আম্বুর্জ নার্ভও শুরু হয়ে গেছে । চট করে বিপদে মাথা ঝেঁকে নেয়া । আমি তৎক্ষণাত্মে লাফিয়ে উঠে বাঁপিয়ে পড়লাম সামনের দিকে । ফেলুদার ঘুঁষি খেয়ে একটা লোক আম্বুর্জ দিকে ছিটকে এসেছিল । আমি তাকে লক্ষ্য করে আরেকটা ঘুঁষি চালাতে সে হমড়ি খেয়ে পড়ল ঘাসের উপর ।

কিন্তু এ কী, আরও লোক এসে পড়েছে পিছন থেকে । তার মধ্যে একটা আমায় জাপাতে থরেছে, আরও দুটো গিয়ে আক্রমণ করেছে ফেলুদাকে । ধন্তাধ্নির শব্দ পাইছি । কিন্তু আমি নিজে বলি, যদিও তারই মধ্যে জুতো পরা ডান পা-টা দিয়ে ক্রমাগত পিছন দিকে লাথি চালাচ্ছি ।

লালমোহনবাবু কী করছেন এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই থুতনিতে একটা বিরাশি শিক্কা যা খেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অঙ্ককার যেন আরও দশ শুণ গাঢ় হয়ে গেল ।

তারপর আর কিছু জানি না ।

‘কীরে, ঠিক হ্যায় ?’

ফেলুদার চেহারাটাই প্রথম দেখতে পেলাম জ্ঞান হয়ে ।

‘ঘাবড়াননি, আমিও নক-আউট হয়ে গেসলাম দশ মিনিটের



অন্য । *

এবাবে দেখলাম ঘরের অন্য লোকদের। অমিতাভবাবু তাঁর পাশে একজন মহিলা—নিশচয়ই তাঁর স্ত্রী—লালমোহনবাবু, হ্রষীকেশবাবু, আর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্যবাবু। এ ঘরটা আমে দেখিনি ; বাড়ির বাতিশটা ঘরের কোনও একটা হবে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। একটা কল্কনে বাথা ঘুতনির কশছটায়। তা ছাড়া আর কোনও কষ্ট নেই। ফেলুদা ঘুঁঘিটা খেয়েছিল তান জোখের মীচে সেটা কালসিটে দেখেই বোধ যাচ্ছে। ঝ্যাক-আই বাপাইরটা অনেক বিদেশি ছবিতে দেখেছি : স্বচক্ষে এই প্রথম দেখলাম।

‘একমাত্র জটায়ই অঙ্গত’, বলল ফেলুদা।

সে কী। আশ্চর্য ব্যাপার তো !—‘কী করেছুল ?’

‘মোক্ষম ওয়েপন ওই হামানদিত্ত’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘হাতে নিয়ে মাথার উপর তুলে হেলিকপ্টারের মত বাঁই বাঁই করে চুরিয়ে গেলাম। আমার আশে কাছেও এসোৱানি একটি গুণাত।

‘ওরা গুণা ছিল বুঝি ?’

‘হায়ার্ড গুণাজ’, বললেন লালমোহনবাবু।

‘বললায় লোকটা ডেঙ্গুরাস’, বললেন হ্রষীকেশবাবু। ‘তবে ও যে এতটা করবে তা ভাবিনি। আমি তো গিয়ে অবাক। একজন শোয়া একজন বসা একজন হমড়ি বেয়ে পড়ে মাটিতে। আর আসল যে লোক সে হাওয়া।’

ফেলুদা আর লালমোহনবাবু নাকি আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে তোলেন। অমিতাভবাবু নিজে বেশ রাত অবধি পড়েন, তাই উনি জেগে ছিলেন। যে ঘরটায় আমরা রয়েছি, সেটা একত্তমার একটা গেস্টরুম। কেশ বড় ঘর, পাশেই বাথরুম। পুরে জানালা দিয়ে নাকি বাগান দেখা যায়। অমিতাভবাবুই জোর করলেন আজ রাতটা এখানে থাকব জন্য। অসুবিধা এই যে বাড়তি কাপড় নেই, যা পরে আছি তাই পরেই গুতে হবে। ‘হ্রষীকেশবাবুর ভয়ের জন্যই এই গোলমালটা হল’, বললেন অমিতাভবাবু, ‘পুলিশকে বলা থাকলে সাধু সমেত গুণারা এতক্ষণে হাজারে !’

হ্রষীকেশবাবুও অবিশ্ব অ্যাপপজাইজ করলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধারকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে ? ও রকম শাসনির পর যে কোনও মানুষেরই ভয় হতে পারে ।

অবিশ্বাবধারুর স্তুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বললেন, 'বাড়িতে এই দুর্যোগ, আপনাদের সঙ্গে বসে দু' দণ্ড কথা বঙ্গারও সুযোগ হল না । এনার এত বই আমি পড়েছি—কী বে আনন্দ পাই তা বলতে পারি না ।'

শেষের কথাটা অবিশ্ব লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলা ।

ফেলুদা বলল, 'কাল সকালে যাবার আগে আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলে নেব । ঘরে চোর ঢোকার পরেও ও যা সাহস দেখিয়েছে তেমন সচরাচর দেখা যায় না ।'

সাড়ে বারোটা মাগাদ যখন আমরা গোল্ডার আয়োজন করছি তখন ফেলুদা একটা কথা বললু ।

'ঘুষিটাও যে ব্রেন ট্রিনিংজ কাজ করে সেটা আজ প্রথম জানলাম ।'

'কী রকম ?' বললেন লালমোহনবাবু ।

'সাধুবাবু ভ্যানিশ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এতদিনে ।'

'বলেন কী ।'

'তুখোড় লোক । তবে যার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, সেও তো কম তুখোড় নয় ।'

এর বেশি আর কিছু বলল না ফেলুদা ।

॥ ৬ ॥

অনিয়ন্ত্র সকালে ঝুলে যায়, তাই চা যাবার আগেই কেলুদা ওর সঙ্গে দেখা করে নিল ।

চোর ঢোকার কথাটা আজ শুনে ঘনে হল ছেলেটি বেশি রকম কঢ়ান্ত্রিবণ । পরপর দু'বার ! একটু বাড়াবাড়ি বলে ঘনে হল । ফেলুদা বলল, 'তুমি যে বন্দুকটা দিয়ে চোরকে ঘারবে ঠিক করেছিলে সেটা তো আমাকে দেখালে না । শুনলাম তোমার

ছেটিকাকাকে দেখিয়েছ ।'

অনিকৃষ্ণ বন্দুকটা বার করে ফেলুন্দার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা থেকে আগন্মের যুদ্ধকি বেরোয় ।'

লাল প্রাসিটের তৈরি মেশিনগান, ট্রিপার টিপসে মেশিনগানের মতো শব্দের সঙ্গে নলের মুখ দিয়ে সত্ত্বাই স্পার্ক বেরোয় ।

ফেলুন্দা বন্দুকটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে সেটার খুব ভারিফ করে ফেরত দিয়ে বলল, 'তোমার যে ঘুমের ব্যাধাত হচ্ছে, দেখা যাক সেটা বন্ধ করা যায় কি না ।'

'তুমি চোর ধরে দেবে ?'

'গোয়েন্দাৰ তো ওই কাজ ।'

'আৱ আমাৰ চলনা যে চুৱি কৱেছে সেই চোৱ ?'

'সেটারও চেষ্টা চলেছে, তবে কাজটা খুব সুজল নয় ।'

'খুব শক ?'

'খুব শক ।'

'দাক্ষণ রহস্য ?'

'দাক্ষণ রহস্য ।'

'আৱ সে দিন যে বললৈ, বাঁচাৰ দৱজায় রক্ত লেগে আছে ?'

'ওটাই তো ভৱসা । ওটাই তো ঝু ।'

'ঝু ঘানে ?'

'ঝু হল যার সাহায্যে গোয়েন্দা দুষ্ট লোককে জন্ম কৱে ।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস কৰলেন, 'আজ্ঞা, তোমার পাখিকে কথা বলতে শুনেছ ?'

'হ্যাঁ, বলল অনিকৃষ্ণ । 'আমি ঘৱে ছিলাম, আৱ শুনল্যাম পাখিটা কথা বলছে ।'

'কী কথা ?'

'বলছে : 'দাদু ভাত খান, দাদু ভাত খান । আমি তক্ষুনি বেরিয়ে এলাম কিন্তু তাৰপৰ আৱ কিছু বলল না ।'

লালমোহনবাবুৰ মুখে হাসি । অনিকৃষ্ণ শুনেছে, 'দাদু ভাত খান' আৱ লালমোহনবাবু শুনেছেন, 'বাবু সাবধান' । মানতেই হয় দুটো খুব কাছাকাছি । পাখি নিশ্চয়ই ওই ধৱনেৱাই কিছু বলছিল ।

‘আপনার এখানে পাখি ধরতে পারে এমন কেউ আছে?’
ফেলুন্দা অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

‘আমাদের মালির ছেলে আছে, শকর’, বললেন অমিতাভবাবু।
‘এর আগে দু’-একবার ধরেছে পাখি। খুব চালাক-চতুর ছেলে।’

‘তাকে বললেন একটু চোখ রাখতে। খুব সন্তু চন্দলটা
আপনাদের বাগানেই রয়েছে।’

বারাসতে থাকতেই দেখেছিলাম যে, খবরের কাগজে চন্দনার
বিষয় বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। সেটার কাজ যে এত তাড়াতাড়ি হবে
তা ভাবতে প্যারিনি।

বারোটা নাগাদ একটি বছর পঁচিশের ছেলে আমাদের বাড়িতে
এসে হাজির। বেশ চোখাচোখা চেহারা, পরনে জিন্স আর ফাথার
চুলের ক্ষপাল-ঢাকা কায়দা দেখলেই বোধ ঘূর ইনি হাল-ফ্যাশনের
তরঙ্গ।

ফেলুন্দা বসতে বসাতে উত্তীর্ণ ফাথা নেড়ে বললেন, ‘বসব
না। আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। ইয়ে, আমি আসছি ওই
প্যারির ব্যাপারে কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন সেইটে দেখে।’

‘ওটা আপনাদের পাখি ছিল?’

‘আমাদের মানে আমার দাদুর। দাদু মারা গেছেন ল্যাস্ট মানুথ।
তাই বাবা ওটাকে বেচে দিলেন। ওটার দেখানো দাদুই করতেন।
বাবা গের্ট-কাচারি করেন, মা বাতে ভোগেন, আর আমার ও সবে
ইন্টারেস্ট নেই।’

‘কল্পন ছিল আপনাদের বাড়ি?’

‘তা বছর দশেক। দাদুর খুব পিয়ারের চন্দনা ছিল।’

‘কথা বলত?’

‘হ্যাঁ। দাদুই শিখিয়েছিলেন। খুব রসিক মানুষ ছিলেন। অঙ্গুত
অঙ্গুত কথা শিখিয়েছিলেন।’

‘অঙ্গুত মানে?’

‘এই যেমন—দাদুর পাশার নেশা ছিল; পাখিটাকে
শিখিয়েছিলেন “কচে বারো” বলতে। তারপর বিজও বেলতেন
দাদু। খেলার সময় অপোনেন্টের তাস ভাল বুঝতে পারলে

পার্টনারকে একটা কথা খুব বলতেন। সেটা পারিটা তুলে নিয়েছিল।'

'কী কথা ?'

'সাধু সাবধান।'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।'

'আর কিছু— ?'

'না, আর কিছু জানার নেই।'

'ইয়ে, বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারিনি এটা আপনার বাড়ি।'

'সেটা না বোঝাই কথা।'

'আপনাকে মিট করে খুব ইয়ে হ্লাম।'

বাড়া পাঁচ ঘণ্টা তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থেকে বিকেলে তা থেতে বেরিয়ে এসে ফেলুন্ত হাজরাকে একটা টেলিফোন করল :

'কাল সকালে কী করছেন ?'

'কেন বন্ধুন তো ?'

'হালদার বাড়িতে অঙ্গুষ্ঠে পারবেন—ন'চি নাগাদ ? মনে হচ্ছে রহস্যের কিনারা হয়েছে। তৈরি হয়ে আসবেন।'

লালমোহনবাবুকে টেলিফোনে বলে দেওয়া হল, আমরা ট্যাক্সি করে চলে যাব তাঁর বাড়ি সাড়ে আটটায়। সেখান থেকে তাঁর গাড়িতে বারাসত।

'হ্লস্ট আরও বৃক্ষি পেল নাকি ?'

'না। সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত।'

সব শেষে অমিতাভবাবুকে ফোন করা হল।

'আপনাদের বাড়িতে কাল সকালে একটা ছেটিখাটো মিটিং করব ভাবছি।'

'মিটিং ?'

'আপনাদের পুরুষ মেঘার যে ক'জন আছেন তাঁরা যেন থাকেন। আর হাজরাকে থাকতে বলেছি।'

'ক'টায় করতে চাইছেন ?'

'ন'টায় হাজিরা। আপনার কাজের ইয়তে একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি।'

অমিতাভবাবু রাজি হয়ে গেলেন। —‘পুরুষ মেঘার মানে কি অনুকেও চাইছেন?’

‘না। সে ন্য থাকাটাই বাস্তুনীয়। এটা শুধু প্রান্তবয়স্কদের জন্য।’

আমরা যখন পৌছলাম, তার আগেই হাজরার দল হাজির। ফেলুদা এ রুকম ধরনের মিটিং এর আগেও করেছে। প্রত্যেক বারই আমার মনের মধ্যে একটা চনমনে ভাব, কারণ জানি না কী হতে চলেছে, কার ভাগ্য হাতকড়া আছে, কীভাবে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করেছে। লালমোহনবাবু আমাকে বললেন, ‘আমি চিঙ্গিটাকে শ্রেফ অন্য পথে ঘুরিয়ে নিয়েছি। এ ব্যাপারে ত্রেন থাটিয়ে কেনও লাভ নেই, কারণ আমার ঘিলুতে অনেক ভেঙাল, তোমার দাদারটা পিওর। নিজের তৈরি রহস্যের সমাধান এক জিনিস, আর আকচুয়েল লাইফে সমাধান আরেক জিনিস।’

নীচের বৈষ্টকথানা ঘরে জুড়াবেক হয়েছি। হৃষীকেশবাবুর দিল্লি যাবার সময় হয়ে এসেছে—বললেন, ‘এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি মশাই। কাজ থাকলে তবু একটা কথা। এখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।’

অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি। তিনি আপনি করেছিলেন এই মিটিং-এ উপস্থিত থাকার ব্যাপারে। তাঁর নাকি একটা বড় পার্ট নিয়ে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কালই নাকি নাটকটার প্রথম শো। ভদ্রলোক ফেলুদাকে বললেন, ‘আপনার এ ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে?’

ফেলুদা বলল, ‘খুব বেশি তো আধ ঘণ্টা।’

ভদ্রলোক তাও গজগজ্ব করতে লাগলেন।

কফি খাবার পর ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। কালশিটে ঢাকার জন্য ও আজ কালো চশমা পরেছে। এটা ওর একেবারে নতুন চেহারা। হাত দুটোকে প্যান্টের পকেটে পুরে সে আরম্ভ করল তার কথা।

‘পার্বতীচরণের খুনের ব্যাপারে আমাদের যেটা সবচেয়ে অবাক করেছিল সেটা হল সাধন দন্তিদারের অস্তর্ধান। দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে খুনটা হয়। সাধন দন্তিদার পার্বতীবাবুর ঘরে ছিলেন

সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত । সাড়ে দশটায় তাঁকে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিডির দিকে যেতে দেখেছি ; দশটা পঁয়ত্তিশে অনিকন্ত্বে সঙ্গে কথা বলে পার্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখি । তৎক্ষণাত সাধন দস্তিমারকে খোঁজা হয়, কিন্তু পাওয়া যায় না । দারোয়ান বলে, তাঁকে গেট থেকে বেরোতে দেখেনি ! যাগামে খোঁজা হয়, সেখানেও পাওয়া যায়নি । কম্পাউন্ডের যে পাঁচিল, সেটা অটি ফুট উচু । সেটা টপকানো সহজ নয়, বিশেষ করে হাতে একটা ব্রিফকেস থাকলে । আমরা—'

এখানে অচিন্ত্যবাবু ফেলুন্দাকে কাথা দিলেন ।

‘সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন, তাকে কি আপনি বাদ দিচ্ছেন ?’

‘আপনার বাবাকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল, সেটা শতাংশ সমর্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব । পেস্টম্যাজীর আয়োজিটিস আছে, তিনি ডান হাত কাঁধের উপর তুলতে পারেন না । অবিশ্য পেস্টম্যাজী ছাড়াও একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন যিনি পেস্টম্যাজী ও সাধনবাবুর ফাঁকে পার্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে থাকতে পারেন ।’

‘তিনি কে ?’

‘আপনি ।’

অচিন্ত্যবাবু সোফ ছেড়ে উঠে পড়েছেন ।

‘আ—আপনার কি ধারণা আমি— ?’

‘আমি শুধু বলেছি আপনার সুযোগ ছিল । আপনি খুন করেছেন সে কথা তো বলিনি ।’

‘তাও ভাল ।’

‘যাই হোক—সাধনবাবুর অস্তধনি বিশ্বাসযোগ্য হয় এক খদি দারোয়ান ভুল বা মিথ্যে বলে থাকে । আর দুই, যদি সাধনবাবু এ বাড়ি থেকে না বেরিয়ে থাকেন ।’

‘কোনও চোরা কুঠুরিতে আঘাতগোপন করার কথা বলছেন ?’
হৃষীকেশবাবু প্রশ্ন করলেন ।

অমিতাভবাবু বললেন, ‘সে রকম লুকোনোর কোনও আয়গা এ বাড়িতে নেই । একতলার অধিকাংশ ঘরই তালাচাবি বন্ধ । এক

বৈঠকখানা খোলা, রামাঘর ভাঁড়ারথর খোলা আৰ হৃষীকেশবাবুৰ ঘৰ
খোলা।'

'এবং সে ঘৰে তাকে আমি আশ্রয় দিইনি সেটা আমি বলতে
পাৰি, বলছেন হৃষীকেশবাবু। 'তখু তাই নয়, সাধনবাবু যখন
আসেন, তখন আমি ছিলাম না।'

'আমৱা পোস্টাপিসে খোঁজ নিয়েছি', বলল ফেলুন। 'আপনি
টেলিগ্ৰাফ পাঠিয়েছেন পোস্টাপিস খোলাৰ সঙ্গে সঙ্গে। তখন
দশটা। পাঁচ মিনিট লেগোছে আপনাৰ টেলিগ্ৰাফ কৰতে।
তাৱপৱেই আপনি—'

'তাৱপৱ আমি যাই ঘড়িৰ ব্যান্ড কিনতে।'

'দুঃখেৰ বিষয় দোকানেৰ লোকেৰ মুকুটপুঁজিৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰেই
কি আপনি গোয়েলাপিয়ি কুকুন্টে ?'

'না, তা কৱি অঁ ! এবং তাদেৱ কথায় আমৱা খুব আমল
দিইনি। আৱ আপনিও যে সত্যি কথা বলছেন সেটা আমৱা আনতে
বাধ্য নই।'

'কেন, আমি মিথ্যে বলব কেন ?'

'কাৰণ সোয়া দশটাৰ সময় আপনাৰও তো পাৰ্টীচৱণেৰ ঘৰে
যাবাৰ প্ৰয়োজন হয়ে থাকতে পাৱে ?'

'এ সব কী বলছেন আপনি ? আপনি নিজেই বলছেন
সাধনবাবুকে বেৰোতে দেখেছেন, আবাৰ বলছেন আমি গিয়েছি ?'

'ধৰন সাধন দক্ষিদাৰ যদি নহি এসে থাকেন। তাৰ জায়গায়
আপনি গেলেন।'

আমাৰ মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘৰে সবাই চুপ, তাৰই মধ্যে
হৃষীকেশবাবু হো হো কৰে হেসে উঠলেন।

'মিঃ হালদাৰ কি উন্ধাদ না জৱাগ্ৰহণ, যে আমি দাঢ়ি গোঁফ
লাগিয়ে তাৰ ঘৰে চুক্কৰ অৱ তিনি আমাকে চিনবেন না ?'

'কী কৰে চিনবেন, হৃষীকেশবাবু ? আপনি যদি গোঁফ দাঢ়ি
লাগিয়ে চোখেৰ চশমটা খুলে পোশাক বদলে তাৰ ঘৰে চোকেন, তা

হলে আপনাকে সাত বছর আগের সাধন দক্ষিদার বলে কেন ঘনে করবেন না পার্বতীবাবু ? আপনি আর সাধন দক্ষিদার যে আসলে একই লোক ! প্রতিশোধ নেবার জন্য চেহারা পাল্টে নাই পাল্টে সেই একই লোক যে আবার সেক্ষেটারি হয়ে গিয়ে এসেছে, সেটা তো আর বোঝেননি পার্বতীচরণ !'

হৃষীকেশবাবুর মুখের ভাব একদম পাল্টে গেছে। তাঁর ঢেটি নড়ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

ফেলুদার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'খুনের পর কি আপনার ভাড়া করা কোটির পাকেটে পেপার ওয়েট পুরে তার ওজন বাড়িয়ে আপনি পুরুরের জলে ফেলে দেননি ? তাঁরপর নিজের ঘরে গিয়ে আবার হৃষীকেশ দণ্ড সেজে বেরিয়ে আসেননি ?'

এই শীতকালেও হৃষীকেশবাবুর শান্টের কলার ভিজে গেছে।

'আরও একটা কথা', কলা চলল ফেলুদা। 'সাধু সাবধান কথাটা কি চেনা চেনা লাগছে ? অনিয়ন্ত্রের জন্য কেনা চল্দনার মুখে কি কথাটা শোনেননি আপনি সম্পত্তি ? আর শুনে আপনার কুসংস্কারাঙ্গন মনে কি বিশ্বাস তোকেনি যে কথাটা আপনাকে উদ্দেশ করেই বলছে ? আপনি সাধু লেজে ঘনিবের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন জেনেই পাখি এই সাবধানবানী উচ্চারণ করছে ? আপনিই কি এই পাখিকে খাঁচা থেকে বাঁচে করে বাগানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেননি ? এবং এই কাজটা করার সময় আপনাকেই কি পাখি জব্য করেনি ?'

হৃষীকেশবাবু এখার লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

'অ্যাবসার্ড ! অ্যাবসার্ড ! কোথায় জব্য করেছে ? কোথায় ?'

'ইনস্পেক্টর হাজরা, আপনার লোককে বলুন তো তাঁর ভান হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিতে !'

প্রচণ্ড বাধা সব্বেও ঘড়ি খুলে এল।

কবজিতে প্রায় এক ইঞ্জি লম্বা একটা আঁচড়ের দাগ, সেটা দিব্যি ঘড়ির ব্যাসের তলায় লুকিয়ে ছিল।

'আমি খুন করতে যাইনি—দোহাই আপনার—বিশ্বাস করুন !'

হৃষীকেশবাবুর অবস্থা শোচনীয় ।

‘সেটা অবিষ্টাস্য নয়’, বলল ফেলুন্দা, ‘কারণ আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের চিঠিটা নেওয়া । পেস্টনজী বড় রকম দুর দিয়েছেন সেটা আপনি জানতেন । মিঃ হালদার বেচবেন না সেটা আপনি পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন । কিন্তু জিনিসটা চুরি করে তো পেস্টনজীর কাছে বিক্রি করা যায় ! তাহি—’

‘আমি না, আমি না !’ মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ জানালেন হৃষীকেশবাবু ।

‘আগে আমার কথা শেষ করতে দিন । ফেলু মিত্রির আধাৰ্য়েচড়াভাবে সমস্তার সমাধান করে না । এ ব্যাপারে আপনি একবা নন, সেটা আমি জানি । চিঠিটা বার করে এনে নিজের ঘরে পিয়ে মেক-আপ বদলে আপনি যান আচুলকজনের কাছে চিঠিটা দিতে । কিন্তু বাড়িতে খুন হয়ে আছে, খুন্দুকজাম্পা হবে, সেটা জেনে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ও সামুদ্রিকস্থানে চিঠিটাকে অন্য জায়গায় ঢালান দেন । তাই নয়, অচিক্ষিতাম ?’

প্রশ্নটা একেবারে বুলেটের মতো । কিন্তু লোকটাৰ আশ্চর্য মার্ড । অচিক্ষিতাম ঠোটের কোনে হাসি নিয়ে দিকি বসে আছেন সোফায় ।

‘বলুন, বলুন, কী বলবেন,’ কলনেন ভদ্রলোক, ‘আপনি তো দেখছি সবই জেনে বসে আছেন ।’

‘আপনি সাড়ে দশটার একটু পরে একবার আপনার ভাইপোর ঘরে যাননি ?’

‘গিয়েছিলাম বইকী । আমার ভাইপোর ঘরে যাওয়ায় তো কোনও বাধা নেই । সে ক’দিন থেকেই বলছে তার অন্তুম খেলনা দেখাবে, তাই গিয়েছিলাম ।’

‘আপনার ভাইপোর ঘরে গতকাল এবং তার আগের সাড়ে একজন চোর চুকেছিল । সে যা খুঁজছিল তা পায়নি । আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, সে চোর আপনিই এবং আপনি খুঁজতে গিয়েছিলেন নেপোলিয়নের চিঠি—যেটা আপনিই তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন ? চিঠিটা পাবেন এই বিশ্বাসে আপনিই পেস্টনজীকে

ফোন করে অফার দিয়েছিলেন, তারপর সেটা না পেয়ে আর পেন্টনজীর ওবানে যেতে পারেননি ?'

'আমিই যখন লুকিয়েছিলাম, তখন সেটা আমি কেন পাব না সেটা বসতে পারেন ?'

'কারণ যাতে লুকিয়েছিলেন, সেটা ছিল যোকার বালিশের তলায়। এই যে !'

ফেলুদা মিঃ হাজরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হবি সেটার থেকে কেবা লাল প্লাস্টিকের মেশিনগান চলে এল ফেলুদার হাতে। তার নলের ভিতরে আঙুল চুকিয়ে টান দিতে বেরিয়ে এল গোপ করে পাকানো নেপোলিয়নের চিঠি।

'হৃষীকেশবাবুর মেক-আপের ব্যাপারে আপনিই মালমশলা সাম্পাই করেছিলেন বোধহয় ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা, 'ভাগ বাটোয়ারা কী রকম হত ? ফিল্ট্র ফিল্ট্র ?'

মালিয়া ছেলে শঙ্কর চন্দনাটা ধরতে পেরেছিল ঠিকই, যদিও পায়ি কেবত পাওয়ার পুরো ক্রেডিটটা তার খুদে মক্কলের কাছে ফেলুদাই গেল।

আমিতাভবাবু ফেলুদাকে অফার করেছিলেন পার্টীচরণের কালেকশন থেকে একটা কোনও জিনিস যেহে নিতে। ফেলুদা রাজি হল না। বলল, 'এই কেসটায় আমার জড়িয়ে পড়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। আসলে আমি এসেছিলাম আপনার ছেলের ডাকে। তার কাছ থেকে তো আর ফি নেওয়া যায় না !'

ঘটনার দু' দিন পরে শনিবার সকালে লালমোহনবাবু এসে বললেন, 'জলের তল পাওয়া যায়, মনের তল পাওয়া দায়। আপনার অতলস্পন্দনী চিকিৎসকের জন্য আপনাকে একটি অন্তরারি টাইটেলে ভূষিত করা গেল। —এ বি সি ডি।'

'এ বি সি ডি ?'

'এশিয়া'জ কেস্ট গ্রাইম ডিটেক্টর !'

অস্ত্র সেন অন্তর্ধান রহস্য

Pradosh C. Mitter

Private Investigator



অন্ধর সেন অন্তর্ধান রহস্য

‘আপনি তো আমার দেখা শুধরে দেন,’ বললেন সালমোহনবাবু, ‘সেটা আর এবার থেকে দরকার হবে না।’

ফেলুদা তার প্রিয় সোফাটায় পা ছড়িয়ে বসে কুবিক্স কিউবের একটা পিরামিড সংস্করণ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল; সে মুখ না তুলেই বলল, ‘বটে?’

‘নো স্যার। আমার পাড়ায় এক ভদ্রলোক এয়েচেন, কাল পার্কে দেখা হল। এক বেঞ্জিতে বসে কথা বললুম প্রায় আধ ঘণ্টা। গ্রেট ক্লার। নাম মৃত্যুঞ্জয় সোম।’

‘ক্লার?’

‘ক্লার। বোধহয় হার্বার্ট ইউনিভার্সিটির ডবল এম. এ., বা ওই ধরনের কিছু।’

‘উফফ।’ ফেলুদা এবার মুখ না তুলে পারল না। ‘হার্বার্ট নয় মশাই, হার্ভার্ড, হার্ভার্ড।’

‘তাই হবে। হার্ভার্ড।’

‘হার্ভার্ড সেটা বুবলেন কী করে? নাকিসুরে মার্কিন মার্কা ইংরিজি বলেন ভদ্রলোক?’

ইংরিজিটা একটু বেশি বলেন। নাকিসুর কিনা সক্ষ করিনি। তবে বিধান লোক। থাকেন বহুমপুর। একটা বই সিখছেন, তাই নিয়ে রিসার্চ করবেন বলে কদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। চেহারাতে বেশ একটা ইয়ে আছে। ফ্রেঞ্চ-কাট দাঢ়ি, চোখে সোনার বাই-ফোকাল, জ্বামাকাপড়ও ধোপদুরস্ত। আমার ‘হস্তুরাসে হাহাকার’টা পড়তে দিয়েছিলুম। চৌক্রিক মিসটেক দেখিয়ে দিলেন। তবে বললেন তেরি অনজ্যেব্ল।’

‘তাহলে আর কী। আপনার পেট্টিল খরচা অনেক কমে যাবে এবার থেকে। আর গড়পার-বাদিগঞ্জ ঠাণ্ডাতে হবে না।’

‘তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কী—’

ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেটা আর আলা গেল না, কেন না ঠিক এই সময় এসে পড়লেন ফেলুদার মক্কেল অস্তর সেন। ন-টায় আপরেন্টমেন্ট ছিল। ঘড়ির কঠিয় কঠিয় আমাদের কসিং কেস বেজে উঠল।

অস্তর সেনের বয়স মনে হয় পঁয়তালিশ থেকে পঁতাশের মধ্যে, ফরমা রং, দাঢ়িগোঁফ কার্যালো, জোখে পুরু ক্ষেমের চশমা, পায়ে পাঞ্জাবি আর ধূতির উপর একটা পুরানো জামেওয়ার শাল। কাশ্মীরী শাল যে কতরকম হয় সেটা সেদিন ফেলুদার সঙ্গে মিউজিয়ামে পিয়ে দেখে এসেছি।

অস্তর সেন ফেলুদার মুখোমুখি চেয়ারে বসে বললেন, ‘আপনিও ব্যস্ত মানুষ, আমিও ব্যস্ত। কাজেই সময় নষ্ট না করে সোজা কাজের কথায় চলে যাওয়াই ভাল। আগে এই জিনিসটা দেখুন।’

পাঞ্জাবির পক্ষে থেকে একটা কাগজ বের করে ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। খাতা থেকে হেঁড়া একটা পাতা, সেটাকে দলা করে পাকানো হয়েছিল, তারপর আবার হাত বুলিয়ে মসৃণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাগজটাতে গোটা অঙ্করে লাল কালি দিয়ে লেখা—‘আমার সর্বনাশের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হও। আর সাতদিন মেয়াদ। পালিয়ে পথ পাবে না।’

কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখে ফেলুদা প্রশ্ন করল, ‘কীভাবে পেলেন এটা?’

‘আমার বাড়িতে একতলায় আমার কাজের ঘর’, বললেন ভদ্রলোক, ‘রাতিরে এসে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ভেক্ষের উপর ফেলে দিয়ে গেছে। সকালে আমার চাকর লক্ষণ এটা পেয়ে আমার কাছে নিয়ে আসে।’

‘আপনার ঘর কি রাস্তার উপর?’

‘না। ঘরের বাইরে বাগান, তারপর কম্পাউন্ড ওয়াল, তারপর রাতা। তবে দেয়াল টপকানো যায়।’

‘সর্বনাশের কথা যে বলছে সেটা কী?’

অস্বর সেন মাথা নাড়লেন।

‘দেখুন মিস্টার মিত্র, আমি নির্বাঙ্গট মানুষ। আমার পেশা হল ব্যবসা, তবে আসল কাজ আমার ভাইই করে। আমার পাঁচ রুক্ম অন্য শখ আছে, সেই সব নিয়ে থাকি। সজ্জানে কারুর কখনও কেনও সর্বনাশ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। অন্তত এমন সর্বনাশ নিশ্চয়ই নয় যেটা এই হমকি-চিঠিকে জাস্টিফাই করতে পারে। ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।’

ফেলুদা ভুক্ত কুচকে একটুক্ষণ ভেবে বলল, ‘অবিশ্য এটা এক ধরনের বসিকতাও হতে পারে—যাকে বলে প্র্যাকটিকাল জোক। আপনার পাড়ায় কাছাকাছির মধ্যে মন্তান ছেলেদের আস্তানা আছে?’

‘আমরা থাকি পার এভিনিউতে,’ বললেন অস্বর সেন। ‘পুর দিকে কিছু দূরে একটা বাসি আছে, সেখানে এই ধরনের ছেলে থাকা কিছুই আচর্য নয়।’

‘পুজোর চাঁদার জন্য হামলা করে না?’

‘তা করে, কিন্তু চাঁদা তো আমরা নিয়মিত দিই।’

শ্রীনাথ চা এনেছে, তাই কাজের কথা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। লালমোহনবাবু দুবার বিড়বিড় করে ‘রিডেঞ্জ’ কথাটা বললেন। ফেলুদা সেই সুযোগে আবাদের দুজনের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিল।

‘আপনিই বিশ্যাত লালমোহন গান্ধুলী?’

‘ই ই।’

ভদ্রলোক বেশ তৃপ্তি সহকারে চায়ে চুম্বক দিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, ‘আসলে আপনার বিষয় আমি আপনার কাহিনীগুলো থেকেই জেনেছি। তাই মনে হল আপনার কাছেই আসি।’

‘পুলিশে থেকর দেলনি?’ জিগ্যেস করল ফেলুদা।

‘আমার ভাই অবিশ্য পুলিশের কথাই বলেছিল, কিন্তু আমি আবার এ সব ব্যাপারে একটু আন-অর্থড়া। প্রচলিত নিয়মগুলো চট্ট করে মানতে মন চায় না। আমি সত্তি বলতে কী, এখনও বোধহয় অতটা বিচলিত হ্বার কারণ ঘটেনি। আপনায় কাছে এসাম, তার একটা কারণ আপনাকে দেখাইও একটা ইচ্ছেও ছিল। আবাদের পরিবারের

মোটামুটি সকলেই আপনাকে চেনে।*

‘পরিবারে আর কে কে আছেন?’

‘আমার ভাই অস্বৃজ্জ আছে। সে বিয়ে করেছে, আমি করিনি। অস্বৃজ্জের স্ত্রী আছে, একটি মেয়ে আছে বক্তর দশখনের—চেলে দুটি বড়, তারা বাইরের থাকে। তা ছাড়া আমার বিধবা মা আছেন, আর আছে আমাদেরই এক দুর সম্পর্কের আঁচ্ছীয়। সে আমাদেরই বাড়িতে মানুষ। ফ্যামিলি মেমবার বলতে এই; তার বাইরে তিনজন চাকর, একটি ঠিকে খি, রাজাৰ পোক, মালি, দারোয়ান আৰু ড্রাইভাৰ। আমৰা থাকি ফাইভ বাই ওয়ান পাম এভিনিউতে। বাবা ছিলেন নামকৱা হার্ট স্পেশালিস্ট অনাথ সেন।’

ফেলুদা একটি কিঞ্চি-কিঞ্চি ভাব করছে দেখে ভদ্রলোক বলেন, ‘আপনাকে আমি শুধু ব্যাপারটা জানিয়ে গেলাম। হতে পারে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক ছাড়া আৰু কিছুই না; তবে কী জানেন, এ ধরনের বৰ্সিকতাৰ টাৱশেটি বিব্যাত ব্যক্তিদেৱ মাৰে মাৰে হতে হয় কিছই, কিঞ্চি আমি তো আৰু তেমন কেউ-কেটা নই, তাই...’

ফেলুদা বলল, ‘কুবাতেই পারছেন, এ ভূমকি যদি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হয় তাত্ত্বে আমার পক্ষে কিছু কৰা সম্ভব নয়। যাই হোক—আপাতত এই চিঠিটা আমি রাখতে পারি তো?’

‘নিশ্চয়ই। ওটা তো আপনাকে দেবাৰ জন্যেই আনা।’

এমন একটা হৃষকি-চিঠি লিয়ে অস্বৰ সোনৰ ফেলুদার কাছে আসটা একটু বাজাবাড়ি বলেই মনে হচ্ছিল, পরদিন সকালে পাম এভিনিউ থেকে যে ফোনটা এল, তাতে সমস্ত ব্যাপারটা একটা অনা চেহারা নিল।

বসবার ঘৰ থেকে ফেলুদার ঘৰে কলটা টানসফার কৰে দিয়ে কাল সাগিয়ে থা শুনসাম তা হল এই—

‘কে, মিস্টার মিস্টার?’

‘আজ্জে হ্যাঁ।’

‘আমাৰ নাম অস্বৃজ্জ সেন। কাল আমাৰে দাদা, বাধুয় আপনাৰ ওখানে গোস্বামী একটা হৃষকি-চিঠিৰ ব্যাপারে?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’

‘ওফেল, হি ইজ মিসিং।’

‘আনে ?’

‘দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘পাওয়া যাচ্ছে না ?’

‘না। দাদা ব্রোজ ভোরে গাড়িতে করে বেরোল; গঙ্গার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তারপর মাইল দূরেক হাঁটেন। আজও সেস্লেন, কিন্তু আজ আর কেরেননি।’

‘সে কী।’

‘জাহিতার গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে এক ঘটা ওয়েট করার পর। ও তখন করে খুঁজেও দাদার দেখা পায়নি।’

‘পুলিশে আনাবনি ?’

‘সেখানে একটা গোলমাল আছে মি. মিত্র। আমার মা-র থেস আশি, শরীরও ভাঙ নেই। ওঁকে দাদার ব্যাপারটা নিয়ে এখনও কিছুই জানাইনি। পুলিশ এলেই কিন্তু ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না। তখন ওঁকে সামনানো মুশ্কিল হবে। কাজেই আমাদের ইচ্ছা কেসটা আপনিই হ্যান্ড করল। আপনার উপর আমাদের পুরো ভরসা আছে। অবশ্য আপনার উপর পারিশ্রমিক আমরা দেব।’

‘আমি তাঙ্গে একবার আপনাদের ওখানে আসছি। অসুবিধা হবে না তো ?’

‘মোটেই না। আপনি এখনই চলে আসুন। আমাদের বাড়ির নবারটা জানেন তো ?’

‘ফাইত বাই ওফান পাম এভিনিউ তো ?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’

॥ ২ ॥

সাহেবি ধীচের গাড়িবারাদাওয়ালা মোতলা ছড়ানো বাড়ি, সামনে একটা ছেট বাগান, পিছনেও সবুজ দেখে মনে হঙ্গ বোধহয় টেনিস কোর্ট জাতীয় কিছু আছে। সেটের গাজে খেতপাথরের ফলকে

অসমবাবুর বাবার নাম, মামের পরে অনেকগুলো ইংরিজি অঙ্গর, কমা, যুক্তিপু। সব শেষে ব্র্যাকেটের মধ্যে “এডিন” কথাটা দেখে বুলাম অঙ্গেককে স্টেল্যান্ড যেতে হয়েছিল ডাঙারি পড়তে।

যিনি আমাদের ট্যাঙ্গির শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে অসমবাবুর আদল আছে ঠিকই, কিন্তু ইনি বেঁটে, মোটা আৱ কালো। অর্থাৎ মুখের মিল বাদ দিলে ইনি অসমবাবুর ঠিক উলটো।

আমাদের দেখে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে উঠলেও, দৃশ্টিগুলো সেটা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল।

‘আসুন ভিতরে।’

থেতপাথরের মেঝেওয়ালা স্যান্ডিং পেরিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে চুক্লাম। এখানেও মার্বল, তার উপর কার্পেট, আৱ তার উপর দামি দামি ফারলিচার। যে সোফায় বসলাম, সেটার গদি এত নৱম যে, আমার ভারেই প্রায় ছ হৃষি বসে গেল।

‘কুনা, এসো।’

একটি ফ্রক-পরা মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক ঢাঁধে ঢেকে আছে ফেলুদার দিকে। অসুজবাবু ডাকতেই সে গুটি গুটি ঘরের ভিতরে এগিয়ে এল।

‘ইনি কে জানো?’ জিগ্যেস করলেন অসুজবাবু।

‘ফেলুদা,’ চাপা গলায় উত্তর এল।

‘আৱ ইনি?’

‘তোপসো।’

‘বাঃ, তুমি তো আমাদের দুজনকেই চেনো দেবছি,’ বলল ফেলুদা।

‘জটায়ু কোথায়?’ জিগ্যেস করল মেয়েটি। বোৰা গেল সে এই তৃতীয় ব্যক্তিকে না দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছে।

‘তিনি তো আসেননি,’ বলল ফেলুদা। ‘তবে তাঁকে একদিন নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।’

‘তোপসে এত মিথ্যে কথা বলে কেন?’

এই রে।—আমার সম্বন্ধে হঠাৎ এমন বদলাম কেন?

‘মিথ্যে যানে?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘একটা বাইয়ে মিথ্যে ফেলুদা ওৱ মাসভূতো ভাই, আৱ একটোয়

লিখেছে জ্যাঠভূতো ভাই। মিথ্যেই তো।'

ফেনুদাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। বলল, 'ওহো—পথমে মাসভূতো। ভাই লিখেছিল বটে, তখন ও গুপ্তের মতো বানিয়ে লিখতে চেষ্টা করছিল। আমি ধমক দিতে তারপর সত্ত্ব কথাটা লিখতে শুরু করল। আসলে জ্যাঠভূতো ভাইটাই ছিল।'

'আপনার সব অ্যাডভেক্টর ওর পড়া,' বললেন অমৃজ সেন।

'জেনুকে খুঁজে বার করে দিতে পারবে তুমি?' ফেনুদার দিকে সটান আকিয়ে প্রশ্ন করল রমা।

'চেষ্টা করতে হবে।' বলল ফেনুদা। 'তুমি যদি কোনও ক্ল জোগাড় করে দিতে পারো তাহলে তো কথাই নেই।'

'ক্ল ?'

'ক্ল জানো জে ?'

'জানি।'

'আছে তোমার কাছে কোনও ক্ল, যাতে আমরা চট করে বের করে দিতে পারি তোমার জেনুকে ?'

'ক্ল তো তুমি বার করবে। তুমি তো ডিটেকচিভ।'

'টিক বলেছ। খুব চালাক যেয়ে তুমি। কী নাম তোমার ? একটা নাম তো জানি, অন্যটা কী ?'

'ভাল নাম বলো।'

ফেনুদা অমৃজবাবুর দিকে কিন্তু।

'সেক্ষুল, আপনাদের দিক থেকে কড়কগুলো ব্যাপারে সাহায্য না দেলে কিন্তু আমার পকে এগোনো মুশকিল হবে।'

'কী সাহায্য করুন।'

'প্রথমত, আপনাদের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। আপনার দাদার সঙ্গে আমার মাঝ কয়েক মিনিটের আলাপ। তাঁকে আমার আরেকটু ভাল করে ছিলতে হবে। তাঁর কাজের ঘরটাও একবার দেখা দরকার। এমনকী, দরকার হলে তাঁর জিনিসপত্র একটু ঘৈটে দেখতে হতে পারে। আশা করি আপনি হবে না।'

'মোটেই না,' বললেন অমৃজবাবু।

'আম আপনার দাদা যেখানে যানিং ওয়াকে যেতেন, সেই

জায়গাটা একবার দেখে আসা দরকার।'

'কেনওই অসুবিধে নেই। আমাদের জ্ঞানভার বিলাস আপনাদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আনবে।'

কেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পাইচারি আরম্ভ করেছে। তিনটে বড় বড় বুককেস বোঝাই বই, সেইদিকে তার দৃষ্টি।

'এ সব বই কার ?'

'সবই দাদার।'

'মানান বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এমনকী গোয়েন্দাগিরি সমস্কেও তো বই আছে।'

'হ্যাঁ। এক সময় ওটা নিয়েও পড়াশুনা করেছেন।'

'বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজার বই, মুদ্রা সংগ্রহ, থিয়েটার...'

'থিয়েটারটা দাদার নেশা বলতে পারেন। আমাদের মাঠে পুজোর সময় স্টেজ বৈধে নাটক হয়। দাদাই নির্দেশক; ফ্যান্ডিলির সকলেই রঞ্টিং মেধে নেয়ে পড়ে। এমনকী ইনিও।' কুনার দিকে দেখিয়ে দিলেন অসুজবাবু। কুনা এখনও সেইভাবেই হ্যাঁ করে চেয়ে আছে কেলুদার দিকে।

'এবারে অস্বরবাবুর কাজের ঘরটা একটু দেখতে পারি ?'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

অসুজবাবু উঠে পড়লেন সোফা থেকে।

বৈঠকখানার পাশে একটা প্যাসেজ, সেইটা পেরিয়ে পিছনের মাঠের দিকের একটা ঘরে গিয়ে চুকলাম আয়ো।

পুর দিকের জানালা নিয়ে ঝোদ এসে ঘরটাকে আঙো করে দিয়েছে। একটা বড় ডেস্ক, তার সামনে একটা রিভলভিং চেয়ার, উলটোদিকে আরও দুটো চেয়ার। জানালার ধারে একটা আরাম-কেদারা। এ ছাড়া টেবিলের পিছন দিকে রয়েছে একটা শেলফ, একটা ক্যাবিনেট আর একটা গোদরেজের আলমারি। তার পাশের দেয়ালে একটা ফোলভিং ব্র্যাকেট থেকে হ্যাঙারে ঝুলছে একটা ছাই রঙের কোট।

ডেস্কের উপরটা দেখলে মনে হয় অস্বরবাবু বেশ গোছানো লোক

ছিলেন। কাগজপত্র টেলিফোন পেনহেলডার পিনকৃশন পেপার-ওয়েট চিঠির র্যাক, সব পরিপাটি করে সাজানো। একটা ডেট-ক্যালেন্ডার রয়েছে, তার তারিখটা তিনদিন আগের। ব্যাপারটা আমারও পটকা লেগেছিল, ফেলুদা সেটার দিকে অস্বৃজ্ঞবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দলোক বললেন, 'দাদাকে কয়েকদিন থেকেই অন্যমনস্ত দেখছিলাম। সচরাচর দাদার এরকম ভুল হয় না কিন্তু।'

ফেলুদা খুতুরুতে মানুষ, সে নিজেই শনিবার দোসরাটা বনাস মঙ্গলবার পাঁচটাই করে দিল।

'দেরাজ খুলে দেখতে পারি কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'দেখুন না।'

তিনটে দেরাজই পরপর খুলে তার ভিতরের জিনিসপত্র হাতকে দেখল ফেলুদা। উপরের দেরাজ থেকে পাওয়া এক টুকরো কাগজ সহকে মনে হল তার একটু কৌতুহল হয়েছে, কারণ সেটা সে বুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

'হিমালয়ান অপটিক্যালস থেকে চশমা করাতেন বুঝি আপনার দাদা?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ক্যাশমেমো দেখছি। তারিখটা সাতদিন আগের। নতুন চশমা করিয়েছিলেন বুঝি?'

'কই, না তো।' বলে উঠল কুমা। সেও আপনাদের পিছন পিছন এসেছে।

'ভূমি কী করে জানলে, কুমা?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'আমাকে তো দেখায়নি জেন্টের।'

অস্বৃজ্ঞবাবু একটু হেসে বললেন, 'দাদা যে কখন কী করছেন তার অবর আমরা সব সময়ে পেতাম না।'

আমরা অস্বৃজ্ঞবাবুর স্টাডি থেকে দেরিয়ে এলাম।

'আপনাদের এক আশীর্বাদ এখানে থাকেন বোধ হয়', প্যাসেজে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা, 'আপনাদের এখানেই মানুষ হয়েছেন?'

'কে, সমরেশ? হ্যাঁ, থাকে বইকী।'

ফেলুদার অনুরোধে সমরেশবাবুকে ডেকে পাঠানো হল। বছর



পঁয়ত্রিশ বয়স, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে পুরু চশমা। একটু যেন
আড়ষ্টভাব নিয়ে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ান্তে আমাদের খেকে হত
দশেক দূরে।

‘বসুন,’ বলল ফেলুদা।

কেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে বসন্তেন সময়েশবাবু।

‘আপনার পদবিটা কী?’

‘মলিক।’

‘কদিন আছেন এ-বাড়িতে?’

‘বছর পঁচিশ।’

‘কী করেন?’

‘একটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন আপিসে কাজ করি।’

‘কোথায়?’

‘শ্রীমতলায়।’

‘কী নাম কোম্পানির?’

‘কোইনুর পিকচার্স।’

‘কদিন আছেন শুধানে?’

‘সাত বছর।’

‘তার আগে কী করতেন?’

‘এই...বাড়ির কাজকর্ম।’

হাত দুটোকে ডাঁজ করে হাঁটুর মধ্যে চেপে রেখেছেন ভুজলোক—
যাকে বলে জবুখনু ভাব।

‘আপনি অশ্বরবাবুর অস্তর্ধানের ব্যাপারে কোনও আলোকপাত
করতে পারেন?’

সমরেশবাবু চুপ। ফেলুদা বলল, ‘তিনি একটা ভূমকি-চিঠি
পেরেছিলেন জানেন?’

‘জানি।’

‘আপনার ঘর কি এ বাড়ির একতলাতে?’

‘হ্যা।’

‘অশ্বরবাবুর কাছে বাইরের লোকজন দেখা করতে আসত?’

‘তা আসত, মাঝে-মাঝে।’

‘সম্পত্তি এমন কোনও লোককে আসতে দেখেছেন, যাকে আগে
দেখেননি?’

‘সেটা শুরু করিনি। তবে—’

‘তবে কী?’

‘এই পাঢ়ায় কিছু ছেলেকে দেখেছি, যাদের আগে দেখিনি।’

‘কোথায় ?’

‘মোড়ের মাথায়।’

‘কী করত তারা ?’

‘মনে হত এই বাড়ির দিকে ঢোখ রাখছে।’

‘বয়স কীরকম তাদের ?’

‘বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বলে মনে হয়।’

‘কজন ছেলে ?’

‘চারজন।’

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে কী ফেল ভাবল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে। আপনি আসতে পারেন।’

এইসব কথা থেকে ফেলুদা কোনও ছু পেল কিনা জানি না। যেটাতে মনে হয় সত্যি করে কাজ হল, সেটা হল অস্বরবাবুর ঢ্রীর সঙ্গে কথাবার্তায়।

গীতিমত সুন্দরী মহিলা, তার উপর যাকে বলে ‘আইট’। বয়স চাঁচিশের উপর হলেও দেখে বোবার জো নেই। দোতলার একটা ছেটি বৈঠকখানায় বসে কথা হল।

ফেলুদা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে লিল ভদ্রহিলাকে বিত্রিত করার জন্য। ‘তাতে কী হয়েছে,’ বললেন মিসেস অস্বর সেন, ‘গোয়েন্দাকে যে এভাবে জেরা করতে হয় সে তো ফেলুদার গল্প পড়েই জেনেছি। খুব ভাল লাগে পড়তে গোয়েন্দার কাহিনী।’

‘তাহলে তো ভালই হল,’ বলল ফেলুদা। ‘আমর প্রথান মুশকিলটা কোথায় হচ্ছে বলি। অস্বরবাবু একটা হমকি-চিঠি পেয়েছিলেন আনেন বোধহয়।’

‘তা জানি বইকী।’

‘দেখেছেন সে চিঠি ?’

‘তাও দেখেছি।’

আমি অস্বরবাবুকে ডিগ্রেস করেছিলাম তাঁর জীবনে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা যার ফলে তাঁ কোনও মানুষের সর্বনাশ হতে পারে। উনি বসেছিসেন তেমন কোনও ঘটনা তাঁর জানা নেই। অবিশ্বা আমার কিনা উচিত ছিল যে, রিসেট ঘটনা হবার দরকার নেই,

অঙ্গীতের ঘটনা হলেও চলবে, কেননা প্রতিহিংসার ভাবটা মানুষ
অনেক সময়ে অনেক দিন পুষে রাখে। আমি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস
করতে চাই, আপনি কি এমন কোনও ঘটনার কথা জানেন? দশ-বিশ
বছর আগের হলেও চলবে।'

ভদ্রমহিলা একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, 'তা
হলে আপনাকে বলি। আপনি দেখুন এমনি ঘটনার কথাই বলছেন
কিনা। এটা আমার কাল রাত্তিরে হঠাত মনে পড়ে। আমার স্বামীকেও
এখনও বলিনি।'

'কী ঘটনা বলুন তো!'

'একটা অ্যান্ডিডেন্টের ব্যাপার।'

'অ্যান্ডেন্ট?'

'অনেকদিন আগে। তখনও রুমা হয়লি; বোধহয় তার পরের বছরই
হল। আমার ভাসুর তখন নিজেই গাড়ি চালাতেন। আমার খণ্ডরের
গাড়ি। অস্টিন। উনি শ্যামবাজারের দিকে একজন লোককে চাপা দেন।
সে-লোক মারা যায়।'

আমরা দুঃজনেই চুপ। ঘরে দমথমে ডাব। অনুজবাবু পাশেই ছিলেন,
চাপা গলায় বললেন, 'আশ্চর্য, এটা আমার মনেই ছিল না।'

'আর কী মনে পড়ছে?' ফেলুদা দুঃজনকেই প্রশ্নটা করল।

'নিম্ন-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি,' বললেন অনুজবাবু, 'কুর্ক ছিলেন
ভদ্রলোক।'

'মাম মনে পড়ছে?'

'উহ।'

'স্ত্রী ছিল, আর তিনটি ছেলেমেয়ে,' বললেন মিসেস সেন।
'ছেলেটির বয়স তেরো-চার্দো। মেয়ে দুটি আরও ছোট। পাঁচ হাজার
টাকা তুলে দেন বিধবার হাতে।'

'কে, অনুজবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'সেই থেকেই সামা জ্বাইভিং বন্ধ করে দেন,' বললেন অনুজবাবু।
'এখন মনে পড়ছে।'

'ই..,' ফেলুদা গাঢ়ীর। 'তার মানে এখন সে-ছেলের বয়স বৎসর

পাঁচিশ। পরিবারটির যে সর্বনাশ হবে এই ঘটনার ফলে, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পাঁচ হাজার টাকা আর কদিন চলে ?'

'এর বেশি আর কিছু মনে পড়ছে না, জানেন,' বললেন মিসেস সেন।

'আমারও মা,' বললেন অসুজবাবু।

'অসুজবাবু কি ডায়রি রাখতেন ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কই, সে রকম তো শুনিনি এখনও,' বললেন অসুজবাবু।

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'অনেক ধন্যবাদ, মিসেস সেন। আপনি অস্বকারে একটা আলো দেখিয়েছেন আমাদের, তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।'

'আমরা কিঞ্চি মনেপালে চাইছি যে, আপনি ব্যাপারটার একটা সুরাহা করেন।'

কথাটা যে ভদ্রমহিলা খুব আস্তরিকতার সঙ্গে বললেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

অসুজবাবুর অসুস্থ মাকে বিশুক করার কোনও মানে হয় না, তাই আমরা আপাতত পাম এভিনিউ-এর পাট শেষ করে সেনদের আ্যামবাসারে চলে গেজাম গঙ্গার ধারে। সে রেস্টোরান্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার বিলাসবাবু বললেন, 'এইখান থেকে স্যার হাঁটতে আরম্ভ করে সোজা দক্ষিপ দিকে শিয়ে ঠিক এক ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে আসতেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।'

'আপনি গাড়িতেই বসে থাকতেন ?'

'আজ্জে হ্যাঁ।'

'কদিন ড্রাইভারি করছেন সেন-বাড়িতে ?'

'নাইন ইয়ারস।'

'তার মানে আ্য়ারিডেশ্টের ব্যাপারটা আপনি জানেন না ?'

'আ্য়ারিডেশ্ট ?'

'অসুজবাবু বছর বাবো আগে একবার একটি সোককে গাড়ি চাপা দিয়ে আরেম।'

‘কেন সাহেব ?’

‘কেন, আপনার বিখ্যাস হচ্ছে না ?’

‘উনি যে কোনওদিন নিজে ড্রাইভ করেছেন সেইটেই জানতুম না।’

‘ওই ঘটনার পরেই ড্রাইভিং ছেড়ে দেন।’

‘তা হবে। ড্রাইভারের তো দোষ দেওয়া যায় না সব সময় ! রাস্তার সোকে যেভাবে চলাফেরা করে, আরও বেশি লোক মরে না কেন সেইটেই তো ভাষি। ড্রাইভারের আর কী দোষ ?’

‘অন্ধরবাবু যেদিন আর ফিরলেন না, সেদিনের ঘটনাটা একটু বলবেন ?’

‘সেদিন উনি আসছেন না দেখে আমি হেস্টিংস পর্যন্ত গিয়ে তামাস করেছিলাম। পথে সোক ধরে ধরে জিগ্যেস পর্যন্ত করছি। গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে রাস্তায় নেমে খুঁজেছি যদি কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়ে থাকেন। হাটটা তেমন মজবুত ছিল না তো।’

‘সোকজন কেমন ছিল রাস্তায় ?’

‘সকালে এলিফ্ট সোক মন্দ থাকে না। সব হাঁটিতে আসে। তবে নিউ হ্যাওড়া বিজের সাইডটায় সোক থাকে না বললেই চলে। স্থার তো শব্দিকেই যেতেন। ফস করে যদি গাড়িতে কঠা জোয়ান সোক এসে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যায়, কেউ টেরও পাবে না।’

আমরা গাড়িতে করেই দশ মাইল স্পিডে চালিয়ে হেস্টিংস পর্যন্ত দুরে এলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিন্তুই দেখতে পেলাম না।

ঝরপর দু দিন পায় এভিনিউ থেকে কেনও থবর নেই। বিদ্যুদবার বিকেলে দালমোহনবাবু এসেই বললেন, ‘ঘটনা এগোজ ?’ অন্ধর সেন উখাও শুনে তমলোকের চোখ কপালে উঠে গোল। বললেন, ‘আপনারে একটি ক্ষেত্র গৈঞ্জে যেতে দেখলুম না। ধনি আপনার জাক।’

‘আপনার শ্রেষ্ঠ কলার প্রতিক্রিয়া মৃত্যুজয় সোমের কী থবর ?’

‘দূর দূর। কলার না মৃতু।’

‘মে কী মশাই, এর মধ্যে আবার কী হল ? সেদিন তো সুপারলেটিভ ছাড়া কথাই বলছিলেন না।’

‘আর বলবেন না মশাই।’

‘কেল, কী হল?’

‘বলতেও লজ্জা করে।’

‘আমার কাছে আবার লজ্জা কী? বলে ফেলুন।’

ব্যাপারটা কী জানি না, কিন্তু সেটা যে লালমোহনবাবু চেপে যেতে চাইছেন সেটা বুঝতেই পারছি। এদিকে ফেলুদা ও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষটায় পীড়াপীড়িতে ভদ্রলোক বলেই ফেললেন।

‘আরে মশাই, ভাবতে পারেন, ভদ্রলোক প্রদোষ মিত্রের নাম শোনেননি! আপনার বালু বলে পরিচয় দিতে গিয়ে একেবারে ভেড়া বলে ফেলুম! বলে কিনা—হ ইজ প্রদোষ মিত্র!’

‘তাতে আর কী হল, এত ঝড় স্কলার, হার্বার্টের ডবল এম. এ., আমিও তো তাঁর নাম শুনিনি।’

কথাটা বোধহয় লালমোহনবাবুকে কিছুটা আশ্রম করল। বললেন, ‘তা যা বলেছোঁ। এত বড় দুনিয়ায় কটা মানুষকে আর কটা মানুষ চেনে। আর ভদ্রলোক বোধহয় বেশির ভাগ সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। কাজেই এক্সকিউজ করে দেওয়া যাব—কী বলেন?’

আপাদের কথার মাঝাখানেই পাম এভিনিউ থেকে ফোন এল। অসুস্থ সেন। একটা বেনামি চিঠি এসেছে ভদ্রলোকের নামে। টেলিফোনে সেটা পড়ে শোনালেন ভদ্রলোক।

আগামীকাল শুক্রবার সকার সাড়ে ছ-টায় ১০০ টাকার নোটে ২০০০০ টাকা বাঁচে পুরে প্রিমিয়েস্যাটের দক্ষিণ-পূর্ব ক্ষেপের ধারের ধারে রেখে বাবেন। অস্বর সেনকে অক্ষত অবস্থায় কি঱ে পাবার এই একমাত্র উপায়। পুলিশ বা গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল হবে মানুষক।’

ফেলুদা ফোনে বলল, ‘এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই, মি. সেন। আরও চকিতি ঘট্টা সময় আছে। এর মধ্যে আমার কয়েকটা কাজ আছে। আপনাদের দিক থেকে কী করবীয় সেটা আমি কাল দুপুর দুটোর মধ্যে আপনাদের বাড়ি গিয়ে বলে আসব। তবে হাঁ, টাকার ব্যবহার করে রাখবেন। ওটা খুবই জরুরি।’

‘কিন্তু গোয়েন্দার ব্যাপারে শাসিয়ে রেখেছে যে মশাই,’ ফেলুদা ফোন রাখার পর লালমোহনবাবু বললেন।

ফেন্দুদা উভয়ে শুধু বসল, 'আনি।'

রক্ষেটের মেঝে ঘটনা এগিয়ে চলেছে। এই টাকাটা না নিয়ে উপায় কী আছে সেটা আমিও ভেবে পেলায় না।

'জানমোহনবাবু, কাজ আপনার গাড়িতে একটু পাওয়া যাবে কি?'
ଆয় পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে অবশ্যেই প্রশ্ন করল ফেন্দুদা।

'আনি টাইয়ে, 'বঙ্গদেশ অটোয়ু। 'কখন চাই বলুন।'

'সবাসে একবার থেঝোব। সাড়ে ন-টা নাগাত পেলেই চলবো। ঘটা মুঝেকের মধ্যে আমার কাজ হয়ে যাবে। অন্যপর বিবেল পাঁচটা মাসাদ আপনি যদি গাড়িতে নিয়ে চলে আসেন তো শুধু তাল হয়।'

'ভেবি শুভ।'

এসপর ফেন্দুদা আর কেবলও কথাই বলল না।

প্রদিন জানমোহনবাবুর গাড়িতে করে ফেন্দুদা বেরোল। একই
বেরেল, কাজেই কোথায় গোল কী করল আসার উপায় নেই। বাগোটা
নামাদ নিয়ে আসার পর দেখলাম তার মুখের ভাব বদলে গেছে।

'কী ঠিক করলে ফেন্দুদা?' তবে তায়ে জিশোস করলায়।

'টাকাটা নিয়েই হবে,' বসল ফেন্দুদা। 'তবে গোকুলে সংপর্কে
অকিংতা যানা চলবে না।'

'মানে? তুমি নিজেও থাকবে সেখানে?'

'ফেন্দু খিতির অত সহজে ধারণবার লোক নয় বো তোপসো।'

'আমি আমরা?' আমরা কোথায় থাকব?'

'ভেবাও' থাকবি কাছকাছির মধ্যে, করণ হেলপ দরকার হতে
পারো।'

আমি তো শুনে থা।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে আমরা সেলাম পাম এভিনিউ।

অনুজবাবু কজবতই বাড়িতে ছিলেন, ফেন্দুদাকে দেখেই বাস্তু হয়ে
উঠলেন।

'কাল রাতিয়ে চেঁকের পাতা এক করতে পারিনি মশাই। দেখতে
দেখতে কী যে হয়ে গেল।'

ফেন্দুদা গভীরভাবে কাল, টাকাটা আপনাদের অসবেই, যি সে।
অবরবাবুকে নিয়ে পারার আর কেবলও নাও সেই।'



‘তুমি ধরতে পারোনি এখনও?’ কুন্তা হঠাতে ঘরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে ডিগ্রেস করে উঠল।

‘অনেকটা ধরে ফেলেছি, কুন্তা,’ বলল ফেলুদা। ‘শুব চেষ্টা করছি যাতে বাকিটা আজ বিকেলের মধ্যেই ধরতে পাবি।’

‘ব্যাস, ঠিক আছে।’

কুন্তাকে ভীষণ নিশ্চিন্ত বাস মনে হল। ফেলুদা বার্ষ হবে এটা কেন

তার কাছে ভয়ানক একটা দৃঢ়খের ব্যাপার।

‘তাহলে কী করা উচিত বলে মনে হয়?’ জিগোস করলেন অম্বুজবাবু।

‘টাকার ব্যবস্থা হয়েছে?’

‘সেটা করে ফেলেছি। গাড়িতে তো অত কাশ থাকে না, তাই আজ সকালেই সমরেশকে দিয়ে ব্যাক থেকে আনিয়ে নিয়েছি।’

‘সেই টাকা, এবং যে ব্যাগে করে সেটা দেওয়া হবে—এই দুটো জিনিস আমি একবার দেখতে চাই।’

টাকা এবং ব্যাগ এসে গেল। এত টাকা এর আগে একসঙ্গে দেখেছি কি? যন্তে তো পড়ে না।

ফেলুদার সামনেই কুড়িটা করে একশো টাকার নোট রাবার ব্যান্ড দিয়ে গোছ করে দশ ভাগে ব্যাগের মধ্যে পূরে দেওয়া হল। তার ফলে ব্যাগের চেহারা হয়ে গেল কচ্ছপের পিঠের মতো।

‘ভেরি গুড়,’ বলল ফেলুদা। ‘তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ছি পৌনে ছটা নাগাদ।’

অম্বুজবাবু চমকে উঠলেন।

‘সে কী, আপনি যাবেন?’

‘অপরাধীকে ধরার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, মি. সেন। আপনি টাকা বেরে আসবেন, আর সে লোক দিবি এসে সেটা তুলে নিয়ে চলে যাবে, এ তো হতে দেওয়া যায় না। অস্বরবাবুকে ফেরত পাওয়াটাই বড় কথা সেটা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই গুণাদেরও সাজা হওয়া উচিত নয় কি? না হলে তো তারা এই ধরনের কুকুরি করেই চলবে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। সাবধানতা অবলম্বন না করে আমি কৰনও কিছু করি না।’

‘তাহলে—’

‘আমি বলছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন। আপনি আপনার গাড়িতে করে যাবেন টাকা নিয়ে। নিউ হাওড়া খিল্ডের দিকটা দিয়ে আসবেন। ওদিকটা সোটামুটি নিমিবিলি। গাড়ি খিল্ডেপথটি থেকে অন্তত দুশো গজ আগে দাঁড় করিয়ে আপনার স্লাইডারকে বলবেন টাকাটা যথাস্থানে রেখে আসতে। আমি কাছাকাছির মধ্যেই থাকব। কাউটা

ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেটা আমি দেখতে পাব। আমরা মিট করব
ষট্টনার পর। গে রেস্টোরান্টের সামনে। আপনি টাকা রেখে
সোজা ওখানে চলে আসবেন। আমিও তাই করব। অপরাধীকে
যদি ধরতে পারি তাহলে তিনিও আমার সঙ্গেই থাকবেন, বলাই
বাহল্য।'

অমৃজবাবুকে মনে হল যেন তিনি বেশ নার্তাস বোধ করছেন। সেটা
অস্বাভাবিক নয়। টাকার অক্ষটা তো কম নয়। আর গুগুরা কী করবে
না-করবে কে জানে?

বিকেল সাড়ে চারটের সময় লালমোহনবাবু এলে পর ফেলুদার
প্রথম কথা হল, 'মশাই, এমন অভিনব কেস আর আমি কেনওদিন
পাইনি।'

অবিশ্যি আমাকে জিগ্যেস করলে পরে আমি এখনও বলতে পারব
না এর বিশেষত্বটা কোথায়।

'তাহলে আমরা কী করছি?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'গুনে নিন মন দিয়ে,' বলল ফেলুদা। 'তুইও শোন, তোপসে।
সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার গাড়ি নিয়ে আপনি আর তোপসে
চলে যাচ্ছেন গে রেস্টোরান্ট। সেখানে আপনাদের অভিজ্ঞ
অনুযায়ী পানাহার সেরে ঠিক সোয়া ছ-টায় রেস্টোরান্ট থেকে
বেরিয়ে স্টান চলে যাবেন দক্ষিণে প্রিনসিপস্টাট লক্ষ করে।
গাড়ি রেখে যাবেন রেস্টোরান্টের সামনে। থামওয়ালা ঘাটটার
কাছে পৌছনোর কিছু আগেই দেখবেন ডানদিকে একটা
গমুজওয়ালা বসার ঘর রয়েছে। মুজনে সেখানে দুকে বেঞ্জিতে
বসে পড়বেন। তাবটা এমন হওয়া চাই যেন সান্তান্ত্রিক আর
বায়ুসেবন ছাড়া আপনাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। ঘাটটির
দিকে আড়দৃষ্টি রাখবেন, তবে যেন মনে না হয় যে, ওটাই
আপনাদের লক্ষ। তারপর সাড়ে ছ-টার দশ মিনিট পর ওখান
থেকে উঠে পড়ে নিজের গাড়িতে ফিরে আসবেন। আমিও
সেখানেই আপনাদের মিট করব।'

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু একনও দিনি ঠাণ্ডা। তবে শীতকালের মতো দিন আর অত ছোট নেই, ছ-টা পর্যন্ত বেশ আলো থাকে। আমি আর লালমোহনবাবু কফি আর মুরগির কাটলেট খেয়ে ঠিক সোয়া ছ-টায় রেস্টোরান্ট থেকে বেরিয়ে ঝঙ্গা দিলাম প্রিসেপঘাটের দিকে।

পথে লালমোহনবাবু মাঝে-মাঝে বুক ভরে নিঃঘাস নিয়ে আঃ উঃ শব্দ করে সান্ধ্যবন্ধনের অভিনয় করছেন, সেটা যে খুব কমভিন্নসিং হচ্ছে তা নয়। কিন্তু ক্রমেই আশপাশের লোকজন এত কমে আসছে, মুচকওয়ালা আর ভেলপুরিওয়ালার দল এত পিছিয়ে পড়ছে যে, একন উনি যা খুশি করলেও আপত্তির কিছু নেই।

দশ মিনিট জাগল আমাদের গমুজওয়াপা বসার আয়গাটায় পৌছতে। বেঁক দখল করার পর একিক ওদিক দেয়ে লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্ন করছেন, ‘তোমার সাদাকে দেখতে পাই কি, তপেল?’

সাদা কেন, কেনও যানুবকেই দেখতে পাই না ঘাটের নৌকোর আবিদের ছাড়া। কেনখানে লুকিয়ে রয়েছে কেন্দুনা কে জানে। ঘাটের দেড়শো বছরের পুরনো ধামগুলো যাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কাঁকগুলো ক্রমেই অক্ষরের হয়ে আসছে। ওখানে গিয়ে কেউ টাকার ব্যাগ রাখলে, বা সে ব্যাগ নিতে এসে, কেউ দেখতেও পাবে না।

‘ওই যে’ লালমোহন বাবু আমার হাত খামচে ধরেছেন।

হ্যাঁ—চিকই দেখেছেন ভদ্রলোক।

একজন সাদা প্যান্ট আর কাসো কোটি পরা লোক হাতে একটা বাগ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিসেপঘাটের দিকে। অবরবাবুদের জ্বাইভার। বিলাসবাবু।

বিলাসবাবু এবার ধামগুলোর ফাঁক দিয়ে ভিতরে চুকে অক্ষকাণ্ডে মিলিয়ে গেলেন।

মিনিটখানেক পরেই তাঁকে আবার দেখা গেল। এবার হাত খালি। বড়মাত্তায় পড়ে ভাইনে ঘোড় ঘুরে গাছের আঢ়াল হয়ে গেলেন

অন্ধলোক।

সাড়ে ছ-টা বেজে গেছে। আলো আরও পড়ে এসেছে। এখন সামনের সারির খামগুলো হাজা আর কেনওটাই দেখা যাচ্ছে না। একবার মনে হল অস্ককারের মধ্যে কে যেন নড়ে; কিন্তু সেটা চোখের ভূজ হতে পারে।

এবার দেখলায় সেবদের গাড়ি আয়াদের সামনে দিয়ে আসেন্টেরাটের দিকে চলে গেল। তারপর তিনজন জিনস-পরা ছেলে, আর তাদের পিছনে চোলা প্যাটপরা হাতে সাতিয়ালা এক বৃক্ষ ফিরিলিও সেই দিকেই চলে গেল।

আফরাও উঠে পড়লাম।

আবার ঠিক দশ মিনিটই সামগ্র আয়াদের গাড়িতে পৌঁছেতে।

কিন্তু ফেলুনা কই?

এবার গাড়ির ডিতরে চোখ দেল।

নস্টিরভের আলোয়ান জড়ানো এবং সুজি পরা এক বুড়ো বসে আছে জাইভার হনিপদবাবুর পাশে। খুতনিতে খোঁচা-খোঁচা দাঢ়ি, কিন্তু শোঁক নেই।

‘স্যালাম কর্তা।’ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে কলম সোকল।

ও আর বলতে হবে না। ওই মুসলমান যাবি ফেলুনা হাজা আর কেউ না। এদিকে অস্বৃজবাবুও এসে পড়েছেন নান্তার পরিক থেকে। তাঁর কাছে ফেলুনার নিজের পরিচয় দিতেই হল। ‘নোকে থেকে বাটটা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়, তাই ওখানেই ওত পাতার সিদ্ধান্ত নিরূপিত্ব।’

কিন্তু কী হল সেইটে কলুন, মি. মিডিরা?’

ফেলুনা গাঢ়ীয়।

‘তেমি সবি, মি. সেন।’

‘মানে?’

‘আমি ঘাটে ওঠার আগেই সে সোক টাঙ্গ নিয়ে হাঁওয়া।’

‘বসেন কী। টাঙ্গা নেই। সোকটাকেও ধুল গেল না?’

‘কলাই তো—আমি অত্যন্ত দুঃখিত।’

অস্বৃজবাবু কিছুক্ষণ ফ্যানফ্যান করে চেয়ে রাখলেন ফেলুনার দিকে।

কথাটা যেন অন্তর্লোকের বিশ্বাসই হচ্ছে না। সত্ত্ব বজান্তে কী, আমরা কেমন যেন মাথা বিমুক্তি করাইছি। ফেলুদাকে এভাবে হাত মালাতে এর আগে দেখিলি কখনও।

‘আপনাদের পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে, মি. সেন,’ বলল ফেলুদা। ‘আপনি বাড়ি চলে যান। এবার তো অস্বরবাবুর ক্ষিরে আস। উচিত। আমরা একবার বাড়িতে টুঁ মেরে আপনার ওয়ালেই আসার্ছি। এই বেশে তো আম পায় এভিনিউ-এর বৈঠকখানায় দোকা যাবে না।’

বাড়ি যাওয়ার একমাত্র কারণ ফেলুদার একটু ফিটফাট হয়ে নেওয়া। তা ছাড়া হাতেও ৩১ সেগেছিল—জিগ্যেস করতে বলল আসকাতরা—সেটাও ধূয়ে নেওয়া দরকার। আসকাতরাটাও মেক-আপের অংশ কিন। জিগ্যেস করাতে কোনও উত্তর দিল না ফেলুদা।

আমরা যখন পায় এভিনিউ রান্না হস্তাম, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। পথে সালমোহনবাবু একবার বসেছিলেন, ‘আপনার অস্বর বিসিয়াস্ট মেক-আপটা মাঠে মারা যাবে তাবিনি মশাই—’ কিন্তু তাতে ফেলুদা কোনও মন্দ্য করেনি।

পায় এভিনিউ পৌরাণোর সঙ্গ-সঙ্গেই কলার গলায় উচ্ছিত টিংকার শোনা গেল, ‘জেন্ট এসে গেছে।’

অস্বরবাবু ফিরেছেন আমরা আসায় মিসিট দলেক আগে। আমরা বৈঠকখানার পিয়ে টুকুতেই ভদ্রলোক সেফা ছেড়ে উঠে হাত বাজিয়ে ফেলুদার হাত দুটো ধরে ধৌকিয়ে দিলেন। ভাই, ভাইয়ের বউ, ভাইরি, সমরেশবাবু, বিজ্ঞাসবাবু, সকলেই ঘরে গ্রহণেন।

‘কোথায় অটিক করে যেখেছিল আপনাকে?’ একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন সালমোহনবাবু।

‘ও—সে আম বলকেন না—’

ফেলুদা হাত তুলে যাবা দিল ভদ্রলোককে।

‘তিনি তো কলকাতার নাই, আম আপনিও বলকেন না, মি. সেন। কারণ কলকাতার একদাশ কলমায় আশ্রয় লিজে ছবে। মিথ্যে খবটা বাবহাব কলমায় না, কারণ সেটা ভাল শোনায় না।’

‘হৱৱে হৱৱে হৱৱে।’ ঠেঁচিয়ে উঠল কলা। ‘ফেলুদা ধৱে ফেলেছে, ফেলুদা ধৱে ফেলেছে।’

এবাব ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল, ‘আপনারা যে একটা বিৱাটি ফন্দি এঁটেছিলেন সেটা ধৱে ফেলেছি, কিন্তু সেটার ফার্মণটা এখনও ঠিক ধৱতে পারছি না।’

‘কানগ বলছি মি. মিত্রী,’ হেসে বললেন অস্বর সেন। ‘কারণ আমার ওই খুদে ভাইয়িটি। সে আপনাকে বলতে গেসে একবৰকম পুজোই কৱে। তার ধারণা আপনি ভুলভাবের উদ্দেৰ। তাই ওকে আমি সেনিল বললাম যে, তোর ফেলুদাকে আমি জন্ম কৱতে পারি। ব্যাস— ওই একটি উত্তি খেকেই সমস্ত ফন্দিটির উৎপত্তি। এতে আমাদের অকলেরই ভূমিকা আছে।’

‘অর্থাৎ এও আপনাদের একটা ফ্যামিলি নাটক?’

ঠিক তাই। সবাইকে সব কিছু আবিহীন শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলাম। আপনি কী জিস্যোস কৱলে কী উত্তর দেবে, সব লিখে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলাম—এমনকী প্রাহ্লাদ ও চাকরকে পর্যন্ত। প্রধান নারীচরিত্র অবশ্য বটুমা, যাঁকে দিয়ে ঘনগড়া অ্যাকসিডেন্টের কথাটা বলানো হয়েছিল। আমি নিজে ভাবিনি যে, আপনি ব্যাপারটা ধৱে ফেলবেন— ইন ফ্যান্টি, এই নিয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে একশো টাকা বাঞ্জিও ধৱেছিলাম। এ ব্যাপারে কুন্তার উৎকৃষ্টাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ তার হিমো যদি ফেল কৱত, তাহলে তার দুঃখের সীমা থাকত না। এই খুকিটা অবশ্য আমাকে নিতেই হয়েছিল, কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত। এবাব বলুন তো আপনার সিসটেমটা কী। কীসে আপনার প্রথম সন্দেহ হল মি. মিত্রী?’

ফেলুদা বলল, ‘প্রথমত এবং প্রধানত, দুটো ঝু. দুটোই আপনার কাজের ঘৱে পাওয়া। এক হল হিমালয়ান অপটিক্যালসের কাশ সেনো। আমি সেখানে খৌজ নিয়ে জেনেছি যে, আপনি দিন সাতক আলে একটি সোনালি ফেমের নতুন চশমা করিয়েছেন। অথচ আপনার খাড়িতে সেটা সম্ভবে কেউ জানে না, বা কেউ সেটা আপনাকে পৱতে দেখেনি। অথ হল, এই চশমার দরকার পড়ছে কেন। এবং ঠিক এই লক্ষে দরকার কেল।

‘মুই হল—আপনার ডেট ক্যালেন্ডারে তিনি দিনের পুরানো তারিখ। আপনার চাকর যখন তারিখ বদল করে না, তখন সেটা নিশ্চয় আপনাই করেন। তাহলে বদল হয়নি কেন?’

‘তখনই মনে হল যে, আপনাকে যদি কিডন্যাপড় হবার ভাব করেন গা ঢাকা দিতে হয়, তাহলে হয়তো একটা জেরা স্থির করে দু দিন আগে পিয়েই সেখানে থাকা অভ্যাস করতে হবে। নতুন জায়গা ধারত্ব হতে সময় লাগে বাইকী। আর তাই যদি হয়, তাহলে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আপনাকে হয়তো একটি হৃদ্দাকেশ ও একটি নতুন নাম নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে একটি নতুন চশমা নেওয়াও মোটেই অস্বাভাবিক নয়।’

‘ধরে ফেলেছে, ফেলুন সব ধরে ফেলেছে!’ আবার চেঁচিয়ে উঠল কুমা।

এর মধ্যে জালমোহনবাবু যে হঠাৎ কেন খাঁচায়-বজ্জ সিংহের মতো পাইচারি করতে আরম্ভ করেছেন তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক বাতে কোনও বাজবাড়ি না করে ফেলেন তাই ওকে সামলাতে যাব, এফন সময় উনি হঠাৎ দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—

‘ইউরেকা!’

‘চিনেছেন ভদ্রলোককে?’ ফেলুন প্রশ্ন করল।

‘চিনব না? মৃত্যুজ্ঞ সোম।’

অবরুদ্ধবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন।

‘আপনার সঙ্গে সেদিন পার্কে দেখা হওয়াটা সম্পূর্ণ আকসিডেন্ট, মন্দাই। আসলে গড়পারেই আমার এক বছুর বাড়িতে গিয়ে ছিলাম সাতদিন। আপনি যখন এগিয়ে এসে জটায়ু-টটায়ু বলে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন ভাবলাম— বা রে, এ তো কেশ মজু! যাকে জুব করতে হাতি তারই সাকরেদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তাহলে একে নিয়ে একটু রংগড় করতে পারলে কেমন হয়? তারপর অবিশ্বা মিস্টির মশাইয়ের বাড়িতেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার আসল চেহারায়, কিন্তু আপনি চিনতে পারেননি।’

‘কিন্তু তাহলে বাপারটা কী মাড়াছে?’ বলল ফেলুন। ‘নাটকের তো এখানেই শেষ নয়, অবরুদ্ধবাবু। এখনও তো প্রপসিন ফেলা চলবে না।’

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে বদলে গেল, কারণ কেলুদা কথাটা বলেছে পক্ষীর থমথমে ভাবে।

‘হোয়ার ইজ দ্য মানি?’ প্রশ্ন করল কেলুদা।

অস্বর সেন কেলুদার দিকে তীক্ষ্ণভিত্তে চেয়ে বললেন, ‘মি. মিস্টির, আপনি আমাকেও কিন্তু একজন শখের গোয়েন্দা বলতে পারেন। আমি যদি বলি যে, টাকাটা আপনিই নিয়ে আমাদের সঙ্গে একটু রগড় করছেন, তাহলে কি যুব ভুল বলা হবে? অপরাধী বলন নেই, কিডন্যাপার নেই, তখন টাকাটা সরে কোথায় যাবে মি. মিস্টির?’

কেলুদা মাথা নেড়ে বলল, ‘মি. সেন অত্যন্ত দৃঢ়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনার শখের গোয়েন্দাগিরি একেবেজে খাটল না। প্রিনসেপ্টাটোর কাছে আজ সন্ধ্যায় আমি ছাড়াও আরেকজন ছদ্মবেশী ছিলেন।’

‘বলেন কী?’ বললেন অস্বর সেন, ‘আপনি তাকে দেখেছেন?’

‘দেখেছি, কিন্তু চিনিনি।’

‘কিন্তু আপনি তখনই তাকে ধরলেন না কেন?’

‘তখন ধরাটা আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট নাটকীয় হত না। আপনারা নাটক পছন্দ করেন তো? আমার মনে হয় আপনাদের সামনে ধরাটা আরও নাটকীয় হবে। আমার সন্দেহ তিনি এখানেই আছেন। এ সন্দেহ ঠিক কিনা সেটা আমি একবার পরাখ করে দেখতে চাই।’

ঘরে যাকে বলে পিন-পড়া নিষ্ঠকতা। ঝলায় দিকে আড়তেখে চেষ্টে দেখলাম সেও ফ্যাকাসে মেরে গেছে।

‘বিলাসবাবু, আপনার জুতোর তলাটা একবার দেখুন তো,’ বলে উঠল কেলুদা।

বিলাসবাবু ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, ‘দেখব আম কী স্তাব, জুতোর তলায় তো আলকাতরা লেগে রায়েছে। ব্যাগ রেখে ফেরবার সময় তো রাস্তায় পা আটকে যাচ্ছিল।’

‘ওই আলকাতরা আমিই ছাড়িয়ে রেখেছিলাম থামটার চারপাশে,’ বলল কেলুদা, ‘কারণ একজনের সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। আপনারা সকলেই বালিয়ে বালিয়ে কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইনি যে মিথ্যেটা বলেছিলেন সেটা একটু অনাবকম। ইনি

বলেছিলেন...ও কী, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?’

কিন্তু পাজাবার পথ নেই। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন বিলাসবাবু। এক বাটকায় যাকে বগলদাবা করে ফেলেছেন ভদ্রলোক, তিনি হচ্ছেন সমরেশ মল্লিক।

‘এবার আপনার স্যান্ডেলের তলাটা এঁদের দেখিয়ে দিন তো,’ বলল ফেলুদা। ‘বিলাসবাবু একটু হেল্প করলে ব্যাপারটা সহজে হয়ে যাব।’

বিলাসবাবু নিচু হয়ে সমরেশবাবুর পা থেকে স্যান্ডেলটা একটানে খুলে নিয়ে তার তলাটা সকলকে দেখিয়ে দিলেন। উনিই যে শিয়েছিলেন প্রিসেপবাটের থামের পাশে, তাতে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

‘আপনার কোহিনুর কোম্পানি তো দু বছর হল লাটে উঠেছে সমরেশবাবু,’ বলল ফেলুদা, ‘তা সঙ্গেও আপনি সেখানে চাকরি করছিলেন কী করে সেটা এঁদের একটু বুঝিয়ে বলবেন? আর যদি চাকরি না-ই করে থাকেন, তবে এই দু বছর কীভাবে রোজগার করবেন সেটা বলবেন?’

সমরেশবাবু নিম্নস্তর। বিলাসবাবু এখনও তাঁকে জাপটে ধরে আছেন; মনে হয় পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত সেইভাবেই ধরে থাকবেন।

‘অবিশ্বিত এই ব্যক্তির খোলস খুলে ফেলার জন্য আপনাদের আমাকেই ধন্যবাদ দিতে হবে,’ বলল ফেলুদা। ‘আপনারা তো আর বিশ হাজার টাকা রাখতেন না থামের পাশে! সেহাত আমি যখন বললাম শাসানি কেমার করি না, আমি নিজে থাকব সেখানে, তখন আপনাদের বাধ্য হয়েই রাখতে হল, আর সেই টাকা হাত করার সুযোগ নিজেন সমরেশবাবু। যাকগো, এখন তো জানলেন টাকা কোথায় আছে। এবার সেটা আদায় করার রাস্তা আপনারা দেখুন। উনি ষদি সে-টাকা অন্যত্র পাচার করে থাকেন, তাহলে পুলিশ তো আছেই; তারা এ সব আদাহের অনেক রাস্তা জানে। আমার কাজ এখানেই শেষ।’

ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু জনও উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু ঠো আর হল না। মিসেস সেন বাধা দিলেন।

‘শেষ বললেন কী ? এত সহজে শেষ হবে কী করে ? আপনাকে ঝুঁড়ি
ঝুঁড়ি মিথো কথাগুলো বললাম, তার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না ?
আজ রাত্তিরে আপনাদের খেতে হবে আমাদের বাড়িতে।’

‘আর ওই বিশ হাজারের অন্তত খানিকটা তো আপনার প্রাপ্য,’
বললেন অন্ধর সেন, ‘সেটা না নিয়ে যাবেন কী করে ?’

‘আর তোমরা তিনজনে একসঙ্গে এসেছ,’ বললেন শ্রীমতী কুলা,
‘আমার অটোগ্রাফে সই দেবে না বুঝি ?’

‘এন্স ওয়েল দ্যাটি অল্স ওয়েল,’ বললেন লালমোহনবাবু।

সুর্যজিত রায়

জাহাঙ্গীরের

অগ্রয়ণ



জাহাঙ্গীরের স্বর্গমুদ্রা

॥ ১ ॥

‘হ্যালো—থেমো মির আছেন?’

‘কথা বলছি।’

‘ধনুন—পানিহাটি থেকে কল আছে আপনার... হ্যাঁ, কথা বলুন।’

‘হ্যালো—’

‘কে, যি, থেমো মির?’

‘বলছি—’

‘আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী। আমি পানিহাটি থেকে বলছি। আমি অবিশ্য আপনার অপরিচিত, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাতে আপনাকে টেলিফোন করছি।’

‘বলুন।’

‘আমার ইচ্ছা আপনি একবার এখানে আসেন।’

‘পানিহাটি?’

‘আজেও হ্যাঁ। আমি এখানেই থাকি। গঙ্গার উপরে আমাদের একটা একশো বছরের পুরনো বাড়ি আছে। নাম অমরাৰত্তী। এখানে সকলেই জানে। আপনার কাজের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং আপনারা হে তিনজন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন তাও আমি জানি। আমি আপনাদের তিনজনকেই আমৃতে জানাচ্ছি। এই শনিবার সকালে এসে—এই ধনুন দশটা নামাদ—ৱাস্তিৱটা থেকে আবার ব্রহ্মব্রাহ্ম কিরে যাবেন।’

‘কোনও অসুবিধায় পড়েছেন কি? মানে আমার পেশাটা তো জানেন; কেন্দ্রও বহন্তা—?’

‘তা না ইলে অংশন্মাকে ডাকব কেন বলুন? তবে সে বিষয়ে আমি কোনে বলব না, আপনি এসে বলব। আম্যার বাড়িটা আপনাদের ভালই লাগবে, তাল ইঞ্জিশ মাছ ধাওয়াব, যদি ভিডিও ক্যামেটে ছবি দেখতে চান তাও দেখাব, অৱৰ ভায় উপরে আপনার মণ্ডিক খাটানোর খোরাকও জুটিবে বলে মনে হয়।’

‘আমার অবিশ্য এখন এয়নিতে কোনও এন্গেজমেন্ট নেই—’

‘তা হলে চলে আসুন—ধিধা করবেন না। তবে একটা কথা।’

‘এখানে আমি জড়াও করেকজন থাকবেন। গোড়ার আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টি দিতে চাই না—একটা বিশেষ কারণে।’

‘ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বসছেন?’

‘সেটার হয়তো হয়োজন নেই। অপ্পনি তো ফিল্মটার নন। যাঁরা এখানে থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি তখন আপনাদের ভিন্নভিন্নের জন্য ভূমিকা বেছে নেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেষ্ট করতে পারি।’

‘কীরকম?’

‘আমার প্রপিতামহ বনোয়াবিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর কথা পরে জানবেন, কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি যে তাঁর একটা জীবনী লেখা এমনিতেও বিশেষ দরকার। আপনি যদি ধরন তাঁর সমকে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।’

‘ভেবি তত্ত্ব। আর আমার বনু—মি, গান্ধুলী।’

‘আপনার বাইনোকুলার আছে?’

‘তা আছে।’

‘তা হলে তাকে পক্ষিবিদ করে দিন না। আমার বাগানে অনেক শাখি আসে; তাঁর একটা অকৃপেশন হয়ে যাবে।’

‘বেশ। আমার বুড়ুতো ভাইটি হবেন পক্ষিবিদের ভাইপো।’

‘ব্যাস, তা হলে তো হয়েই গেল।’

‘তা হলে পরত শনিবার শকাল দশটা?’

‘দশটা।’

‘অব্রাহামভী?’

‘অব্রাহামভী। আর আমার নাম শক্রলপ্তপাদ চৌধুরী।’

ফেলুদাকে অবিশ্য টেলিফোনের পুরো ব্যাপারটা আমর জন্য রিপিট করতে হল। বলল, ‘কিন্তু শোক আছে মাদের কঠিনতে এমন একটা ভরসা-জগানো হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব থাকে যে মাদের অনুরোধ এড়ানো কুব ধূশকিল হয়।’

আহি বললাম, ‘এড়াবে কেন? একে তো একরকম মকেল বলেই মনে হচ্ছে। তোমার বোজপারের কথাটাও ভাবতে হবে তো।’

আসলে ফেলুনার একটা ব্যাপার আছে। পৰ পৰ গোটা দুতিন কেনে ভাল রোঞ্জগাঁও হলে কিছুদিনের জন্য গোয়েন্দাপিরিতে ইঙ্গল দিয়ে অন্য জিনিস নিয়ে গড়ে। সে জিনিসে অবিশ্য রোজগাঁও নেই, তখন শব্দের ব্যাপার। এখন ওর সেই অবস্থা চলেছে। এখনকাব মেশা হল আদিম মানুষ। সম্মতি পূর্ব আঁত্রিকার জীবত্ত্ববিদ রিচার্ড লাইকিন একটা সাক্ষাৎকার পড়ে ও জেনেছে যে লীকিন কিছু আবিকাবের ফলে আদিম মানুষের উভয়ের সময়টা এক ধাক্কায় লাখ মাথ বছর পিছিয়ে গেছে। ফেলুদ: এখন আদিম মানুষ ও তার বানর পূর্বৰহস্তার ভাবনায়

সশঙ্গে। পাঁচবার গেছে মিউজিয়ামে, ডিনবার ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর একবার চিড়িয়াঘানা। একদিন বলল, 'একটা হিংস্রিতে কী বলে জানিস?' বলে হানুষ এসেছে অঙ্গীকার এক বিশেষ ক্রমের খুনে বান্ন থেকে, যাকে বলে "কিলার এপ"। আর সেই কারণেই মাকি হানুষের মজায় একটা হিংস্র প্রবৃত্তি বয়ে গেছে—ফেটা প্রকাশ পায় যুক্ত, দাপয় আর খুন-খারাপিস্ট।'

পানিহাটিতে মানুষের এই হিংস্র প্রবৃত্তির কোনও নতুনা ও আশা করছে কি না জানি না, তবে এটা জানি যে মাঝে মাঝে তর কলকাতা হেড়ে অন্তর কিছুক্ষণের ভন্য বাইরে যুরে আসতে ভালই লাগে। এইভো সেইন আমরা লালমোহনবাবুর পাড়িতে পিয়ে বর্ধমানের রাজায় পারুয়ার বিশ্বাত ও তিহাসিক গম্বুজ আর হিন্দু মন্দিরের উপরে তৈরি শোভ্য শতাব্দীর মুসলমান মসজিদ দেখে এলাম।

লালমোহনবাবুর ভাইভাই হরিপদবাবু দশ দিনের ছুটিতে দেশে গেছেন বলে ফেলুনকেই তাঁর জানগা নিতে হল। পথে বেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'দিলেন তো মশাই একটা দয়িত্ব আর একটা বাইসোকুলার আর দুধানা বই ঘাড়ে চাপিয়ে; এনিকে পড়াবে তো কাক-চড়ুই ছাড়া কোনও পাখি কোনওদিন দেখিচি বলে মনে পড়ে না।'

বই দুটো হল সেলিম আলেক উত্তীর্ণ বার্ডস আর অঞ্চল হোমের বাংলার পাখি।

ফেলুদা বলল, 'কুহ প্রদোয়া নেই। মনে ধাখবেন, কাক হল করভাস স্প্রেন্ডেলস, চড়ুই হল পারবে ডোমেটিকাস। সব সময় খ্যাটিন নাম বলতে গেল জিভ জড়িয়ে যাবে, তাই ইংরিজি নামও ব্যবহার করতে পারেন—ফেলন ফিল্ডেকে ভুসো, টুলটুলিকে টেন্স বার্ড, ছত্তারেঁকে জাগল ব্যাবলার। আর পাখি না দেখলেও, মাঝে মাঝে বাইসোকুলার চোখে দাগালেই অনেকটা কাজ দেবে।'

'আমার নামও তো একটা চাই' বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনি হলেন ভবতোষ তিংহ, আপনার ভাইপো প্রবীর আর আমি সোমেশ্বর রাজ।'

পৌনে নটীয় রঞ্জন হয়ে আমরা দশটা বেজে পানিহাটিতে শক্রপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি অমরাবতীতে পৌছে গেলাম। আমাদের গাড়ি দেখেই বন্দুকধারী গৰ্বী দারোয়ান এসে বিকট কঁা-চ শব্দে লোহার পেট খুলে দিল।

ফেলুদা বলে, 'গঞ্জের ক্ষেত্রেই একগাদা বর্ণনা হড় হড় করে দেসে দিলে পাঠক হাবুড়ু খাব; ওটা দিন গঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে।' তাই অধু বলছি—বিশাল অধির ওপর লাল বাড়িটা পেলায়, ধম্মথমে আর অনেকটা বিলিতি কাসুলের ধাচে তৈরি। বাড়ির দক্ষিণে ফুলবাগান, তার পরে গাছপালা রাখার কাচের ঘর, আর তারও পরে ফুলবাগান। নুড়ি বিছানো পঁচালো খথ দিয়ে আমরা সদর দরজায় পৌছলাম।

বাড়ির ঘাসিক পাড়ির শব্দ পেরে বাইরে এসে দাঢ়িয়েছিলেন, আমরা ন্যামলে হেসে বললেন, 'ওয়েলকাম টু অমরাবতী।' এর বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, ফরসা রঁ, বয়স পঞ্চাশ-টপ্পাশ। পরনে পায়জামা আর আন্দির পাঞ্জাবি, পায়ে পাঁড় তোলা লাল চাটি, ডান হাতে চুক্টি।

'আমার পুড়ভুগ্তে ভাই জয়তও কাল এসেছে, তাকেও দমে টেনে নিবেছি। অর্ধাং সে আপনার আসল পরিচয় জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না।'

'অন্যরা কি এসে গেছেন?' ফেলুন্দা জিজ্ঞেস করল।

'না। তারা আসলেন বিকেলে। চলুন, একটু বসে জিরোবেন। আর সেই সুযোগে কিছু কথাও হবে।'

আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকের বিলাটি চওড়া বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে দিয়ে পঙ্গা বয়ে চলেছে, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে থাক ; অমরাবতীর প্রাইভেট ঘাটও দেখতে পাওয়া সামনে ডান দিকে। একটা সেরপের নীচ দিয়ে সিঁড়ি দেমে গেছে জল অবধি।

'ওই ঘাট কি ব্যবহার হয়?' ফেলুন্দা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ বইকী', বললেন শঙ্করবাবু। 'আমার পুড়িমা থাকেন তো এখানে। উনি রোজ সকালে গঙ্গামান করেন।'

'উনি একা থাকেন এ বাড়িতে?'

'একা কেন? আমিও তো দু বছর হল এখানেই থাকি। তিটাগড় আমার কাছের জায়গা। কলকাতায় আমহার্স্ট ট্রাইরে বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি অনেক কাছে হ্যাঁ।'

'আপনার পুড়িমার ব্যাস কত?'

'সেভেনটি এইট। আমাদের পুরনো চাকর অন্ত পুর দেখাশোনা করে। এমনিতে মোটামুটি শক্তই আছেন, তবে ছানি কাটাতে হয়েছে কিছুদিন হল, দাঁতও বেশি থাকি নেই, আর স্বাস্থ্য সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম সুনে যান, খেতে ভুলে যান, মাঝেমধ্যে পান ছাঁচতে বাসেন—এই আর কী। যুব তো এমনিতে খুবই কদ-- বাস্তিবে খট্টা দুয়োকের বেশ নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মাঝা যাওয়ার পর উনি আর কলকাতায় থাকতে চার্জনি। এখানে থাকাটা পুর কাছে একরকম কাশীবাসের হচ্ছে।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর মিষ্টি নিয়ে এল।

'দুপুরে খেতে খেতে সেই একটি-দেক্টা হবে', বললেন শঙ্করবাবু, 'কাজেই আপনারা মিষ্টিটার সংগ্রহালয় বন্দুক। এ মিষ্টি কলকাতায় পাবেন না।'

চারের কাপ হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুন্দা বলল, 'আমাদের আসল আর নকল দুটো পরিচয়ই তো জানেন, এবার আপনাদের পরিচয়টা পেলে ভাল হত। আপনি কি করেন জিজ্ঞেস করাটা কি অসম্ভূত হবে?'

'মোটেই না', বললেন শঙ্করবাবু। 'আপনাকে ডেকেছি তো সব কথা চুলে

বলবার জন্যেই; না হলে আপনি কাজ করবেন কী করে?—সোজা কথায় আমি ইনাম ব্যবসাদার। বুবত্তেই পারছেন, এত বড় বাড়ি যখন মেনটেন করছি তখন ব্যবসা আমার খেটাযুক্তি ভালই চলে।'

'আপনার কি বংশানুকরণিক ব্যবসা?'

'না। এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ—বনোয়ারিপাল চৌধুরী।

'অর্থাৎ যার জীবনী নিবাতে খালি জায়ি।'

'এগজ্যাক্টিলি।' তিনি ছিলেন ক্লাবপুরের ব্যারিষ্টার। অগাধ পয়সা করে শেখ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন; এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন। উনি এখানেই থাকতেন, এখানেই মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদাও ব্যারিষ্টার ছিলেন, তবে তাঁর পসার আমার প্রপিতামহের হস্তে ছিল না। তার দুটো কারণ—জুয়া আর মদ। তার ফলে চৌধুরী পরিবারের অবস্থা কিন্তুটা পড়ে যায়। বাড়িতে বনোয়ারিপালদের কিন্তু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল—সেগুলোর কথায় পরে আসছি—তার কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা বিক্রি করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা, আর তার ফলে বৎসর ভিত্তি খানিকটা মজবুত হয়। তারপর আমি।'

'আর আপনার পুত্রতো ভাই!'

'জ্যোতি ব্যবসায়ে যায়নি।' সে আছে এক এনজিনিয়ারিং ফার্মে। ভালই রোজগার করে, তবে ইদানীং তবেছি ক্লাবে গিয়ে পোকার বেসছে। ঠাকুরদাদার একটা তৃণ পেয়েছে আর কী? জ্যোতি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছেট।'

এই ফাঁকে ফেলুন পকেট থেকে তার থাইক্রোক্যামেট রেকর্ডারটা বার করে চানু করে দিয়েছে। এটা হৎকৎ থেকে আনা। আজকাল মক্কলের কথা বাতাস না দিবে রেকর্ডারে তুলে নেয়, তাতে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

শঙ্করবাবু বললেন, 'আঙ্গীয়ের কথা তো হল, এবার অনাঙ্গীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।'

'তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই', বলল কেশুনা। 'যদিও আমি ধরে উঠে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে আপনার কপালে একটা চন্দনের ফেঁটা দেখতে পাইছি। তার মানে—'

'তার মানে আর কিন্তুই না, আজ হল আমার জন্মতিথি। ফেঁটাটা দিয়েছেন খুড়িমা।'

'জন্মতিথি বলেই কি আজ এখানে অতিরি সমাগম হবে?'

'অতিরি বলতে যাত্র তিনজন। গত বছর ছিল ফিল্টারের বার্ষিকে, সেবারও হেকেছিলাম এই তিনজনকেই। তেবেছিলাম শুই একটি বারই তিথি পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবায়ও করছি। বুবত্তেই পারছেন, এ বাড়িতে যান। একবার এসেছেন, তাঁদের দ্বিতীয়বার আসতে কোনও আপত্তি হবে না।'

'এই বিত্তীয়বারের কারণটা কী?'

শঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'ধূব ভাল হয় আপনারা যদি তা খেয়ে

একবারটি দোতলায় আমেন অমোর সঙ্গে—আমার শুভ্রিমার ঘরে। তা হলে বাকি ঘটনাটা শুধুতে সহজ হবে। আর আমিও ব্যাপ্তিরটা গুছিয়ে বলতে পারব।'

আমরা মিনিটখানেকের মধ্যেই উঠে পড়লাম।

সিডিতে পৌছতে হলে বৈঠকখানা দিয়ে যেতে হয়। এখানে বলে রাখি—
বাহাদুর আসবাব, কাপেট, মখমলের পর্দা, ঝাড়লঠন, শ্বেতপাথরের মূর্তি
ইত্যাদি মিলিয়ে এমন জমজমাট বৈঠকখানা আমি বেশি দেখিনি।

সিডি উঠতে উঠতে ফেলুন্দা বলল, 'আপনার শুভ্রিমা হাজা দোতলায় আর কে
ঢাকেন।'

'শুভ্রিমা ঢাকেন উত্তর প্রাণে', বললেন শক্রবাবু, 'আর দক্ষিণে থাকি আমি।
জয়ত্ব এলেও দক্ষিণেই একটা ঘরে থাকে।'

দোতলার ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে আমরা চুকলাম শুভ্রিমার দরে। বেশ বড় ঘর,
কিন্তু এতে কেনও ঝাঁকজমক নেই। পশ্চিমে দরজার বাইরে আশো আর
বাড়াসের ধরে দেখে বোঝা যায় শদিকেই গঙ্গা। দরজার পাশেই শুভি মাদুরে
বসে মালা জপছেন। তাঁর পাশে একটা হামানদিত্তা, একটা পানের বাটা আর
একটা মোটা বই। নির্ধার রামায়ণ কি মহাভারত হবে। আসবাব বলতে একটা
খাট আর একটা ছেট আলমারি।

আমরা ঘরে চুক্তেই শুভ্রিমা মাথা তুঙ্গে পুরু চশমার ডিত্তৰ দিয়ে আমাদের
দিকে চাইলেন।

'কজন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে', বললেন শক্রবাবু।

'তাই এই ঘাটের মডাকে দেখাতে আনলি?'

আমরা তিনজনে এগিয়ে দিয়ে প্রণাম করতে বৃক্ষ বললেন, 'তা বাপু
তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে, মাম তো মনে থাকবে না। নিজের
নামটাই ভুলে যাই যাবে মাঝে। এখন তো বসে বসে দিন গোনা।'

'আসুন—'

শক্রবাবুর ডাকে আমরা ঘুরলাম। বৃক্ষ আবার বিড়বিড় করে মালা জপতে
শক্র করলেন।

এবার দেখলাম ঘরের উল্টোদিকে বাটের পাশে একটা প্রকাণ সিন্দুর
রয়েছে। শক্রবাবু পকেট থেকে চাবি বার করে সিন্দুরটা খুলতে খুলতে বললেন,
'এবারে আপনাদের যে জিনিস দেখাব সে হল আমার অপিতামহের সম্পত্তি:
রামপুরে থাকতে বহু নবাব-তাতুরদার তাঁর ঘরেলু ছিলেন। এগুলো তাঁদের
উপচোকন। এবই বেশ কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন।
তবে তার পরেও কিন্তু আছে। যেমন এই যে দেখুন—'

শক্রবাবু একটা থলি বার করে তার মুখটা কাঁক করে হাতের তেলোয়
উপুড় করলেন। বানবাস করে কিন্তু গোল চাকতি তেলোয় পড়ল।



‘আমলোরের আমলের মুদ্রা’, বললেন শঙ্করবাবু। ‘দেখুন, প্রত্যেকটিতে একটি করে রাশির ছবি যোদাই করা। এই জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্ত।

‘রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন?’ কেন্দুদা জিজ্ঞেস করল। ‘বারোটা হওয়া উচিত নয় কি?’

‘একটি মিসিং।’

আমরা পরম্পরারের দিকে চাইলাম :

‘আরও জিনিস আছে’, বললেন শঙ্করবাবু, ‘সেগুলো এই আইডির বান্ডটার অধ্যে। সেগুলোর উপর চুনি বসানো ইটলিয়ান নস্যুর কৌটো, জেড পাথরে চুনি আর পান্না বসানো মোগল সূরাপাত, আংটি, লকেট...কিন্তু সে সব আপনারা দেখবেন আজ সক্যাবেলা, সর্বসমক্ষে। এখন নয়।’

‘এর চাবি তো আপনার কাছেই থাকে?’ কেন্দুদা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যা, আমার কাছেই। একটি চুপলিকেট আছে, থাকে খুড়িমার আলমারিতে।’

‘কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় বেন?’

‘এ ঘরটা অঙ্গীতে ছিল আমার প্রিন্সিপায়ের ঘর। সিন্দুক তাঁরই আমলের। ওটা আর সরাইলি। আর কড়া পাহাড়া আছে গেটে, এ ঘরে খুড়িয়া প্রাণ সর্বক্ষণ থাকেন, তাই এক হিসেবে ওটা এখানে ঘথেট সেফ।’

আমরা আবার নীচের বারান্দায় ফিরে এলাম। কেয়ারে বসার পর কেন্দুদা টেপ্রেকর্নার চাপ্প করে দিয়ে বলল, ‘একটি মুদ্রা মিসিং হল কী করে?’

‘সে কথাই তো বলছি, বললেন শক্রবাবু। তিনজনকে উইক এন্ড নেমস্টন্স করেছিলাম গত জন্মতিথিতে। একজন হলেন আমার বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল। আরেকজন এখানকারই ভাঙ্গার অর্বেন্দু সরকার। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালীনাথ রায়। ইনি ইঙ্গলে আমার সহপাঠী ছিলেন; পঁঠত্রিশ বছর পর আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমার প্রপিতামহের মহামূল্য সম্পত্তির কথা এরা সকলেই উনেছিলেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তিরে ডিনারের পর জয়স্ত সিন্দুক থেকে বৰ্ষমুদ্রার থলিটা বার করে নীচে বৈষ্ঠকথান্বয় আনে। কয়েনগুলো টেবিলের উপর দুড়িরে রেখেছি, সকলে বিবে দেখছে, এমন সমস্ত হল শোজশেডিং। যার অঙ্গকার। এটা অবিশ্য অস্থান্তরিক ঘটনা নহ। চাকর দুর্মিনিটের ঘণ্টে মোমধাতি নিয়ে আসল, আমি কয়েনগুলো তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রেখে এলাম। একটা যে কমে গেছে সেটা তখন খেয়াল করিনি। এফন যে হতে পারে ফলনাও করিনি। পরদিন সকলে চলে যাবার পর ঘনে একটা খটকা লাগাতে সিন্দুক তুলে দেখি কক্ষ রাশির মুদ্রাটি নেই।’

‘কয়েনত্বে আপনিই তুলে রেখেছিলেন?’

‘হ্যাঁ, আমি। ব্যাপারটা বুঝুন মি. হিস্টির। তিনজন নিয়ন্ত্রিত। একজনকে পঁচিশ বছর চিনি—আমর বিজনেস পার্টনার। অর্বেন্দু সরকার হলেন ভাঙ্গার এবং ভালই ভাঙ্গার। ঘৃন্দা টিটাগড় থেকে কল আসে ওঁৰ। আর কালীনাথ আমার বালবেকু।’

‘কিন্তু এদের সকলকেই কি অনেক শোক বলে আনেন আপনি?’

‘সেখানেই অবিশ্য গুণগোল। কাঞ্জিলাসের কথা ধরুন। ব্যবসায় অনেকেই জেনেগুনে অসৎ পছ্য নেয়, কিন্তু কাঞ্জিলালের মতো এমন অস্তান বাদমে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি। আমাকে ঠাণ্ডা করে বলে—তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও, তোমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।’

‘আর অন্য দুজন?’

‘ভাঙ্গারের কথা আমি জানি না। ঘৃন্দা যাকে যাকে বাতে জোগেন, ভাঙ্গার তাঁকে এসে দেবে যান। এর বেশি জানি না তবে কালীনাথ বোধহয় গভীর জঙ্গের মাছ। এক দুগ দেখে নেই, হঠাতে একদিন টেলিফোন করে আমার কাছে এল। বলল—ব্যস যত বাড়ছে ততই পুরনো দিনের কথা হনে পড়ে। তাই একবার ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি।’

‘আপনি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন?’

‘তা চিনেছিলাম। তা ছাড়া ইঙ্গলের বহু পুরনো পক্ষ করল। সে যে আমির সহপাঠী ভাতে সন্দেশ নেই। গোলমালটা হচ্ছে, সে যে এখন কো করে তা কিন্তুভেই ভেঙ্গে বলে না। জিজেস করলেই বলে, ধরে নাও তোমারই মতো ব্যবসা করে। এদিকে শুধ যে নেই তা নয়। কুব আমুদে বসিক শোক। ইঙ্গলে

থাকতে ম্যাজিক দেখাত, এখনও সে অভ্যাসটা রেখেছে। যাত সাফাই গ্রীতিমতো তাই।'

'আপনার ভাইও তো অস্বাক্ষরের মধ্যে যাবে ছিলেন।'

'সে ছিল। তবে সে তো এ জিনিস আগে দেখেছে, তাই সে টেবিলের কাছে ছিল না। নিয়ে আবলে ওই তিনজনের একজনই নিয়েছে।'

'তারপর আপনি কী করলেন?'

'কী আগু করতে পারি বলুন। এমন সোক আছে যারা এই অবস্থায় সোজাসুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাত। কিন্তু আমি পারিনি। এই তিনজনের সঙ্গে বসে কত ব্রিজ খেলেছি, আর তাদের একজনকে বলব চোর।'

'তার মানে শ্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?'

'শ্রেফ হজম করে গেলাম। ফলে এখনও কেউ জানেই না যে আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছি। সেই ঘটনার পরেও তো এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কতবার, কিন্তু কেউ তো কোনওরকম অসোমান্তি বা অপরাধ বোধ করছে বলে মনে হয়নি। অস্থচ আমি জানি যে এই তিনজনের মধ্যেই একজন দেষী। একজন চোর।'

আমরা তিনজনেই চুপ; ঘটনাটা অন্তত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা যায়?

আদুর হনের প্রশ্নটা হেলুদাই করল। শক্তরবাবু বললেন, 'এরা জানে যে আমি এদের সন্দেহ করি না। তাই এদের আবার ডেকেছি, এবং আজ রাত্রে আমি আবার এদের সাথনে বনোয়ারিলালের কিন্তু মূলাবান জিনিস বার করব। ধার্মবানেক থেকে ধড়ির কাটায় কাটায় সক্ষা সাক্ষায় লোডশেডিং হচ্ছে এখানে। তার ঠিক আগে আমি জিনিসগুলো টেবিলে সাজাব। যত জাবার অস্বাক্ষর হবে। আশা করছি সেই অস্বাক্ষরে চোরের প্রত্যন্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে এই সম্পত্তির মূল্য চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখের কম নয়। হয়তো আমার কুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিষ্ণাস চোর সোজ সামলাতে পারবে না। চুরির পর আপনি আপনার আসল ভূমিকায় অবস্থীর্ণ হবেন। তখন এদেশ মিতিয়ের কাজ হবে চোর ধরা এবং চোরাই মাল বার করা।'

কেলুদা বলল, 'আপনার ভাই এ সমস্কে কী বলেন?'

'সেও তো কাল অবধি কিন্তুই জানত না', বললেন শক্তরবাবু, 'কাল আপনাকে ইনভাইট করার পর ওকে বলি।'

'উনি কী বললেন?'

'বুর চোটগাট করল। বললে—তুমি অ্যান্ডিম চেপে রেখেছ ব্যাপারটা—তখন তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মি. মিতির কিন্তু করতে পারবেন, ইন্ডিয়া।'

'একটা কথা বলব মি. চৌধুরী?'

'বলুন।'

‘আপনি মনুষটা এ নবম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল । অতিথিকে ছুরির অপবাদ দিতে সবাই পেছপা হত না ।’

‘সেটা জানি । দেই জনাই তো আপনাকে ভাকা । আমি ষেটা পারিনি, সেটা আপনি পারবেন ।’

॥ ২ ॥

সরবে নাট্য দিষ্টে চমৎকার গঞ্জার ইলিশ সহেতু দুপুরের খাওয়াটা হল ফার্স্ট ক্লাস । জয়স্বরাবুর সঙ্গে আলাপ হল বাবার টেবিলে । ইনি খাবারি হাইটের চেয়েও কম, বেশ সুস্থ, সবল মানুষ । শঙ্করবাবুর পার্সোনালিটি এর নেই, কিন্তু বেশ হাসিমুশি চাপাক চতুর সোক ।

বাবার পর শঙ্করবাবু বললেন, ‘আমাদের এখন আর ডিস্টাৰ্ব কৰব না, যা মন চায় কৰোন । আমি একটু গড়িয়ে নিই । বিকেলে চায়ের সময় বারান্দায় আবার দেখা হবে ।’

আমরা জয়স্বরাবুর সঙ্গে বাড়ির আশপাশটা যুক্তে দেখব বলে বেতোলাম ।

পশ্চিম দিকে একটা ন্যূন ধারাগাঁওয়ালা পাঁচিল চলে গেছে নদীর ধার দিয়ে । পাঁচিলের পরেই জমি তালু হয়ে নেমে গেছে জল অবধি । এই পাঁচিলই বাকি তিনদিকে হয়ে গেছে দেড় মানুষ উঁচু ।

জয়স্বরাবুর যুলের শব্দ, তাই তিনি আমাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে গোলাপ সমস্কে একটা ছোটখাটো বক্সে দিয়ে দিলেন । গোলাপ যে তিনশো বুকমের হয়তা এই প্রথম জানলাম ।

বাড়ির উত্তরে গিরে, দেৰখাম সেদিকে আর একটা গেট রয়েছে । শহরে কোথাও যেতে হলে এই গেটটাই নাকি ব্যবহার কৰা হয় ।

আরেকটা সিডিও রয়েছে এদিকে । জয়স্বরাবু বললেন বুড়িমা, মানে উঁর মা, গঙ্গাশানে যেতে শুটাই ব্যবহার কৰেন । একতলায় নদীর দিকে আর পঙ্গার দিকে চওড়া বারান্দা, মুদিক দিয়েই সিডি রয়েছে নীচে নামার জন্য ।

দেখা শেষ হলে পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম । জয়স্বরাবু কাচের ঘরে চলে গোলেন অকিঞ্চ দেখার জন্য ।

আমাদের থাকার জন্য একটা প্যাসেজের এক দিকে পর পর দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে । উল্টোদিকে আরও তিনটো পাশাপাশি ঘর দেখে মনে হল তাতেই বোধহয় তিনজন অতিথি থাকবেন । ঘরে ঢুকে বাহারে থাটে নবম বিহানা দেখে সালোমোহনবাবু বোধহয় দিবানিদ্রার তাল কৱছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, ‘পাথির বইগুলোতে একবার সেখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার ।’

আমি একটা কথা হেলুদাকে না ভিজেস কৰে পারলাম না ।

‘অচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এখার আর চুরি না করে, তা হলে তুমি তোর ধরবে কী করবে?’

ফেন্দুদা বলল, ‘সেটা এই তিন ভদ্রলোককে স্টাডি না করে বলা শত। যার মধ্যে চুরির অব্যুতি রয়েছে, তার সঙ্গে আর পাঁচটা অনেক লোকের একটা সূক্ষ্ম ভঙ্গাত থাকা উচিত। চোখ-কান খোলা রাখলে সে তফাত ধরা পড়তে পারে। তুলিস না, যে লোক চুরি করে তার বাইরেটা যতই পালিশ করা হোক না কেন তাকে আর ভদ্রলোক বলা চালে না। সত্যি বলতে কী, ভদ্রলোক সাজার জন্য তাকে যথেষ্ট অভিয় করতে হয়।’

বিকেলে পৰি পৰি দুটো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে খুঁকলাম অভিধিরা এসে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আয়োজন হলে পৰি শক্তরবাবুই আমাদের তেকে নিয়ে গেলেন তিন গেটের সঙ্গে আঙ্গাপ করানোর জন্মে।

ডা. সরকার এক মাইলের মধ্যে থাকেন, ইনি হেঁটেই এসেছেন। বছর পঞ্চাশ বছর, চোখে চৰমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, গোফটা কাঁচা হলেও কানের পাশের চুলে পাক থাকে।



নরেশ কাঞ্জিলাল বিরাট মন্দির, ইনি সুট-টাই পৰে সাহেব সেজে এসেছেন ফেন্দুদাৰ পৰিচয় হেলে বললেন, ‘বনোয়াৰিলালের জীবনী লেখাৰ কথা আমি শক্তৰকে অনেকবার বলেছি। আপনি এ কাজের ভাবটা নিয়েছেন শুনে খুশি হলাম; হি শোভা এ বিমার্কেণ্ড ম্যান।’

মজাব লোক হলেন কালীনাথ রায়। এর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, তাতে হয়তো ম্যাজিকের সরঞ্জাম থাকতে পারে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতেই বললেন, 'পক্ষিবিদ যে মুরগির ডিম পকেটে নিয়ে দোরে তা তো জানতুম না অশাই।' কথাটা বলেই বপ্ন করে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মুরগির ডিমের সাইজের মসৃণ সাদা পাথর বার করে দিয়ে আঙ্গুপের সুরে বললেন, 'এ হে হে, এ যে দেখেছি পাথর! আমি তো ক্ষাই করে বাবার মতলব করেছিলুম।'

কথা হল বাতিলের ধাবার পর কালীনাথবাবু তাঁর হাতসাফাই দেখাবেন।

সূর্য হেলে পড়েছে, গঙ্গার জল চিক চিক করছে, খিরকিরে হাওয়া, তাই বোধহয় নরেশবাবু আর কালীনাথবাবু লেন্দে গেলেন বাইরের শোভা উপভোগ করতে। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্থুস্থু করছিলেন, এবার বাইনোকুলার কান করে উঠে পড়ে বললেন, 'দুপুরে যেন একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের ডাক উনেছিলুম। দেখি তো পাখিটা আশেপাশে আছে কি না।'

ফেলুদার গঠন মুখ দেখে আরিও হাসিটা কোনওমতে চেপে গেলায়।

ডাঙুর সরকার চায়ে চুমুক দিয়ে শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার ভাতাটিকে মেখছি না—সে কি বাগানে ঘুরছে নাকি?'

'ওর ফুলের নেশারে কথা তো আপনি জানেন।'

'ওকে তো বলেছি মাথায় টুপি না পরে যেন ঘোদে না ঘোরেন। সে আদেশ তিনি মেনেছেন কি?'

'জয়ন্ত কি ডাঙুরের আদেশ মানার লোক? আপনি তাকে চেনেন নাঃ'

ফেলুদা যে চারমিনার হতে আড়চোখে ডাঙুরের কথাবার্তা হাবতাব শক্ষ করে যাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

'আপনার বুড়িমা কেমন আছেন?' শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ডা. সরকার।

'এমনিতে তো জাই', বললেন শঙ্করবাবু, 'তবে অস্তিত্ব কথা বলছিলেন যেন। আপনি একবার টু থেরে আসুন না।'

'ভাই যাই।'

ডা. সরকার তলে গেলেন বুড়িমাকে দেখতে। আয় একই সঙ্গে জয়ন্তবাবু ফিরে এলেন বাগান থেকে—ঠেটের কোণে হাসি।

'কী ব্যাপার? হাসির কী হস?' জিজ্ঞেস করলেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু তি পট থেকে কাপে তা তেলে নিয়ে ফেলুদাকে দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার বক্স কিনু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন পক্ষিবিদের।'

ফেলুদাও হেসে বলল, 'অভিনয় তো আজ সকলকেই করতে হবে অজ্ঞবিদের। আপনার দাদার পরিকল্পনাটাই তো নাটকীয়।'

জয়ত্বাবু গঞ্জির হয়ে গেলেন।

‘আপনি কি নানার পরিকল্পনা আয়ুক্ষণ করেন?’

‘আপনি করেন না বলে আনে হচ্ছে’ বলল ফেলুন।

‘মোটেই না’, বললেন জয়ত্বাবু। ‘আমার ধারণা চোর অত্যন্ত সেয়ানা শোক। সে কি আর বুঝবে না যে তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে সে কি জানে না যে দানা অ্যান্ডিনে টের পেয়েছে যে সিল্কের একটি মূল্যবান জিনিস গায়েধ হয়ে গেছে’

‘সবই বুঝি’, বললেন শক্রবাবু, ‘কিন্তু তাও আমি ব্যাপারটা ত্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও এটা আমার পোয়েন্ডা কাহিনী শ্রীতির ফল।’

‘তুমি কি সিল্কের বাকি সব জিনিসই বার করতে চাও?’

‘না। শুধু ইউরিয়ান মসিয়ার কৌটো আর মোগলাই সুরাপাত্র। ডা. সরকার খুড়িমাকে দেখতে গেছেন। উনি এলেই তুমি ওপরে গিয়ে জিনিস দুটো বার করে আনবে। আমি পকেটে রেখে দেব। এই নাও চাবি।’

জয়ত্বাবু অনিষ্টার তাব করে চাবিটা নিলেন।

মিনিট পাঁচকের মধ্যে ডা. সরকার ফিরে এলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘দিবি ভাল আছেন আপনার খুড়িমা। বাবান্দায় বসে দুখতাত খাচ্ছেন। আপনাদের আরও অনেকদিন জ্বালাবেন।’

জয়ত্বাবু চুপচাপ উঠে পড়লেন।

‘কী বসে আছেন চেয়ারে?’ ফেলুন্দার দিকে ফিরে বললেন ডা. সরকার। ‘চখুন একটু হাওয়া খাবেন। এ হাওয়া কলকাতাত পাবেন না।’

শক্রবাবু সমেত আমরা চারজনই সিডি দিয়ে নামলাম। বায়ে চেয়ে দেখি লালমোহনবাবু বাগানের মাঝবালে একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির পাশে দাঢ়িয়ে চেয়ে বাহিনোকুলার লাগিয়ে অদিক ওদিক দেখছেন। ‘পেলেন আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা।’

জিজেস করল ফেলুন।

‘না, তবে এইমাত্র একটা জাপেল ব্যাবলার দেখলুম মনে হল।’

‘এখন পাখিদের বাসায় ফেরার সময়’, বলল ফেলুন। ‘এর পরে প্যাচ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।’

বাকি দুজনে গেলেন কোথায়? বাড়ির সামনের দিকে কি, না কাচের খয়ের পিছনে অল্পবাগানে?

শক্রবাবুর বোধহয় একই প্রশ্ন মনে জেগেছিল, কারণ উনি ইাক দিয়ে উঠলেন—‘কই হে, নয়েশ? কলীনাথ শেলে কোথায়?’

‘একজনকে দেখলুম এদিকের সিডি দিয়ে বাড়ির ভেতর চুকড়ে’, বললেন লালমোহনবাবু।

‘কোন্ত?’ ‘প্রশ্ন করলেন শক্রবাবু।

‘বোধহয় সেই ম্যাজিশিয়ান অন্তর্লোক।’

কিন্তু গালমোহনবাবু ভুল দেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কাশীনাথবাবু নয়, নরেশ কাঞ্জিলাল।

‘সঙ্গের দিকে আপ করে টেমপারেচারটা পড়ে’, বললেন কাঞ্জিলাল, ‘তাই অভ্যন্তরে চাপিয়ে এলাম।’

‘আর কালীনাথ?’ প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

‘মে তো বাগানে নেমেই আলাদা হয়ে গেল। বলছিল ওকনো ফুসকে টাটকা করে দেবার একটা ম্যাজিক দেখাবে, তাই—’

মি. কাঞ্জিলালের কথা আর শেষ হল না, কারণ সেই সময় বুড়ো চাকর অনন্তর চিৎকার শোনা গেল।

‘বাদাবাবু!'

অনন্ত গঙ্গার দিকে বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে নেয়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটে এল আমাদের দিকে।

‘কী হল অনন্ত?’ শঙ্করবাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করে এগিয়ে গেলেন।

‘ছেট সানা বাবু অভ্যন্তর হয়ে পড়ে আছেন দোতলায়।’

॥ ৩ ॥

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যাঙ্কিং পেরিয়েই খুড়িমার ঘর, সেটা আগেই বলেছি। অয়স্তবাবু সেই ঘরের চৌকাটোর হাত তিনেক এদিকে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর শাখার পিছনের যেকোনে আনিকটা রজ ছুইয়ে পড়েছে।

ডাক্তার সরকার দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবচেয়ে আগে পৌঁছে অয়স্তবাবুর নাড়ি টিপে ধরলেন। ফেলুন্দাও প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছে অয়স্তবাবুর পাশে হাঁটু গেড়ে দসেছে। তাঁর মুখ পর্তীর, কপালে খাঁজ।

‘কী মনে হচ্ছে?’ চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

‘পাল্স সামনা দ্রুত’, বললেন ডা. সরকার।

‘শাথার জন্মগতি?’

‘মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে। এই সময় খালি মাথায় রোদে ঘোরা দেনজারাস সেটা অনেকবার বলেছি ওকে।’

‘কলকাতান—?’

‘সেটা তো পরীক্ষা না করে বগা সংস্করণ না। আজ আবার আমি যত্নপাতি কিনুই অনিনি সঙ্গে : একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হ্ত।’

‘তাই করুন না। গাড়ি তো রয়েছে।’

অন্তর্লোক বেশ ভাল ভাবেই অভ্যন্তর হয়েছে, কারণ ফেলুন্দা সমেত চারজন প্রাথরি করে গাড়িতে তোলার সময়ও তাঁর জ্ঞান হল না : সিঁড়ি দিয়ে আমার

সহয় অবিশ্য কালীনাধৰাবুর সঙ্গে দেখা হল। বললেন, 'আমি জান্ট গুৰুত্ব আবাব জন্য ঘৰে গোছি—আৱ তাৰ মধ্যে এই কাণ্ড।'



'আমি সঙ্গে আসব কি?' শঙ্কুবাবু ভাঙ্গাৰকে জিজ্ঞেস কৰলেন।

'কোনও দৱকাৰ নেই', বললেন ডা. সুধকাৰ, 'আমি হাসপাতাল থেকে আপনাকে কোন কৰব।'

পাড়ি চলে গেল। এই দুঃটিনার জন্য শঙ্কুবাবুৰ প্র্যান যে ভেন্টে গেল সেটা বুঝতে পাৱছি। বেচাৰি ভদ্ৰলোকৰ জন্মতিথিতে এমন একটা ঘটনা ঘটাৰ জন্য আমাৰও খাৰাপ লাগছিল।

আমৰা সবাই এসে বসবাৰ ঘৰে বসেছিলাম, প্ৰায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুন্দা কেল যে, 'আমি আসছি' বলে বলে উঠে গেল তা জানি না। অবিশ্য খিনিট দুয়েকেৰ মধ্যে আবাব হিৱে এল।

শঙ্কুবাবু আতিথিদেৱ সামনে যথাসন্তোষ আভাৰিক হাসিখুশি ব্যবহাৰ কৰছিলেন। এমনকী তাৰ আশৰ্য প্ৰিপোমহ সকলে অনুভ সব ছটনাৰ বলছিলেন, কিন্তু আমি বুঝতে পাৰছিলাম যে সেটা কৰতে তাৰ বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

প্ৰায় ঘটাৰখানেক এইভাবে চলাৰ পৰ হাসপাতাল থোকে ডা. সুধকাৰেৱ কোন এল। জয়ন্তবাবুৰ জ্ঞান হয়েছে। তিনি অনেকটা ভাল। মনে হচ্ছে কাল সকালেই আসতে পাৰবেন।

এই সুখবৰেৱ পৰ অবিশ্য ঘৰেৱ আবহাওয়া বানিকটা হালকা হৈ, কিন্তু

আমি জানি যে শক্তরবাবুর মোটেই তাল লাগছে না, কারণ চোরের রহস্যই থেকে যাবে।

শাওয়া দাওয়ার পর, ভিত্তি-ক্যাসেট ছবি দেখতে চাই কি না জিজ্ঞেস করাতে আমরা সকলেই না বলতাম। এ অবস্থায় কুর্তি চলে না। তাই ম্যাজিকও বাদ পড়ল।

সকলকে গুড নাইট জানিয়ে নিজেদের ঘরে আসতেই আমি যে প্রশ্নটা ফেলুনকে করব ডাবছিলাম, সেটা লালমোহনবাবু করে ফেলেন।

‘আপনি তখন ফসু করে বেরিয়ে কোথায় গেলেন যশাই?’

‘কুড়িয়ার ঘরে।’

‘কুড়িয়াকে দেখতে গেসলেন?’ অবিশ্বাসের মুরে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

‘মেই সঙ্গে অবিশ্য সিল্কের হাতল ধরে একটা টানও দিয়ে এলাম।’

‘কোনা নাকি?’

‘বন্ধু। সেটাই বাভাবিক। যে ভাবে ঘরের দরজার দিকে পা করে পড়েছিলেন অন্দরোক, তাতে মনে হয় ধরে তোকার আগেই পড়েছেন।’

‘কিন্তু চাবিটা কোথায় ফেলুন?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম। প্রশ্নটা কিন্তু কিন্তু থেকেই আমার মাথায় মুরাহিল।

ফেলুন বললে, ‘শক্তরবাবু হয়তো দুর্ঘটনায় খটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।’

কথাটা বলতে বলতেই শক্তরবাবু এসে চুকলেন অংখাদের ধরে। ‘দেখুন তো কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল!’ বললেন অন্দরোক। ‘জয়তর আর একবার এরকম হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেশারটা একটু বেশি নেমে যায় মাঝে যাবে।’

‘ফোনে আর কী বললেন ডাঃ সরকার?’

‘সেটাই তো বলতে এলাম। তখন লোকজনের সামনে বলিনি। চাবির কথাটা তো গোলমালে ভুলেই গিয়েছিলাম; এখন কী হয়েছে জানেন তোঁ। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে বললেন জয়তর কাছে জাবি ছিল না। হয়তো অজ্ঞান হবার সময় হত থেকে পড়ে গেছে।’

‘ও’ পনি খুঁজেছেন চাবি?’

‘তন্ম ভন্ম করে। সিডি, স্যান্ডি, মদর দগ্ধজ্বার বাইরে, কোথাও বাদ দিইনি। সে চাবি হাঁওয়া।’

‘যাকগে, ভুল্পিকেট আছে তো’, বলল ফেলুন। ‘ও নিয়ে ভাববেন না।’

‘তা না হয় ভাবব না’, গঁজীরবাবে বললেন শক্তরবাবু, ‘কিন্তু রহস্য তো দূর হল না। চোর তো অজ্ঞাতেই রয়ে গেল। আর আপমাকে একটা মাথা খেলানোর মুখোগ দেব ভেবেছিলাম, সেটাও হল না।’

‘তাতে কী হল?’ ফেলুন বলল। ‘এখানে এসে লাভ হয়েছে বিক্রি। একে এরকম বাড়ি, তার উপর আপনার আতিথেয়তা।’

শঙ্করবাবু যাবার আগে বলে গেলেন যে সকালে সাড়ে ইটায় চা দেবে, আর আটটায় ব্রেকফাস্ট।

‘এটা অ্যাটেম্প্টেড মার্জার ময়তো মশাই?’ লালমোহনবাবু ফিস ফিস করে প্রশ্ন করলেন। ‘মি. কাঞ্জিলাল আর মি. ম্যাজিপিলান মুজনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে চুক্তিলেন।’

‘মার্জারের দরকার কী? কার্যসিদ্ধির জন্য তো শুধু অজ্ঞান করলেই চলে।’

‘কার্যসিদ্ধি?’

‘জয়স্তবাবুকে অজ্ঞান করে তাঁর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুর খুলে যা বার করার ব্যব করে আবার হ্যাতে চাবি তাঁজে দিয়ে চলে আসা।’

সর্বনাশ! এটা তো খেয়াল হয়নি আমার। আমি বললাম ‘তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে তো এখন তিনজনের জায়গায় সাসপেন্স ম্যান দুজন—কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ।’

‘নারে তোপ্সে’, বলল ফেলুন। ‘ক্যাপারটা অত সহজ নয়। জয়স্তবাবুর মাথায় কেউ ধাক্কি দেবার পেটা তিনি জ্ঞান হলে বলতেন; তা তো বলেননি। আর অজ্ঞান করে যে সিন্দুর খুলবে সেটাই বা কী করে সন্দেহ—খুড়িয়া তো ঘরে থাকতে পারেন। একজন বাইরের লোক সিন্দুর খুলচে দেখলে কি তিনি চুপ করে থাকতেন?’

একটা আশার আলো জুলতে না জুলতে নিজে গেল। আমি তবে পড়েছিলাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আর ঘুমোনো হল না। ইঠাং আঘাতের ঘরে এসে নিচু গলাট বললেন, ‘বারান্দায় গেসলুন। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, খশাই—উপচে পড়ে আলো।’

‘উপচে নয়, উছলে’, বলল ফেলুন।

‘সরি, উছলে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দুশ্য দেখবেন না কখনও।’

‘আপনি একা কাব্যি করবেন, এটা হতে দেওয়া থায় না’, বলস ফেলুন। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে গিয়ে মনে হল এ ধেন দিনের বেলায় দৃশ্যের চেয়েও তের বেশি শুন্দর। একটা পাতলা কুম্হা মনীর ওপরটাকে থায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। গঙ্গার আবহ্য পাতৃ জলের উপর ছড়ানো চাঁদির টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। শুরই মধ্যে কিন্দির ডাক, হাসনুহানার গান, ফুরফুরে বাতাস, সব শিল্পে সত্যিই অস্বাবহ্য।

ফেলুন ত্রয়োদশীর চাঁদটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ‘চাঁদের ঘাটিতে শান্তবের পা পড়েছে এব মজা কেনওদিন নষ্ট করতে পারবে না।’

‘একটা মাঝারুক পোষেষ আছে চাঁদ নিয়ে’, বললেন লালমোহনবাবু।

‘আপনার এথিনিয়াম ইন্সিটিউশনের সেই বাংলার শিক্ষকের লেখা?’

‘ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মন্ত্রিক। এই পোড়া দেশে লোকটা রেফগনিশন পেলে না, কিন্তু আপনি তুন কবিতাটা। শোনো, তৎপেশ।’

এতক্ষণ আমরা নিজু গলায় কথা বলছিলাম। কিন্তু আবৃত্তির সময় লালমোহনবাবুর গলা আপনা থেকেই চড়ে গেছে।

‘আহা, দেখ চান্দের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যাখালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একঘালি
যেন মন্ত্র কাটা নব পড়ে আছে নভে—
সেটুকুও নাহি থাকে, যবে
আসে অস্বাবস্যা—
সেই রাতে ভূমি ভাই
অচ্ছ্রম্পণ্যা।’

বুঝতেই পারছ, তৎপেশ, পদচাটা একজন সেজিকে অ্যাড্রেস করে শেখা।

‘একজন সেজিকে তো আপনি আবৃত্তির ঠেলায় ঘর থেকে টেনে বার করেছেন দেখছি।’

ফেলুদার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। এই যে বুড়িমায় ঘর। বৃক্ষ বারান্দার দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মিনিটখানেক এদিক ওদিক দেখে আবার তিতরে চুক্কে গেলেন।

এর পরে আমরা ঘাটের সিঁড়িতে শিয়ে বসেছিলাম আধ ঘণ্টা। মনমেজাজ শাজা, রাতের খাওয়া ইভম। তাত্রপর এক সময় ফেলুদা তার হাতঘড়ির রেডিয়াম ভাষাল চোবের সামনে ধরে বলল, ‘পৌনে এক।’

আমরা তিনজনেই উঠে পড়লাম, আর তিনজনেই একসঙ্গে তনলাম শব্দটা। সেটা যেন আসছে বাড়ির দোতলা থেকেই।

ঘট ঘট ঘট ঘট ঠং ঘট ঘট...

আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম।

‘সিদ কগটিহে সাকি হশাইঃ’ লালমোহনবাবু ফিল্মস করালেন। আলো জুলছে। আওয়াজটা আসছে খই ঘর থেকে।

ঘট ঘট ঘট ঘট ঠং ঠং...

বিলু এই ঘর ছান্তা ও আরেকটা ঘরে আলো জুলছে। দশিল দিকের ঘরটা। খোলা আনালা দিয়ে দেখে যাচ্ছে একজন লোক দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে:

এবার লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘মি. কাঞ্জিলাল’, বলল ফেলুদা। ‘ওটাই শক্তরবাবুর ঘর।’

‘এই যাবারাত্তিরে কী আলোচনা মশাইঃ’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করালেন।

‘জানি না’, বলল ফেলুন। ‘যথবসা সংক্রান্ত কিছু হবে।’

‘আপনাদেরও ঘূর্ম আসছে না?’

নতুন গলা পেয়ে চমকে উঠে দেখি ধ্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবু।

জন্মলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। বট বট শব্দটা এখনও হয়ে চলেছে।
কালীনাথবাবুর ঘাড় ঘূরে গেল সেই দিকে।

‘কীসের শব্দ ঘূরতে পারছেন তো?’ প্রশ্ন করলেন জন্মলোক।

‘হামানদিক্কা কি?’ ফেলুন বলল।

‘ঠিক বলেছেন। এই মাঝবাসিনীর বুড়ি পান ছাঁচতে বসেন। এ শব্দ আগেও
পেয়েছি।’

কথাটা বলে হাতের তেলোর আড়ালে দেশলাই জালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে
ফেলুনার দিকে একটা সেয়ালা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘বনোয়ারিলালের জীবনী
লেখার জন্য গোয়েন্দার দরকার হল কেন?’

আমি তো বললো না কেন মি. মিত্রিঃ এ শব্দ অনেক ঘাটের জল খেয়েছে।
অনেক কিছু দেখে তনে চোখ কান দুইই খুলে গেছে।’

ফেলুনা একদৃষ্টি চেয়ে আছে জন্মলোকের দিকে। তারপর বলল, ‘আপনি কি
রহস্যই করবেন, না খুশে বলবেন?’

‘খুলে আর কজনে বলতে পারে মি. মিত্রিঃ স্পষ্টবর্তা আর কজনে হয়।
বেশির ভাগই তো খুখচোরা। আর দুঃখের বিষয়, আমি যে সেই দলেই পড়ি।
আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার। তবে আপনাকে আমি একটা
কথা বলতে চাই। এখানে এসে আপনার পেশটাকে কাজে লাগানোর কথা খুলে
যান। অমরাবতীতে এসেছেন, দুদিন ফুর্তি করে গঙ্গার হ্রত্বে খেয়ে ফিরে যান।
নইলে বিপদে পড়তে পারেন।’

‘আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।’

কালীনাথবাবু নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

‘লোকটা অনেক কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে।’ চাপা গলায় বললেন
লালমোহনবাবু।

‘একটা জিনিস তো জানতেই পারে’, বলল ফেলুনা।

‘কী?’ আমরা দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

‘চুরিটা কে করেছিল। যে করেছিল সে তো ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।’

আমি বললাম, ‘কিছু সেটা জো উনি নিজেও করে থাকতে পারেন। উনি তো
হ্যাত সাফাই জানেন।’

‘গেজ্যাস্টলি’, বলল ফেলুনা।

সাড়ে ছাঁটায় বেজ টি না দিলে হয়তো ঘূম ভাঙতে আবার দেরি হত, কিন্তু ফেলুনকে দেখে খনে হল সে অনেকস্থপ আগেই উঠেছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'ওধু উঠেছি নয়, এর মধ্যে একটা চকুরও মেরে এসেছি।'

'কোথায়?'

'শহরের দিকে।'

'কী দেখলে?'

'কী দেখলাম না সেটাই বড় কথা।'

'কিছু বুঝতে পারলে?'

'পানিহাটিতে আসা বৃথা হয়নি এটা বুঝেছি।'

জালমোহনবাবু এসে বললেন এমন সলিড ঘূম নাকি ওর অনেকদিন হয়নি।

'শুভ্রিমার উঠতে দেরি দেবে তিনিও খুব সলিড ঘূমিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে',
বলল ফেলুন।

আমি বললাম, 'সেটা আবার কী করে জানলো?'

'অন্তরে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল মা-ঠাকুরপ এপনও গঢ়াচ্চানে
যাননি। এমনিতে ছটার মধ্যে নাকি ওর জ্ঞান স্যরা হয়ে যায়।'

আমরা তিনজন বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম, মিনিট দশকের মধ্যে শক্রবাবু
এসে পড়লেন। স্লান-টান সেরে ফিটফাট।

'আমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছি, মি. চৌধুরী', বলল ফেলুন। 'আপনার বালাবন্ধু
আমার চিনে ফেরেছেন।'

'দে কী!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। অন্দরোক গলীর জলের মাছ।'

'তা হলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেবা?'

'তা হলে কিছু সেই সঙ্গে আপনার জানিয়ে দিতে হবে আপনি কেন আমাকে
ভেকেছেন। অর্ধাং একদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে
হবে।'

শক্রবাবুর কপালে আবার দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাঞ্জিলাল আব কালীনাথবাবু বারান্দায় এসে পড়লেন,
আব তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।
কাঞ্জিলাল আব কালীনাথ বারান্দায় রুরে গেলেন, আমরা চারজন নদৰ দরজায়
গিয়ে হাজির হলাম।

জাল ক্রস-মার্ক একটা কলো অ্যামবাসার্ড থেকে নামলেন জয়ন্তবাবু আব

ডা. সরকার। জয়স্বরাবুর মাথার পিছনের চুল খানিকটা কাসিয়ে দেখানে প্রাইর
লাগানো হয়েছে।

জয়স্বরাবু নেমেই তাঁর দাদার কাছে কমা চাইলেন।—‘তেরি সরি। তোমার
জন্মতিথিতে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম। আসলে প্রেশারটা...’

‘কোনও চিন্তা নেই’, বললেন ডা. সরকার। ‘আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। তবে
রোদে বেশি ঘোরাঘুরি ছলবে না।’

‘আপনার চা খাবেন তো?’ বললেন শক্রবাবু।

‘তা হলে মজ হত। চা-পানের সময় পাইনি এখনও।’

‘এরা সব কোথার?’ জয়স্বরাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘বারান্দায়’, বললেন শক্রবাবু।

জয়স্বরাবু আর ডা. সরকার বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

‘চলুন, সকলে একসঙ্গেই বসা যাক’, ফেলুদাৰ দিকে কিৰে বললেন
শক্রবাবু।

‘দীক্ষান, আগে একটা কাজ সেৱে নেওয়া দৰকাৰ।’

ফেলুদা কথাটা কেশ জোৱের সঙ্গেই বলল। কী কাজের কথা বলছে ওঁ।

‘কাজ?’ শক্রবাবু একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস কৰলেন।

‘আপনার শুড়িমার কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্পিকেট চাবিটা আছে সেটা চাইলে
গাওয়া ঘৰে নিষ্ঠয়ই।’

‘তা নিষ্ঠয়ই ঘৰে, কিন্তু—’

‘একবাৰ সিন্দুকটা বুলে দেখতে চাই।’

শুড়িমাৰ ঘৰে শিয়ে দেখি বুড়ি শামছা নিয়ে আনে বেৱোচ্ছেন।

‘আজ তোমার এত দেৰি?’ শক্রবাবু প্রশ্ন কৰলেন।

‘আৱ বলিস না। চোখ মেলে দেখি বী খী বোদ। একেকদিন কী যে হজা।’

‘তোমার চানিগোছাটা একবাৰ নিতে হবে শুড়িমা। সিন্দুকটা ঘুলব।’

‘কিন্তু তোৱ কাছে যে—?’

‘আমাৰটা বুজে পাছি না।’

শুড়িমা আলমারি খুলে চাবিৰ গোছা বার কৰে দিয়ে চলে গেলেন।

শক্রবাবু সিন্দুকেৰ দিকে এগিয়ে গেলেন, আৱ দেখি কোকে কেন আনি
ফেলুদা হাতান্দিঙ্গাটা হাতে শিয়ে একবাৰ নেড়েচেড়ে দেখল।

‘সৰ্বনাশ।’

শক্রবাবুৰ চিৎকাৰে চমকে পালমোহনবাবু সেলিম আলিৰ বইটা তাঁৰ হাত
পেকে কেলেই দিলেন।

‘আলি বাপ্পি কিন্তুই সেই’, বলল ফেলুদা।

শক্রবাবুৰ ফ্যাকাশে শুখ দিয়ে কথাই বেৱোচ্ছে না।

‘কুটা বক কল্পন’, বলল ফেলুদা। ‘তাৰপৰ চলুন নীচে গাওয়া যাক। সতা

উদ্ঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচাটো সকলকে জানিয়ে দিয় এবং কর্তৃতালো প্রশ্ন করব সেটা জানিয়ে দিন।'

বুরতে পারছি শঙ্খবাবুকে অনেকখানি মনের জোর প্রয়োগ করতে হচ্ছ, কিন্তু তিনি গত বছরের চুরির ব্যাপারটা আর আজ এইখানে সিদ্ধুক খুলে যা দেখলেন সেটা ঘোটামুটি উচ্চিয়ে সকলকে বলে বললেন, 'আমার বাড়িতে অসমানই অভিব্রহ হয়ে এসে আমার এত কমছের লোক যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটা বপ্পেও তাবিনি। কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে তাতে কোনও ভুল নেই, আর সেই কারণেই আমি কলকাতার বনামধন্য ইনডেসিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক জবাব দেবে।'

সকলে চুপ। কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখে বোঝা উপায় নেই।

ফেলুন্দা তরু করুন। প্রথম প্রশ্নটা ডা. সরকারকে, আর সেটা যাকে বলে অপ্রত্যাশিত।

'ডা. সরকার, আপনাদের এই পানিহাটিতে কটা হ্যাসপাতাল আছে?'

'একটাই', বললেন ডা. সরকার।

'তার মানে সেখানেই আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন জয়নুববুকে, আর সেখান থেকেই কাশ রাখে ফোন করেছিলেন।'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি কি?'



‘কারণ আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, জয়ত্বাবু সেখানে যাননি।’

ডা. সরকার হাসপেন্স :

‘কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে কোন করেছিলাম সে কথা তো আমি শক্তব্যাবুকে বলিনি।’

‘তবে কোথেকে করেছিলেন?’

‘আমার বাড়ি থেকে। কাল যাবার পথেই জয়ত্বাবুর জ্ঞান হয়। তখন বুঝতে পারি আঘাত গুরুতর নয়, কনকাশন হয়নি। তবু একবার দেখব বলে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই। তখনই ঠিক করি রান্ডিরটা ওখানে রেখে সকালে পৌছে দিয়ে যাব।’

‘এবার জয়ত্বাবুকে একটা প্রশ্ন’, বলল ফেলুন। ‘আপনি কাল যে সিদ্ধুক খেলার জন্য চাবিটা নিলেন, সেটা তো আপনার হাতেই ছিল।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ার পথ আর হাতে নাও থাকতে পারে।’

‘হাতে না থাকলেও, কাজ্জাক ছিল পড়ে থাকার কথা। কিন্তু তা তো ছিল না।’

‘সেটার আমি কী জানি? চাঁচ আপনারা খুঁজে পেলেন কি না পেলেন তার আমি কী করতে পারি? আপনি কী বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না।’

‘আর একটা প্রশ্ন আছে, সেটা ডাক্তারকে। তার পরেই সরাসরি বলছি: ডা. সরকার, হিমোগ্রোবিন বলে একটা পদার্থ আছে সেটা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।’

‘কেন জানব না?’

‘সাধারণ লোকের চোখে সেটার রঙের সঙ্গে রংকের কোনও তফাত ধরা পড়ে না সেটাও নিশ্চয়ই জানেন।’

ডাক্তার সরকার গলা থাকুনি দিয়ে মাথা মেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

‘আমার বিষ্ণাপটু কী তা হলো এবার বলি?’ বলল ফেলুন। সকলে একদৃষ্টি চেয়ে আছে ফেলুনার দিকে। ‘আমার বিষ্ণাস জয়ত্বাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হবার তান করেছিলেন—ডাক্তার সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের এই বাড়ি থেকে তলে বাঁচাবার দরকার ছিল।’

‘নমস্কৃৎ! চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ত্বাবু। ‘কেন, চলে যাব কেন?’

‘কারণ মাঝের গোপনে খুবার ফিরে আসবেন বলে।’

‘ফিরে আসব?’

‘হ্যাঁ। উত্তরের কটক দিয়ে ঢুকে, পিছনের সিডি দিয়ে উঠে আপনার মাঝে যাবেন বলে।’

‘আপনি একটু বাজ্জাবাড়ি করাচ্ছন মি. মিস্কির। মাঝে রান্ডিরে যা-র ঘরে যাব, আর যা টের পাবেন না? মা রান্ডিরে তিনঘণ্টার বেশি মুয়োন না সেটা আপনি জানেন?’

‘এমনিতে ঘুমোন না—কিন্তু ঘুমের শুধু আওয়ালেই ধৰন যদি জানবাবু গন্তব্যাল তাকে দেবার সময় তার দুরভাগ্যে কিন্তু মিশ্রিয়ে দিয়ে আকেন?’

জয়স্বৰাবু আর ডা. সরকার দুজনেরই তোল্ট-ক্ষেত্রের ভাবটা মিনিটে মিনিটে করে আসছে সেটা বুবতে পারছি। ক্ষেত্রে বলে চল, ‘আপনার ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ এক বছর আগে যে কাঁচা কাজটা করেছিলেন, এবার আর সেরকম করলে চলত না। শক্রবাবুর পুরো প্ল্যানটাই ভেঙ্গে দিয়ে থাকবাতিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। সে চুরি ধরা পড়ত কবে তার কোনও ঠিক নেই। অবিশ্য চাবি আপনার কাছে ছিল না, তাই আপনার মা-র আলগারি থেকে ভুগিয়েকেট বাবু করে নিতে হয়েছিল। সে সময় আমার এই বকুর আবৃত্তি ঘনে আপনি কিংবিং বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই গায়ে একটা আন জড়িয়ে দরজার মুখে এসে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে আপনার মা জেগেই আছেন, এতরিধিং ইঙ্গ অল রাইট। তার পরে আমাদের ঘনে এই ধারণা বন্ধযুক্ত করার জন্য হামানদিত্তা পিটচে তর করেন। এতেও আমার সম্মেহ হয়েছিল, কাবণ হামানদিত্তায় পান খাকলে শব্দটা হয় একটু অন্যরকম; এটা ছিল ফঁকা শব্দ।’

‘সবই বুঝলাম, মি. মিশ্রি, বললেন জয়স্বৰাবু, ‘কিন্তু তারপর?’

‘তারপর চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলা।’

আপনি কোন অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মি. মিশ্রি? অজ্ঞান হয়ার ভাব করা? আমার মাকে ঘুমের শুধু দেওয়া? বাতিরে ফিরে এসে ভুগিয়েকেট চাবি বাবু করে সিন্দুক খোলা?’

‘তার ঘানে এর সবগুলোই করেছেন শীকার করছেন তো?’

‘এর কোমওটার ঘন্য শান্তি হয় না সেটা আপনি আনেন? আসল ব্যাপারটায় আনহেন না কেন আপনি?’

‘ঘটনা মে দুটো জয়স্বৰাবু, একটা তো নয়। আগে প্রথম ঘটনাটা সেরে নিই—এক বছর আগের চুরি।’

‘সেটা আপনি সারবেন কী করে, মি. মিশ্রি? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কেথায়?’

‘আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক তো ছিল। যিনি চুরি করেছিলেন তার ঠিক পাশেই শোক ছিল। তাদের মধ্যে অন্ত একজন কি টের পেয়ে থাকতে পারেন না।’

একারে শক্রবাবু কথা বললেন। তিনি বেশ উজ্জেবিত।

‘এটা আপনি কী বলছেন, মি. মিশ্রি? চুরি হয়েছে সেটা আনবে অথচ আম্যা বলবে না, আমার এত কাছের লোক হয়ে?’

ক্ষেত্রে এবার ম্যাজিস্ট্রিয়ান কালীনাধবাবুর দিকে ঘুরল।

‘আপনি কাল বাতিরে কী বিপদের কথা কেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে নলাছিলেন সেটা বলবেন, কালীনাধবাবু?’

কালীনাথবাবু হেসে বললেন, 'অগ্রিয় সত্য প্রকাশ করায় বিপদ নেই? শক্তরের মনের ঘনস্থূলি ভোকে দেখুন তো!'

'না, নেই বিপদ', দৃঢ়বয়ে বললেন শক্তরবাবু। 'অনেকদিন ধ্যাপারটা ধামা চাপা রয়েছে। এসব অকাশ হওয়াই ভাল। তুমি যদি কিছু জেনে থাক তো বলে দেবে, কালীনাথ।'

'সেটা বোধহয় ওর পক্ষে সহজে নয়, মি. চৌধুরী', বলল ফেলুনা, 'কাবণ তদন্তে চোর ধরা পড়লে যে ওরও বিপদ হত। এই একটা বছর যে উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন!'

'ব্ল্যাকমেল!

'ব্ল্যাকমেল, শক্তরবাবু। সেটা উনি স্বীকার করবেন না, তোরও স্বীকার করবেন না। অবিশ্বিয় চোরের যে দোসর আছে সেটা সম্ভবত কালীনাথবাবু জানতেন না, উনি একজনকেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা এই অস্বরূপ ব্ল্যাকমেলিং-এর ঠেলায় দ্বিতীয় চুবিটা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। আর তাই—'

'তুল! তুল!' তার পায়ে টেচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'সিন্দুক থেকে যা দেবার তা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। বনোয়ারিলাদের আর একটি জিনিসও তাতে নেই! সিন্দুক খারি!'

'তার মানে আমার থাকি অভিযোগ সবই সত্যিই!'

'কিন্তু...কাল রাতের কুকুরিটা কে করছে সেটা বলছেন না কেন?'

'সেটাও বলছি, কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারের ক্ষেত্রে তাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু—ডা. সরকার আর আপনি যিনি গত বছর বারোটার মধ্যে থেকে একটি পৰ্যন্ত সরিয়েছিলেন কি না।'

জয়ন্তবাবুর মাথা হেটি হয়ে গেছে; ডা. সরকার দুবাতে রগ টিপে বসে আছেন।

'আমি স্বীকার করছি', বললেন জয়ন্তবাবু। ফেলুনা পকেট থেকে টেপ রেকর্ডারটা থাক করে চালু করে আমার হাতে দিয়ে দিল।

'অয়িদাদার কাছে ক্ষম' চাইছি। সে পৰ্যন্ত ডা. সরকারের কাছেই আছে, সেটা ক্ষেত্রে দেওয়া হবে। আমাদের দুজনেই অর্ধাত্তাব হয়েছিল। একটার জায়গায় বারোটার পুরো সেটো বিক্রি করলে আর একশে গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই...'

'তাই একি এগারটা নেবার কথা তাৰিখেন।'

'স্বীকার করছি, কিন্তু চোর আরও আছে, মি. মিত্র। যে সোক ব্ল্যাকমেল করতে পারে—'

'—যে সোক চুরি করতে পারে' বলল ফেলুনা। 'কিন্তু তিনি চুরি করেননি।'

‘তা হলো’ প্রশ্ন করলেন শক্তিযারু।

‘ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র।’

ফেলুন্দা পর থেকে বাকি ধাল এনে টেবিলের উপর রূক্ষল। সকলের মুখ হাঁ
হয়ে গেছে।

‘এই হল বনোয়ারিলাসের বাকি সংশ্লিষ্টি, বলল ফেলুন্দা, ‘মেঝেতে চাবি না
পেয়ে, এবং ইতের বদলে হিয়োগ্রেবিল মেঝে মনে যোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।
তাই যখন আপনাকে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বাধা হয়েই
আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তাণ্ড ভাল যে চাবিটা
ছিল আপনার প্যান্টের ডান পকেটে। বাঁ পকেটে থাকলো পেতাম না। আপনাকে
নিয়ে যাবার পর বৈঠকখানার এসে বসি। তখনই এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে আমি
সিদ্ধুক ঘুলে জিনিসগুলো ধার করে আমার ঘরে রেখে দিই। আমি জানতাম যে
বিপদের আশঙ্কা আছে।—এই নিন আপনার চাবি, মি. চৌধুরী। এরপর কী কর্তব্য
হবে সেটা আপনিই হিঁর করুন; আমার কাজ এখানেই শেষ।’

‘অবাক প্রতিজ্ঞা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এসের মগজে কী যে ছিল তা কে কবে?
ম্য ডিক্ষি অইন্টাইন খনা লীলাবতী
স্বারেই অরি আমি, সবারে প্রণতি।’

শাহাদু ফেনুদা



এবার কাণ্ড কেদারনাথে

‘কী ভাবছেন, ফেলুবাবু ?’

প্রশ্নটা করলেন রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়। আমরা তিনজনে বিবিধাবের সকালে আমাদের বালিগঞ্জের বৈঠকখানায় বসে আছি, লালমোহনবাবু যথারীতি তাঁর গড়পারের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন গালগুজবের জন্য। কিছুক্ষণ হল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন গন্ধনে রোদ। বিবিবার লোডশেডিং নেই বলে আমাদের পাখাটা খুব দাপটের সঙ্গে ঘূরছে।

ফেলুদা বলল, ‘ভাবছি আপনার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসটার কথা।’

পয়লা বৈশাখ জটায়ুর ‘অতলাত্তিক আতঙ্ক’ বেরিয়েছে, আব আজ পাঁচই বৈশাখের মধ্যেই নাকি সাড়ে চার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘ও বইতে যে আপনার মৃত্তো লোকের ভাবনার খোরাক ছিল, তা তো জানতুম না মশাই।’

‘ঠিক সে রূকম ভাবনা নয়।’

‘তবে ?’

‘ভাবছিলাম আপনার গল্প যতই গাঁজাখুরি হোক না কেন, শ্রেফ মশলা আর পরিপাকের জোরে শুধু যে উত্তরে যায় তা নয়, রীতিমতো উপাদেয় হয়।’

লালমোহনবাবু গদগদ ভাব করে কিছু বলার আগেই ফেলুদা বলল, ‘তাই ভাবছিলাম আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনও গল্প লিখিয়ে-ঢিয়ে ছিলেন কি না।’

সত্ত্ব বলতে কি, আমরা লালমোহনবাবুর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে

প্রয় কিছুই জানি না । উনি বিয়ে করেননি এবং শুরু থাপ থা আগেই মারা গেছেন সেটা জানি, কিন্তু তার বেশি উনিষ বলেননি, অথবা আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করিনি ।

লালমোহনগুৰু বললেন, ‘পাঁচ-সাত পুরুষ আগের কথা তো আর বিশ্বে জানা বাব না, তাঁদের মধ্যে ইতো কেবলও কথক ঠাকুর-টাকুর থেকে থাকতে পারেন । তবে গত দুঁ-তিন জোনারেশনের মধ্যে ছিল না সেটা বলতে পারি ।’

‘আপনার বাবার আর ভাই ছিল না?’

‘খ্রি ব্রাদার্স । উনি ছিলেন মিডল । জ্যোঁ মোহিনীমোহন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন । ছেলেবেশ্য আৱনিকা রাস্টাকস বেলাদোনা পালসেটিলা হে কত যেযেছি তাৰ ইয়ন্তা নেই । গ্রেট প্র্যান্ডফাদাৰ ললিতমোহন ছিলেন, পেপাৰ মার্চেন্ট । এল. এম. গাঞ্জুলী আৰু সন্সেৱ দোকান এই সেদিন অবধি ছিল । ভাল ব্যবসা ছিল । গুৰুপারেৱ বাড়িটা এল. এম-ই তৈরি কৱেন । ঠাকুৰদাদা, বাবা দুজনেই বাবস্বার যোগ দেন । বাবা এদিন দেঁচে ছিলেন তদিন ব্যবসা চালান । ফিফটি-টু তে চলে গোলেন । তাৰ পৰ যা হয় আৱ কি । এল. এম. গাঞ্জুলী আৰু সন্স-এবং নামটা ব্যবহাৰ হয়েছিল কিছু দিন, কিন্তু মালিক বদল হয়ে গেছিল ।’

‘আপনার ছেটিকাকা ? তিনি ব্যবসায় যোগ দেননি?’

‘নো সহ্যৰ । ছেটিকাকা দুর্গামোহনকে দেখি আমাৰ জন্মেৰ অনেক পৰে । আমাৰ জন্ম থার্টি সিঙ্গুলাৰ দুর্গামোহন টোয়েন্টি নাইনে সপ্তাস্বাদীদেৱ দলে যোগ দিয়ে খুলনাৰ অ্যাসিস্ট্যুট কমিশনাৰ টাৰ্নবুল সাহেবকে গুলি মেৰে তাৰ দুতনি উড়িয়ে দেন ।’

‘তাৰ পৰ ?’

‘তাৰ পৰ হাওয়া । বেপাও । পুলিশ ধৰতে পাৱেনি ছেটিকাকাকে । আমৰা ধাৰণা আমাৰ অ্যাডভেক্ষন-প্রতিটা ছেটিকাকাৰ কাছ থেকেই পাওয়া ।’

‘উনি আৱ আসেননি ?’

‘এসেছিলেন । একবাৱ । স্বাধীনতাৰ পৰ ফটি নাইনে । তখন অমি থার্ড ক্লাসে পড়ি । সেই প্ৰথম আৱ সেই শেষ দেখা

ছোটকাকার সঙ্গে। তবে যাঁকে দেখলাখ, তিনি সেই অশ্বিয়গোরে ছোটকাকা দুর্গামোহন গান্ধুলী নন। কমপ্লিক চেঙ্গ। কোথায় সন্ত্বাস, কোথায় পিণ্ডল। একেবারে নিরীহ, সাহিক পুরুষ। মাসথানেক ছিলেন, তার পর আবার চালে যান।'

‘କୋଥାଯ୍ ?’

‘ଯଦୁର ମନେ ପଡ଼େ କୋନାଓ ଜଞ୍ଜଳେ କାଠେର ସ୍ୟବଦୀ କରନ୍ତେ ଯାନେ ।’

‘विद्या करेननि ?’

"WIFC" | 3

‘কিন্তু আপনার আপন বা জাঠিতে ভাই-বোন আছে নিশ্চয়ই।’

‘আপন বোন একটি আছেন, দিদি। স্বামী রেলওয়েতে ঢাকিরি করেন; ধানবাদে পোস্টড। জ্যাঠার ছেলে গেই, তিন মেয়ে, তিনজনের স্বামীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বিজয়া দশমীতে একটি করে পোস্টকার্ড—বাস। আসলে রঞ্জের সম্পর্কটা কিছুই নয়, ফেলুবাবু। এই যে আপনার আর তপেশের সঙ্গে আমার ইয়ে, তার সঙ্গে কি যাব বিদেশনের কোনও—?’

ଲାଲମୋହନବୀର କଥା ଥାମାତେ ଇଲ୍, କାରଣ ଦରଜୀଯ ଟୋକା ପଡ଼େଛେ । ଏଟା ଥାକେ ବଲେ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ, କାରଣ ଟେଲିଫୋନେ ଆପଯେନ୍ଟମେନ୍ଟ କରା ଛିଲ ସାଡେ ନ୍ଯାଟାର ଜନ୍ୟ, ଏହି ବେଜେଛେ ନ୍ଯାଟାର ତେବେଶ ।

তো এম।
ভদ্রলোকের নামটা জানা ছিল টেলিফোনে—উমাশঙ্কর
পুরী—এবাব চেহারাটা দেখা গেল। মাঝেরি হাইট, দোহারা গড়ন,
পরনে যি রঙের হ্যান্ডলুমের সুট। দাঢ়ি-গোঁফ কাঞ্চালো। মাথার
চুল কৰ্ণচা-পাকা মেশালো, ডান দিকে সিঁথি, এই শেষের বাপারটা
দেখলেই কেন হেন আমার অসোয়াস্তি হয়; মনে হয় মুখটা ঘেন
আয়নায় দেখছি। পুরুষদের মধ্যে শতকরা একজনের বেশি ডান
দিকে সিঁথি করে কিনা সন্দেহ, যদিও ক'রণটা জিজেস করলে বলতে
পারব না।

‘আপনাকে খুব তাড়াছড়ো করে চলে আসতে হয়েছে বলে মনে



ইছে ?' ফেলুন্দা মন্তব্য করল আলাপ পর্বের পর উদ্বোক চেয়ারে বসতেই।

‘হ্যাঁ, তা—’ উমাশঙ্করের ভুক্ত কপালে উঠে গেল—‘কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কী করে ?’

‘আপনার বাঁ হাতের সব নখই পরিষ্কার করে ক্লিপ দিয়ে কঢ়ি, তার একটি নখ এখনও কোটের পকেটের ধারে লেগে আছে, অথচ ডান হাতে দুটো নখের পরে আর বাকিশুলো...’

‘আর বলবেন না !’ বললেন মিঃ পুরী, ‘ঠিক সেই সময় একটা ট্রাঙ্ক কল এসে গেল ; কথা শেষ হতে দেখি, আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় হয়ে গেছে ।’

‘যাক গে—এবার বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি ।’

‘মিঃ পুরী গন্তীর হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন। তার পর বললেন, ‘মিঃ মিটার, আমি থাকি ভারতবর্ষের আর এক প্রাণে !

আপনার নাম আমি শনেছি ভগওয়ানগড়ের রাজাৰ কাছ থেকে।
শুধু নাম নয়, প্রশংসা : তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

‘আমি তাতে গৰ্ব বোধ কৰছি ।’

‘এখন কথা হচ্ছে কি—’ মিঃ পুরী থামলেন। তাঁর মধ্যে এক ইতস্তত ভাব লক্ষ করছিলাম। তিনি আবার বললেন, ‘ব্যাপারটা হচ্ছে কি—একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; সেইটে যাতে না ঘটে, তাই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। সেটা পাওয়া যাবে কি?’

ফেলুদা বলল, ‘আপনি কী ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা বলছেন, সেটা না জানা পর্যন্ত আমি মতামত দিতে পারছি না।’

শ্রীনাথ এই সময় ৩-চান্দুর-বিশুটি এনে বাখাতে কথায় একটু বিরতি পড়ল । তার পর মিঃ পুরী একটা বিশুটি তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনি কৃপনারায়ণগড় স্টেটের নাম শনেছেন ?'

‘आहुटो! चेना-चेना लाग्छे, बलल फेलुदा, उत्तर प्रदेश कि?’

‘ঠিকই বলেছেন,’ বললেন মিঃ পুরী : ‘আলিগড় থেকে ৯০
কিলোমিটার পশ্চিমে। আমি যখনকার কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা
আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। তখন রাজা ছিলেন চন্দ্রদেও সিং।
আমি ছিলাম এস্টেটের মানেজার। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলেও
তখনও এসব নেটিভ স্টেটের উপর তত চাপ পড়েনি ; রাজাৰা
রাজাই ছিলেন। চন্দ্রদেও-এর বছর চুয়ানু বয়স কিন্তু তখনও
মিংহের মতো চেহারা। শিকার করেন, টেনিস খেলেন, পোশে
খেলেন, প্রোটেন্সের কোনও লক্ষণ নেই। একটি ব্যারাম তাঁকে খাবে
মাবে বিশ্বত ক্ষমত, কিন্তু সেটা যে হঠাৎ এমন আকার ধারণ করবে,
সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। হাঁপানি। সে যে কী হাঁপানি, সে
আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। একটা জলজ্যাম
জোয়ান মানুষকে ছ’ মাসের মধ্যে কঙালৈ পরিণত হতে এই প্রথম
দেখলাম। কোনও ওষুধে কোনও কাজ দিল না। হয়তো দু’ দিন
দেখলাম। কোনও ওষুধে কোনও কাজ দিল না।

— ২৮ — সরিনার নাকি এক ভদ্রলোক থাকেন,

‘সেই সময় খবর এল, হুরমানে নান্দ নামে জন্মানী উপাধায়, তিনি নাকি হৈপানিন্দ অবাধে

ନାମ ଭବାନୀ ଉପାୟୀ, ୧୦୧ ।
ବର୍ତ୍ତ କମ୍ପୀ ତାର ଓସ୍ତଥେ ମଞ୍ଜୁର୍ ଆରୋଗ୍ଯଲାଭ କରେଛେ ।

‘আমি নিজেই চলে গেলাম হবিবার। টিকানা জানা ছিল না ভদ্রলোকের, কিন্তু যেঁজ পেতে অসুবিধা হল না, কারণ তাকে অনেকেই চেনে। সাদাসিধা মানুষ, ছেঁটে একটা বাড়িতে থাকেন, আমাকে যথেষ্ট খাতির করে তাঁর ভক্তিপোশে বসালেন। তাঁর পর সব শুনেটুনে বললেন—আমি যাব আপনার সঙ্গে, রাজাকে ওযুধ দেব; সারবার হলে দশ দিনের মধ্যে সারবে, না হলে নয়। সেই দশ দিন আমি ওখানে থাকব। ওযুধে কাজ না দিলে আমি কোনও পয়সা নেবে না।

‘বললে বিশ্বাস করবেন না মিঃ মিটার, দশ দিন নয়, সাত দিন নয়, তিনি দিনের মধ্যে রাজার হাঁপানি উধাও। এগল যে ঘটতে পারে, সেটা ন’ দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। উপাধ্যায় বললেন তাঁর ওযুধের দাম পঞ্চাশ টাকা রাজাকে বলতে তিনি তো কথাটা কানেই তুললেন না। বললেন—আমি অবশেষে বসেছিলাম, উনি এসে আমাকে নতুন জীবন দান করলেন, আর তার দাম হল কিনা পঞ্চাশ টাকা ?

‘এখানে বলে রাখি যে রাজা চন্দ্রদেও মানুষট একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর শোক, তাঁর আনন্দ, তাঁর ক্রোধ, তাঁর দয়া-দাঙ্খিণ্য—সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে মাত্রায় অনেকটা বেশি ছিল। পঞ্চাশ টাকার বদলে উনি উপাধ্যায়কে যেটা দিলেন, সেটা একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার বালগোপাল। জিনিসটা আসলে একটা পেনডেন্ট বা লকেট—লম্বায় ইঞ্চি তিনেক। তখনকার দিনে সেটার দাম পাঁচ-সাত লাখ টাকা।’

একটু ফাঁক পেয়ে ফেলুন্ডা ‘প্রশ্ন’ করল, ‘উপাধ্যায় নিলেন সেই লকেট ?’

‘সেই কথাই তো বলছি, বললেন উমাশঙ্কর পুরী। উপাধ্যায় বললেন—আমি সাদাসিধে মানুষ, আমাকে এমন বিপাকে ফেলছেন কেন ? এত দামি একটা জিনিস আমার কাছে থাকবে, সেটা শোকে আমার বলে বিশ্বাস করবে কেন ? সবাই ভাববে আমি চুরি করেছি।

‘রাজা বললেন—কারুর তো জানার দরকার নেই। আমরা তো আর খবরটা ঢাক পিটিয়ে জাহির করতে যাচ্ছি না। আর মেহাতই

যদি কেউ খেনে খেলে, তার জন্য আমি আমার নিজের সিগারেটের দিয়ে লিখে দিছি যে, এটা আমি তোমাকে পারিতোষিক হিসেবে দিলাম। এর পরে তো আর কান্দার কিছু বলা নেই।

‘উপাধার বলল—তাই যদি হয়, তা হলে আমি মাথা পেতে নেব আপনার এ পারিতোষিক।’

ফেলুদা বলল, ‘আপনি, রাজা, এবং উপাধার—এই তিনজন ছাড়া আর কেউ কি ঘটনাটা জানত?’

‘আমি সত্যি কথা বলব’, বললেন উমাশঙ্কর পুরী, ‘রাজা নিজে যদি খেয়ালবশে কাড়িকে বলে থাকেন তো সে আমি জানি না; ব্যাপারটা জানত রাজা, রানি এবং দুই রাজকুমার—সুরয় ও পূর্ব। বড় কুমার সুরয় অতি চমৎকার ছেলে, রাজপুরিবারে এখন দেখা যায় না। তার বয়স তখন বাইশ-তেইশ। ছেটি কুমারের বয়স পনের। এ ছাড়া জানতাম আমি, আমার স্ত্রী আর আমার ছেলে দেবীশঙ্কর—তার বয়স তখন পাঁচ কি হয়। বাস্তু, আর কেউ না। আর এটাও আপনি খেয়াল করে দেখুন মিঃ মিটার—এ বরে কিন্তু গত ত্রিশ বছরে কোনও কাগজে বেরোবলি। আপনি তো সাংবাদিকদের জানেন; তারা এর গন্ত পেলে কি হেতু দিত?’

‘সে কথা ঠিক’, বলল ফেলুদা, ‘ব্যাপারটার গোপনীয়তা বক্ষিত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।’

‘যাই হোক, এবার আমি এগিয়ে আসছি বর্তমানের দিকে। রাজা চজ্জবেও মিঃ বেঁচেছিলেন আর বছর ব্যারো। তার পর সুরয়দেও রাজা হলেন। রাজা মানে, তখন তো আর রাজা কথাটা ব্যবহার করা চলে না; বলতে পারেন উনিই হলেন কর্তা।’

‘আপনি তখনও ম্যানেজার?’

‘আজ্জে হ্যাঁ; এবং আমি প্রাপ্তগে চেষ্টা করছি যাতে ব্যবসা ইত্যাদির সাহায্যে কুপনারায়ণগড়ের ভবিষ্যৎকে আরও যজবুত করা যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, সুরয়দেওর এ সব দিকে কোনও উৎসাহ নেই। তার নেশা হচ্ছে বই। সে দিনের মধ্যে বোল ঘণ্টা তার লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে। সেখানে আমার একার চেষ্টায় আমি তার লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে। সেখানে আমার একার চেষ্টায় আমি কী করতে পারি? ফলে আর্টিক দিক দিয়ে স্টেটের অবস্থা ক্রমেই

খারাপ হয়ে আসতে থাকে ।

‘আপনার নিজের ছেলেও তো তত দিনে বড় হয়েছে ?’

‘হ্যাঁ । দেবীকে অবশ্য আমি আগেই আলিগড়ে শুলে পাঠিয়ে দিই । সে আর রাপনারায়ণগড়ে ফেরেনি । দিল্লী গিয়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছে ।’

‘আপনার কি ওই একই ছেলে ?’

‘আজ্জে হ্যাঁ । যাই হোক, আমার নিজের অনেকবার মনে হয়েছে যে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়ে আমার নিজের দেশ মোরাদাবাদে গিয়ে একটা কিছু করি, কিন্তু মায়া কাটাতে পারছিলাম না ।’

মিঃ পুরী এবার পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘এবার আমি আসল ঘটনায় আসছি ; আপনার দৈর্ঘ্যতি হয়ে থাকলে আমার মাপ করবেন ।

‘সাত দিন আগে, অর্থাৎ ডিনত্রিশে এপ্রিল, শনিবার রাপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার পৰনদেও সিং হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির হয় । তার প্রথম কথাই হল—আমার বাবার হাঁপানি যিনি সারিয়েছিলেন, তাঁর নাম ও তাঁর হরিদ্বারের ঠিকানাটা আমার চাই ।

‘স্বত্বাবতাই আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর কোনও অসুখ করেছে কি না ; পৰন বলল, না, তা নয় ; সে একটু টেলিভিশনের ছবি করছে, তার জন্য তার এই ভদ্রলোককে দ্রুক্কার ।

‘পৰন যে ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, সেটা আমি জানতাম, কিন্তু সে যে টেলিভিশন নিয়ে মেরে উঠেছে, সে যেবর জানতাম না । আমি বললাম—তুমি কি তোমার ছবিতে সে ভদ্রলোককে দেখাতে চাও ? সে বললে—অবশ্যই । শুধু তাই নয় । বাবা তাকে যে লকেটটা দিয়েছিলেন সেটাও দেখাব । একটা অসুখ সারিয়ে এ বকল বকশিস আর কেউ কোথাও পেয়েছে বলে আমার মনে ইয়ে না ।

‘তখন আমার পৰনকে বলতেই হল যে, উপাধ্যায় তাঁর এই পারিতোষিকের ব্যাপারটা একেবারেই প্রচার করতে চাননি । পৰন বলল—ত্রিশ বছর আগে একটা লোক যে-কথা বলেছে, আজও যে সে তাই বলবে, এমন কোনও কথা নেই । সমস্ত পৃথিবীর কাছে

নানা রকম তথ্য পরিবেশন করা টেলিভিশনের একটা প্রধান কাজ। আপনি আমাকে নাম ঠিকানা দিন। ওকে রাজী করা বাবুর ভার আমার।

‘কী আর করি; বাধ্য হয়ে উপাধায়ের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলাম; সে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।’

‘উপাধায়ের বয়স এখন আন্দোজ কর হবে?’ ফেলুদা জিগেস করল।

‘তা সন্দর-বাহাওর তো হবেই। রূপনারায়ণগড়ে যখন এসেছিল, তখন তার ঘোবন পেরিয়ে গেছে।’

ফেলুদা উমাশঙ্করের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আপনি কি শুধু এই ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না বলেই চিপ্তি হচ্ছেন?’

মিঃ পুরী মাথা নাড়লেন।

‘না মিঃ মিটার। আপনি ঠিকই আন্দোজ করেছেন। শুধু যদি তাই হত, তা হলে আমি আপনার কাছে অস্তাম না। আমার তব হচ্ছে ওই লকেটাকে নিয়ে। পৰনের নতুন শখ হয়েছে টেলিভিশনের ছবি তোলার। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, কাজটা খরচসাপেক্ষ। পৰনের নিজের কোনও অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে ওই একটি লকেট ওর সমস্ত অর্থসম্পদ্যা দূর করে দিতে পারে।’

‘কিন্তু ওই লকেটটি হাত করতে হলে তো তাকে অপনুপায় অবলম্বন করতে হতে পারে।’

‘তা তো বটেই।’

‘পৰনদেও ছেলে কেমন?’

‘সে বাপের কিছু দোষ-গুণ দুটোই পেয়েছে। পৰনের মধ্যেও একটা বেপরোয়া দিক আছে। ভাল খেলোয়াড়। ছবি ভাল তোলে। আবার জুয়ার নেশাও আছে। অথচ তার দৰাজ মনের বাপকে।’

‘তা হলে আপনি আমার কাছে কী চাইছেন?’

‘আমি চাইছি, আপনি দেখুন যাতে এই অসদুপায়টি অবলম্বন না করাই হয়।’

‘পৰন্তেও কি হলিদ্বার যাচ্ছেন?’

‘আজ্জে হ্যাঁ, তবে তাঁর যেতে একটু দেরি হবে—অন্তত পাঁচ মাত্র দিন, কুরণ এখন উনি প্যালেসের ছবি তুলছেন।’

‘আমাদেরও যেতে গেলে সময় লাগবে, কারণ তাঁর আগে তো ঢেনে বুকিং পাওয়া যাবে না।’

‘তা বটে।’

‘কিন্তু ধৰন যদি আমি কেসটা নিই, আমি আপনাদের ছেট কুশারকে চিনছি কি করে?’

‘সে ব্যবস্থাও আমি করে এনেছি। দিল্লীর একটি সাম্প্রাহিক কাগজে কুশারের এই রঙীন ছবিটা বেরিয়েছিল গত মাসে। একটা বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিল। এটা আপনি রাখুন। আর ইয়ে, আপনাকে আগাম কিছু...?’

‘আমি হাজার টাকা আগুণ্ডাপ নিই, বলল ফেলুন।’ ‘কেস সফল না হলেও সেটা ফেরত দিই না, কারণ সফল না হওয়টা অনেক সময় গোয়েন্দার অক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। সফল হলে আমি আরও এক হাজার টাকা নিই।’

‘বেশ। আপনাকে এখনই কিছু বলতে হবে নাহি। আমি পার্ক হোটেলে আছি। আপনি কী হির করেন, বিকেল চারটে নাগাদ ফোন করে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ হলে আমি নিজে এসে আপনাকে আগাম টাকা দিয়ে যাবো।’

ফেলুন্দা যে কেসটা নেবে, সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম। আজকাল আমরা মক্কেলের কথাবার্তা হংকং থেকে কেনা একটা মহিক্রোক্যাসেট ব্রেকডারে ভুলে রাখি। মিঃ পুরীর বেলাতে খুর অনুমতি নিয়ে তাই করেছিলাম। ফেলুন্দা দুপুরে সেই সব কথাবার্তা প্লে ব্যাক করে খুব ঘন দিয়ে শুনে বলল, ‘কেসটা নেবার সপক্ষে

দুটো ঘুড়ি রয়েছে; একটা হল এর অভিনবত্ত, আর দুই হল—গোয়েন্দগিরির প্রথম ঘুগে দেখা হরিদ্বার-হৃষীকেশটা আর একবার দেখার গোভ।'

বাদশাহী আংটির ফ্লাইম্যাক্স-টা যে হরিদ্বারেই শুরু হয়েছিল, সেটা আমিও কোনও দিন ভুলব না।

পার্ক হোটেলে টেলিফোন করে কেসটা নিচ্ছে বসে ফেলুন মিঃ পুরীকে জানিয়ে দিয়েছিল। আর মিঃ পুরীও আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুস্পক ট্র্যাভেলসে ফোন করে ফেলুন ভুল এক্সপ্রেসে আমাদের বুকিং-এর জন্য জানিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দু' দিন পরে এক অস্তুত ব্যাপার। কৃপনারায়ণগড় থেকে মিঃ পুরীর এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—

‘রিকোয়েস্ট ড্রপ কেস। পেটার ফলোজ।’

ড্রপ কেস! এ তো তাজ্জব ব্যাপার! এমন তো আমাদের অভিজ্ঞতায় কখনও হয়নি।

মিঃ পুরীর চিটিও এসে গেল দু' দিন পরে। মোদা কথা হচ্ছে—ছেটকুমার মত পালটেছে। সে হরিদ্বার হৃষীকেশ গিয়ে ছবি তুলবে, তাতে উপাধ্যায় থাকবেন, কিন্তু তাতে শুধু দেখানো হবে তিনি কিভাবে নিজের তৈরি ওযুধ দিয়ে হানীয় লোকের চিকিৎসা করেন। কৃপনারায়ণগড়ের রাজ্ঞির চিকিৎসাও যে উপাধ্যায় করেছিলেন, সেটা ছবিতে বলা হবে, কিন্তু মহামূল্য পারিতোষিকের কথাটা বলা হবে না।

ফেলুন টেলিগ্রামে উন্নত দিল—‘ড্রপিং’ কেস, বাট গোইং অ্যাজ পিলগ্রিমস।’ অর্থাৎ কেস বাতিল করছি, কিন্তু তীর্থযাত্রী হিসেবে যাচ্ছি।

আমি জানি, ফেলুন ও কথা লিখলেও ও নিজের গরজেই চোখ-কান খোলা রাখবে, আর তদন্তের কোনও কারণ দেখলে তদন্ত করবে। সত্যি বলতে কি, ভবনী উপাধ্যায় আর ছেটকুমার পৰবনদেও সিং—এই দুটি লোককেই আমার খুব ইণ্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা তিনজন এখন ডুন এক্সপ্রেসের একটা শ্রি টিয়ার কম্পার্টমেন্টে বসে আছি। ফৈজাবাদ স্টেশনে মিনিট দু'-এক হল গড়ি হেমেছে, আমরা ভাঁড়ের ঢা কিনে থাচ্ছি।

‘আপনি যে বলছিলেন হরিদ্বার গেসলেন, সেটা কবে?’ ফেলুদা তার সামলের সিটে বসা লালমোহনবাবুকে জিগোপ করল।

‘আমার ঠাকুরদা একবার সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যান’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘ইন্দুডিং হরিদ্বার। তখন আমার বয়স দেড় ; কাজেই নো মেমারি।’

এবার অন্য দিক থেকে একটা প্রশ্ন এল।

‘আপনারা কি শুধু হরিদ্বারই যাচ্ছেন, না ওখান থেকে এ দিকে ও দিকেও ঘুরবেন?’

এ-প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবুর পাশে বসা এক বৃক্ষ। মাথায় সামান্য চুল যা আছে তা সবই পাকা, কিন্তু চামড়া টান, দাঁত সব ওরিজিন্যাল, আর চোখের দু' পাশে যে খঁজগুলো রয়েছে, সেগুলো যেন হাসবার জন্য তৈরিই হয়ে আছে।

‘হরিদ্বারে একটু কাজ ছিল’, বলল ফেলুদা। ‘সেটা হয়ে গেলে পর... দেখা যাক--’

‘কী বলছেন মশাই! ধূকের চোখ কপালে উঠে গেছে—‘আদুর এসে কেদার-বজ্রীটা দেখে যাবেন না? বজ্রীনাথ তো সোজা বাসে করেই যাওয়া যায়। কেদারের শেষের কটা মাইল অবিশ্য এখনও বাস-রুট হয়নি। তবে এও ঠিক যে কেদারের কাছে বজ্রী কিছুই নয়। যদি পারেন তে একবার কেদারটা ঘুরে আসবেন। শেষের হাঁটা পথটুকু আর—’ ফেলুদা আর আমার দিকে তাকিয়ে—‘আপনাদের বয়ন কী? আর লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে—‘এনার জন্য তো ডাঙি আর টাট্টু ঘোড়াই আছে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?’

শেষের প্রশ্নটা অবিশ্য লালমোহনবাবুকেই করা হল। লালমোহনবাবু হাতের ভাঁড়টায় একটা শেষ চুমুক দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে গভীরভাবে অন্য দিকে চেয়ে বললেন, ‘আজ্জে না, তবে থর ডেজাটে একবার উটের পিঠে চড়ে দৌড়ের

অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা আপনার হয়েছে কি ?

ধৃঢ় মাথা নাড়লেন। —'তা হয়নি : আমার চরণের ক্ষেত্র হল হিমালয়ের এই বিশেষ অংশ। তেইশবার এসেছি কেদার-বদ্রী। ভক্তি-টক্তি আমার যে তেমন আছে তা নয়, তবে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই আমি সব আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করি। কোনও বিশ্বাসের দরকার হয় না।'

ভদ্রলোকের নাম পরে জেনেছিলাম মাঝমালাল মণ্ডলার। শুধু কেদার-বদ্রী নয়, যমুনোট্টী, গঙ্গোট্টী, গোমুখ, পঞ্চকেদার, বাসুকিতাল—এ সবও এর দেখা আছে। মেহাত একটা সহসার আছে, না হলে হিমালয়েই থেকে যেতেন। অবিশ্য এটাও বললেন যে, আজকের বাস-ট্যাঙ্গিতে করে যাওয়া আর আগেকার দিনের পায়ে হেঁটে যাওয়া এক জিনিস নয়। বললেন, 'আজবাল তো আর কেউ পিলগ্রিম নয়, সব পিকনিকারস। তবে হ্যাঁ, গাড়ির রাস্তা' তৈরি করে তো আর হিমালয়ের দৃশ্য পালটানো যায় না। নয়নাভিরাম বলতে যা বোঝায়, সে বর্কম দৃশ্য এখনও অসুবস্থ আছে।'

ভোর ছাঁটায় ডুন এক্সপ্রেস পৌঁছাল হরিদ্বার।

সেই বাদশাহী আঠটির সময় যেমন দেখেছিসুম, পান্তির উপদ্রবটা যেন তার চেয়ে একটু কম বলে থাকে হল তু। স্টেশনেই একটা রেস্টোরান্টে চা-বিশুট খেয়ে নিলাম। উপাধ্যায়ের নাম এখানে অনেকেই জানে অন্দাজ করেই বৈধ হয় ফেলুদা। রেস্টোরান্টের ম্যানেজারকে তাঁর হাদিস জিগোস করল।

উন্নত শুনে বেশ ভালবকম একটা ছোঁচট খেলাম।

ভবানী উপাধ্যায় তিন-চার মাস হল হরিদ্বার ছেড়ে কুস্তিপ্রয়াগ চলে গেছেন।

তাঁর বিষয়ে আরও খবর কে দিতে পারে, বলতে পারেন ?' জিগোস করল ফেলুদা। উন্নত এল—'এখনকার খবর পেতে হলে কুস্তিপ্রয়াগ যেতে হবে, আর যদি আগেকার খবর চান তো কাষ্টিভাই পন্তিতের কাছে যান। উনি ছিলেন উপাধ্যায়জীর বাড়িওয়লা। তিনি সব খবর জানবেন।'

'তিনিও কি সক্ষণ মহলাতেই থাকেন ?'

‘হাঁ হাঁ। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন ওঁরা। সবাই ওঁকে
চেনে ওঁখানে। জিগোড় কুলেই বলে দেবে।’

আমরা আর সময় নষ্ট না করে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে
পড়লাম।

কান্তিভাই পশ্চিমের ধন্দস হাট-পৈয়াঘটি, রেঁটেখাটো চোখাচ'খা
ফুরসা চেহারা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, কপালে চন্দনের ফেঁটা আর
চোখে বাইকেন্কুল চশমা। অমরা ভবানী উপাধ্যায়ের খোঁজ
করছি জেনে উনি বীতিমত্তে অবাক হয়ে বললেন, ‘কী ব্যাপার বসুন
তো ? আর একজন তো ওর খোঁজ করে দেশেন এই তিন-চার দিন
আগে।’

‘তুঁর চেহারা মনে আছে আপনার ?’

‘তুঁ আছে বইকি।’

‘দেখুন তো এই চেহারার সঙ্গে যেনে কিনা ?’

ফেলুদা পকেট থেকে ছোটকুমার পুনরাদেও-এর ইবিটা বার করে
দেখান।

‘হাঁ হাঁ, এই তো সেই লোক, বললেন কান্তিভাই পশ্চিম।
আমি কুস্তিগোলের ঠিকানা দিয়ে দিলাম তাঁকে।’

‘সে ঠিকানা অবিশ্ব অমরাতে চাই, বলে বেলুদা তার একটা
কার্ড বার করে দিল মিঃ পশ্চিমের হাতে।

কার্ডটা পাওয়ামাত্র মিঃ পশ্চিমের হাবভাব একদম বদলে গেল।
এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম; এখন আমাদের সকলকে
চেয়ার, মোড়া আর তত্ত্বপোশে ভাগাভাগি করে বসতে দেওয়া
হল।

‘কেয়া, কুছ গড়বড় ভয়া মিঃ মিস্টর ?’

‘যত দূর জানি, এখনও হ্যানি,’ বলল ফেলুদা। ‘তবে হ্যার
একটা সন্তাননা আছে। এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে
চাই, মিঃ পশ্চিম ; আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে খুব উপকার
হবে।’

‘আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।’

‘মিঃ উপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কি কোনও একটা মূল্যবান

জিনিস ছিল ?

মিঃ পণ্ডিত একটু হেসে বললেন, 'এ প্রশ্নটাও আমাকে দ্বিতীয়বার করা হচ্ছে। আমি মিঃ সিংকে যা বলেছি, আপনাকেও তাই বলছি। মিঃ উপাধ্যায়ের একটা থলি উনি আমার সিন্দুকে রাখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে যে কী ছিল, সেটা আমি কোনও দিন দেখিনি বা জিগেসও করিনি।'

'সেটা উনি কুন্তপ্রয়াগ নিয়ে গেছেন ?'

'ইয়েস স্যার। আস্তে আ্যানন্দার থিৎ—আপনি ডিটেকটিভ, তাই এ থবর আমি আপনাকে বলছি, আপনার হয়তো কাজে সাগরে পারে—পাঁচ-ছে মহিনে আগে দুজন লোক—তখনও মিঃ উপাধ্যায়ে ছিলেন এখানে—একজন সিন্ধী কি মাড়োয়ারি হবে—হি লুকড এ রিচ ম্যান—আস্তে আ্যানন্দার ম্যান—দুজন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথা হচ্ছিল সেটা আমি শুনতে পারছিলাম। এক ঘণ্টার উপর ছিল। তারা যখন পর উপাধ্যায় একটা কথা আমাকে বলে—পণ্ডিতজী, আজি আমি একটি রিপুকে জয় করেছি। মিঃ সিংঘানিয়া আমাকে লোভের মধ্যে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সে লোভ কাটিয়ে উঠেছি।'

'আপনি উপাধ্যায়ের এই সম্পত্তির কথা আর কাউকে বলেননি ?'

'দেখুন মিঃ মিত্র, ওর যে একটা কিছু লুকে বার জিনিস আছে, সেটা অনেকেই জানত। আর সেই নিয়ে আড়ালে ঠাট্টাও করত। আমার আবার সন্ধ্যাবেলায় একটু নেশা করার অভ্যাস আছে, হ্যাতো কখনও কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু উপাধ্যায়জীকে সকলে এখানে এত ভক্তি করত যে, সিন্দুকে কী আছে সেই নিয়ে কেউ কোনও দিন ঘাথা ঘামায়নি।'

'এই যে রুন্ধপ্রয়াগ গোলেন তিনি, এর পিছনে কোনও কারণ আছে ?'

'আমাকে বলেছিলেন, গদ্দার ঘাটে ওর একজন সাধুর সঙ্গে আঙ্গাপ হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে উপাধ্যায়ের মধ্যে এক মানসিক চেঙে আসে। আমার মনে হয়, চেঙ্গটা বেশ সিরিয়াস ছিল। কথা-টো সব কমিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সময় চুপচাপ বসে

ভাবতেন।'

‘ওঁর ওবুধপত্তর কি উনি সঙ্গেই নিয়েছিলেন?’

‘ওমুধ বলতে তো বেশি কিছু ছিল না : কয়েকটা বৈরাম, কিছু শিকড়-শাকড়, কিছু মলম, কিছু বড়—এই আর কি। এগুলো সবই উনি নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আমার নিজের ধারণা : উনি ক্রমে পুরোপুরি সন্ধ্যাসের দিকে চলে যাবেন।’

‘উনি বিয়ে করেননি?’

‘না। সংসারের প্রতি ওঁর কোনও টান ছিল না। ধারার দিন আমাকে বলে গেপেন—ভোগের রাস্তা, ত্যাগের রাস্তা, দুটোই আমার সামনে ছিল। আমি ত্যাগটাই বেছে নিলাম।’

‘ভাল কথা,’ বলল ফেলুদা, ‘আপনি যে বসালেন, ওঁর কন্দুপ্রয়াগের ঠিকানা আপনি দিয়ে দিয়েছেন ওই ভদ্রলোকটিকে—আপনি ঠিকানা পেলেন কি করে?’

‘কেন, উপাধ্যায় আমাকে পোস্টকার্ড লিখেছে সেখান থেকে।’

‘সে পোস্টকার্ড আছে?’

‘আছে বইকি।’

মিঃ পঙ্গিত তাঁর পিছনের একটা তাকে রাখা বাস্তুর ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা পোস্টকার্ড বার করে ফেলুদাকে দিলেন। হিন্দিতে লেখা আট-দশ লাইনের চিঠি। সেটা ফেলুদা বার বার পড়ল কেন, আর পড়ে বিড়বিড় করে দু’ বার ‘মোস্ট ইন্টারেস্টিং’ বলল কেন, সেটা বলতে পারব না।

মিঃ পঙ্গিত আমাদের একটা ভাল ট্যাক্সির কথা বলে দিলেন। আপাতত কন্দুপ্রয়াগ, তার পর যেখানেই যাওয়া দরকার—সেখানেই যাবে। গাড়োয়ালি ড্রাইভারের নাম যোগীন্দ্ররাম। লোকটিকে দেখে আমাদের ভাল লাগল। আমরা বললাম, বাবোটা নাগাদ যেয়েদেয়ে রওনা দেব হ্রীকেশ থেকে। হ্রীকেশ এখান থেকে মাইল পনের। হরিপুরে কিছুই দেখবার নেই, গঙ্গার ঘাটটা পর্যন্ত আগের বার যা দেখেছিলাম, তেমন আর নেই। বিশ্রী দেখতে সব নতুন বাড়ি উঠেছে আর তাদের দেওয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপন। হ্রীকেশে যাওয়া দরকার, কারণ আমাদের কন্দুপ্রয়াগে থাকার



বন্দোবস্ত করতে ইবে । ইচ্ছে করলে ধরমশালায় থাকা যাব ; এখানে প্রায় সব শহরেই বহু দিনের পুরনো নাম-করা কালী কমলী ধরমশালা রয়েছে, কিন্তু ফেন্দু জানে যে রামনারায়ণগড়ের ছেটকুমার ও সব ধরমশালায় থাকবে না ।

আমরা হ্রষীকেশ গিয়ে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিপামের রেস্ট হাউসে একটা উবল-রুহ পেয়ে গেলাম । তো বলল যে, তিনজন সোক হলে পড়তি একটা খাটিয়া পেতে দেবে । বারোটা নাগাদ খেয়ে আমরা রওনা দিলাম রুদ্রপ্রয়াগ । কয়েক মাইল যাবার পর ডাইনে পড়ল লহুমন্তুলা । এখানেও দু' দিকে বিশ্বী বিশ্বী শতুন বাড়ি আর হোটেল হয়ে জায়গাটির মজাই নষ্ট করে দিয়েছে । তাও বাদশাহী আংটির শেষ পর্বের ঘটনা মনে করে গা-টা বেশ ছমছম করছিল ।

রুদ্রপ্রয়াগ জরুরী দূটো করবে । এক হল জিম করবেট । 'দ্য ম্যান-ইটিং লেপার্ট' অফ রুদ্রপ্রয়াগ' যে পাড়েছে, সে কোনও দিন তুলতে পারবে না কী আশ্চর্য দৈর্ঘ্য, অধ্যবসায়, আর সাহসের সঙ্গে করবেট মেরেছিল এই মানুষকেকোকে আজ থেকে পক্ষাঘ বছর আগে । আমাদের ড্রাইভার যোগীপুর বগল, সে ছেলেবেলায় তার বাপ-ঠাকুরির কাছে শুনেছে এই বাধ মারার গল্প । কর্বেট যেমন ভালবাসত এই গাড়োয়ালিদের, গাড়োয়ালিয়াও ঠিক তেমনই ভক্তি করত করবেটকে ।

রুদ্রপ্রয়াগের আর একটা ব্যাপার হচ্ছে—এখান থেকে বদ্বী ও কেদার দু' জায়গাতেই যাওয়া যায় । দুটো নদী এসে মিশেছে রুদ্রপ্রয়াগে—মন্দাকিনী আর অলকনন্দা । অলকনন্দা ধরে গেলে বদ্বীনাথ আর মন্দাকিনী ধরে গেলে কেদারনাথ । বদ্বীনাথের শেষ পর্যন্ত বাস যায় ; কেদারনাথ যেতে বাস থেমে যায় ১৪ কিলোমিটার আগে গৌরীকুণ্ডে । সেখান থেকে হয় হেটে, নাহয় ভাণি বা টাটু যোড়া ভাড়া করে যাওয়া যায় ।

হ্রষীকেশ থেকে বেরিয়েই বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের পথ আরও হয়ে গেল । পাশ দিয়ে বয়ে চলছে—হানীয় সোকেরা যাকে বলে গজা মাসি । হ্রষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ১৪০ কিলোমিটার ;

পাহাড়ের রাস্তায় ৩০ কিলোমিটার করে গেলেও সেই সন্ধার আগে পৌঁছানো যাবে না। তা ছাড়া পথে তিনটে জায়গা পড়ে—দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর, আর শ্রীনগর। এই শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী নয়, গাড়ওয়াল জেলার রাজধানী।

পাহাড় ভেদ করে বনের মধ্য দিয়ে কেটে তৈরি-করা রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠছে, আবার ঘুরে ঘুরে নামছে। মাঝে মাঝে গাছপালা সরে গিয়ে খোলা সবুজ পাহাড় বেরিয়ে পড়ছে, তারই কোলে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

দৃশ্য সুন্দর ঠিকই, কিন্তু আমার মন কেবলই বলছে ভবানী উপাধ্যায়ের কাছে একটা মহামূল্য লকেট রয়েছে। একজন সন্ধ্যাসীর কাছে এমন একটা জিনিস থাকবে, আর তাই নিয়ে কোনও গোলমাল হবে না, এটা যেন ভাবাই যায় না। তা ছাড়া মিঃ পুরীর একবার ফেলুদাকে কাঁজের ভার দিয়ে, তার পরই টেলিগ্রাম করে বারণ করাটাও কেমন যেন গণ্ডগোল লাগছে। অবশ্য তিনি চিঠিতে কারণ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এ জিনিস এর আগে কক্ষনো হয়নি বলেই বোধহয় একটা খট্টকা মন থেকে যাচ্ছে না।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্থুস করছিলেন, এবার বললেন, ‘আমি ভূ-গণ্ডগোল আর ইতিহাস ক্ষেত্রে চিরকালই কঁচা ছিলাম ফেলুবাবু—সেটা তো আপনি আমার সেখা পড়েও অনেক বার বলেছেন। তাই, মানে, আমরা ভারতবর্ষের এখন ঠিক কোনখানে আছি, সেটা একটু বলে দিলে নিশ্চিন্ত বোধ করব।’

ফেলুদা তার বার্থেলোমিই কোম্পানির বড় ম্যাপটা খুলে বুঝিয়ে দিল—‘এই যে দেখুন হরিদ্বার। আমরা এখন যাচ্ছি এই দিকে। এই যে কন্দপ্রয়াগ। অর্থাৎ পূর্বে নেপাল, পশ্চিমে কাশ্মীর, আমরা তার মধ্যখানে, বুঝেছেন?’

‘হ্যাঁ। এই বারে ক্লিয়ার।’

পথে শ্রীনগরে খেমে চা খেয়ে কন্দপ্রয়াগ পৌছতে পৌছতে হয়ে পেল প্রায় পাঁচটা । ইঙ্গুলি কলেজ হাসপাতাল পোস্টাপিস থানা সহ মিলিয়ে কন্দপ্রয়াগ বেশ বড় শহর করবেট যেখানে জেপার্টে মেরেছিল, দেখানে অনেক দিন পর্যন্ত নাকি সহিনবোর্ড ছিল, কিন্তু যোগীন্দ্র বলল, সেটা নাকি কয়েক বছর ইল ভেঙে গেছে ।

আমরা সোজা চলে দেশাম গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসে । শহরের একটু বাহিরে সুন্দর নিরিবিল জায়গায় তৈরি রেস্ট হাউসে গিয়ে যে খবরটা প্রথমেই শুনলাম, সেটা হল : কেদারনাথের রাস্তায় এক জায়গায় ধস লামাতে নাকি বাস চলাচল বেশ কয়েক দিন বন্ধ ছিল, আজই আবার নতুন করে শুরু হয়েছে । এতে যে আমাদের একটা বড় রকম সুবিধে হয়েছিল, সেটা পরে বুঝেছিলাম ।

ম্যানেজার মিঃ গিরিধারী ফেলুদাকে না চিনলেও আমাদের খুব খাতির করলেন । উনি নাকি হিন্দি অনুবাদে বহু বাংলা উপন্যাস পড়ে খুব বাঙালি-ভক্ত হয়ে পড়েছেন । ওঁর ফেভারিট অথরস হচ্ছেন বিমল মিত্র আর শংকর ।

মিঃ গিরিধারী ছাড়াও আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন রেস্ট হাউসে, তিনি কেদারের পথ বন্ধ বলে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন । ইনি কিন্তু ফেলুদাকে দেখে চিনে ফেললেন । বললেন, ‘আমি একজন সাংবাদিক, আমি আপনার অনেক কেসের খবর জানি ; সেভেনটি নাইনে এলাহাবাদে সুখতঙ্কর ঘার্ডার কেসে আপনার ছবি বেরিয়েছিল নদৰ্ন ইঙ্গিয়া পত্রিকায় । সেই থেকেই আমি আপনাকে চিনেছি । আমার নাম কৃষ্ণকান্ত ভাগৰ্ব । আই আয়াম ভেরি প্রাউড টু মিট ইউ, স্যার ।’

ভদ্রলোকের বছর চলিশেক বয়স, চাপ-দাঢ়ি, আবারি গড়ন । মিঃ গিরিধারী স্বভাবতই ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভাবি উদ্দেজিত হয়ে পড়লেন—‘দেয়ার ইজ নো ট্রাবল হিয়ার আই হোপ ?’

‘ট্রাবল সর্বত্রই হতে পারে, মিঃ গিরিধারী । তবে আমরা এসেছি একটা অন্য ব্যাপারে । আপনাদের এখানে ভবানী উপাধ্যায় নামে

একজন ভদ্রলোক—'

‘উপাধ্যায় তো এখানে নেই, বলে উঠলেন সাংবাদিক মিঃ ভার্গব। ‘আমি তো ওঁকে নিয়েই একটা স্টোরি করব বলে এখানে এসেছি। হরিধারে গিয়ে শুনলাম, উনি কন্দপ্রয়াগ গেছেন; এখন এখানে এসে শুনছি তিনি খুব সন্তুষ্ট কেদারনাথ গেছেন। আমি তাই কাল সকালে কেদার যাচ্ছি ওঁর খৈঙে। হি ইঙ্গ এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারাক্টার, মিঃ মিটার।’

‘আমি অবিশ্য ওঁর অসুখ সাবানোর কথা শুনেছি, বলল ফেলুন। তার পর লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘আমার এই বন্ধুটির মাঝে মাঝে একটা মন্তিকের ব্যবাধের মতো হয়। ভুল বকেন, সামান্য ভায়োলেস্কও প্রকাশ পায়। তাই একবার ওঁকে দেখাব ভাবছিলাম। কলকাতার অ্যালোপাথি হেমিওপ্যাথিতে কোনও কাজ দেয়নি।’

লালমোহনবাবু প্রথমে কেমন খতমও খেয়ে, তার পর ফেলুন্দার কথা সত্ত্বে প্রমাণ করার জন্য মুখে একটা হিংস্র ভাব আনার চেষ্টা করলেন, যেটা আমাদের একটা নেপালি মুখোশ আছে, স্টোর মতো দেখাল।

‘তা ইলে আপনাদের এই কেদার-বন্দী যাওয়া ছাড়া গতি নেই, বললেন মিঃ ভার্গব। ‘আমি বদী গিয়ে ওঁকে প্রাইনি।’ অবিশ্য উনি নাকি সন্ধ্যাসী হয়ে গেছেন, তাই নামও হয়তো বদলে নিয়েছেন।’

এই সময় রেস্ট হাউসের গেটের বাইরে একটা আমেরিকান গাড়ি থামল, আর তার থেকে তিনজন ভদ্রলোক নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এদের যিনি দলপতি, তাঁকে চিনতে মোটেই অসুবিধা হল না, কারণ তাঁরই রঙিন ছবি রঘেছে ফেলুন্দার কাছে। ইনি ইলেন কৃপনামায়ণগড়ের ছেটকুমার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন পৰবন্দেও সিঃ। অন্য দুজন নির্ণয় এর চামচ।

আমরা পাঁচজন এতক্ষণ বাংলের সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এবার আরও তিনজন লোক বাড়ল। পৰবন্দেও একটা বেতের চেয়ার দখল করে বললেন, ‘আমরা বন্দীনাথ থেকে আসছি। সো লাক। উপাধ্যায় ওখানে নেই।’

মিঃ গিরিধারী বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমার এখানে যতজন অতিথি এসেছেন, সকলেই উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন, এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন কারণে। আপনি ওর ছবি তুলবেন, মিঃ ভার্গব ওঁকে ইন্টারভিউ করবেন, আর মিঃ মিটার তাঁর বন্ধুর চিকিৎসা করবেন।'

পবনদেওর দলের সঙ্গে টেলিভিশনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। ক্যামেরাটা পবনদেওর নিজের হাতে, আর তাতে লাগানো একটা পেল্লায় লেপ।

'ওটা তো আপনার টেলি-সেন্স দেখছি', ফেলুদা মন্তব্য করল।

পবনদেও ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'হ্যাঁ। সকালের রোদে বদ্বীনাথের চুড়ো থেকে বরফ গলে গলে পড়তে দেখা যায়। আর কচুয়েলি আমার পুরো সরঞ্জাম একজনেই হ্যান্ডল করতে পারে। ক্যামেরা, সাউন্ড, সব কিছু। আমার এই দুই বন্ধু থাকবেন গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। বাকিটা আমি একাই তুলব।'

'তার মানে আপনিও কেদারনাথ যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ছি।'

'আপনি ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে ফিল্ম তুলছেন ?'

'হ্যাঁ। অন্তেলিয়ান টেলিভিশনের জন্য। উপাধ্যায়—মানে, তার সঙ্গে হরিদ্বার-হ্যায়ীকেশ-কেদার-বদ্বীও কিছু থাকবে।' তবে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হবেন ভবানী উপাধ্যায়। আশ্চর্য চরিত্র। উনি আমার বাবার হাঁপানি যেভাবে সারিয়েছিলেন, সেটা একটা মিরাক্ল।'

আমি আড়চোখে পবনদেওকে জরু করে যাচ্ছিলাম। মিঃ উমাশঙ্কর পুরী যে চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন, তার সঙ্গে কেনও মিল পাচ্ছিলাম না। ফেলুদা দেখলাম উমাশঙ্কর পুরীর কেনও উল্লেখ করল না।

কন্দপ্রয়াগে পৌছানোর সময় একটা হোটেল দেখে রেখেছিলাম, সেইখানেই আমরা তিনজন গিয়ে ডিনার সাবলাম। বয় যখন অর্ডার নিতে এল, তখন লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ তেজের সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে একটা গোলমরিচদান উল্টে দিয়ে বললেন, তিনি আরমাডিলোর ডিমের ডাঙলা খাবেন। তখন

ফেলুদার তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হল যে, যাদের কাছে ওঁর অসুখের কথাটা বলা হয়েছে, শুধু তাদের সামনেই এই ধরনের ব্যবহার চলতে পারে, অন্য সময় নয় । বিশেষ করে ভায়োলেন্সটা যার তার সামনে দেখাতে গেলে হয়তো লালমোহনবাবুকেই প্যাদানি খেতে হবে ।

‘তা বটে’ ; বললেন পাপমোহনবাবু । ‘তবে অপরচুনিটি পেলে কিন্তু ছাড়ব না ।’

প্রদিন ভোরে উঠতে হবে বলে আমরা খাওয়ার পর শেষ করেই রেস্ট হাউসে চলে এলাম । কেউ কোনও হ্মকি চিঠি দিয়ে যায়নি তো এই ফৌকে ? আমাদের আবার এই জিনিসটার একটা ট্র্যাডিশন আছে । কিন্তু না ; এদিক ওদিক দেখেও তেমন কিছু পেলাম না ।

আমাদের দুটো ঘর পরেই যে পৰন্দেও তার দুই বন্ধু আর মিঃ গিরিধারীকে নিয়ে পানীয়ের সম্বুদ্ধার করছেন, সেটা গেলাসের টুং টাং আৰ দমকে দমকে হাসি খেকেই বুঝতে পাৰছিলাম ।

লালমোহনবাবু তাঁর বালিশে মাথা দিয়ে বললেন, ‘একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে ফেলুবাবু—সে দিন আপনার ঘরে বসে পূরী সাহেব ছেটকুমার সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ মাই ডিয়ার বলেই মনে হচ্ছে ।’

ফেলুদা বলল, ‘প্রকৃতি কিন্তু অনেক হিংস্র প্রাণীকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে । বাংলার বাঘের চেয়ে সুন্দর কোনও প্রাণী আছে কি ? ময়ুরের ঠোকুরানিতে যে কী তেজ আছে তা তো আপনি জানেন । জানেন না ?’

লালমোহনবাবু তাঁর অ্যালার্ম ক্লকের চারিটায় একটা মোচড় দিয়ে, চেয়ে একটা হিংস্র উন্মাদ ভাব এনে বললেন—‘পোপোক্যাটাপেটাপোটোপুলটিশ ।’

আমরা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ট্যাক্সির সামনে গিয়ে হাজির হলাম । যোগীন্দ্ররাম তার আগেই রেডি । আমাদের গাড়ির কাছেই পৰন্দেওর আমেরিকান গাড়িতে মাল তোলা হচ্ছে । ও

গাড়ি আধ ঘণ্টার আগে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না । তবে এও ঠিক যে, মাঝপথে ও আমাদের ছাড়িয়ে থাবে ।

ট্যাঙ্গিতে যখন উঠতে যাব, তখন হেটকুমার হঠাৎ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন । বোঝাই যাচ্ছে কিছু বলার আছে ।

ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘কাল রাত্রে মিঃ গিরিধারী নেশার বৌকে আপনার আসল পরিচয়টা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন । আমি আপনাকে একটা সোজা প্রশ্ন করতে চাই ।’

‘বলুন ।’

‘উমাশঙ্কর কাকা কি আমার উপর চোখ রাখার জন্য আপনাকে একাজে বহুল করেছেন ?’

‘তিনি যদি সেটা করেও থাকতেন,’ বলল ফেলুদা, ‘সেটা আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না, কারণ সেটা নীতিবিকল্প এবং বোকায়ি হত । তবে আমি আপনাকে এলেই দিচ্ছি—আসলে আমি মিঃ পুরীর হয়ে কিছু করছি না । আমাদের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য এমণ । তবে যদি কোনও গুণগোল দেখি, তা হলে গোয়েন্দা হয়ে আমার নিজেকে সংযত রাখা বুদ্ধি মুশকিল হবে । ভবানী উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা প্রবণ কৌতুহল জেগে উঠেছে । তার একটা বিশেষ কারণ আছে, যদিও এখনও সেটা প্রকাশ করতে পারছি না ।’

‘আই সি ।’

‘এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?’

‘করুন ।’

‘আপনি কি আপনার ফিল্মে সেই বিখ্যাত লকেটটি দেখাতে চান ?’

‘নিশ্চয়ই । অবিশ্বাস্য সেটা যদি এখনও উপাধ্যায়ের কাছে থেকে থাকে ।’

‘কিন্তু উপাধ্যায়ের কাছে যে ও-রকম একটা জিনিস আছে, সেটা জানাজানি হয়ে গেলে তো ওর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে । এত দিন যে-ব্যাপারটা গোপন ছিল, সেটা আপনি প্রচার করে দেবেন ?’

‘মিঃ মিস্টির, তিনি যদি সত্যিই সম্মাসী হয়ে থাকেন, তা হলে



তো তাঁর আর ও জিনিসের কোনও প্রয়োজন থাকতে পত্তে না ! আমি ওঁকে বলব, একটা কোনও বড় মিউজিয়ামে ওটা দান করে দিতে । জিনিসটা চারশো বছর আগে ত্রিবাঙ্গুরের রাজাৰ ছিল । ক'রিগৱিৰিৰ দিক দিয়ে অঙ্গুলীয় । উনি ওটা ডোনেট কৱলে চিৰকাল ওঁৰ নাম ওই লকেটেৰ সঙ্গে জড়িত থাকবে । মোট-কথা, ওই লকেট আমি ছবিতে দেখাচ্ছি, এবং সেখানে আপনি জন্মা কৱি কোনও বাধা দিতে চেষ্টা কৱবেন না ।

শেষেৰ কথাটা বেশ দাপটেৰ সঙ্গেই বলে ছেটকুমাৰ তাঁৰ গাড়িতে ফিৰে গেলেন । এবাৰ তাঁৰ জায়গায় মাংবাদিক মিঃ ভার্গব এসে বললেন, 'আপনাৰা তিনজন আছেন জন্মলে তো আপনাদেৱ সঙ্গেই যাওয়া যেত । উপাধ্যায় সন্ধানে আমি যে-সব তথ্য আবিষ্কাৰ কৱেছি, মেণ্টে আপনাকে বলতে পাৰতাম ।'

'আপনাৰ এই তথ্যেৰ সোৰ্স কী ?' ফেলুদা জিগোস কৱল ।

'কিছু দিয়েছেন রূপনাৱায়গড়েৰ বড় কুমাৰ সূৰ্যদেও, কিন্তু আসল তথ্য দিয়েছে রাজবাড়িৰ এক আশি বছৱেৰ শুড়ো বেয়াৰা । আপনি কি জানেন যে, রূপনাৱায়গড়েৰ রাজা চন্দ্ৰদেও সিং-এৰ হৰ্ষপানি উপাধ্যায় সাৱিয়ে দিয়েছিলেন ?'

'তাই বুঝি ।'

'আৰ তাৰ জন্য রাজা তাঁকে ইনাম দিয়েছিলেন ওয়ান অফ হিজ মোস্ট প্ৰেশাস অৰ্নমেন্টস । এ যৰু এত দিন ওদেৱ ফ্যান্ডলিৰ বাইৱে কেউ জানত না । আপনি ভাৰতে পাৱেন, যবৱেৰ কাগজেৰ কাছে এই ঘটনার কী দাম ?'

'আপনি তো তা হলে রাজা ছয়ে যাবেন, মিঃ ভার্গব !'

'আমি আপনাকে বলছি মিঃ মিস্টের, এই লকেট উপাধ্যায়েৰ কাছে বেশি দিন থাকবে না । আপনি কি ছেটকুমাৰৰ কথায় বিশ্বাস কৱেন যে, ও শুধু টি ডিন ছবি তুলতে গোছে ? আমি বলছি আপনাকে, এখানে শিগগিৰই আপনাৰ নিজেৰ পেশাৰ আশ্রয় নিতে হবে ।'

'তাৰ জন্য আমি সদা প্ৰস্তুত', বলল ফেলুদা ।

মিঃ ভার্গব চলে গেলেন ।

‘লোকটা তো ঘোড়েল আছে, মশ’ই, বললেন লালমোহনবাবু।

‘সাংবাদিক মাত্রেই ঘোড়েল’, বলল ফেলুদা। ‘গোয়েন্দাগিরিতে ওরাও কম যায় না। রাজবাড়ির পুরনো বেয়ারাকে জেরা করায় ও খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। পরিচারকেরা অনেক সময় এমন খবর রাখে, যা মনিবেরা জানতেই পারে না। কিন্তু তাও---’

‘তাও কী?’ আমি জিগ্যেস করলাম, ফেলুদার মনটা খচখচ করছে।

‘তাও যে কেন লোকটাকে দেখে অসোয়াস্তি লাগছে, তা বুঝতে পারছি না।’

আমাদের গাড়ি ঝদ্রপ্রয়াগ থেকে রওনা হয়ে অলকানন্দার পাশ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ একটা টানেলে চুকে পড়ল। সেই টানেল থেকে যখন আবার আলোয় বেরোলাম, তখন নদী পালটে গিয়ে হয়ে গেছে ‘মন্দাকিনী’। এটাই এখন চলবে আমাদের সঙ্গে কেদার পর্যন্ত। কেদার থেকেই নাকি মন্দাকিনীর উৎপন্নি।

ফেলুদার ভুকুটি থেকেই বুঝতে পারছিলাম, কোনও একটা কারণে ওর বিরক্ত লাগছে। এবাবে ওর কথায় সেটা বুঝতে পারলাম—

‘আমার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে ওই পিরিখৰী লোকটার উপর। ও যে এত ইরেসপনসিভল তা ভাবতে পারিনি। ছেটকুমার এখন যে কথাগুলো বললেন, সেগুলো অবিশ্য ওর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আশ্চর্য লাগছে জেনে যে, মিঃ পুরীর সঙ্গে ওর আর দ্বিতীয়বার কোনও কথাই হয়নি। সেঙ্গেত্রে মিঃ পুরীর চিঠি, টেলিগ্রাম দুটোই রহস্যজ্ঞনক হয়ে উঠছে। অবিশ্য সবই নির্ভর করছে, কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে তার উপর। মোট-কথা, কেস ড্রপ করলেও, এখানে আসার সিদ্ধান্ত যে ড্রপ করিনি, সেটা খুব ভাগ্যের কথা।’

গৌরীকুণ্ড ঝদ্রপ্রয়াগ থেকে আশি কিলোমিটার হলেও এত চড়াই-উঁরাই আৰ এত ঘোৱপ্যাঁচেৰ রাস্তা, যেতে বেশ সময় লাগে। পথে তিনটে শহুৰ পড়ে। ৩০ কিলোমিটারেৰ মাথায় অগন্ত্যমুনি, শাইট আন্দাজ ৯০০ মিটাৰ; সেখান থেকে ৯

কিলোমিটার দূরে গুপ্তকাশী—যদিও হাইট এইটুকুর মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে ডবল। গুপ্তকাশী থেকে শোনপ্রয়াগ, যেখানে শোনগঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গে এসে মিশেছে। এই শোনপ্রয়াগ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে হল গৌরীকুণ্ড—যদিও সেখানে গিয়ে হাইট হয়ে যাচ্ছে সোয়া দু' হাজার মিটার।

আমাদের গরম জামা যাতে প্রয়োজন হলে সহজেই ধার করে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছিলাম। বড় সুটকেস জাতীয় মাল আমাদের সঙ্গে যা ছিল, তা সবই গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসের লকারে রেখে দিয়ে এসেছি, ফেরার সময় আবার নিয়ে যাব। লালমোহনবাবুর টাকের জন্য উনি এর মধ্যেই টুপি পরে নিয়েছেন, যদিও আমাদের বাঙালি মাস্কি ক্যাপ না ; রাজস্থান থেকে কেনা কান-ঢাকা পশ্চমের লাইনিং দেওয়া স্কার্ট চামড়ার টুপি।

অগস্তমুনি পৌছে গাড়ি থামিয়ে যখন আমরা গরম জামা পরছি, তখন আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল পৰমদেওর আমেরিকান ট্যুরার। ছোটকুমার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওয়েভ করাতে ফেলুন্দাকে হাত নাড়াতে হল।

আমরা শীতের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়ে আবার বাঁচা দিলাম। বাঁয়ে মন্দাকিনী একবার আমাদের পাশে চলে আসছে, আবার পরফ্রগেই নেমে যাচ্ছে সেই খাদের একবারে নীচে। নদীর শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লালমোহনবাবুর সুর করে বলা, 'ওরে তোরা কি জনিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে চেউ'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি পুরো কুবিতাটার কেবলমাত্র ওই দুটো লাইনই জানেন।

শেষে ফেলুন্দা আর থাকতে না পেরে লাইন যোগ করতে শুরু করে দিল—ওরে তোরা কি জনিস কেউ, কেন বাঘ এলে ডাকে যেউ... ওরে তোরা কি শুনিস কেউ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, খোকা কাঁদে ভেউ ভেউ...

গুপ্তকাশী যখন পৌছলাম, তখন বেজেছে দশটা। এখানে একটা চায়ের দোকান দেখে থামতে হল। যাকে ত্রেকফাস্ট বলে

সেটা সকালে হয়নি, কাজেই খিদেটা ভালই হয়েছিল। গরম জিলিপি, কচুরি আর চা দিয়ে দিব্য ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল।

যোগীন্দ্রের এক ভাই কাছেই থাকে, সে বলল তার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করে আসছে। সেই ফাঁকে লালমোহনবাবু চন্দ্রশেখর মহাদেব আর অর্ধনারীশ্বরের মন্দিরগুলো দেখতে গেলেন।

গুপ্তকাশী থেকে পাহাড়ের উপর দেখা যায় উঠীমঠ। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বেদারের পথ যখন বরফের জন্য এক্ষ থাকে, তখন কেদারেশ্বরের পুজো এই উঠীমঠেই হয়ে থাকে।

লালমোহনবাবু মন্দির দেখে ফিরে এলেন, কিন্তু যোগীন্দ্রের ফেরার নাম নেই। ফেলুদা আর আমি বাস্তভাবে এদিক-ওদিক দেখছি। এমন সময় দেখি, ছেটকুমারের গাড়ি আসছে। ওরা আমাদের পেরিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে পড়ল কেন?

আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে কুমার নেমে এলেন। বললেন, গুপ্তকাশী থেকে নাকি কেদার ও বদ্রী দুটো চুড়োরই ভিত্তি পাওয়া যায়, তাই ওরা এখানে কিছুটা সময় দিলেন। তবে আর দেরি করলে চলবে না, কারণ তা হলো যাত্রীদের রওনা দেবার দৃশ্য তোলার জন্য আর আসে থাকবে না।

কিন্তু তাও যোগীন্দ্রের দেখা নেই। তার বদলে দেখা দিলেন সংবাদিক মিঃ ভার্গব। তাঁর গাড়িটা আগে দেখেছিলাম, আর ভাবছিলাম তিনি এখানে একক্ষণ কী করছেন। ভদ্রলোক বললেন যে, কেদারনাথের সেবায়েতের একজন নাকি এখানে রয়েছেন। এরা সকলেই রাওয়াল পরিবারের সোক; এই বিশেষ রাওয়ালটির সঙ্গে নাকি একটা ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলেন মিঃ ভার্গব। এখনই আবার তাঁকে ছুটতে হবে শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড।

মিঃ ভার্গব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বছর পরেরের ছেলে এসে হঠাতে ‘ফোর-থার্টি-ফোর ট্যাঙ্কি কি কেই পাসিঙ্গের হ্যায় ইহা?’ এসে হঠাতে ‘ফোর-থার্টি-ফোর ট্যাঙ্কি কি কেই পাসিঙ্গের হ্যায় ইহা?’ বলে হাঁক দিতেই ফেলুদা বাস্তভাবে তার দিকে এগিয়ে গেল!

‘ফোর-থার্টি-জিলো-ফোর কি পাসিঙ্গের?’

‘হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?’

ব্যাপার আৰ কিছুই না, আমাদেৱ গাড়িৰ ড্রাইভৰ ভগ্ন হয়ে পড়ে আছে কিছু দূৰে। ছেলেটি তাকে চেনে বলে সে খবৰ দিচ্ছে এসেছে।

লালমোহনবাবুকে আমাদেৱ জিনিসপত্ৰ পাহাৱা দেৰার জন্ম রেখে, আমৱা দুঃখ ছেলেটাকে অনুসৰণ কৰে গেলাম।

পাঁচ-সাতটা বাড়ি নিয়ে একটা নিৰিবিলি পাড়ায় একটা কলাগাছেৰ ধাবে যোগীন্দ্ৰৱাম মাটিতে মুখ খুৰতে পড়ে আছে; তাৰ মাথাৱ পিছন দিকেৰ ঘন কালো চুলে অন্তৰ ছোপ। শৰীৱেৰ ওঠা-নামা থেকে বোৰা যাচ্ছে সে মৱেনি, কিন্তু ফেলুদা তাৰ দোচূ গিয়ে তাৰ মাড়ি পৰীক্ষা কৱল।

কে এই কুকীৰ্তি কৱেছে, এ নিয়ে চিন্তা কৰাৰ সময় নেই; এখন দৱকাৰ ওৱ চিকিৎসা। ছোকৰাটি বলল, এখানে হাসপাতাল দাওয়াখানা দুই-ই আছে। সে আবাৱ গাড়িও চালাতে জানে। শেষ পৰ্যন্ত সে-ই নিজে টাঙ্গি চালিয়ে যোগীন্দ্ৰৱকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সব মিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েক দেৱি হয়ে গেল। যোগীন্দ্ৰেৰ মাথাৰ ব্যান্ডেজ, ব্যথাও আছে; তাকে বলা হল যে এখন থেকে অন্ত টাঙ্গিৰ ব্যবস্থা কৰে দিলে, আমৱা তাতেই যাব। কিন্তু সে রাজ্ঞী হল না। সে নিজেই যাবে আমাদেৱ নিয়ে।

‘কে মেৰেছিল, কিছু বুৰুতে প্ৰেৰেছিল?’ ফেলুদা জিজেস কৱল।

‘নেহি, বলল যোগীন্দ্ৰ, ‘পিছে সে আ কৱ মাৰা।’

‘এখানে তোমাৰ কোনও দুশ্মন আছে?’

‘কোই ভি নেহীঁ।’

ফেলুদা কী ভাবছে সেটা আমি জানি। দুশ্মন যদি থাকে তো সে আমাদেৱ দুশ্মন। আমাদেৱ দেৱি কৱিয়ে দেৱার জন্ম ব্যাপারটা কৰা হয়েছে। শক্ত কে আমৱা বুৰুতে না পাৱলেও, শক্ত যে কৰেছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমৱা রঞ্জনা হ্বাৱ পৱ আমি ফেলুদাকে বললাম, ‘আচ্ছা, মিঃ পুৰী বে তোমাৰ কাছে এসেছিলেন, সেটা আনতে পেৱে ছেটকুমাৰ



তাকে দিয়ে টেলিগ্রামটা করিয়ে চিঠিটা লেখায়নি তো ?—গাত্রে
তার কাজে ফেনু মিঞ্চির কোনও বাধার সৃষ্টি না করতে পারে ?'

‘এটা গুই খুব ভাল ভেবেছিস তোপসে। কথাটা আমারও মনে
হয়েছে। অবিশ্বিত তার মানে এটাও বোঝা যায় যে, যিঃ পুনীর উপর
এতটা কর্তৃত করার ক্ষমতা ছেটকুমারের আছে।’

‘তা ধাকবে না কেন’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘ছেটকুমার ইউ
এ প্রিস, আশু পুরী ইউ ওনলি এ কর্মচারী।’

‘ঠিক বলেছেন আপনি’, বলল ফেলুন্দা, ‘এখানে বয়সের তফাতটা
কিছু মাটোর করে না। তবে হাঁ—এটাও ঠিক যে টেলিগ্রাম আর
চিঠি সত্ত্বেও আমি যে চলে আসব, সেটা বেঢ়েয় ছেটকুমার
ভাবতেই পারেনি।’

‘তার মানে যোগীন্দ্রকে জখম ওরাই করিয়েছে ?’

‘যোগীন্দ্র যখন বলছে এখানে ওর কোনও শক্ত নেই, তখন
আর কী হতে পারে ?’

‘এক্সকিউজ মি স্যার’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমার কিন্তু শুই
সাংবাদিক লোকটিকেও বিশেষ সুবিধের লাগছে না।’

‘কেন বলুন তো ? আমার নিজেরও যে ভদ্রলোককে একেবারে
আদর্শ চরিত্র বলে মনে হচ্ছে তা নয়। কিন্তু আপনার ভাল
না-লাগার কারণটা জানার কৌতুহল হচ্ছে।’

‘সাংবাদিক হলে পকেটে কলম থাকবে না ?’ বললেন
লালমোহনবাবু। ‘বাইরের পকেটে তো নেই-ই, কাল যখন কেটি
পরছিল তখন দেখলাম বুক পকেটেও নেই, শার্টের পকেটেও
নেই।’

‘আমার মতো যদি একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার থাকে ?’

‘লালমোহনবাবু যেন কথাটি শনে একটু দমে গেলেন।
বললেন, ‘তা যদি হয়, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। আসলে
আমার চাপ-দাঢ়ি দেখলেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়।’

‘যাকগে—এবার একটু কাজের কথায় আসা হাক।’

‘কী ?’

আপনি কোনটা প্রেফার করবেন—যোড়া না ডাঙি ?’

‘ন্যাচারেলি আপনারা যেটা প্রেফার করবেন, সেটাই। এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হতে পারে না।’

‘কেদারের পথ সম্মতে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, আশা করি?’

‘হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ?’

‘হাসছেন কেন?’

‘আমার ধারণাটা বোধ হয় আপনার চেয়েও ভিত্তিড, কারণ কেদার-যাত্রা সম্মতে এখিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক যা লিখে গেছেন, তার তুলনা লিটারেচরে বেশি পাবেন না। তবে, জানো পোয়েমটা?’

‘না তো।’

‘শুনুন ফেলুবাবু।’

‘দাঁড়ান, সামনে দুটো ইউ-টার্ন আসছে, সেগুলো পেরিয়ে যাক। সোজা রাস্তা না পেলে আবৃত্তি করাও যাব না, শোনাও যাব না।’

মিনিট দশক পরে একটা সোজা রাস্তা পেয়ে লালমোহনবাবু তাঁর আবৃত্তি আরম্ভ করলেন—

“শহরের যত ক্লেদ, যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দেখ চলে কত ভজ্জন
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে।
শুধু আজ নয়, সেই পুরাকাল হতে—
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গান্ধীর্য মাঝো ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী”—

এইবার হচ্ছে আসল ব্যাপার। শুনুন, যাত্রীদের কিভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন ভদ্রলোক—

“তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী—
দেবদৰ্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি
মিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী অগমন
প্রাণ যায় যদি হয় পদশ্বলন,
তাও চলে আঘারোহী, চলে ডাঙিবাহী,

যষ্টিধারী বৃক্ষ দেখ তাৰিখ ক্লাস্তি নাহি
 আছে শুধু অটুন বিশ্বাস
 সব ক্লাস্তি হবে দূৰ, পূৰ্ণ হবে আশ
 যাত্রা অঙ্গে বিৰাজেন কেদারেশৰ
 সৰ্বশুণ্ঠি সৰ্বশক্তিধৰ
 মহাত্মীৰ্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
 উচ্চকঠে ধৰ সবে—কেদারেৰ জয় !”

‘হুঁ’ বলল ফেলুদা, ‘বোৰাই যাচ্ছে, মল্লিক মশাই এ কবিতা
 লিখেছিলেন বাস-ট্যাঙ্কিৰ যুগেৰ অনেক আগে।’

‘সাটেনলি,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘তাঁকে তুই র্ঘ্যাত্মীৰ পুত্ৰো
 ধকল ভোগ কৰতে হয়েছিল।’

‘কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হচ্ছে—আপনি কি অশ্বারোহী হতে চান, না
 ডাঙিৰ দ্বাৰা বাহিত হতে চান, না পয়দল ধেতে চান।’

‘সেটা সব ডিপেন্ড কৰছে আপনাদেৱ উপৰ। দলচূত হৰিৱ প্ৰশ্ন
 তো আৱ উঠতে পাৰে না।’

‘আমি আৱ তোপসে তো হেঁটেই যাব হিৰ কৱেছি। আপনাৰ
 পক্ষে ডাঙিটা সবচেয়ে নিৱাপদ, কাৰণ ঘোড়াগুলোৱ টেনেপি হচ্ছে
 পথেৰ যে দিকটায় যাদ, তাৰ কান্দা ধৰে চলা। সে টেনশন
 আপনাৰ সহ্য হবে না।’

লালমোহনবাবু ভয়ঙ্কৰ রকম গন্তীৰ হয়ে বললেন, ‘শুনুন
 ফেলুবাবু, আপনি কিন্তু আমাৰ ক্ষমতাকে ক্ৰমান্বয়ে আন্তাৰ এস্টিমেট
 কৰে চলেছেন। আমি গেলৈ হেঁটে যাব, আৱ নয়তো যাব না। এই
 আমাৰ সোজা কথা।’

‘যাক, তা হলৈ এটা সেটুলড’, বলল ফেলুদা।

‘একটা প্ৰশ্ন আমি কৰতে পাৰি কি?’ বললেন
 লালমোহনবাবু—‘অবিশ্বিত এটা জাৰি সম্বন্ধে নয়।’

‘নিশ্চয় পাৱেন।’

‘এৱা তো মশাই আমাদেৱ চিনে ফেলেছে; এখন কেদার গিয়ে
 আমৰা কৰছিটা কী?’

‘সেটা সব নির্ভর করছে—কে আগে উপাধ্যায়ের সঙ্গান পায় তার উপর।’

‘শরম যদি আমরাই পাই।’

‘তা হলে তাঁকে স্বিন্তারে বাপারটা দলতে হলে। সংযোগী হয়ে তাঁর মনোভাব যদি বদলে গিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো লকেটটা উনি আর নিজের কাছে রাখতে চাইবেন না। আমাদের কর্তৃত্ব হয়ে—তিনি সেটা কাকে দিয়ে যেতে চান, তাঁর অনুসরণ করা—অবশ্য সে একম সোক যদি কেউ থেকে থাকে। এর মধ্যে যদি ছেটকুমারও উপাধ্যায়ের সঙ্গান পেয়ে যান, তা হলে তিনি হয়তো লকেটটাৰ ছবি তুলতে চাইবেন। চন্দ্রদেৱের ছেলে বসে উপাধ্যায় হয়তো স্নেহবশত তাতে রাজিত হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উপাধ্যায়ের অমতে পৰবন্দেওকে কোনও মতেই লকেটটা হস্তগত করতে দেওয়া যায় না। অবিশ্বিত সে যে সেটা হাত করতে চাইছে, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। আমরা শুধু অনুমান করছি যে, সেই হমকি দিয়ে মিঃ পুরীকে চিঠি ও টেলিগ্রামটা পাঠাতে বাধা করেছিল। কিন্তু তারও এখনও কোনও প্রমাণ নেই। টেলিভিশনের ছবি তোলা ছাড়া তার আর কোনও উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু সাংবাদিক মিঃ ভার্গবও যে উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন।’

ফেলুদা বলল, ‘আমার বিশ্বাস : ভার্গব যখন আসল ঘটনা জেনে গেছে, তখন তার শুধু দুটো ছবি পেলেই কাজ হয়ে যাবে—একটি উপাধ্যায়ের, একটি লকেটের। কারণ এই কাহিনী দ্বরের কাগজে প্রকাশিত হলে ভার্গবের অন্তর্ভুক্ত কিছু দিন আর অন্ধচিন্তা থাকবে না।’

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়িটা কিন্তু অত্যন্ত বেয়াড়া রকম চড়াই উঠে দশ হাজার ফুট বা সাড়ে তিনি হাজার মিটারের উপরে পৌঁছে গেল। অন্তত যোগীন্দ্র তাই বলল, আর সেই সঙ্গে বাইরের কানকানে শীতেও তার প্রমাণ পেলাম। এখন মাঝে মাঝে বরফের কানকানে শীতেও তার প্রমাণ পেলাম। এখন মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনটা যে কোন শূল তা বুঝতে

পারছি না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গৌরীকুণ্ড পৌছে যাওয়া উচিত। ঘড়ি বলছে পাঁচটা পনেরো। দূরে পাঠাড়ের চুঙ্গোয় উচ্চল রোদ থাকলেও আশেপাশের পাহাড়ে পাইন আর রঙেরেন্ড্রনের বনে অঙ্ককার ঘনিয়ে এসেছে।

একটা ঘোড় ঘুরে সামনে দুর বাড়ি গোড়া ইত্যাদি দেখে বুঝলাম যে, আমরা গৌরীকুণ্ডে এসে গেছি। এটাও বুঝলাম যে, আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে। আমদের কেদার-থাত্রা শুরু হবে কাল শোবে। আর তোরে রওনা হলেও চোদ কিলোনিটাৰ চড়াই পথ যেতে সক্ষে হয়ে যাবে। অর্থাৎ আসপ ঘটনা যা ঘটিবাব, তা পরপুর আগে নয়।

বাস টারমিনাস হ্বার ফলে ছোট জায়গা হওয়া সহেও গৌরীকুণ্ডে ব্যস্ততার শেষ নেই। ঘোড়া, ডাঙি, কাঞ্চি, কুলি—এদের সঙ্গে দুর-দুষ্কৃতি চলছে। কাঞ্চি জিনিসটা বুড়ি টাইপের। এতে করেও মানুষ যায়, যদিও দেখে মোটেই ভুসা হয় না।

এখানে রাতে থাকতে হবে জেনেও আগে কোনও বন্দোবস্ত করিনি। কারণ, জানি অস্তত একটা ধরমশালা কি চাই পেয়ে যাব : সত্যই দেখা গেল, জায়গার কোনও অভাব নেই। এখানে পাতারা ঘর ভাড়া দেয়। বিছানা বালিশ সেপ কস্তুর সরই দেয়। পাতারা বাঞ্চালি না হলেও বাঞ্চালি যাত্রী এত আসে যে, এরা দিবিয় বালু শিখে গেছে। এদের থাকার ঘরগুলো হয় দোতলায়। বেঁটে বেঁটে ঘর, যার সিলিং-এ ফেলুদার প্রায় মাথা ঠেকে যায়। এই ঘরের নীচে সেই রুকমই বেঁটে বেঁটে সার বাঁধা দোকান। সজ্জার ব্যাপার, তবে আমদের কথা হচ্ছে রাত্তিরে ঘুমোনো। সেই কাঞ্চটায় কোনও ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না।

আমরা এখানে এসেই ছেটকুমারের হসদে আমেরিকান গাড়িটা দেখেছিলাম। ওরা আমদের চেয়ে ঘন্টা চারেক আগে পৌছেছে নিশ্চয়। অর্থাৎ দুপুরে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে রাত্তিরের মধ্যে পৌছে যাবে। তার ফালে কেদারে একটা পুরো দিনেরও বেশি সময় পাচ্ছে ছেটকুমার।

আমার ধারণা, মিঃ ভার্গবও আজ রান্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

আশচর্য এই যে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—উপাধ্যায় মশাইয়ের সন্ধান করা।

৫.

পাঞ্চাদের ঘরে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে ভোর পাঁচটার মধ্যে অ্যালার্ম বাজিয়ে উঠে আমরা তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এত ভোরে বিভিন্ন দেশীয় এত যাত্রীর ভিড় এখানে জমায়েত হয়েছে, সেটা ভাবতেই পারিনি। এদের মধ্যে বাঙালি আছে প্রচুর, আর তাদের প্রায় সবাই দলে এসেছে। দল বলতে অবিশ্য পরিবারও বোবায়। সত্ত্বর বছরের দাদু থেকে নিয়ে পাঁচ বছরের নাতনি পর্যন্ত, তার মধ্যে মাসি-পিসিও যে নেই, তা নয়।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ক্যামেরা হাতে পরবন্দেওকে দেখে বেশ অবাক হলাম। তিনি ঘোড়া ভাড়া করেছেন দুটো—একটা নিজের জন্য, আর একটার পিঠে থাকবে সরঞ্জাম। আমাদের দেখে বললেন, শোনপ্রয়াগে নাকি অনেক ইন্টারেস্টিং ছবি তোলার ছিল, তাই কাল এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ বাত হয়েছে। আমাদের সঙ্গেই অবিশ্য রওনা হচ্ছেন, তবে উনি থেমে থেমে ছবি তুলতে তুলতে যাবেন; ক্যামেরা ও সাউন্ডের সরঞ্জাম থাকবে নিজের সঙ্গে—ফিল্ম, অর্থাৎ কাঁচামাল থাকবে অন্য ঘোড়ার পিঠে।

ফেলুদা ছেটকুমারের কাছ থেকে সবে এসে বলল, ‘রহস্যের শেষ নেই। উনি কি তা হলে কেদারে লোক লাগিয়েছেন উপাধ্যায়কে খুঁজে বার করার জন্য?’

যাই হোক, এ সব ভাববাব সময় এখন নয়, কথণ আমাদের রওনা দেবার সময় এসে গেছে।

‘আপনি তা হলে দৃঢ়সংকল্প যে হেঁটেই যাবেন?’ ফেলুদা জালমোহনবাবুকে আবাব জিজ্ঞেস করল।

‘ইয়েস স্যার’, বললেন জটায়, ‘তবে হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে তাল

বেথে হাঁটতে পারব কিনা সে বিষয়ে...’

‘সে বিষয়ে আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না। আপনি আপনার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হাঁটবেন। গন্তব্য যখন এক, রাস্তা যখন এক, তখন পিছিয়ে পড়লেও চিন্তার কারণ কিছু নেই। এই নিন, এইটে হাতে নিন।’

আমরা তিনজনের জন্য তিনটে লাঠি কিনে নিয়েছি, ধার নিচের অংশটা ছুঁচোলো লোহা লাগানো। এ লাঠি এখন প্রত্যেক পদযাত্রীর হাতে। এর দাম দু’ টাকা, ফিরে এসে আবার ফেরত দিলে এক টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তারই একটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

আমরা ধড়ি ধরে হাঁটায় রওনা দিলাম। লালমোহনবাবু যে ব্রকম হাঁক দিয়ে ‘জয় কেদার’ বলে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নিলেন—আমার তো মনে হল, তাতেই তাঁর অর্ধেক এনার্জি চলে গেল।

পাহাড়ের গা দিয়ে পাথরে বাঁধানো রাস্তা। শুধু যে শীর্ণ তা নয়, এক-এক গুরুগায় একজনের বেশি একসঙ্গে পাশাপাশি যেতে পারে না। এক দিকে পাহাড়, এক দিকে খাদ, খাদের নিচ দিয়ে বেগে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। দু’ দিকেই মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ থাকার ফলে যাত্রীদের মাথার উপর একটা চাঁদোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বেশির ভাগ অংশেই গাছপালা নেই, খালি শুকলো ঘাস আর পাথর। যারা পায়ে হাঁটছে, তাদের মুশকিল হচ্ছে, অশ্বারোহী আর ডাঙিবাহীদের জন্য প্রায়ই তাদের পাশ দিতে হচ্ছে। এখানে নিয়মটা হচ্ছে কি, সব সময়ই পাহাড়ের গা যেঁয়ে পাশ দেওয়া। খাদের দিকটায় গিয়ে পাশ দিতে গেলে পদল্পলনের সমূহ সম্ভাবনা।

যোগব্যায়াম করি বলে বোধ হয় আমাদের দুজনের খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। লালমোহনবাবুর পক্ষে ব্যাপারটা খুব শ্রমসাপেক্ষ হলেও উনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন সেটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। চড়াই ওঠার সময় তো কথা বলা যায় না ; এর পর থানিকটা সমতল রাস্তায় আমাদের কাছাকাছি পেয়ে বললেন, ‘তেনজিং নোরকের মাহাত্ম্যটা কোথায়, সেটা এখন বুঝতে পারছি।’

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা ঘটনা ঘটল, যেটা আমাদের কেদার পৌঁছানোটা আরও আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিল।

একটা বেশ বড় পাথরের খণ্ড পাহাড়ের গা দিয়ে হঠাতে গড়িয়ে এল সোজা ফেলুদার দিকে। ব্যাপারটা সম্ভবে সচেতন হতে যে কয়েকটা মুহূর্ত গেল, তাতেই কিছুটা ড্যামেজ হয়ে গেল। পাথরের ঘণ্টা খেয়ে ফেলুদার হাতের এইচ এম টি ঘড়িটা চুরমার হয়ে গেল, আর আমাদের পাশের এক প্রোট যাত্রীর লাঠিটা হস্তচুত হয়ে পাশের যাদ দিয়ে পাথরের সঙ্গে ঝড়ের বেগে গড়িয়ে নেমে গেল মন্দাকিনী লক্ষ্য করে।

ফেলুদা একটু হকচকিয়ে গেলেও সেটা মুহূর্তের জন্য। ওর শরীর যে কত মজবুত আর স্ট্যামিনা যে কী সাংঘাতিক, সেটা বুঝলাম এই এতখানি খাড়াই পথ হাঁটার পর সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল, আমিও ওর পিছন পিছন গিয়েছিলাম, কিন্তু যতক্ষণে ওর কাছে পৌঁছালাম, তার মধ্যেই ও একটা লোকের কলার চেপে তাকে একটা পাছে ঠেসে ধরেছে। লোকটার বয়স বছর পঁচিশের বেশি না। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং দে স্বীকার করেছে যে, পাথর ফেলার ব্যাপারে সে আর একজনের আদেশ পালন করছিল। পকেট থেকে দশখানা কড়কড়ে দশটাকার মেটি বার করে সে দেখিয়ে দিল, কেন্তাকে এমন একটা কাজ করতে রাজী হতে হয়েছে।

কে তাকে এই টাকা দিয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, তাই এক অচেনা জাতভাই। বোঝা গেল আসল লোক সে নয়, সে শুধু দালালের কাজ করেছে।

আপাতত ফেলুদা লোকটার গা থেকে একটা পশমের চাদর খুলে, সেটা দিয়ে তাকে দু' হাত সমেত পিছমোড়া করে পাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। বলল, যাত্রীদের ফাঁকে ফাঁকে কনস্টেবল থাকে, তাদের একজনকে পেলে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

লাসমোহনবাবুর ভাষায় পাথর ফেলার অন্তর্নিহিত মানেটা সত্ত্ব করে ভাবিয়ে তোলে। ভদ্রলোক বললেন, ‘বোঝাই যাচ্ছে, কেউ বা কাহারা কেদারে আপনার উপরিটো প্রিভেট করার জন্য উঠে-পড়ে



লেগেছে ।

গৌরীকুণ্ড আৰ কেদারেৱ মাৰামাবি একটা জায়গা আছে, ঘোটাৰ নাম রামওয়াড়া । সকলেই এখনে থামে বিশ্রামেৰ জন্য ! চঠি আছে, ধৰমশালা আছে, চায়েৰ দোকান আছে । লালমোহনবাবুকে আমৰা এখনে অংঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া স্থিৰ কৰলাম । এখানকাৰ এলিভেশনে আড়াই হাজাৰ মিটাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰায় আট হাজাৰ খুট । চারিদিকেৱ দৃশ্য কলমেই ফ্যান্ট্যাস্টিক হয়ে আসছে । লালমোহনবাবু একেবাৰে মহাভাৱতেৰ মুড়ে চলে গেছেন ; এমন কি এও বলছেন যে যাত্রাপথে যদি তাৰ পতনও হয়, তা হলেও কোনও আক্ষেপ নেই, কাৰণ এমন প্ৰোৱিয়াস ডেখ নাকি হয় না ।

ফেলুদা বলল, ‘আপনি কিন্তু প্ৰাবলিকেৱ উপৰ যে পৰিমাণে গাঁজাখুৰি মাল চাপিয়েছেন, আপনাৰ নৱকভোগ না হয়ে থাক না ।’

‘হেঁ’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘খুধিষ্ঠিৰ পাৰ পাননি ইশাই নৱকভোগেৰ হাত থেকে, আৰ লালমোহন গাঞ্জুলী !’

যাকি সাড়ে তিনি মাইলেৰ মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল । একটা জায়গা থেকে হঠাৎ কেদারেৱ মন্দিৱেৱ চুড়ো দেখতে পেয়ে সব যাত্ৰীৱা ‘জয় কেদার !’ বলে কেউ মাথা নৃত কৰে, কেউ হাত জোড় কৰে, কেউ বা সাটোঙ্গ হয়ে তাদেৱ ভজ্জিত জানলেন । কিন্তু আবাৰ হাঁটা শুকু কৰাৰ সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিৱেৱ চুড়ো লুকিয়ে গেল পাহাড়েৱ পিছনে, আৰ বেৱোল একেবাৰে কেদার পৌঁছানোৱ পৰ । পৱে জানলাম যে, এই বিশেষ জায়গা থেকেই এই বিশেষ দৰ্শনটাকে এৱা বলে ‘দেও-দেখনী’ ।

৬

কেদার পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদেৱ হয়ে গেল বিকেল সাড়ে পাঁচটা । তখনও যথেষ্ট আলো রায়েছে, চার দিকেৱ পাহাড়েৱ চুড়োগুলোয় রোদ বালমল কৰছে ।

এতক্ষণ চড়াই-এৱ পৰ হঠাৎ সামনে সমতল জমি দেখতে পেলে যে কেমন লাগে, তা লিখে বোঝাতে পাৰিব না । এটুকু বলতে পাৰি

যে, অবিশ্বাস আশ্বাস আনন্দ—সব যেন এক সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, আর তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা মেশানো একটা আন্তর্ভুক্ত শ্যাম্ভু ভাব। সেটাই বোধ হয় থাত্রীদের মনে অ'রও বেশি ভক্তি জাগিয়ে তোলে।

চারিদিকে সবাই পাথর-বাঁধানো জমিতে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে 'জয় কেদার' 'জয় কেদার' করছে, মন্দিরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনি দিকে যেরা বরফের পাহাড়ের মধ্যে, আমরা তিনজন তারই মধ্যে এগিয়ে গেলাম একটা বাসন্তানের ব্যবস্থা করতে।

এখানে হোটেল আছে—হোটেল হিমলোক—কিন্তু তাতে জায়গা নেই, বিড়লা বেস্ট হাউসেও জায়গা নেই। এক রাত্রের ব্যাপার যখন, মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হলেই হল। তাই শেষ পর্যন্ত কালীকমলীওয়ালির ধরমশালায় উঠলাম আমরা। সামান্য ভাড়ায় গরম লেপ তোশক কম্বল সবই পাওয়া যায়।

কেদারনাথের মন্দির এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা ছ'টায় বন্ধ হয়ে গেছে, আবার খুলবে সেই কাল সকাল আটটায়। তাই লালমোহনবাবুর পুজো দেবার কাজটা আজ স্থগিত থাকবে। আপাতত ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দরকার, সেটা হল গরম চা। আমাদের থাকার ঘর থেকে নীচে নেমেই চায়ের দেৱকান পেয়ে গেলাম। এটা হল কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতোই কেদারনাথের গলি। দোকানগুলো সবই অস্থায়ী, কারণ নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বরফের জন্য কেদারনাথে জনপ্রাণী থাকবে না।

আমি ভেবেছিলাম, এই ধরকলের প্রাণলালমোহনবাবু হয়তো একটু বিশ্রাম নিতে চাইবেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, তাঁর দেহের রক্তে রক্তে নাকি নতুন এনার্জি পাচ্ছেন—'তপেশ, এই হল কেদারের মহিমা।'

বিশ্বনাথের মতোই এখানেও কেদারের গলির দোকানগুলোতে বেশির ভাগই পুজোর সামগ্রী বিক্রি হয়। এমন কি, বেনারসের সেই অতি-চেনা গন্ধটাও যেন এখানে পাওয়া যায়।

আমরা তিনজনে এলাচ-দেওয়া গরম চা খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ চেনা গল্যায় প্রশ্ন এস—'উপাধ্যায়ের সন্ধান পেলেন ?'

ছেটকুমার পৰন্দেও সিং। এখনও তাৰ হাতে ক্যামেৰা আৱ
বেশ্টেৱ সঙ্গে লাগান্বে সাউন্ড রেকৰ্ডিং ঘন্টা।

‘আমৰা তো এই মিনিট কুড়ি হল এলাম’, বলল ফেলুন।

‘আমি এসেছি আড়াইটোয়,’ বলল পৰন্দেও। ‘ফেটুকু জেনেছি,
তিনি এখন পুৱোপুৱি সাধুই হয়ে গেছেন। চেহাৰাও সাধুৱাই
মতো। বুৰো দেখুন, এখানে এত সাধুৰ মধ্যে তাকে খুঁজে বাব কৱা
কৰ কঠিন। একটা বাপৰ সমৰকে আমি শিওৱ। তিনি নাম
বললেছেন: উপাধ্যায় বলে কাউকে এখানে কেউ চেনে না।’

‘দেখুন চেষ্টা কৱে’, বলল ফেলুন, ‘আমৰাও খুঁজছি।’

পৰন্দেও চলে গেলেন। লোকটা আমাৰ কাছে এখনও বহস
ৱাবে গেল।

আমৰা চা শেৰ কৱে উঠে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময়
আৱ-একটা চেনা কঠে বাংলায় একটা প্ৰশ্ন এল।

‘এই যে—এসে পড়েছেন? কেমন, আসা স্বার্থক কিনা বলুন।’

আমাদেৱ ট্ৰেনেৱ আলাপী মাখনলাল মজুমদাৰ।

‘বোল আনা স্বার্থক’, বলল ফেলুন, ‘আমাদেৱ ঘোৱ এখনও
কাটেনি।’

‘হৱিদ্বাৰেৱ কাজ হল?’

‘হয়নি বলেই তো এখানে এলাম। একজনেৱ সন্ধান কৱে
বেড়াচ্ছি। আগে ছিলেন হৱিদ্বাৰে। সেখানে গিয়ে শুনি, তিনি
চলে গেছেন কুন্দপ্ৰয়াগ। আবাৰু কুন্দপ্ৰয়াগে গিয়ে শুনি
কেদারনাথ।’

‘কাৰ কথা বলছেন, বলুন তো?’

‘ভবানী উপাধ্যায় বলে এক ভদ্ৰলোক।’

মাখনবৰুৱ চোখ কপালে উঠে গেল।

‘ভবানী? ভবানীৰ খৌজ কৱছেন আপনাৱা? আৱ সে কথা
অ্যাদিন আমাকে বলেননি?’

‘আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?’

‘চিনি শানে? সাত বছৰ থেকে চিনি। আমাৰ পেটেৱ আলসাৰ
সারিয়ে দিয়েছিল এক বড়িতে। তাৰ পৰ হৱিদ্বাৰ ছাড়াৰ কিছু দিন



আগেও আমার সঙ্গে দেখা করেছে। একটা বৈরাগ্য শুক্র করেছিলাম ওর মধ্যে। বললে, রুদ্রপ্রয়াগে যাবে। অমি বললাম, বাসরুট হয়ে প্রয়াগ আর এখন সে জিনিস নেই। তুমি জপতপ করতে চাও তো সোজা কেদার চলে যাও। বোধ হয় একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিল, তাই কিছু দিন রুদ্রপ্রয়াগে থেকে যায়। কিন্তু এখন সে এখানেই।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায় ?'

'শহরের মধ্যে তাকে পাবেন না ভাই। সে এখন গুহাবাসী। চোরাবালিতাল নাম শনেছেন ? যাকে এখন গাঁকি সরোবর বলা হয় ?'

'হাঁ, হাঁ, শনেছি বটে।'

'ওই চোরাবালিতাল থেকে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি। কেদারনাথের পিছন দিয়ে পাথর আর বরফের উপর দিয়ে মাইল তিনেক যেতে হবে। তুম্দের ধারে একটা গুহায় বাস করে গুবানী। উপাধ্যায় অংশটা তার নাম থেকে উঠে গেছে; এখন সে গুবানীবাবা। একা থাকে, কাছেপিটে আর কেউ থাকে না। কাল সকালে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'আপনার সঙ্গে এবার দেখা হয়েছে ?'

'না, তবে স্থানীয় লোকের কাছে খবর পেয়েছি। ফগমূলের জন্য তাকে বাজারে আসতে হয় মাঝে মাঝে।'

'আপনি আমাদের অশেষ উপকারী করলেন, খিঃ মজুমদার। কিন্তু তাঁর অতীতের ইতিহাস কি এখানে কেউ জানে ?'

'তা তো জানতেই পারে,' বললেন মাঝনবাবু, 'করণ সে তো চিকিৎসা এখনও সম্পূর্ণ ছাড়েনি। এই কেদারনাথের মোহাস্তই তো বলছিলেন যে, ভবানী সম্পত্তি নাকি একটি ছেলের পোলিও সারিয়ে দিয়েছে। তবে আমার ধারণা, সে কিছু দিনের মধ্যে আর চিকিৎসা করবে না—পুরোপুরি সম্মাসী বনে যাবে।'

'একটা শেষ প্রশ্ন', বলল হেলুদা, 'ভদ্রলোক কোন দেশী তা আপনি জানেন ?'

'এ বিষয় তো তাকে কোনও দিন জিগ্যেস করিনি। তবে সে

আমার সঙ্গে সব সময় হিন্দিতেই কথা বলেছে। ভাল হিন্দি।
তাতে অন্য কোনও প্রদেশের ছাপ পাইনি কখনও।'

মাথনবাবু চলে গেলেন।

লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে আমাদের দল থেকে একটু দূরে সরে
গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। এবার এগিয়ে এসে
বললেন, 'বিড়লা গেস্ট হাউস থেকে আমাদের তলব পড়েছে।'

'কে ডাকছে?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

একজন বেঁটে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'মি
সিংঘানিয়া।'

ফেলুদার ভুক্তা কুচকে গেল। আমাদের দিকে ফিরে চাপা
গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে এই সিংঘানিয়াই এক ভদ্রলোককে সঙ্গে
নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে।' আমর
মনে হয়, একে খানিকটা সময় দেওয়া যেতে পারে চলিয়ে।'

হদিও চারিদিকে অনেকগুলো বরফের পাহাড়ের চূড়াতে এখনও
রোদ রয়েছে—তার কোনওটা সোনালি, কোনওটা লাল, কোনওটা
গোলাপি—কেদার শহরের উপর অন্ধকার নেমে এসেছে।

বিড়লা গেস্ট হাউস কেদারনাথের মন্দিরের পাশেই, কাজেই
আমরা তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। দেখে মনে হল,
এখানে হয়তো এটাই থাকবার সবচেয়ে ভাল জায়গা অন্তত
পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে তো বটেই; খাবারের কথা জানি না।
খাবারের ব্যাপারে এমনিতেও শুনছি, এখানে আঙু ছাড়া আর বিশেষ
কিছুই পাওয়া যায় না।

বেঁটে লোকটা আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে বিড়লা গেস্ট
হাউসের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। বেশ বড়
ঘর, চারিদিকে চারতে গদি পাতা। মাথার উপর একটা ঝুলন্ত
লোহার ডাঙা থেকে বেরোনো তিনটি হকে টিমটিম করে তিনটে
বাল্ব জুলছে। কেদারনাথে ইলেক্ট্রিসিটি আছে বটে, কিন্তু আলোর
কেনও তেজ নেই।

আমরা মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই, যিনি আমাদের আহান
করেছিলেন, তাঁর আবির্ভাব হল।

যা ভাবা যায়, সেটা যখন না হয়—তখন মনের অবস্থাটা আবার স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সিংঘানিয়ার নামটার সঙ্গে সিংহের মিল আছে বলে বোধ হয় ব্যক্তিসম্পর্ক কাউকে আশ্চর্য করেছিলাম। যিনি এলেন তাঁর মাঝারি গড়ন, মেজাজে মাঝারি গ্যাস্ট্রীয়, গলার স্বর সরুও নয় মেটাও নয়। শুধু একটা মেটা পাকানো গোঁফে বলা যায় কিছুটা ভারিকি ভাব এসেছে।

‘মাই নেম ইজ সিংঘানিয়া’ বললেন ভদ্রলোক—‘প্রিজ সিট ডাউন।’

‘আমরা তিনজনে দুটো গদিতে ভাগাভাগি করে বসলায়, সিংঘানিয়া বসলেন তৃতীয় গদিতে সোজা আমাদের দিকে মুখ করে। কথা হল ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে।

সিংঘানিয়া বললেন, ‘আপনার খ্যাতির সঙ্গে আমি পরিচিত মিঃ মিটার, কিন্তু আলাপ হ্বার সৌভাগ্য হয়নি।’

ফেলুদা বলল, ‘বিপদে না পড়লে তো আর আমার ডাক পড়ে না, তাই আলাপ হ্বার সুযোগও হয় না।’

‘আমি অবিশ্বিত আপনাকে বিপদে পড়ে ডাকিনি।’

‘তা জানি’, বলল ফেলুদা। ‘আপনার নামও’ কিন্তু আমি শুনেছি। অবিশ্বিত সিংঘানিয়া তো অনেক আছে কাজেই যাঁর নাম শুনেছি, তিনিই আপনি কিনা বলতে পারব মাঁ।’

‘আই আজ্যাম তেরি ইন্টারেস্টেড টু মো, আপনি কী ভাবে আমার নাম শুনলেন।’

‘আপনি হরিহর গিয়েছিলেন কখনও ?’

‘সাটেনলি।’

‘সেখানে ভবানী উপাধ্যায় বলে একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?’

‘করেছিলাম বইকি ; কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কী করে ?’

‘উপাধ্যায়ের বাড়িওয়ালা আমাকে বলেছিলেন যে, মিঃ সিংঘানিয়া এবং আর একজন ভদ্রলোক উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা

করতে এসেছিলেন । '

'আর কিছু বলেননি ?'

'বলেছিলেন যে উপাধ্যায়কে নাকি আপনি লোভে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু উপাধ্যায় দেটা কাটিয়ে ওঠে । '

'হেয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান, দিস উপাধ্যায় ! আমি এমন লোক আর দ্বিতীয় দেখিনি । তবে দেখুন মিঃ মিটার—লোকটার রোজগার মাসে পাঁচশো টাকার বেশি নয়, কারণ গরীবদের সে বিনা পয়সার চিকিৎসা করে সেই লোককে আমি পাঁচ লাখ টাকা অফসুর করলাম । আপনি জানেন বোধ হয় যে, ওর কাছে একটা অত্যন্ত ভালুয়েবল লকেট আছে—যুব সন্তুষ্ট এককালে সেটা ট্র্যাভাকোরের মহারাজাৰ ছিল ।

'সে তো জানি, কিন্তু আমার জনার কোতুহল হচ্ছে, আপনি এই লকেটের খবরটা জানলেন কি করে ।' ওটা তো ভাজাৰ পাঁচ-ছ' জন যুব কাছের লোক ছাড়া আৱ কাৰণ কাছে প্ৰচাৰ হয়নি । '

'আমি খবৰটা জেনেছিলাম সেই কাছের লোকেদের একজনেৰ কাহু থেকেই । আমাৰ ঝুয়েলারিৰ ব্যবসা আছে দিল্লীতে । আমাৰ কাছে এই লকেটেৰ খবৰ আনে রূপনাৱায়ণগড়ৰ ম্যানেগোৰ মিঃ পুৰীৰ ছেলে দেবীশঙ্কৰ পুৰী । সে আমাকে লকেট কিনতে বলে । ন্যাচারেলি হি এগ্রিপেটেড এ প্ৰাৰম্ভেন্টেজ । আমৰা গেলাম হৰিদ্বাৰ । উপাধ্যায় রিফিউজ কৰলেন । পুৰীৰ উৎসাহ চলে গেল । কিন্তু আমি ওটা কেনাৰ লোভ ছাড়তে পাৱছি না । আমাৰ মনে হয়, এখনও চেষ্টা কৰলে হৱতো পাওয়া যাবে । তখন তিনি ভাজাৰি কৰছিলেন, লোকেৰ সেবা কৰছিলেন, এখন হি ইজ এ সম্মাসী । একজন গৃহত্যাগী সম্মাসীৰ ওই রকম একটা পার্থিব সম্পদেৰ উপৰ কোনও আসত্তি থাকবে, এটা ভাবতে একটু অনুভূত লাগছে না ? আমি চাই, ওঁকে আৱ একবাৰ আ্যাপ্রোচ কৰতে । '

'বেশ তো, কৰুন না । '

'দ্যাট ইজ ইমপিসিবল, মিঃ মিটার । '

'কেন ?'

'উনি এমন জ্ঞানগায় থাকেন, সেখানে আমাৰ পক্ষে যাওয়া

অসম্ভব । আমি আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি ?

‘করুন ।’

‘হোয়াই আৱ ইউ হিমাৰ ?’

‘প্ৰধানত প্ৰমণেৰ উদ্দেশ্যে । তবে উপাধ্যায় লোকটাৰ উপৰ
আমাৰ একটা শৰ্ষাৰ রয়েছে । তাৰ যদি কোনও অনিষ্ট হচ্ছে দেখি,
তা হলে কিন্তু আমি বাধা দেব ।’

‘ইউ আৱ অ্যাকটিং অ্যাজ এ ফ্ৰি এজেণ্ট ? আপনাকে কেউ
এমন্ত্র কৰেনি ?’

‘না ।’

‘আপনি আমাৰ হয়ে কাজ কৰবেন ?’

‘কী কাজ ?’

‘আপনি উপাধ্যায়েৰ সঙ্গে দেখা কৰে তাকে বুঝিয়ে বলে
লকেটটা এনে দিন । আমি আপনাকে পাঁচ লাখেৰ টেন পাসেণ্ট
দেব । উনি যদি নিজে টাকা না নেন, তা হলে ওৱা যদি কোনও
উত্তৰাধিকাৰী থাকে, তাকে আমি টাকাটা দেব ।’

‘কিন্তু এই লকেট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড আৱণ কয়েকজন এখানে
ৱয়েছে, আপনি জানেন সেটা ?’

‘কুপনাৰায়ণগড়েৰ ছোটকুমাৰ তো ?’

‘আপনি জানেন ?’

‘জানতাম না । আজ বিকেলেই ভাৰ্বি বলে এক সাংবাদিক
এসেছিল । কেদাৱে এসেও যে সাংবাদিকদেৱ উৎপাত সহ্য কৰতে
হবে, সেটা ভাবিনি । যাই হোক, সে-ই খবৰটা দিল । কিন্তু
ছোটকুমাৰ তো ফিল্ম তুলতে এসেছে ।’

‘জানি । কিন্তু তাতে উপাধ্যায় আৱ লকেটেৰ একটা বড় ভূমিকা
আছে ।’

সিংঘানিয়াৰ চেহাৱতি এবাৱ একটা ইন্দুৱেৰ মতো হয়ে গেল ।
সে হাতজোড় কৰে বলল—

‘দোহাই মিঃ মিটাৰ—পিজ হেল্প মি ।’

‘আপনি ভাৰ্বিকে এ সব নিয়ে কিছু বলেননি তো ?’

‘পাগল । আমি বলেছি তীৰ্থ কৰতে এসেছি । কেদাৱে আসাৱ

আর কোনও কারণ থাকার দরকার আছে কি ?

‘ভার্গবি লোকটা ও উপাধ্যায় মন্ত্রকে ইন্টারেস্টেড । তবে খবরের কাগজের খোরাক হিসেবে ।’

‘আপনি কিন্তু এখনও আমার কথার উত্তর দেননি ।’

মিঃ সিংহানিয়া—আমি এন্ট্রুকু বলতে পারি যে, আপনার প্রস্তাব আমি উপাধ্যায়কে জানাব । তবে আমার ধারণা : তিনি যদি লকেটা নিজে না রাখেন, তবে সেটা ইয়ত্তে অন্য কাউকে দিয়ে যেতে চাইবেন কাজেই এখন কোনও পাকাপাকি কথা বলার দরকার নেই তখন অবশ্য বুঝে ব্যবস্থা হবে, কেমন ?

‘ভেরি শুভ ।’

বাহিরে রাত । কেদার শহর ঝিমিয়ে পড়েছে । বাড়ির বাতি, রাস্তার বাতি, দোকানের বাতি—সবই যেন ঝুকছে । তারই মধ্যে এক জায়গায় কেশ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, ছোটকুমার পবনদেও একটা ব্যাটারির আলো ঝালিয়ে কেদারের গলির ফিল্ম ঝুলছে । আমাদের দেখে শুটিং থামিয়ে ফেলুনকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, ‘উপাধ্যায়ের কোনও খবর পেলেন ?’

ফেলুন উত্তর না দিয়ে একটা পান্টা প্রশ্ন করল—

‘আপনি উঠেছেন কোথায় ?’

‘এখানে পাঞ্জাব ঘর ভাড়া দেয়, জানেন তে ? তারই একটাতে রয়েছি—এই বায়ের রাস্তা দিয়ে দুটো বাড়ির পরে ভান দিকের বাড়ি ।’

ঠিক আছে—আমি আপনার ‘সঙ্গে যোগাযোগ করছি’, বলল ফেলুন । আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের ধরমশালার দিকে ।

লালমোহনবাবু হঠাৎ মন্তব্য করলেন, ‘ছোটকুমার কেমন লোক জানি না মশাই, কিন্তু সিংহানিয়া লোকটা ধড়িবাজ আছে ।’

‘কী করে জানলেন ?’ ফেলুন প্রশ্ন করল ।

‘আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে বোধ হয় দেখতে পাননি, কিন্তু আমি দেখলাম, লোকটার কোটের বাঁ পকেটে একটা



ক্যাসেট বেকরির। কথা শুরু হবার আগে সেটা টুক করে চাপু করে দিল।'

'ধড়িবাজের উপর আবার ধড়িবাজতর হয় জানেন তো ?'

ফেলুদাও তার পকেট থেকে মাইক্রোক্যাসেট বেকরিটা ব'র করে দেখিয়ে দিল।

'আপনি কি ভাবছেন যে, এটা আমি—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না, কারণ কাঁধে একটা ধা খেয়ে ততক্ষণে সে মাটিতে পড়ে গেছে। গলির এই অশ্রু নিরিবিলি, সেই সুযোগে পাশের হোনও গলি থেকে একটা লোক আচমকা বেরিয়ে এসে ওই কাণ্ডটি করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা তুলকালাম কণ্ঠ হয়ে গেল।

লোকটা মেরেই পালাচ্ছিল ; আমি তার উপর বাঁপ দিয়ে পড়ে তার কোমরটা দু' হাতে জাপটে ধরে তাকে দেয়ালে চেপে ধরলাম সেও পালটা চাপ দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু তার হাতের অন্দুটা দিয়ে তাকে এক ঘায়ে ধরাশায়ী করে দিলেন।

অঙ্গটা আর কিছুই না, গৌরীকুণ্ডে দু'টাকা দিয়ে কেনা সেই লোহ-লাগানো লাঠি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, লোকটার মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোছে কিন্তু সেই অবস্থাতেই সে আবার উঠে, এক দৌড়ে অঙ্ককারে মিলিয়ে গেল।

এদিকে ফেলুদা উঠে বসেছে। বৌঝাই যাচ্ছে সে বেশ কাবু। আমরা দু' জন দু' দিক থেকে তাকে ধরে তুললাম। আমাদের ধরমশালায় প্রায় পৌঁছে গেছি। শেষ পথটুকু ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কেদারেও তাহজে গুণ্ডা এসে পৌঁছে গেছে।'

কপাল-জ্বারে আমাদের পাশের ঘরেই একজন বাঙালি ডাক্তার পাওয়া গেল, নাম অধীর সেন। অধীরবাবু আবার ফেলুদাকে চিনে ফেললেন, কাজেই যত না জখম, তার তুলনায় শুশ্রূষাটা একটু বেশি হল। ডান কাঁধে একটা জায়গায় কেটে গিয়েছিল, সেখানে গুরুত্ব দিয়ে ব্যাস্ত-এড দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফ্ল্যাকচার হয়েছে কি না, সেটা তো এঙ্গ-রে না করলে বোঝা যাবে না।'

ফেলুদা বলল, 'ফ্যাকচারই হোক আৱ যাই হোক, আমাকে
বিছানায় শুইয়ে রাখতে পাৱেন না, এটা আগে থেকেই বলে
দিলাম।'

ফি-এৱ কথা জিগোস কৰাতে ভদ্রলোক জিব-টিভ কেটে
একাকার—'তবে ব্যাপারটা কী জানেন, মিঃ মিত্র। এই নিয়ে
আমাৰ তিনবাৰ হল কেদাৰ। আৰুত্তিৰ সৌন্দৰ্য যেমন ছিল
তেমনই আছে, কিন্তু ক্রমে অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্টস তুকে পড়ছে
শহৰে। এৱ জন্য দায়ী কী জানেন তো ? আমাদেৱ যানবাহনেৰ
সুব্যবস্থা। এক দিকে ভাল কৱেন তো অন্য দিকে দীয়ে খাৱাপ তুকে
পড়ে—এই তো দেখে আসছি জগতেৰ নিয়ম।'

কালীকমলীৰ ম্যানেজাৰ নিজেৰ বুদ্ধি খাটিয়েই এখানকাৰ
পুলিশকে খবৰ দিয়ে অনিয়ে নিয়েছিলেন। ফেলুদা তাৰ সঙ্গে বেশ
কিছুক্ষণ ধৰে কথা বলল। বুঝতে পাৱলাম যে, নানা ব্যক্তি নিৰ্দেশ
দেওয়া হল, এবং সবই দারোগা সাহেব অতি মনোযোগেৰ সঙ্গে
শুনে নিলেন।

পুলিশ চলে যাবাৰ পৰি সাংবাদিক মিঃ ভাৰ্গব এসে
হাজিৰ—'শুনলাম আপনাৰ লাইফেৰ উপৰ একটা অ্যাটেম্পট হয়ে
গেছে ?'

'গোয়েন্দাৰ জীবনে এ তো দৈনন্দিন ঘটনা, মিঃ ভাৰ্গব।
এখানকাৰই কোনও গুণা হয়তো পকেট মারতে চেয়েছিল, কিন্তু
বিশেষ সুবিধা কৰতে পাৱেনি।'

'আপনি বলতে চান, আপনাৰ কোনও তদন্তেৰ সঙ্গে এৱ কোনও
কানেকশন নেই ?'

'তদন্ত আবাৰ কোথায় ? আমি তো এখানে এসেছি উপাধ্যায়েৰ
সঙ্গে দেখা কৰতে।'

'ভাল কথা, তিনি কোথায় থাকেন সে খবৰ পেয়েছেন ?'

'আপনি পেয়েছেন ?'

'উপাধ্যায় বলে এখানে কেউ কাউকে চেনে না।'

'তা হলে ভদ্রলোক হয়তো নাম বদলেছেন।'

'তাই হবে।'

ফেলুদা আসল ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেল। ভার্গব কিছুটা নিরাশ হয়েই যেন চলে গেলেন।

কাল সকাল সকাল উঠতে হবে বলে আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে পুরি-তরকারি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে লাগলাম। এই সময় ফেলুদা যে ব্যাপারটা করল, সেটা কিন্তু আমি আর লালমোহনগু মোটেই অ্যাপ্রুভ করতে পারলাম না। ও বলল, ‘তোরা দুজনে শুয়ে পড়, আমি একটু ঘুরে আসছি।’

‘ঘুরে আসছ মানে?’ আমি অবাক এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম। আমি জানি, ওর কাঁধে এখনও বেশ ব্যথা। ‘কোথেকে ঘুরে আসছ?’

‘একবার ছোটকুমারের সঙ্গে দেখ করা দরকার।’

‘সে কি, তুমি সোজা এলিমি ক্যাম্পে চলে যাবে?’

‘আমার এ রুক্ম অনেক বার হয়েছে বে তোপ্সে। একটা চেট খেলেই বুদ্ধি খুলে যায়। এবারও তাই। পৰন্দেও আমাদের শক্র না।’

‘তবে?’

‘আসল শক্র কে, সেটা জানতে পারবি খুব শিগ্গিরই।’

‘কিন্তু তুমি বেরোবে, আর শক্র যদি এখন তুঁত প্রেতে থাকে?’

‘আমার সঙ্গে অন্ত আছে। তোরা শুয়ে পড় আমি যখনই ফিরি না কেন, কালকের প্রোগ্রামে কোনও চেঙ নেই। গান্ধী সরোবর। তোর সাড়ে চারটায় রওনা হচ্ছি।’

সঙ্গে রিভলভার আর একটা বড় টর্চ নিয়ে ফেলুদা চলে গেল।

‘তোমার দাদার সাহসের জরুর নেই, বললেন জটায়।

৮

ফেলুদা কাল বাতিরে কখন ফিরেছে, জানি না। সেটা ওকে আর জিগোস করলাম না, কারণ ও দেখলাম, সাড়ে চারটার মধ্যে রেডি হয়ে আছে।

আমরা দুজনও দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়ার পর

তিনজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এখন ফিকে ভোরের আলো, রাস্তার বাতিশুলো এখনও টিমটিম করে ঝুলছে।

কেদারনাথের মন্দির ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পড়ে ফেলুনা হঠাতে জিগ্যেস করল, ‘তুই যে জিভ আৰ দাঁতেৰ ফাঁক দিয়ে খুব জোৱে শিস দিতিস, সেটা এখনও পাৰিস?’

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, ‘হ্যাঁ, তা পাৰি বইকি।’

ফেলুনা বলল, ‘আমি যখন বলব, তখন দিবি ব?’

আমরা তিনজনেই সঙ্গে লোহার প্পাইক-দেওয়া লাঠি এনেছিলাম, তা না হলে মাঝে মাঝে বৰফে ঢাকা এই পাথুৱে পথ দিয়ে হাঁটা অসন্তুষ্ট হত। গোড়াতেই মন্দাকিনীৰ উপৰ দিয়ে একটা তঙ্গ-ফেলা সেতু পার হতে হয়েছে আমাদেৱ। নদী এখানে সুর নালার মতো। তিনি দিকে ধিৱে যে সব তুষার-শৃঙ্গ বয়েছে, তাৰ কোনওটাৰ নাম এখনও জানা হয়নি। তাদেৱ মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উচু, সেগুলোৰ চুড়োৱ গোলাপি আভা লক্ষ্য কৰা যাচ্ছে। শীত প্রচণ্ড, তাৰই মধ্যে কাঁপা গলায় লালমোহনবাৰু হঠাতে প্ৰশংসন কৰলেন, ‘তো-হে-হোপ্সে তো শি-হিস দেবে; আমাৰ ভূ-ভূ-ভূমিকাটা—?’

ফেলুনা বলল, ‘আপনি আপনাৰ ওই হাতেৰ লাঠিটা প্ৰয়োজনে পাগলা জগাই-এৰ মতো মাথাৰ ওপৰ ঘোৰাবেৰে, তাতে আপনাৰ ধীৰত্ব আৰ ব্যারাম দুটোই একসঙ্গে প্ৰমাণ হৈবে।’

‘বু-ভু-বৈছি।’

আৱও আধৰণ্টা চলাৰ পৱে দেখতে পেলাম, দূৰে একটা ছাঁচ রঞ্জেৰ মদ্দণ সমতল প্রান্তৰ বয়েছে। চাৰিদিকেৰ পাথৱেৰ মধ্যে সেটাই যে চোৱাবালিতাল বা গাঙ্কী সৱোৱৰ, সেটা বুৰাতে অসুবিধা হল না। তবু আমি ফেলুনাৰ দিকে ঘাড় ফিৰিয়ে জিগ্যেস কৰলাম, ‘ওটাই কি—?’ ফেলুনা ঘাড় নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল, হ্যাঁ।

হুদেৱ পশ্চিম ধাৰে একটা পাথৱেৰ চিবি বয়েছে, সেটাৰ মধ্যে অনায়াসে একটা গুহা থাকতে পাৱে। পুৰো ব্যাপারটা এখনও আমাদেৱ থেকে অন্তত আড়াইশো গজ দূৰে।

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানে জমিতে আলগা পাথৱ

ছাড়াও বেশ বড় বড় শিলাখণ্ড রয়েছে। তা ছাড়া বরফ জামে রয়েছে চতুর্দিকে।

কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি যে ফেলুদার দৃষ্টিটা এদিক ওদিক ঘূরছে, ও যেন কিছু একটা খুঁজছে এবং দৃষ্টিটা এক জায়গায় স্থির হল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখাম আমাদের ডান দিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে ক্যামেরার তেপায়ার একটা ঠার।

ফেলুদ প্রায় নিশ্চলে সেই দিকে এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে।

পাথরটা পেরোতেই দেখা গেল ছেটকুমার পবনদেও ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লেন্সটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেটা টেলি-ফোটো, অর্থাৎ—টেলিকোপের কাজ করবে।

ছেটকুমারের পাশে পৌঁছতেই তিনি বললেন, ‘স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহাটা, কিন্তু এখনও তুনি বেরোননি।’

এবার পর পর ফেলুদা আর আমি দুজনেই চোখ লাগালাম।

লেকের জলটা স্থির, তাতে আকাশের আবছা গোলাপি রঙ প্রতিফলিত হয়েছে: তার পর বাঁ দিকে ক্যামেরা ঘূরিয়ে দেখা গেল গুহাটা। পাথরের ফাঁকে গেঁজা একটা গৈরিক পতাকা রয়েছে গুহাটার ঠিক পাশে।

আমাদের চারপাশের যে শৃঙ্গগুলো সরচেরে উচু, তাতে এখনই গোলাপি রোদ লেগেছে। পুরো একটা উচু শৃঙ্গ, তার পিছনে আকাশের লাল রঙ দেখে মনে হচ্ছে সূর্যটি ওখান দিয়েই উঠবে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পুরের পাহাড়ের চুড়োর পিছন দিয়ে চোখ-ঝলসানো সূর্যটা উকি দিতেই গান্ধী সরোবরটা রোদে ধূয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লক্ষ করলাম, গুহার গায়ে রোদ পড়েছে আর এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আশ্চর্য নাটক হচ্ছে এইভাবে এক সম্মাসী বেরিয়ে এসেন গুহা থেকে। তার দৃষ্টি সোজা পুর দিকে। যেন নতুন-গঠা সূর্যকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

‘তোপ্সে, এগিয়ে চল !’ ফিসফিসিয়ে আমরা এল, ফেলুদার কাছ থেকে ।

‘আমি ক্যামেরায় আছি’, বললেন ছেটকুমার ।

আমরা তিনজন দ্রুত এগিয়ে গেলাম গুহার দিকে এ-পাথর ও-পাথরের আড়াল দিয়ে ।

আলো পড়ছে, কিন্তু কেনও শব্দ নেই । অকৃতি যেন কুকুরাসে কোনও একটা বিশেষ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে ।

এবার গুহা, সন্ধ্যাসী, পতাকা সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । আমরা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলেছি । সন্ধ্যাসী আমাদের দিকে পাশ করে পূর্ব দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর গেরুয়া বসনের উপর একটা খয়েরি রঙের পটুর চাদর ।

এবার একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম । গুহার পুর দিকের পাথরের টিবির গায়ে একটা আলো নড়া চড়া করছে । সেটা যে কোনও ধাতব জিনিস থেকে প্রতিফলিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ।

এবার গুহার টিবির পিছন দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল । তাঁর ওভারকোটের কলার তেলা, তাঁই মুখটা বোঝা যাচ্ছে না । লোকটার মাথায় একটা পশন্তের টুপি, আর হাতে যে জিনিসটা রোদ পড়ে চকচক করছে, সেটা রিভলভার ছাড়া অরু কিছুই না ।

সন্ধ্যাসী সেই একই ভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে, সূর্যের আলো পড়ছে তাঁর মুখে ।

ফেলুদা এবার চাপা গলায় বলল, ‘আমি এগোচ্ছি । তোরা এই পাথরের আড়াল থেকে দ্যাখ । রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই তোর সেই শিসটা দিবি ।’

ফেলুদা নিশ্চলে এগিয়ে গেল গুহটার দিকে । খালিক দূর গিয়ে সে একটা পাথরের পাশে এমনভাবে দাঁড়াল যে সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পায় । ‘আমরা আছি তাঁর বিশ গজ পিছনে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকের সব চরিত্রকে ।

ফেলুদার পকেট থেকেও এবার রিভলভার বেরিয়ে এল ।

এবার সন্ধ্যাসী তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন বাঁ দিকে, অর্থাৎ ওভারকোটে



মুখ-ঢাকা লোকটার দিকে ।

পরমুহুর্তেই এই অপার্থিব নৈশব্দ্য চুরমার করে একটা রিভলভারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওভারকোট পরা লোকটা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি টিপে বরফের উপর বসে পড়ল, আর তার হাতের রিভলভারটাও ছিটকে গিয়ে পড়ল বরফের উপর ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল ফেলুদার নির্দেশ ।

শিসের শব্দ হওয়া মাত্র এ-পাথর সে-পাথরের আডাল থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ ।

‘তোপ্সে, তোরা আয় !’

আমরা দুজনে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ঘটনাস্থলের দিকে ।

এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সাধুর গুহার সামনে ।

সৌম্যমূর্তি গেরয়াধাৰী সন্ন্যাসী এখনও যেন পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেননি । আমাদের সকলের দিকেই ঘুরে ঘুরে অবাক হয়ে দেখছেন ।

আর যিনি মাটিতে বসে আছেন তাঁর কবজি টিপে ? এবারে তো তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে ।

সে কি, ইনি যে সাংবাদিক মিঃ ভার্গব !

একজন কনস্টেবল যেন ফেলুদারই কাছ থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন । ফেলুদা বলল, ‘আগে ওর দাড়িটা টেনে খুলুন তো !’

ভার্গবের দাড়িটা টেনে খুলতে যে মুখটা বেরোল, সেই মুখটাই ম্যাজিকের মতো আশ্চর্য রকম চেনা চেনা হয়ে গেল-- যখন ফেলুদা নিজেই গিয়ে এক টানে মাথার টুপিটা ঝুলে ফেলল ।

‘আশ্চর্য জিনিস রে হেরেভিটি’, বলল ফেলুদা—‘শুধু যে এর কানের লতি এর বাপের মতো, তা নয়, ইনি সিঁথিও করেন ডান দিকে—আর তাই এঁকে দেখে আমার এত অসোয়াস্তি হত ।’

তার মানে কী দাঁড়াল ?

ইনি উমাশকল পুরীর ছেলে দেবীশকল পুরী ।

এবার আমাদের সকলের দৃষ্টি গোল সম্যাসীর দিকে : তাঁর এখনও কেমন যেন মুহূর্মান ভাৰ । হিন্দিতে বললেন, ‘পিঙ্কলের শব্দ শনে মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল—কিছু মনে কৰবেন না ।’

ফেলুদাও হিন্দিতে বলল, ‘যদি কিছু মনে ন কৰেন, আপনার কাছে যে থলিটি আছে, সেটি একবার ব'র কৰা দুরকার । আমরা আপনার বন্ধু, সেটা বোধ হয় বুঝাতেই পারছেন । ওটা আপনার গুহার মধ্যেই আছে তো ?’

‘আর কেথায় থাকবে ? ওই তো আমার একমাত্র সম্পত্তি !’

একজন কনস্টেবল পিয়ে গুহার ভিতর থেকে একটা লাল থলি বার করে নিয়ে এল সেটা খুলতে প্রথমে বেরোল একটা প'কানো কাগজ । এটা রাজা চন্দ্রদেৱ সিং-এর সিলমোহৰ সম্মেত ভবানী-উপাধায়কে লকেট-দানের স্বীকৃতি ।

তাঁর পর বেরোল আর একটা ছেঁটি থলি থেকে সেই বিখ্যাত সোনার লকেট—বালগোপাল—যার অপূর্প সৈন্দর্য এই পরিবেশে, এই সকালের বোদে আরও শতঙ্গ বেড়ে গেছে ।

এইবার ফেলুদ মুখ খুলল । তাঁর বেস্ট হিন্দিতে সে বলল, ‘এবার আপনার আসল পরিচয়টা দিলে কিন্তু আমাদের সকলের হুব সুবিধে হত ।’

‘আমার আসল পরিচয় ?’

‘আপনার নিজের নামটা বাংলাতেই বলুন না । অ্যাদিন পরে বাংলা বলতে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে ।’

উপাধায় ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে গিয়ে বাংলায় বললেন, ‘আপনি বুঁকে ফেলেছেন আমি ব'ঙ্গালি ?’

‘কেন বুঁব না ?’ বলল ফেলুদ, ‘আপনি দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিতে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু আপনার “ল” আৱ বগীয় “জ” বাংলার মতো । তা ছাড়া আপনার হরিদ্বারের ঘরের তাকে একটা বাঁহয়ের পাতার টুকুৱো পেয়েছি, সেটাও বাংলা ।’

‘আপনার বৃক্ষি তো আশ্চর্য তীক্ষ্ণ।’

‘এবাব আৱ একটা প্ৰশ্নেৰ জবাব দেবেন কি ?’

‘কী ?’

‘উপাধ্যায় কি সত্ত্বিই আপনার পদবি, আৱ ভবানী কি সত্ত্বিই আপনার নাম ?’

‘আপনি কী বলছেন আমি—’

‘উপাধ্যায় কি গঙ্গোপাধ্যায়েৰ অংশ নয়, আৱ ভবানী কি দুর্গার আৱ-একটা নাম নয় ? আমি যদি বলি, আপনার আসল নাম দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায়—তা হলে কি খুব মিথ্যে বলা হবে ?’

‘ছো—ছো—ছো—ছো—’

‘আপনি কাকে ধিক্কার দিচ্ছেন লালমোহনবাব ?’ ফেলুদা বলে উঠলে।

‘ছো-ছোটকাকা !’

দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় অবাক হয়ে চাইলেন লালমোহনবাবুৰ দিকে।

‘আমি যে লালু !’ বললেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু গিয়ে দুর্গামোহনকে চিপ কুন্ত প্ৰণাম কৰায় সাধুবাবা তাৰ ভাইপোকে বুবে ওড়িয়ে ধৰে বললেন, ‘তা তলি তো আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হয়েও গেল। ওই লকেট তো তোৱই আপ্য ! ও জিনিস আমাৰ কাহু রাখা এক বিকাট বিড়স্বনা !’

‘তা তো বটেই। তা, আমাৰে দলে আমি কোটা বাবাকেৰ ভণ্টে রেখে দিতে পাৰি। আপনি তা জানোৱ না ছেটকাকা, অজ্ঞকাল আমি ছোটদেৱ উপন্যাস লিখে বেশ কঢ়ি পাঠিস কৰিছি; তাৰে কুঞ্জিয় তো কিছু বলা যায় না, একদিন দেখব বাপু কৰে সেল পড়ে গোছে। তখন লকেটটা থাকলে তবু একটা...’

নিজেৰ ছেলে লকেটটা হাত কৰায় তাল কৰছে জেনে উমাশঙ্কুৱকে বাধ্য হয়ে ফেলুদাকে টেলিগ্ৰাম ও চিঠি পাঠাতে হয়েছিল। বাপকে হাতেৰ মুঠোৰ মধ্যে রাখাৰ ক্ষমতা দেবীশকৱেৱ নিশ্চয়ই আছে। দুর্গামোহন খুন হলে লকেট বেহাত হয়ে যেত

এটাও ঠিক, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিল ওই ধস্। দেবীশক্র আটকা পড়ে গিয়েছিল কুন্দপুরাগে। সিংঘানিয়া যে এসেছিল কেদারে, সে একেবারে নিজের গরজে, লকেটটাকে কেনার জন্য।

দেবীশক্রই লোক লাগিয়ে ফেলুদার দিকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার কেদারে রাস্তিরবেলা শুগা লাগিয়ে ফেলুদাকে জখম করার চেষ্টা করেছিল।

ছোটকুমার পবনদেও সিং অবিশ্য তার ক্যামেরা দিয়ে পুরো ঘটনাই টেলি-ফেটো লেন্স-এর জোরে বেশ কাছ থেকেই তুলে রেখেছিল। দেবীশক্র যে রিভলভার বার করে দুর্গামোহনের দিকে তাগ করেছিল, সেটা স্পষ্ট বোৰা ঘাবার কথা। আপাতত ছোটকুমারের আর ফিল্ম নেই, কিন্তু দিল্লী থেকে স্টক এলে পরে দুর্গামোহনের একটা সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দুর্গামোহন আপন্তি করলেন না ; বরং বললেন, ‘একজন রাজার আশ্চর্য দরাজ মনের কথাটা বিশ্বের লোকের কাছে গোপন থাকে কেন ? আমি টেলিভিশন ক্যামেরায় নিশ্চয়ই বলব : আমার সোনার বালগোপাল পাবার কথা।’

পবনদেও বললেন, ‘কিন্তু বালগোপাল তো আর আপনার কাছে থাকছে না।’

‘না’, বললেন দুর্গামোহন। ‘সেটাক ছবি যদি তুলতে চাও তো আমার ভাইপোকে বলো।’

পবনদেও লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনার বাড়ি গিয়ে আমি লকেটটার ছবি তুলে আনতে পারি কি ?’

জটায়ু তাঁর সবচেয়ে বেশি সাহেবি উচ্চারণে বললেন, ‘ইউ আর মোটাস্ট ওয়েলখাম !’



বোসপুরে খুনখারাপি

॥ ১ ॥

আমাদের বকু রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন পাত্তুলি গুরুকে জটায়ুর পাছায় পড়ে শেষটার যাত্রা দেখতে হল। এখনকার সবচেয়ে নায়করা যাত্রার নল ভারত অপেরার হিট নটিক সূর্যতোরণ। এটা বলতেই হবে যে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ জয়ে বেতে হয়। কোথাও কোনও তিলোচলা ব্যাপার নেই; আকাশে একটু রং চড়া হলেও কাউকেই কৌচা বলা যায় না। লালমোহনবাবু ফেরার পথে বললেন, 'আমার গল্পের যা গুণ, এরণ তাই। মনকে টানবার শক্তি আছে পুরোপুরি। অথচ তলিয়ে দেখুন, দেখবেন অনেক কাঁক, অনেক কাঁকি।'

কথটা বড়ই-এর মতো শোনালেও, অঙ্গীকারে কৰ্ত্তা যায় না। লালমোহনবাবুর লেখাও তলিয়ে দেখলে তাতে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। অথচ ভদ্রলোকের পপুলারিটি কিন্তু একটা চমক লাগার মতো ব্যাপার। নতুন বই বেরোনোর পরদিন থেকে একটানা তিন ফাস বেস্ট সেল লিস্টে নাম থাকে। অথচ উনি বেশি লেবেন না; বছরে দুটো উপন্যাস—একটা বৈশাখে, একটা পুজোয়। আজকাল তথ্যের ভুল আশের চেয়ে অনেক কষ থাকে। কারণ শুধু যে ফেলুদাকে পাতুলিপি দেবিয়ে নেন তা নয়, সম্প্রতি নিজেও অনেক ব্রহ্ম এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি কিনেছেন। সেগুলোর যে সব্বহার হচ্ছে সেটা বইগুলো পড়লেই বোঝা যাব।

সূর্যতোরণ যাত্রা নায়ক প্রথমেই করার ব্যবস্থ হল, এই যাত্রার সঙ্গে



বুক্ত এক ভদ্রলোককে নিয়েই আমাদের এবারের তদন্ত। ভদ্রলোকের নাম ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য। এইই লেখা নাটক, গানও এর শেখা, অর্থাৎ নিজেই গীতিকার—আর ইনি নিজেই অকেন্দ্রিয় কেহালা বাজান। ষ্টেট কথা শুনী লোক। তাঁকে নিয়ে যে গোলমালটা হল সেটা অবিশ্য বুবই প্রাচলো ব্যাপার, আর ফেনুদাকে তাঁর বুদ্ধির শেষ কণাটুকু খরচ করে এই রহস্যের সমাধান করতে হয়েছিল।

আমরা যাত্রার দেখবার দিন দশক পরেই একদিন টেলিফোনে আপয়েন্টমেন্ট করে ইন্দ্রনারায়ণবাবু নিয়েই আমাদের বাড়িতে এসেন তাঁর সহস্যাটি নিয়ে। সিনটো রবিবার। লালমোহনবাবু যথোর্থীভি ন-টার মধ্যেই আজ্ঞা মারতে চলে এসেছেন, দশটা নামাত ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। বাকে বলে কিন শেভ্ব চেহারা, বাস আলা-চালিশ-বেয়ালিশ, রং ফরসা। হাইট মাঝারির চেয়ে একটু বেশি, মাথার চুল প্রায় সবই বাঁচা। ফেনুদা প্রথমেই সূর্যগোরসের প্রশংসা করে বলল, ‘আপনি তো মশাই জ্যান অফ মেনি পার্টস; এত রকম শিখলেন কী করে?’

ভূলোক হালকা হেলে বললেন, 'আমরে লাইফ হিন্টিং একটি বেশোভা ধরনের। আমার ফ্যামিলির কথা জানলে পরে বুঝবেন যে আমার যাত্রার সঙ্গে কানেকশনটা কত অস্বাভাবিক। আপনি কি বোসপুরুরের আচার্য পরিবারের কথা জানেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' ফেলুদা বলল, 'সে তো অতি নান্দকরা ফ্যামিলি রশাই। আপনাদেরই এক পৃষ্ঠপুরুষ ছিলেন না কল্পনারায়ণ আচার্য? যিনি বিলেত গিয়ে প্রিস স্কুকানাথের মতো নবাবি মেজাজে থাকতেন?'

'আপনি টিকই ন আছেন,' বললেন ইন্দুনারায়ণবাবু। 'কল্পনারায়ণ ছিলেন আমার ঠাকুরুর বাবা। আঠারো শে পঁচাত্তরে বিলেত যান। অত্যন্ত সৌন্দর্য লোক ছিলেন। গান্ধারজনার শখ ছিল। তাঁর কিনে অনেক বেহালাই আভিন্নাভাব। আমাদের পরিবারে এক আমার মেজে দস্তা হরিনারায়ণ। তিনি গান্ধারজনার দিকে আর কেউ যায়নি। সে অবিশ্য কিছু বাজাধূঁজায় না; তাঁর উচ্চাসে সঙ্গীতের শখ। সে রেকর্ড আর ক্যাসেট শোনে নাই হোক, পরিবার যে খনদানি সে তো বুঝতেই প্যারচেন। আমরা তিনি ভাই—আমি, হরিনারায়ণ আর দেবনারায়ণ। আমি ছেটি, দেখনারায়ণ বড়। দেব ব্যবসায়ী আর হরি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমাদের বাবা রেচে আছেন। নাম কীর্তনারায়ণ, বয়স উন্নাশি উনি কান্দন্তার, যদিও এখন আমি কোর্ট-কাছারি করার সামর্থ্য নেই। বুঝতেই পারহেল, এই অবস্থায় আমার যাত্রার সঙ্গে যোগটা কত অস্বাভাবিক। কিন্তু আমার ছেলেবেলা থেকেই শুই দিকে শখ। আই, এ পাশ করে আর পড়িনি। বেহালা শিখেছি মাস্টার রেখে, গান করতাম, গান লিখতাম বুব কম বয়স থেকেই। বাবাকে সোজাসুজি থলি যে আমি যাত্রায় কান্দন্ত করব। বাবার আবার কেন জানি আমার উপর একটা দুর্বলতা ছিল, তাই আমার আবদারটা মেসে নিলেন। এখন অবিশ্য আমি আমর অন্য দু ভাইয়ের চেয়ে কম কিছু রোজগার করি না। যাত্রার আর্থিক সম্ভালতার কথাটা জানেন তো?'

'তা আর জানি না,' বললেন লালহোস্মবাবু। 'হিরো-হিরোইন মাইনে পার পেচিশ-গ্রিশ হজার টাকা করো।'

'আমার নিজের কথাটা নিজেই বলছি বলে কিছু মনে করবেন না,' বললেন ইন্দুনারায়ণবাবু, 'কিন্তু আজ ভারত অপেরার যে এতে

নাম-ভাব সেটা প্রয় অনেকটাই আমার জন্য। আমার নাটক, আমার গান, আমার বাজ্জনা—এগুলো ভারত অপেরার বড় জ্যোতিক্ষণ, এবং আমার গোলমালটাও এর থেকেই।'

কথটা কুলে ভুজলোক থামলেন। তার একটা কারণ অবিশ্য শ্রীনাথ চা এনেছে তাই। ক্ষেত্রদা বলল, 'আপনি কি অন্য দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলছেন?'

'আজে হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। আমাকে বেশি টাকার প্রলোভন দেবিয়ে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা তো অনেক দিন থেকেই চলছে। টাকা জিমিস্টাকে তো আর অগ্রহ্য করা চলে না, তবে ভারত অপেরার সঙ্গে আমি আছি আজ সতরো বছর ধরে। এরা আমাকে যথেষ্ট যত্ন-আন্তি করে, আমার গুণের হর্যাদা দেব। কাজেই এ দল ছেড়ে অন্য দলে যাবার আগে অনেকবার ভাবতে হয়। আমি তাই এদের মধ্যাইকে ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সেদিন যেটা হল এবং যেটার জন্য আমি আপনার কাছে আসতে বাধ্য হলাম—সেটা হল আমাকে হাতিয়ে ভারত অপেরাকে পদ্ধু করার চেষ্টা।'

'হাতিয়ে মানে?'

'সোজা কথাত ধূন করে।'

'এটার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ একেবারে শারীরিক আক্রমণ। তিনি দিন আগের ঘটনা। এখনও কাঁধে ব্যথা রয়েছে।

'কোথায় হল আক্রমণটা?'

'বিড়ন টিট থেকে বেরিয়েছে মহস্যদ শফি লেন। সেবানে একটা বাতিতে আমাদের আপিস আর রিহার্সালের ঘর। গলিটা অঙ্ককার এবং নিরিবিলি। সেদিন আবুর ছিল সোডশেডিং। তিসি অফ। আমি যাছি আপিসে, এমন সময় পিছু থেকে এসে মারল রড জাতীয় একটা কিছু দিয়ে। মাথায় এমন মারতে চেয়েছিল বোধহয়; অন্নের জন্য পারেনি। সৌভাগ্যজন্মে ঠিক সেই সময় আমাদের দলের দু জন অভিনেতা আসছিল গলি দিয়ে আপিসেই। আমি তখন মাটিতে পড়ে যন্ত্রপায় কাতরাছি। তরু আমাকে কুলে আপিসে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে। আমার হাতে বজ্জে খেলা ছিল, সেটা পড়ে ধায় রাস্তায়। আমার



সবচেয়ে ক্ষত ছিল সেটার শুধি কোনও ক্ষতি হয়েছে—কিন্তু দেখলাম তা হ্যানি। এখন, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার কী করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ নিতে।’

ফেলুনা একটা চারমিনার ধৱিয়ে বলল, ‘এই অবস্থায় তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আর যে লোক আপনাকে আক্রমণ করেছে সে যে বিনান্দ পাটির লোক এমনও ভাবার কোনও কারণ দেখছিনা। সে সাধারণ চোর-ছাঁচোড় হতে পারে—হ্যাতো আপনার মানিব্যাগ হাতানোর তালে ছিল। আপনি বরং পুলিশে অবস্থা দিতে পারেন। এর বেশি আর আমার দিক থেকে কিছু বলা সম্ভব নহ, মি. আচার্য। তবে আর যদি কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি আমাকে জানাবেন। কিন্তু এ বাপারে পুলিশ আপনাকে আরও বেশি সাহায্য করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এটুকু বলতে পারি যে আপনার পারিবারিক ইতিহাস আমার শুধি ইন্টারেস্টিং লাগল। এ কবজ্জ পরিবার থেকে কেউ কোনওদিন যাইহায় যোগ দিয়েছে বলে আমার জানা নেই।’

‘আমাকে বলা হত আচার্য ফ্যামিলির ঝ্যাক শিপ’, বললেন ইশ্বরারায়ণবাবু, ‘অন্তত আমার ভাইরা তাই বলতেন।’

ইশ্বরারায়ণবাবু আর বসলেন না। উনি চলে যাবার পর ফেলুনা দুটো ধৈঘার রিং ছেড়ে বলল, ‘ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র একখো বছর আগে এই আচার্য ফ্যামিলির কল্পনায়াঙ্গ বিলেত গিয়ে চুটিয়ে নবাবি করেছে, আর আজে সেই ফ্যামিলিরই ছেলে মহসুদ শফি লেনে যান্দার রিহার্সাল দিতে গিয়ে গুণ্ডার হাতে রাঙের বাড়ি থাক্কে। মাত্র তিন জেলারেশনে এই পরিবর্তন করুনা করা যাব না।’

‘অবিশ্ব পরিবর্তনটা হয়েছে শুধু এইই ক্ষেত্রে,’ বললেন লালমেহেনবাবু। ‘অন্য ভাইদের কথা যা শুনলুম তাতে তো মনে হয় তৈরা দিবি আচার্য ফ্যামিলির ট্রান্সিশন চালিয়ে যাচ্ছেন।’

‘যাই হোক’, বলল ফেলুনা, ‘ফ্যামিলিটাকে ইন্টারেস্টিং লাগছে। বোসপুরুরের আচার্য বাড়িতে যাবার সুযোগ যে কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পড়বে তা কে জানত?’

॥ ২ ॥

ইন্দ্রনারায়ণের কথা

‘সন্দ্রাট অশোক’ আর দু দিনে শেষ হয়ে যাবে। সে দিক দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণের চিন্তা করার কিছু নেই। সত্ত্ব বলতে কি, নাটক আরও চারথানা আগেই তৈরি হয়ে আছে, যদিও সে কথা ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর যাত্রা দলের মালিককে এক্ষত বলেননি। সব নাটক সব সময় ৮লে না; দর্শকের কৃচি আশ্চর্য রূক্ষ বদলায় বছরে বছরে। হাওয়া বুরো নাটক লিখতে হয়, না হলে ভাল নাটকও অনেক সময় মার খেতে যায়। সে বিচারে সন্দ্রাট অশোক এখন খুবই যুগোপযোগী নাটক।

আসলে দুশিঙ্গার কারণ অন্য। এখন বেজেছে রাত দশটা। আর কিছুক্ষণ পরেই বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অধিনী ভড় আসবেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। এই নিয়ে পাঁচবার হবে তাঁর আসা। এ ছাড়া নব নট কোম্পানির লোকও এসেছে তাঁর কাছে; কিন্তু বীণাপাণির মতো জোর তাদের নেই। আসার কারণ একটাই; ভারত অপেরা থেকে ভাঙ্গিয়ে নিতে চাই তাঁর ইন্দ্রনারায়ণকে। সতেরো বছর যাত্রার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ইন্দ্রনারায়ণ। এখন তাঁর বয়স বেয়াজিশ। এই খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপারটা সম্পর্কে এতদিন তিনি খুব ক্ষিয়হাল ছিলেন না; এখন হয়েছেন। অবিশ্বিত এব জন্য তাঁর খ্যাতিই দায়ি। সুরক্ষার ক্ষমতা নিয়ে জরুরিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। তাই আজ সব দল তাঁকে হত করতে চায়। বিশেষ করে বীণাপাণি অপেরা।

সেদিনের আক্রমণটা অবিশ্বিত এই ব্রেথারেফির সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে। প্রদোষবাবু টিকই বলেছিলেন। এটা খুব সম্ভবত চোর-ছাঁচড়ের ব্যাপার। মাথার বাঁধি মারতে চাইলে কি মারতে পারত মা? আসলে সে উদ্দেশ্য ছিল না; ছিল অজ্ঞান করে পকেট থেকে মানিবাগটি নিয়ে পালানো। সেমিন সঙ্গে টাকাখ ছিল দেড়শোর উপর। ভাগ্নিস ফলয় আর ইন্ডিক্ষন এসে পড়ল। খুব বীচ বেঁচেছেন ইন্দ্রনারায়ণ।

সন্দ্রোম বেয়ারা এসে স্লিপ দিল। অধিনী ভড়।

‘বাও, ডেকে আস’, বললেন ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য।

অশ্বিনী ভড় এসে চেয়ার টেনে নিয়ে পাশেই বসে বসলেন, 'বলুন।'

'আপনি বলুন', বসলেন ইন্দ্রনারায়ণ।

'আমি আর নতুন কথা কী বলব ইন্দ্রবাবু। আমি তো এই নিয়ে পৌঁছাব এন্দুম। এবাব তো একটা এস্পার প্রস্পার না করলেই নয়।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি যে মনস্তির করে উঠতে পারছি না অশ্বিনীবাবু। এত দিনের একটা সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া তো মুখের কথা নয়।'

'সবই বুঝলুম, কিন্তু অ্যাটিস্ট্রা তো যের বদল করছে। নিউ অপেরাম দশ বছর ধৰাব পৰ ভাৰতে চলে গেলেম সঞ্চয়কুমাৰ। এ তো হামেশাই হচ্ছে। আৱ টাকাৰ অঞ্চটা অগ্রাহ্য কৰছেন কি কৱে? আপনি কত পাঞ্জেন ভাৱত অপেৱাম সে তো আমৱা আনি। পনেৱো হাজাৰ। আমৱা সেৱান বল্পছি বিশ। এক বছৰে আপনাৰ ইনকাম হবে আড়াই লাখ। আৱ বান্তিৰ যত্ন আপনাকে আমৱা ওদেৱ চেয়ে কিছু কম কৱব না। গুৰেৰ কদম আমৱাও কৱি। বিজ্ঞাপনে আপনাৰ নাম ধাকবে মেটা হৱফে। আপনি যা বলছেন তাই আমৱা মেনে নেব—নেহাত যদি সাথ্যেৰ বাইৱে না হয়।'

'শুন অশ্বিনীবাবু। আমৱা আৱ দু-তিন দিন লাগবে এই নাটকটা শ্ৰেষ্ঠ কৰতে। আমি এখন আৱ কিছু ভাৰতে পারছি না। আপনি সামনেৰ সপ্তাহে আৱ একটিবাৰ আসুন।'

'তৱসা দিছেন কিম্বুটা?'

'একেবাৱে নিৰাশ কৰাব ইচ্ছে ধাকলে আৱ আপনাকে আসতে বলব কেন? তবে আমাৰ দিকটাও আপনাৰ চিঞ্চা কৰে দেখতে হবে। টাকাটাই যে সব সময় সব থেকে বড় জিমিস তা তো নয়। ভাৱত আপোৱা হন্দি জানে যে আপনাৰা আমাকে বিশ অফাৰ কৰছেন, তাহলে আমাৰ বিশ্বাস ভাৱাও আমাকে ওই টাকাটাই দিতে চাহিবে। আৱ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে - - এত বছৰেৰ সম্পৰ্ক কি চট্ট কৰে শেওলা যায়?'

'ঠিক আছে। তাহলে তো এখন আৱ কথা বলে লাভ নেই। সিম সাতেক পৱে এলে আশা কৱি ফল হবে। এভাৱে বুলিয়ে রাখটাও কেৱল কাজেৰ কথা নহ, ইন্দ্রবাবু। আসি। নমস্কাৰ।'

'নমস্কাৰ।'

ইন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দরজার দিকে কিছু দূর এগিয়ে দিলেন অশ্বিনীবাহুকে। তারপর মিজোর কাজের ঘরে ফিরে এসে অবার চেয়ারে বসলেন। শেষ দৃশ্যটা ভাসই যাচ্ছে। এভাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত গেলে এ নাটককে কেউ রুখতে পারবে না। এটা হবে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

ইন্দ্রনারায়ণ এক মনে কাজ করে চলেছেন। যাকে মাঝে দু-একটা শায়া পোকা আসছে। সামনে পুঁজো। এই পোকাই তাঁর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যাপারের সৃষ্টি করে। আর সোভশেভিং। তবে আজ কদিন থেকে সোভশেভিং হচ্ছে না। আশা করি সামনের দুটো দিলও হবে না।

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর পুরো খনোয়োগটা পেখায় দিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটক। সন্তান অশোক।

কিছু কাজ বেশি দূর এগোতে পারল না। ইন্দ্রনারায়ণ টেরঙ পেলেন না যে একটি সোক ঘরে চুকে অতি সন্তর্পণে তাঁর পিছনে এসে দাঢ়িয়েছে।

তাঁরপর হামানদিপ্তার একটি মোক্ষ ঘাণ্ডি। আর ইন্দ্রনারায়ণের চাহের সামনে সব কিছু চিরকারে অঙ্কুর হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

খবরের কাগজ খুলে চমকে উঠলাম।

ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য তাঁর বাড়িতে শুন হয়েছেন। গত পরশ রাত্রে হয়েছে ঘটনাটা। খবরে দ্বাকায় ইন্দ্রনারায়ণের ভূমিকা সমন্বেও কয়েক লাইন লিখেছে। অশ্রব্য দশ দিলও হয়নি ভদ্রলোক আয়দের বাড়ি এসেছিলেন ফেলুদার সঙ্গে দেখা করতে।

ফেলুদা অবিশ্বিত আমার আগেই খবরটা পড়েছে। আগেপের ভর্তিতে মাথা নেড়ে বলল, 'লোকটা এল আমার কাছে, অথচ কিছু করতে পারলাম না ওর জন্য। অবিশ্বিত করাত কেনও উপায়ও ছিল না।'

আমার একটা ন্যাপারে খটকা লাগছিল। বললাম, 'গুরুমুখার

ভদ্রলোককে গলিয়ে আঢ়াক করেছিল, আর এবার একেবারে বাড়ির ভিতর এসে থুন করল। খুব ডেয়ারিং খুনী বলতে হবে।'

ফেলুনা বলল, 'সেটা ওঁর বাড়ির ধ্যান, ভদ্রলোক কোন ঘরে থাকতেন, ইত্যাদি না দেখে বলা যাবে না। আর থুন করার তেমন তাগিদ থাকলে বাড়িতে এসে করবে না কেন?'

'কিন্তু এবার তো আমর তোমাকে তদন্তের জন্য ভাক্কল না।'

'এবারে পুলিশকেই ডেকেছে বোধ যাচ্ছে। তবে ও পাড়ার থানার দারোগা মণিলাল পোন্দারকে তো বেশ ভাল করে ছিমি। এক তিনি বাদি কোনও খবর দেন।'

মণিলাল পোন্দারকে আমিও একবার দেখেছি। মেটিসেটা খুঁজে ভদ্রলোক, ফেলুনাকে তেমন ঠাট্টাও করেন তেমনি শুভ্রাও করেন।

তবে শেষ পর্যন্ত খবরটা এল দারোগার কাছ থেকে নয়; স্বয়ং আচার্য বাড়ির কর্তা উন্নাশি বছরের বৃংজো কীর্তিনামায়শ ফেলুনাকে ডেকে পাঠালেন। খুন্টা হবার তিনি দিন পরে সকালে নটা নাগাত এক ভদ্রলোক এলেন আমদের বাড়িতে। বয়স চালিশের জাহাকাছি, বেশ শার্প চেহারা, চোখে সোনার চশমা। অঙ্গোবর মাস হলেও বেশ গরম, ভদ্রলোক সোফায় থসে কুমাল বাঁও করে যান সুহে বললেন, 'কিন্তু মনে করবেন না, মি. মিডির; বছরের চেষ্টা করেও আপনার লাইন পেলাম না। আমি আমছি বোসপুরের আচার্য বাড়ি থেকে। আমায় পঁঠিরেছেন বাড়ির কর্তা কীর্তিনামায়শবাবু। আমদের বাড়িতে একটা খুন হয়েছে জ্যোন বোধহয়। সেই ব্যাপারে বাদি আপনার সাহায্য পাওয়া যায়।'

'আপনার পরিচয়টা...?'

'এই দেবুন, আসল কথাটাই বলা হ্যালি। আমার নাম প্রদূষ মিডি। আমি ও বাড়িতে থেকে বহশের আদিপুরুষ কল্পন্যায়ারশের একটা জীবনী লিখছি। লেখাই আমার পেশ। একটা খবরের কথগজে চাকরি করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি। আপাতত জীবনীর জন্য তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিনামায়শের সেক্রেটারির কাজ করছি। উনি ব্যারিস্টার ছিলেন, গিটারার করেছেন বছর ঢারেক হল। ওঁর শয়ীয়তা বিশেষ ভাল সেই।'

‘আমাকে ডাক্তান্ত এসেছে—পুলিশে থবর দেওয়া হয়নি?’

‘পুলিশ যা করার করছে, কিন্তু কীর্তনারায়ণের পছন্দ-অপছন্দ একটু গতানুগতিকের বাইরে। পুলিশকে ডেকেছে তুর হেসেরা। উনি নিজে আপনার কথা বললেন: বললেন পুলিশের চেয়ে একজন ভাল প্রাইভেট ডিটেক্টিভ নিয়োগ করলে কাজ হবে বেশি। উনি আবার গোয়েন্দা কাহিনীর বিশেষ ভঙ্গ। আপনার যা পারিষ্কারিক তাও উনি দিতে রাখি আছেন অবশ্যই।’

‘ইতিমধ্যে কুন সহস্রে আর কোনও তথ্য পাওয়া গেছে?’

‘বিশেষ কিছুই না। কুনটা ধাধার পিছন দিকে বাড়ি হেরে করা হয়। ইন্দ্রনারায়ণ তখন টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। পুলিশের ডাক্তার পর্যাক্ষা করে যানে যে কুনটা হয় রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটায় মধ্যে। ইন্দ্রনারায়ণের ঘর ছিল বাড়ির এক তলায়। একটা শোবার ঘর আর তার পাশে একটা কাজের ঘর। উনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। উনি যে ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে থবর জানেন বোধহয়।’

ফেলুনা এবার মি. মল্লিককে বলে দিল যে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য তার কাছে এসেছিলেন, তাই আচার্য পরিবার সহস্রে অনেক তথ্যই সে জানে।

‘তাহলে তো ভালই হল,’ বললেন প্রদুম্ন মল্লিক। ‘কুনের রাতে দশটার সময় ইন্দ্রনারায়ণের কাছে বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার আসেন দেখা করতে। পুলিশ অবিশ্য তাঁকে জের করছে, কারণ বাড়ির চাকর সঙ্গীয় বেয়াদা তার জ্বানিতে বলে যে, ইন্দ্রনারায়ণ আব ওই ভদ্রস্নাকের মধ্যে বচসা হচ্ছিল সেটা সে শুনতে পায়। কিন্তু বীণাপাণি অপেরার ড্রলোক—বাম বোধহয় অশ্বিনীবাবু—এগারোটাৰ মধ্যে চলে যান। তারপর আবার আসেন কিনা জ্বানি, কারণ বাড়ির পিছন দিকে একটা দুরজ্ঞ আছে সেটা চাকরৰা বন্ধ করে অনেক রাতে। রাতের কাজের পর চাকরতে পাড়ায় আজড়া দিতে বেরোয়, ফেরে একটাৰ কাছাকাছি। কাজেই বারোটা নাগাত যদি অশ্বিনীবাবু আবার কিমে এসে থাকেন তাহলে সে থবর কেউ মাঝ জানতে পাবে। যাই হোক, সে তো আপনি শিয়ে তদন্ত করবেনই।

অবিশ্য যদি আপনি তদন্তের ভাব নিতে রাজি থাকেন। যদি তাই হয় তবে আজ সকালেই এগারোটা নাগাত আপনি আসতে পারেন। তখন কীর্তিনারায়ণ ফি থাকেন।'

ফেনুদা রাজি হবে জনতাম, কারণ আচার্য পরিবার সম্মতে ওর একটা কৌতুহল আগে থেকেই ছিল। তা ছাড়া ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথা বলেও ওর বেশ ভাল লেগেছিল। ঠিক হল আমরা এগারোটার সময় বোসপুরুর শিরে হাজির হব। পদ্মাম্ববাবু আরেকবার আম মুছে বিদায় নিলেন।

‘ওই কাজগাঁটা কী বেরিয়ে পড়ল দেখ তো,’ ফেনুদা বলল ভদ্রলোক চলে যাবার পর।

একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ সোফার কোমে পড়ে আছে, আমি সেটা তুলে ফেনুদাকে দিলাম। ভাঁজ পুলতে দেখা গেল ডট পেনে দু লাইন ইংরিজি লেখা—

HAPPY BIRTHDAY HUKUM CHAND

ফেনুদা ভুক্ত কুঁচকে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বলল, ‘হুকুম চাঁদ নাহাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কথাটা বেশহয় অস্মদিনের কেকের উপর লেখা হবে। হুকুম চাঁদ সম্মত কীর্তিনারায়ণের বক্তু। কিন্তু হয়তো টেলিভিশন পাঠানো হবে; মিলিকের উপর ভাঙ্গ হিল কাজটা করবার।’

ফেনুদা কাগজটাকে আবার ভাঁজ করে নিজের শার্টের বুক পকেটে রেখে দিল।

‘এবার কর্তব্য হচ্ছে ভৃত্যীয় মাস্টেটিয়ারকে ফোন করা। তার যান ছাড়া তো আমাদের গতি নেই, এবং তাঁকে বাদ দিলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলে মনে হয় না।’

সালমোইনবাবুকে ফোন করার এক খণ্টার মধ্যেই ভদ্রলোক আন করে ফিটফাট হয়ে নিজের সবুজ আঘাতসাড়ুর নিয়ে চলে এলেন। সব ভনেটুনে বললেন, ‘এবারে পুজোটা তার মানে রহস্যের জট ছাড়াতেই কেটে যাবে। তা এক হিসেবে ভাল। উপর্যুক্তা লেখা হয়ে গেলে পর হাতটা বজ্জ খালি লাগে। এতে সময়টা দিয়া কেটে যাবে। ভাল

কথা, আমার পড়শি বোহিনীবাবু সে দিন বলছিলেন ক্ষেত্র নাকি বোসপুরে আচার্যদের সঙ্গে চেন্নামনা আছে। বললেন, “এমন পরিদার দেখবেন না মশাই, বাপ-ছেলেয় মিল সেই, ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল সেই, তাও একমধ্যবর্তী হয়ে বসে আছে। সে বাড়িতে যে খুন হবে সেটা আশচর্তৰের কিছুই নয়।”

আমরা রঙনা দিয়ে দিলাম। লালমোহনবাবুর ভাইভাইর হরিপদবাবু যে গাড়িটার ফড় নেন সেটা গাড়ির কভিশন দেখলৈই বোঝা যায়। ভদ্রলোক ফেলুদার ভীষণ ভক্ত।

এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে বোসপুরুর বোতে আচার্যদের বাড়ির পোটিকোর নীচে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আমাদের আশ্বাসাড়ৰ। কলিং বেল টিপতে চাকর এমে দরজা পুলে দিতেই দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে অছেন প্রদূষ মলিক। বললেন, ‘গাড়ির আওয়াজ শনেই শুবোছি আপনি এসেছেন। আমিও থাকি একতলাতেই। আসুন দোতলার একেবারে বড় কর্তার বাজে।’

পেঁচায় বাড়ি, নিচ্ছয়ই সেই কল্পনারায়শের তৈরি, কিন্তু তারও আগে হতে পারে, কারণ দেখে মনে হব বয়স হবে অস্তত দেড়শো বছর। টওড়া কাঠের সিঁড়িতে শব্দ তুলে আমরা দোতলায় গিয়ে পৌছলাম। সিঁড়ির পাশের দেয়ালে আচার্যদের পূর্বপুরুষদের বিশাল বিশাল অয়েল পেটিঃ; সিডি দিয়ে উঠেই সামনে একটা প্রকাণ খেতপাথরের মূর্তি, এদিকে ওদিকে ছড়ানো নানান সাইজের ফুলদানি তার বেশির ভাগই টীনে বলে মনে হল। একটা বিশাল দাঁড়ানো বড়ও রয়েছে সিঁড়ির সামনের বারান্দায়। বারান্দার এক পাশে দাঁড়ালে মীচে নাটমলিয়ির দেখা যায়, অন্য পাশে সরুবীধা যুর। এইই একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে ঢেকালেন প্রদূষ মলিক। দেখলাম এটা একটা মাঝেরি সাইজের বৈষ্ণকথনা; চারিদিকে সোজা বিহানে, মাটিতে কার্পেট, মাঝের উপর দু দিকে দুটো বাড় লষ্টন। আমি আর লালমোহনবাবু একটা সোফায় বসলাম। ফেলুদা কিছুক্ষণ পায়চারি করে জিনিসপত্র দেখে আর একটা ছোট সোফায় বসল। মলিক মশাই গেছেন কীর্তনরাষ্ট্রকে ডাকতে।

দু মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন বাড়ির কর্তা কীর্তনরায়ণ



আচার্য। ধপধপে করসা রং, দাঢ়ি গোক কামানো, তুল অবিকাশই পাকা। তবে উনআশিতেও যে কিছু কঢ়া অবশিষ্ট কয়েছে সেটাই আশৰ্য। ছোটখাটো মানুষ কিন্তু এমন একটা পার্সেন্যালিটি আছে যে তাঁর দিকে চোখ যাবেই, এবং গিয়ে থেমে থাকবে। দেখে মনে হয় ব্যারিস্টার হিসেবে ইনি সিচ্ছাই খুব পাকা ছিলেন। ভদ্রলোকের পরনে সিকের পায়জামা, পাঞ্জাবি আৰু বেগুনি রঙের ক্রেসিং গাউন। চোবে যে চশমাটা বায়েছে সেটা হল যাকে বলে হয়ে গ্রাম, অর্ধেক মীচের দিকে পড়ার জন্য অর্ধেক জ্বেল আৰু উপর দিকটা ফাঁকা।

‘কই, কিনি গোবেন্দা মশাই?’

ফেলুদা নিজের, এবং সেই সঙ্গে আমাদের দু জনের পরিচয় দিতে দিল। লালমোহনবাবুর পরিচয় পেয়ে কীর্তিলালায়প চোখ কপালে তুললেন। ‘কই, আপনার লেখা কোনও রহস্য গুরু তো কোনওদিন পড়িনি।’

কালমোহনবাবু ভীষণ কিম্ব করে বললেন, 'আজ্জে সে সব আপনার
পড়ার হতো কিছুই না।'

'তবু, রহস্য গুরু বখন লেখেন তখন আপনার অব্যোগ একটি
গোয়েন্দা নিশ্চরই বর্তমান। দেখুন, আপনারা দু জনে মিলে এই
রহস্যের কোনও ক্লিয়ার করতে পারেন কিম্ব। ইন্ত ছিল আমার ছেট
ছেলে। যা হয়, কনিষ্ঠ সন্তান অনেক সময়ই একটু নেগেলেবেটেড হয়।
ওর ফেরেও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য ও কোনওদিন অভিযোগ
করেনি বা কুপথে ঘায়নি। গান-বাজনা ভালবাসত, পড়াশুনা যখন হল
না তখন ভাবলুম ওদিকেই ঘাক। ছেট এয়স খেকেই গান লিখত, নাটক
লিখত, বেহালা বাজাত। বাড়িতে বেহালা ছিল ঠাকুরদাদার অন্তৰ
বিলেত খেকে, 'আম আঁটির ভেঁপু'—'

'আম আঁটির ভেঁপু।' ফেলুদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'ওই রকমই রসিকতা ছিল ঠাকুরদার,' বললেন কার্তিনাথায়ণ,
'বেহালাকে বলতেন আম আঁটির ভেঁপু, প্রথম ল্যাগভা মোটির গাড়ি
যখন কিলোন তখন সেটাকে বলতেন পুশ্পক বৎ, প্রামোফেন
রেকর্ডকে বলতেন সুদর্শন চক্র—এই আর কি। ঠাকুরদাদার কথা
বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে কি, ইন্তর এই
ভাবে জীবন শেষ হয়ে যাওয়াতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি। যাজ্ঞার
যোগ দেওয়াটা আচার্য বাড়ির ছেলের পক্ষে কিছু শৌরবের নয় টিকই,
কিন্তু শেয়ের দিকে সে মাইনে পেত পনেরো হাজার টাকা; এটাও তো
মেখতে হবে। তার মধ্যে কুণ না থাকলে এটা কি হয়? আমি নিজে
যাজ্ঞা খিয়েটারের কুব ভক্ত ছিলাম। এক রকম নেশা ছিল বলতে পার।
সেখানে আমার নিজের ছেলে সে লাইনে গেলে নাক সিটকেলে চলবে
কেন? না, ইন্তকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। আর সে সেটার
সংজ্ঞবহুর করে পুরোপুরি। যাজ্ঞার কাজ করেও তার মধ্যে কোনও বদ
বেয়াল দেখা দেয়নি। কাজ-পাগলা যানুষ ছিল সে। বেহালায় হাত ছিল
চৰৎকার, প্রম লিবত গীতিমত জাল। আমার মতে আচার্য বৎশের সে
কোনও রকম অসন্মান করেনি; বরং একদিক দিয়ে সেখলে মুখ
উজ্জ্বলই করেছে।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি জানেন যে দিন পনেরো আগে মহাপুর

শক্তি লেনে তাকে একজন এসে পিছন থেকে আঘাত করে, এবং সে আঘাত কীবৈ না পড়ে যাথায় পড়লে তিনি হয়তো তখনই মরা যেতেন?’

‘তা জানি বইকী,’ বললেন কীর্তনারায়ণ। ‘আমিই তো তাকে তোমার পরামর্শ নিতে বলি।’

‘এবার যে ঘটনাটা ঘটল, আপনার মতে কি তার জন্যও এই যাত্রার দলগুলির মধ্যে রেখাবেষ্টি দায়ী?’

‘সে তো আমি বলতে পারব না। সেটা কার করার দায়িত্ব তোমার। তবে এটা কলতে পারি যে ইন্দ্র শক্তি যদি থেকে থাকে তো সে যাত্রার দলেই হয়তো থাকবে। এমনিতে সে বিশেষ কারুর সঙ্গে মিশত না, আর সম্পূর্ণ নির্বিদী লোক ছিল। বললাম না, সে যে জিনিসটা জানত সেটা হল কাজ। কাজের বাইরে তার আর কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না।’

‘গুলিশ তো বোধ হয় বাড়ির সকলকে জেরা করেছে?’

‘তা তো করবেই। সেটা তো তাদের কুটিলের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তারা করবে বলে তুমি করতে পারবে না এমন কোনও কথা নেই। এখন অবিশ্য তুমি আমার অন্য ছেলেদের পাবে না। সম্ভ্যায় এলে পাবে। প্রদুর্ভাব এখন আছে, তাকে কিমু জিগেস করতে চাইলে করতে পারো। চাকর-বেয়ারারা আছে। আমার এক বউমা আছেন, হরিনায়াতদের শ্রী। বড় হেলে দেবনারায়ণ বিপাক্তীক। হরিনায়াতের মেয়ে লীনা আছে। সে খুব চালাক-চতুর। ইন্দ্রের খুব ন্যাওটা ছিল। তাল কথা, তোমার কি কর?’

‘আমি আশায় হাজার টাকা নিই; তারপর তদন্ত ঠিক যতো শেষ হলে পর আরও হাজার নিই।’

‘রহস্যের সমাধান না হলে আগামটা ফেরত দেওয়া হয়?’

‘আজ্জে না, তা হয় না।’

‘ভেবি শুড়। আমি তোমাকে হাজার টাকার চেক লিখে পাঠিয়ে দিছি। সেহাই বাপু—আমি কোন দিন কস করে চলে যাব—একে ডায়াবেটিস, তার উপর একটা ট্রোক হয়ে গেছে—যাবার অসমে ইন্দ্রের খুলির শাস্তি হয় এটা আমি দেখে যেতে চাই।’

‘শুধু একটা প্রশ্ন করার বাকি আছে।’

‘বলো।’

‘হকুম চাই বলে কি আপনার বকুহনীয় কেউ আছে?’

‘হকুম সিং বলে একজনকে নিবারণ, তা সে অনেকদিন আগে।’

‘থ্যাক ইউ।’

ফেলুদা প্রদুর্ভাবুর সঙ্গেই আগে কথা বলা ছির করল। কীর্তিনারায়ণবাবু উঠে চলে যেতেই প্রদুর্ভাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। ভবসোক প্রথম কথাই বললেন, ‘দারোগা সাহেব একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।’

‘কে, মিস্টার পোলার?’

‘হ্যাঁ, উনি নীচে আছেন।’

আমরা তিনজন নীচে রান্না পিয়াম। লালমোহনবাবু এককণ চুপচাপ ছিলেন, তবে বুঝতে পারছিলাম যে উনি সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বিভিন্ন লোকে কী ভাবে কথা বলে সে দিকে নাকি জেবকদের দৃষ্টি আবক্ষে হয়, তা মাহলে গলে ভাল ভায়ালগ সেৰা যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন আগেই লালমোহনবাবু একদিন আমদের বাড়িতে আজ্ঞা মারতে মারতে বলেছিলেন, ‘শোন ভাই তপ্পেশ, তোমার দামকে কিছু আমরা তদন্তের ব্যাপারে ফতো সাহায্য করতে পারি ততটা করিনা। এবার দেকে আমরাও চোখ-কান খোলা রাখিল। শুধু দর্শকের ভূমিকা নেওয়াটা কেনও কাজের কথা নয়—বিশেষ করে আমি নিজেই যখন গোয়েন্দা কাহিনী লিখি।’

মণিলাল পোকির ফেলুদাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, ‘গুজ্জে গুজ্জে ঠিক এসে হাজির হয়েছেন দেখছি।’

ফেলুদা বলল, ‘আমি তো ভাবলাম এসে দেখব আপনি বুঝি কেস অন্তম করে ফেলেছেন।’

‘ব্যাপারটা তো মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে’, বললেন মণিলালবাবু, ‘যাত্রা পাটিদের মধ্যে রেবারেবি। ভিকটিয় ভাবত অপ্পোর স্তুত বিশেষ, ওঁর জোরেই প্রায় নাটক চলত, অন্য দল তাঁকে ভাঙ্গিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল, পারেনি, তাই তাঁকে খুন করে ভাবত অপ্পোরকে খোঁড়া করে দিয়েছে। অবিশ্য চুরিয়ও একটা মোটিভ ছিল, কর্তব্য ঘরে কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছিল। হয়তো ওঁর লেখা কেবলও নতুন

নাটক খুঁজছিল।

‘আপনি ভারত অপেরার মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন?’

‘তখুন ভারত অপেরা কেন? বে দিন খুনটা হয় সে দিন ইন্ডিয়ান কোম্পানি বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার এসেছিলেন তিকটিমের সঙ্গে দেখা করতে। তত্ত্বালোকের নাম অর্থনী ভড়। অনেক প্রদোভন দেখান। বিশ হাজার টাকা মাট্টুন অফার করেন; কিন্তু ইন্দুনারায়ণ কোনও কমিটি করেননি। ভারত অপেরার প্রতি ন্যাচারেলি উঁর একটা লয়েলটি ছিল। অর্থনী ভড় চলে যান পৌমে এগারোটায়। খুনটা হয় বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। বাড়ির পিছনের দরজা খোলা ছিল। চাকর বলে ইন্দুনারায়ণ তখনও কাজ করছিলেন, আর মাঝে মাঝে বেহালা ধাজাছিলেন। হৃতগো গান লিখছিলেন। সেই সময় মার্ডিগ্রাটা হয়। পিছন দিক থেকে এসে কোনও তোতা ভাবি অন্ধ দিয়ে মাথায় মারে। তৎক্ষণাত মৃত্যু। টেবিলে ঝুকে কাজ করছিলেন, এমনিতেই মারার সুবিধে।’

‘অন্ধটা পাওয়া গেছে?’

‘না। যে দিকটা ইন্দুনারায়ণ থাকতেন সে দিকটা নিরিবিলি। এক তলার ঘর। চাকর-চাকর দেয়ে দেয়ে আজড়া মারতে গিয়েছিল। খাস বেয়ারা সঙ্গেরে আবার অদের নেশা, সে আবার পরে মাল থেকে ঘার, সাড়ে বারোটা একটায় এসে পিছনের দরজা বন্ধ করে। সদর দরজা অবিশ্বি সব সময়ই বন্ধ থাকে, আর বাইরে দারোয়ান আছে। বারোটার পর ঘনি কেউ পিছনের দরজা। দিয়ে চোকে তাহলে কেউ টের পাবে না। কাইগ বাড়ির পিছনে গলি—যদু নক্র সেম।’

‘আমি যদি একবার ইন্দুনারায়ণের শোবার ঘর আর কাজের ঘরটা দেখি তাহলে আপনাদের আপত্তি মেই তো?’

‘মোটেই না। ইউ আর মোস্ট খয়েলকান্দ। তবে আমি যেমন আপনাকে ইনফরমেশন দিলাম, সেটা আপনার কর্তৃক থেকেও পেলে দু পক্ষেই সুবিধা—বুঝতেই তো পারছেন, হৈ হৈ।

॥ ৪ ॥

শশিলালবাবুর সঙ্গে কথ দেরে আমরা প্রদুষবাবুর সঙ্গে গোলামে ইন্দুনারায়ণ অভ্যর্থনের ঘরে। ঘরটা এক তলার উত্তর-পশ্চিম কোণে। বাড়ির উত্তর দিকটা হচ্ছে সামনের দিক। যাবাবাবু নাটমন্দির আব তাকে ঘিরে তিনি দিকে বাবাবু আর সারি সারি ঘর। বাড়ির পিছনের দরজাটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, পশ্চিমের বাবাবুর শেষ মাথার। তার ধানে কেউ দরজা দিয়ে চুকে বাবাবু পেরোলেই ইন্দুনারায়ণবাবুর শেষবাবুর ঘর পাবে সামনে। তারপর উত্তরের বাবাবু ধরে দশ পা গেসে ভাইনে পাবে ইন্দুনারায়ণবাবুর কাজের ঘরের দরজা। অর্ধাং বাইরে থেকে একজন লোক এসে খুন করাটা খুবই সহজ ব্যাপার।

শোবার ঘরে থাটি, একটা আলমারি, দুটো তাক আর কিছু টাক সুটকেস ছাড়া জিনিস বেশি নেই। আমরা কাজের ঘরে গিয়ে হ্যাজির হলাম।

এখানে বড় বড় দুটো তাক বেঝাই কাগজপত্র খাতা ইত্যাদিতে। বুরালাম এগুলোকে নাটক আর গানের খসড়া রয়েছে। সতেরো বছরের যত কাগজ সবই মনে হস এই দুটো তাকে রয়েছে। বাবাবুর দিকে যে দরজাটা রয়েছে সেটাৰ ঠিক ডান পাশে একটা টেবিল আৱ চেয়ার। যোথাই গোল এইবাবেই খুনটা হয়েছিল। টেবিলের উপর ফাউন্টেন পেন, ডট পেন, পেনসিল, পেপার গোট, কালি, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি রয়েছে। আৱ যেটা রয়েছে সেটা হল একটা বেহুলার কেস। কেলুদা বলল, ‘একবার আম আমিৰি ভেপুৰ চেহারাটা দেখা যাক।’

বাবু খুলে বেহুপাটা দেখে কুখলাম ইন্দুনারায়ণবাবু সেটাৰ খুব যত্ন নিতেন। একলো বছরের পুরনো বেহুলা এখনও আৱ নতুনের মতো রয়েছে।

কেলুদা কেসটা বক্ষ করে দিল।

এ ছাড়া ঘরে রয়েছে এক পাশে একটা সোফা, একটা চেয়ার আৱ থেকে পাথরের একটা ছোট তেপায়া টেবিল। দেয়ালে হবিৰ স্থায়



বরঞ্চে দুটো ঘীধানো মাসপত্র—ইন্দুনারায়ণের পাত্রা—একটা বিলিতি ল্যান্ডস্কেপ আৰ একটা বানকৃষ্ণ পৱনহসেৰ মাৰ্কীয়াৰা ছবি।

তাৰ দেখা হলৈ সোক আৰ চেহাৰে ভাগাভাগি কৰে বসলাম অমুৰা চাৰজন। প্ৰদূৰৱশ্ব ইতিমধ্যে ঘোলেৰ সৱবতেৰ জন্য বলেছিলেন, সেটা এনে চাকৰ হেতুপাথৰেৰ টেবিলেৰ উপৰ রাখল। সৱবত খেতে বেতে কথা হল।

‘আপনাৰ ঘৱটা কোথায়?’ ফেলুন্স প্ৰশ্ন কৰল প্ৰদূৰৱশ্বকে।

‘টেৱচা ভাৰে এই ঘৱেৰ বিপৰীত দিকে,’ বললেন প্ৰদূৰৱশ্ব, ‘অৰ্ধেৎ দক্ষিণ-পূৰ্ব কোনো একেবাৰে কোনোৱ ঘৱটা হল লাইকেনি, আৱ আমাৱটা হল তাৰ পাশেই।’

‘আপনি রাত্ৰে ঘুমোন কৰন?’

‘তা বেশ বাক হয়; এক-আধ দিন তো একটা দেড়টাও হয়ে যাব। আমাৰ কাছটা—অৰ্ধেৎ কন্দৰ্পনারায়ণ সৰুক্ষে তথ্য সংগ্ৰহেৰ ব্যাপাৰটা—আমি সাধাৰণত বাবেই কৰি। অৰ্থম দিকে আমাৰ কাজ ছিল কৰ্তৃতাৰায়ণকে ইটাৱড়িত কৰা। তিনি বাইশ বছৰ বয়স পৰ্যন্ত তোৱ ঠাকুৰদাদাকে দেখেছেন। তোৱ কাছ থেকে সব তথ্য সংগ্ৰহ হলে পৱ আমি চিঠিপত্ৰ দলিল ডায়ি ইত্যাদি স্টাডি কৰা শুল্ক কৰি।’

‘তাহলে সে দিন যৰন খুন্টা হৰি তক্ষন আপনি জেগে ছিলেন?’

‘তা তো বটেই। তবে নাটমনিটা এত বড় যে আমাৰ কাজেৰ ঘৱ থেকে এ ঘৱটা দেখাও যাব না, এখনকাৰ কোনও শব্দ শোনাও যায় নো।’

‘ইগাপ্ৰাপি অপেৱা থেকে সোক এসেছিল ইন্দুনারায়ণবাবুৰ কাছে সে ব্যৱ জান গেল কী ভাৰে?’

‘সেটা বলেছে সম্ভোৰ বেয়াৱা। অশ্বিনী ভড় যে ছিপটা পাঠিয়েছিলেন সেটাও টেবিলেৰ উপৰ পাশয়া যায়। ভদ্ৰলোক কখন যান সে ব্যৱত বেয়াৱাই দেয়।’

‘আপনি বেহলা শুনতে পালনি?’

‘তা হয়তো এক-আধৰাৰ শুনেছি, কিন্তু সেটা প্ৰায় বোজই শুনতাৰ দূন দিশেম কৰে দেই দিন শুনেছিলাম কিমা বলতে পাৱন নো।’

‘কন্দৰ্পনারায়ণ কি নিয়মিত ডায়ি লিখতেন?’

‘পরের দিকে লেখেননি, কিন্তু পঁচিশ বছর থেকে চার্লিশ বছর পর্যন্ত
লিখেছিলেন।’

‘তার মানে বিলেত ভ্রমণের ভাবের ভাবেরিও আছে?’

‘আছে বইকী, আর সে এক অশ্চর্ষ জিনিস। কত লার্ড আর ডিউক
আর বারনের সঙ্গে যে তিনি আনাপিনা করেছেন তা পড়লে অশ্চর্ষ
হয়ে যেতে হব। লন্ডন থেকে কন্সর্প্যুরাইণ ফ্লান্সে হন। সেখানে
প্যারিসে কিছুদিন বাটিয়ে তিনি চলে যান ভূমধ্যসাগরের উপকূলে
দক্ষিণ ফ্লান্সের বিভিন্নেরাতে। আপনি তো জানেন এই অঞ্চলের
কফেকটি শহরের ক্যাসিনো হল জুয়াড়িদের তীর্থস্থান। কন্সর্প্যুরাইণ
মন্টি কার্লোর ক্যাসিনোতে কলেট থেকে লাখ লাখ টাকা জেতেন। খুব
কম বাড়ালিই সে যুগে বিলেত গিয়ে এ রকম কীর্তি রেখে এসেছেন।’

‘আচার্যদের জন্মদারি কোথায় ছিল?’

‘পূর্ববঙ্গে কাস্তিপুরে। বিরাট জন্মদারি।’

ফেলুনা একটা চারমিনার ধৰাল। দুটো টান দিয়ে তারপর ফ্লান,
‘মৃত্যদেহ আবিকার করে কে?’

‘সেও সংস্কোষ কেয়ারা। সে নিজে ফেরে প্রায় পঁচাশে একটায়।
তারপর ইন্দুরায়ণবাবুর কাজের ঘরে বাতি ছলছে দেখে একথার
উকি দিতে এসে দেবে এই ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেয়।
তারপর আমি দোতলায় গিয়ে অন্যদের জানাই।’

‘পুলিশে খবর দেবার সিদ্ধান্ত কাব?’

‘দেবনায়ারায়ণবাবুর। বড় কর্তা না করেছিলেন, কিন্তু দেবনায়ারায়ণবাবু
বাপের কথায় কান দেননি।’

‘আপনাৰ সঙ্গে ইন্দুরায়ণবাবুর সম্পর্ক কী রকম ছিল?’

‘দিবি ভাল। আমি ভদ্রলোককেও কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। বিশেষ
করে তাঁৰ বেহুলা সম্পর্কে। উনি বলেন যাপ্টা খুব ভাল এবং আওয়াজ
অতি মিষ্টি। আমি স্মর বছর ওটা না বাজানো অবস্থায় পড়েছিল, কিন্তু
ইন্দুরায়ণ ওটা বার করে বাজাতে আরম্ভ কৰার সঙ্গে সঙ্গেই ওটার
আওয়াজ খুলে যাব।’

‘ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?’

একেবারে কাজ-পাগলা মানুষ ছিলেন। কাজে খুবে থাকতেন

যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন। লাইব্রেরি থেকে বই নিতে আসতেন মাঝে
মাঝে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটক লেখার সময় বই দেখার
দরকার হত। কন্দপুরায়ণের ছেলে, কীর্তিমারায়ণের বাবা
দর্পনারায়ণ ইতিহাসে এম. এ. ছিলেন। তাই লাইব্রেরিতে ইতিহাসের
বই খুব ভালই আছে।'

'এদার অন্য দু ভাই সবক্ষে একটু জানতে চাই।'

'বেশ তো।'

'সবচেতে বড় তো দেবনারায়ণ। তারপর হরিনারায়ণ, তারপর
ইন্দনারায়ণ।'

'হ্যাঁ।'

ইন্দনারায়ণ তো বিয়েই করেননি। আর দেবনারায়ণ শুলাম
বিপরীক ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর সাতক আগে তুর শ্রীর মৃত্যু হয়।'

'তুর হেলেপিলে নেই ?'

'একটি মেয়ে আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পুনায় কাজ করে।
ছেলে একটি আছে সে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।'

'আপনার মতে দেবনারায়ণ লোক কেমন ?'

'অজ্ঞত চাপা, গাঁজীর প্রকৃতির মানুষ।'

'তিনি কি চাকরি করেন ?'

'তিনি স্টকওয়েল টি কোম্পানিতে উচু পোস্টে আছেন।'

'অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন কখন ?'

'তা রাত সাড়ে নটার আগে তো নয়ই, কারণ অফিস থেকে ঝাবে
যান। সঞ্চাটা সেখানেই কাটান।'

'ভাইয়ের মৃত্যুতে কি তিনি খুব শোক পেয়েছিলেন বলে মনে হয় ?'

তিনি ভাইয়ের মৃত্যু বিশেষ সজ্ঞাক ছিল না। বিশেষ করে
ইন্দনারায়ণ যাত্রার কাজ করেন বলে আমার ধারণা অন্য দু ভাই ওঁকে
বেশ হোক জন করতেন।'

'কিন্তু কীর্তিমারায়ণ তো ছোট ছেলেকে কেশ ভালই বাসতেন।'

'তখন ভাসবাসতেন না, তিনি ছেলের মধ্যে ছোটকেই সবচেয়ে বেশি
ভাসবাসতেন। এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কারণ অনেক

কথনতেই এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেত।'

'কীভিনারায়ণ কি উইল করেছেন ?'

'করেছেন বলেই তো আমার ধারণা।'

'সেই স্থিলেও তো এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে।'

'তা তো পারেই।'

কেলুদা একটা চারিমিনার ধূরাল। লালমোহনবাবু তাঁর হোটে লাল গাত্তাটা বার করে কী যে লোট লিখছেন তা উনি জানেন। হয়তো ভবিমাত্রে একটা গজের পটি তুর মাথার আসছে।

'এবার দ্বিতীয় ভাই সহজে একটু ভালা দরকার।'

'কী জানতে চান বলুন,' বললেন প্রদ্যুম্ববাবু।

'উনি জে জটার্ড অ্যাফাউন্ট্যান্ট ?'

'হ্যাঁ। কিনার অ্যান্ড হার্ডিংক কোম্পানিতে আছেন।'

'কেমন লোক ?'

'তুর তো ফ্যামিলি আছে, কাজেই সেবানেই বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটা তক্ষাত হয়ে যাক্ষে। তৎস্মাক মেটামুটি ফুর্তিবাজ, বিলিতি গান ধার্জনার খুব ভক্ত।'

'রেকর্ড আর ক্যাসেট পোনেন ?'

'হ্যাঁ, তবে সেটা রবিবারে। অন্যদিন সকার্য ইনিও ফ্লাবে যান, ফেরেন সেই সাড়ে নটা দশটোঁৰ।'

'কেন ক্লাব ?'

'স্টারডে ক্লাব।'

'বড় ভাইও কি একই ক্লাবের মেম্বার নাকি ?'

'না, উনি ক্লেক্স ক্লাবে।'

'হরিনারায়ণের তো একটি যেয়ে আছে।'

'হ্যাঁ—লৈনা। বুদ্ধিমত্তা। বছর চোদো বয়স, পিয়ানো শিখছে। ক্যালকুলেটা গার্জন স্কুলে পড়ে। সে কেচারি কাকার মৃত্যুতে খুব আঘাত পেয়েছে, কারণ সে কাকার খুব ভক্ত ছিল।'

'আর হরিনারায়ণবাবু ? তিনি আঘাত পাননি ?'

'বড় দু ভাইয়ের কেউই ছেটকে বিশেষ আমল দিতেন না।'

'আর হয়তো ইজনারায়ণ যত্রা থেকে এত ঝোঁজগার বরে সেটাও

তারা বিশেষ সুন্দরে দেখত না।'

'তাও হতে পারে।'

'আমার অবিশ্যি এই দুই ভাঁহের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেটা বোধহয় শনি কি রবিবার করলে ভাল হয়, তাই না?'

'শনিবার সকালে এলে দু ভাইকেই পাবেন।'

'আপনি যে কন্দর্পনারায়ণের কীর্তন্যের উপর কাজ করছেন, সেটা কতদিন পেকে?'

'তা প্রায় ছ-মাস হল।'

'হঠাৎ এই মতি হল কেন?'

'আমি উসবিশ্ব শতাব্দী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব বলে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম। সেই সময় কন্দর্পনারায়ণের নাম পাই। খৌজখবর নিয়ে জানি তাঁর বৎসরের এখনও আছেন বোসপুরে। সোজা এসে কীর্তনারায়ণের সঙ্গে দেখা করি। কীর্তনারায়ণ বলেন—তুমি আমার বাড়িতে থেকে রিসার্চ করতে পার, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কিছু কাজও করে দিতে হবে। তার জন্য আমি তোমাকে পারিশ্রমিক দেব। আমি তখন ব্ববরের কাগজের কাজ হেফে এখানে চলে আসি। এখানে অনেক ঘর থালি পড়ে আছে, তারই একটা ঘরে আমাকে এক স্লায় থাকতে দেন কীর্তনারায়ণ। গত ছ-মাসে আমি এ বাড়ির সঙ্গে বেশ মিলে গেছি। আমার কারবার অবিশ্যি শুধু কীর্তনারায়ণকে নিয়েই, তবে অন্যরাও আমার ব্যাপারে কেনও আপত্তি করছেন বলে শুনিনি।'

'ভাল কথা—'

ফেলুনা তার পার্স থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ ধার করল।

'এটা বোধহয় সে দিন আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল—আপনি যখন ধাম মুছতে রুমাল বরে করেন। তখনিনের জন্য কেকেয় অর্ডার কি, নাকি টেলিআর?'

ফেলুনা 'হালি বাথর্টে হকুম চাঁদ' সেখা কাগজটা প্রদূষব্যাপুর হাতে দিল। প্রদূষব্যাপুর ভুক্ত কপালে তুলে ধললেন, 'কই, এমন তো কেনও কাগজ আমার পকেটে ছিল না। আর এই হকুম চাঁদ যে কে সে তো আমি বুঝতেই পারছি না।'

‘আপনি সে দিন কিসে করে আমার বাড়িতে এসেছিলেন?’

‘বাসা।’

‘বাসে ভিড় ছিল? তার মধ্যে কেউ এটা পকেটে ফেলে দিতে পারে?’

‘তা পারে, কিন্তু এটাৰ তো কোনও মানেই আমি বুঝতে পারছিনা।’

‘এটা যদি আপনার না হয় তো আমার কাছেই থাকুক।’

ফেলুন। কাগজটা আবার পার্শ্বে রেখে দিন। এই কাগজ যে একটা রহস্যের মধ্যে পড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

॥ ৫ ॥

আমরা বোসপুর গিরেছিলাম বিশুদ্ধবার, আবার যেতে হবে শনিবার, কাজেই মাঝে শুভুরবারটা কাঁক। সেই ফাঁকে দেখি লালমোহনবাবু আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আসলে একটা তদন্ত যখন শুরু হয়ে যাব তখন আর সিন্ধু আসা যাব না।

ভদ্রলোক এসেই ধপ করে সোফায় বসে বললেন, ‘আপনার তো শুশু বোসপুর গেলে চলবে না যশাই—যাত্রা পাটিগুচ্ছাতেও তো একবার যাওয়া দুরকার।’

‘সে জারি বলাতে,’ বলল ফেলুন। ‘মৃত ব্যক্তিৰ সমষ্ট জীবনটাই তো যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রায়েছে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন বাড়িতে বসে না সৈজিয়ে চপুন মহসুল শকি লেনটা যুৰে আসা যাক।’

‘আপৰি বীণাপাণি অপেৱাৰ ম্যানেজাৰ সেই ইশানবাবু না কী—’

‘অশ্বিনীবাবু।’

‘হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবুৰ সঙ্গে তো কথা বলতে হবে। তাই নাপ?’

‘নিশ্চয়ই। তোপ্সে, একবার ডিৱেক্টরিতে দ্যাখ তো বীণাপাণি অপেৱাৰ ঠিকানটা কী।’

ডিৱেক্টরি দেখতে বেৱোল বীণাপাণি অপেৱা সুৱেশ মদ্রিক ট্রিপ্ট। লালমোহনবাবু বললেন যে রাস্তাটা তো জন্ম আছে। ওখানেও একটা ব্যাপ্তিমগায়ে নাকি উনি কলেজে থাকতে বেগুলাবলি বেতেন।

‘বলেন কি! বলন ফেলুন।

‘বিশ্বাস করুন। ডন বৈঠক বাবকেল চেস্ট-এন্ডপ্যান্ডার বাদ দিইনি। বড়ির ডেভেলপমেন্টও হঁজেছিল ভালই; আমার হাইটে বেয়ালিশ ইঞ্জিনিয়ারিং দেহাত নিন্দের নয়।’

‘তা সব মাসপেশী গোল কোথায়?’

‘আর মশাই, সেখক হলে কি আর মাস্ল থাকে শরীরে? তখন সব মাস্ল গিয়ে কুম হয় দ্রেনে। তবে ভোয়ে হাঁটার অভিযন্তা যেখেচি। ডেইলি টু মাইলস। তাই তো আপনার সঙ্গে পালা দিয়ে চলতে পারি।’

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর ঝাইভার ইরিপদবাবুর খুব উৎসাহ। খুনের ব্যাপারটা কাগজে পড়েছেন, তা ছাড়া ভারত অপেরার আনন্দ যত্না উঁর দেখা। আমরা সেই খুনেরই তদন্ত বস্তু পেলেন যদলেন, ইন্দ্র আচার্য একজন ভারত অপেরার দীড় করিয়ে দিয়েছিলেন। উঁর খুনিকে কাটগড়ায় দীড় করতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে।’

শুভব্যার ট্যাফিক প্রচুর, তাই ভারত অপেরার অপিসে পৌছতে লাগল প্রায় পাঁয়তাঙ্গিশ মিনিট। নছৰটা ডিবেকটরিতে দেখে নিয়েছিলাম, তা ছাড়া দুরজ্বার উপরে সাইন বোর্ডে লেখাই রয়েছে কোম্পানিয়ার নাম।

দুরজ্বা দিয়ে চুক্তে একটা টেবিলের পিছনে একজন কালো মডেল মাঝবয়সী লোক বসে আছেন; বললেন, ‘কাকে চাই?’

ফেলুদা তারা কাউটা বাব করে দেখাতে ভদ্রলোকের টেবিলের অলস চাহনিতে ফিছুটা ঝৌলুস এল। বললেন, ‘আপনারা কি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন—আমাদের প্রোপাইটার?’

‘আজে হ্যাঁ,’ বলল ফেলুদা।

‘একটু বসুন।’

একটা বেঁকি আর আরও একটা চেয়ার ছিল ঘরটায়, অধিনা তাতেই ভাগাভাগি করে বসলাম। ভদ্রলোক উঠে পিছনের একটা দুরজ্বা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, ‘এই কোম্পানিয়া যে এস রমব্যাস সেটা কিন্তু এ ঘর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।’

মিনিট খাসকের ঘণ্টাই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, ‘আসুন আমার সঙ্গে। শরৎবাবু দোতলায় বসেন।’

একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ঢোর সময় হাতায়েনিয়ামের শব্দ পেলাম। বিহারীলের তোড়জোড় চলছে নাকি? শুঁটি চলে গেলেও আজ্ঞা তো চালিয়েই যেতে হবে।

প্রোপাইটার শরৎ ভট্টাচার্যের আপিস সেবে কিন্তু ধারণা পালটে গেল। বেশ বড় ঘর, শুধু টেবিল, চারপাশে মজবুত চেয়ার, দেয়ালে একটা বিরাট বারোমাসি ক্যালেন্ডার, আটিস্টিন্সের বাধানো ছবি, দুটো আলমারিতে মোটা মোটা খাতাপত্র ছাড়া একটা গোদরেজের আলমারি রয়েছে, মাথার উপর বাই বাই করে স্থুরে পাখ।

টেবিলের পিছনে যিনি বসা তিনিই অবশ্য শরৎবাবু। তাঁর মাথার টাক, কানের পাশে পাকা চুল, ঘন কালো ভুক্ত, মুখের চামড়া টান। বয়স বোঝা যায় না, শুধু কলা যার পঞ্চাম থেকে পঁয়ষষ্ঠির মধ্যে।

‘আপনিই প্রদোর মিস্ত্রি?’ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে ভদ্রসোক প্রশ্ন করলেন।

‘আম ইনি হচ্ছি আমার বক্তু রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গঙ্গুলী,’ বলল বেলুদা।

‘ওরে বাবা, আপনি তো স্বনামধন্য বাক্তি মশাই। আমার বাড়িতে আপনার অনেক ভক্ত আছে।’

লালমোহনবাবু বাবু চারেক হৈ হৈ করলেন, তাঁরপর ভদ্রলোক বসাতে আমরা চেয়ারে বসলায়। ফেলুদাই কথা শুরু করল।

‘ইন্দুরায়ণবাবুর বাবা আমাকে তাঁর ছেলের খুনের তদন্ত করতে বলেছেন, সেই জন্যেই আসা।’

শরৎবাবু মাথা নেতে বললেন, ‘আমি আর কী বলতে পারি বলুন, শুধু এইটুকুই জানি যে আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। নটিক লিখিয়ে হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধন গান কেউ লিখত না, আর কেউ লিখবেও না। আহ—আকাশে হাসিছে চাঁদ, তুমি কেম আনন্দনা— কী গান! শুধু গান শুনতেই জোকে বার বার ফিরে ফিরে আসো।’

‘আমরা শুনেছি অন্য দল থেকে তাঁকে প্রয়োগন দেখানো ছিল।’

‘সে তো বটেই। তবে প্রয়োগনে কোনও কাজ হয়নি। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে আমাকে ছাড়বার অস্থা সে কল্পনাও

করতে পারত না। যখন প্রথম এল টক্স তার কুস পঁচিল। আমিই যে তাকে প্রথম সুযোগ নিয়েছিলাম সেটা সে কেনওশিন ভুলতে পারেন। শেষটায় তার জীবননাশ করে আবক্ষ ঝোঁড়া করে দিল।'

শরৎবৰু ধূতির কথা নিয়ে দেখেও জল দুর্ছিমে: তারপর বললেন, 'আমে একবার ওর প্রণায় বাড়ি আবার চেষ্টা করেছিল রাস্তাক। অবিশ্বিসেটা খুন্দের চেষ্টা কিম। আব দেটার সাথে তাসল খুন্দের কেনওশে সম্পর্ক আছে কিম। সেটা বলতে পারব না। এই গলিটায় গুণা বদম্বারেশের অভ্যব নেই। সে দ্বিতীয় ডো পু জন এসে না পড়লে অন্তত ওর মানিয়াগটি হাওয়া হবে যেত বলে আমাৰ বিশ্বাস। সেটা আৱ হয়নি। তবে আসল খুন্দটা এ আমাকেও এক রুক্ম খুন কৰ্বা সে বিবয় অচেয়াৰ কোনও সন্দেহ নেই। তাপমি তদন্ত করতে চান তো বীণাপাণি অপেৱায় শিয়ে কৰলুন; আমাৰ কুড়োৱ আৱ কিছু বলাৰ নেই।'

আমোৰ উচ্ছে পড়লুম। ইতিমধ্যে চা বাওয়া হবে গেছে সেটা বলে নিই। এৱ পৰেৱ স্টেপ্রুৰেল দুৰ্বেশ আৱক ট্ৰিট।

আমহাস্ট ট্ৰিট দ্বন্দ্বে তদন্তৰে বেতে গিয়ে বাঁয়ে একটা মোড় নিয়ে তাৰ পৰেৱ ভাইনেৰ রাস্তাটোই হজ সুৱেশ মলিক ট্ৰিট। তোম নহৰে বীণাপাণিৰ আপিস বৰ্ত কৰতে কোনও অসুবিধা হল না।

এখানে বাড়িতে ফিরবই বাকে বলে উদান্ত কঠোৰ তন্তে পেয়ে দুখলায় পুৱোদহে যান্তে চলছো। যানেজায় অফিনীবাবুকে আৱ কৰতে সময় লাগল না। বন্দুৰাজাজী চেহাৰা, টুথ ব্রাশ গোঁফ, বহুৰ পঞ্চাশেক বৰস। বাইৱেৰ এ গী ঘৰে আমাদেৱ বসতে দেওয়া হয়েছিল, ভৱলোক চুকে এসে কেলুদাৰ কার্ড দেখেই খাজা হয়ে উঠলৈন।

'একি বোসপুকুৰে খুনেৱ ঝাপার নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'জে হ্যাঁ। আমাৰ উপৱ তদন্তৰে ভাষ পড়েছো। আপনি ইন্দ্ৰনোৱণ কুন সন্দে খুনেৱ রাবে দেখা কৰেছিলেন, তাই আপনাকে দু-একটা প্ৰশ্ন কৱাৰ হিল।'

'পুলিশ তো এক দক্ষ জেৱা কৰে গেছে, আবার আপনি কেন? তা যাই হৈক, আমি বলেই দিছি, আমি খুনেৱ বিষয় কিছুই জানি না। আমি সেমলুম তাঁকে একটা অফাৰ দিতে আমাদেৱ তৱক থেকে। এৱ আগেও কথেকৰাৰ দেছি। ওকে নিৰৱাঞ্জি কৱিয়ে এনেছিলাম, কাৰণ



ভারত অপেরা ঘরকে যে টাকা দিত আমরা তার ক্ষেত্রে দের বেশি অফার করি। আমাদের সে জোর আছে বলেই করি। কাজেই এ অবস্থায় আমরা যেটা ক্ষেত্রেছিলাম সেটা হল উনি যাতে আমাদের দলে যোগ দেন। উনি যদি যাবেই বান তাহলে আমাদের লাভটা হচ্ছে কোথেকে ?’
 ‘অন্য দলের ক্ষতি হলে তাতেও তো আপনাদের লাভ।’

‘না। ওসব ছাঁচভাবের মধ্যে আমরা নেই। এ দল সে দল থেকে আটিস্ট ভাঙ্গিয়ে নেবার চেষ্টা আমরা কর সমর্থই করি, কিন্তু তাতে সফল না হলে কি আমরা সে আটিস্টকে প্রাপ্ত হোৱে অন্য দলের ক্ষতি করব ?’

‘আপনি বলছিলেন উনি নিম্নরাজি হয়েছিলেন। তার কোনও প্রমাণ আছে কি ?’

‘গোড়ায় যখন চিঠি লিখে অফার দিই, তার একটা পোস্টকার্ডের উপর আছে, দেখতে চান দেখাতে পারি।’

ফেলুদা বলতে ভুঁতোক ফাইল থেকে পোস্টকার্ডটা যার করে দেখালেন। তাতে দেখলাম ইন্দুরাম্ববাবু সভ্যুই বলেছেন,

‘আপনাদের প্রস্তাব আমি ভেবে দেখছি। আপনি কাস বানেক বাদে অনুগ্রহ করে আর একবার অনুসন্ধান করবেন।’ অর্থাৎ ইন্দুনারায়ণবাবু বীণাপাণি অপেরার প্রস্তাবে পুরোপুরি না করেননি। তাঁর মনে একটা দ্বিধার ভাব এসেছিল।

ফেলুনা বলল, ‘সে দিন রাত্রে যে আপনি গেলেন, তখন আপনাদের মধ্যে কোনও কথা কাটাকাটি হয়েছিল?’

আমি ওঁকে নানান ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম সেটা ঠিক আর তাতে হস্তে গলা একন্তু আবার চড়ে যেতে পারে। কিন্তু ইন্দুনারায়ণবাবু মাথাঠাণ্ডা লোক ছিলেন, সেই কারণেই তাঁর কাজটা এত ভাল হত। উনি বললেন, ‘ভারত অপেরার সঙ্গে এভদ্বিনোর সম্পর্ক। সেটা ভাড়া তো সহজ কথা নয়। কিন্তু তাও বলছি আপনারা পারলে আমাকে আর কিছুটো সময় দিন। একটা নতুন নাটক আমি লিখছি ভারত অপেরার জন্য। সেটা দেখ বলে কথা দিয়েছি; সে কথার তো আর নড়চড় করতে পারি না। এই বছরের শেষে আমি আবার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব’—এই হল শেষ কথা। তারপর আমি চলে আসি। তখন পৌনে এগারোটা।’...

‘গোলমেলে ব্যাপার’, ফেলুনা বক্তব্য করল চৌরঙ্গিতে একটা রেস্টোরেন্টে বসে কফি খেতে খেতে।

‘বীণাপাণি অপেরাই যে শুণা জানিতে খুন করেছে সেটা এখন আর মনে হচ্ছে না—তাই না?’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘তা হচ্ছে না’, বলল ফেলুনা, ‘তবে প্রশ্ন হচ্ছে শক্রবিহীন এই ব্যক্তিটির উপর কার এত আক্রোশ ছিল? ভাড়াটে শুণাই যদি মেরে থাকে তাহলে ফেলু মিলিনের বিশেষ কিছু করবার দেই। সেখানে পোদ্দারমশাই টেক্কা মেরে বেরিবে যাবেন।’

‘বিস্তু অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে—’

‘অশ্বিনীবাবু যে সত্ত্ব কথা বলছেন সেটাই বা মেনে নিই কি করে? সেদিন ওঁর কথায় যে ইন্দুনারায়ণ সরাসরি না করে দেননি সেটাই বা কে বলতে পারে? সার্কাঁ কই?’

‘আজ্ঞা, বাড়ির লোক যদি খুন করে থাকে?’

‘সেটা সঙ্গাক্ষে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কীর্তিনারায়ণ তাঁর

ছোট ছেলেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি যদি তাঁর উইলে ইন্দুরায়ণকে বেশি টাকা দিয়ে থাকেন, তাতে বড় ভাইদের কি মনে হতে পারে না ছোটভাইকে হঠিয়ে তাদের শেয়ার কিছুটা দাঢ়িয়ে নেওয়া?’

‘এটা আপনি মেঘম বল্সেছেন’, বললেন লালমোহনবাবু।

কিন্তু ব্যাপার কী জানেন? খুন জিনিসটা করা অঙ্গু টঠিন। প্রচন্ড তাপিদ না থাকলে নাথোরণ মানুষের পক্ষে খুনের সাহস সংক্ষয় করা সম্ভব নয়। আগে অন্য ভাই দুটোকে একটু বাজিয়ে নিই, তারপর তেমন খুবলে ওটা নিয়ে ভাব বাবে।’

ফেনুদার কপালে মুকুট তাও যাচ্ছে না দেখে জিল্লেস কঞ্জলাম সে কী ভাবছে। ফেনুদা বলল, ‘সেকেও ত্রাদার হিন্দুরায়ণের কথা।’

‘কেন?’

‘সোকটা আবার ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ভজ—জ্যাসিব্যাল মিউজিক। এই নিয়ে যে দুটো প্রশ্ন করব তারও জো নেই। কারণ ফেনু মিউরি ও ব্যাপারে একেবারেই কঁচা।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আমার কাছে একটা পাশ্চাত্য সংগীতের এমসাইকেলপিডিয়া আছে—এক ভল্যুম, সাড়ে সাতশো পাতা। তাতে আপনি যা জানতে চান সব পাবেন।’

‘আপনি ও বই নিয়ে কী করছেন?’

‘ওটা একটা সেটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল—তাতে হিস্টি, জিওগ্রাফি, মেডিসিন, সায়েন্স, অ্যানিম্যালস—সবই আছে। আমি নিজে উলটে পালটে দেখেছি মিউজিকের বইটা হেডল, মোজাট, বিথোভেন নব বড় বড় সুরকারদের জীবনী রয়েছে।’

‘আমি এ সব সুরকারদের রচনা শুনিনি বটে, কিন্তু এদের নামের উচ্চারণগুলো অস্তত আমার জন্ম আছে, কিন্তু আপনার নেই।’

‘কি বকল?’

‘হাইড্ল, মোৎসার্ট, বেটোফেন—এই হল আসল উচ্চারণ।’

‘হাইড্ল, মোৎসার্ট, বেটোফেন—থ্যাক্স হট স্যার, আর ভুল হবে না।’

‘এখনই সিতে পারেন বহুজা?’

‘আমবৎস! আপমার জন্ম এনি টাইম।’

আমরা বেস্টিয়ার্ট থেকে গড়পার পিয়ে লালমোহনবাবুর বহুজন নিয়ে উন্নোক্তকে বাড়িতে রেখে একটা টালি নিজে বাড়ি ফিরলাম।

বাকি দিলটা ফেলুন্দার সঙ্গে আর কথা বলা সম্ভব হয়নি, বাসুপ মেঘ থেকে করে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক পড়গ।

॥ ৬ ॥

শনিবার সকাল দশটায় বোসপুরুষ পিয়ে প্রথমেই যার সঙ্গে কথা হল, সে হল চরিনারামবাবুর মেয়ে লীনা। লীনার আজ ইকুল ছুটি, সে কদিন থেকেই শুনেছে বাড়িতে ডিটেকটিভ এসেছে। তাই উদ্বৃত্ত হয়ে অংজে। ফেলুন্দার জড় হওয়াতে তার সঙ্গে কথা বলতে আবশ্যিক সুবিধা হল।

‘তোমার হোটেকাফ, তোমাকে খুব ভালবাসতেন, তাই না?’ ফেলুন্দা জিগ্যেস করল।

‘শুধু ভালবাসতেন না’, বলল লীনা, ‘আমরা দু জনে বন্ধু ছিলাম। কাকার সব লেখা আগে আমাকে পঁড়ে শোনতেন। আমার যদি কোনও জানগো গোলমাল পাগল তাহলে কাকা পেটা বদলে দিতেন।’

‘আর গান?’

‘আমাকে প্রথম শোনতেন।’

‘তুমি নিজে গান ভালবাস?’

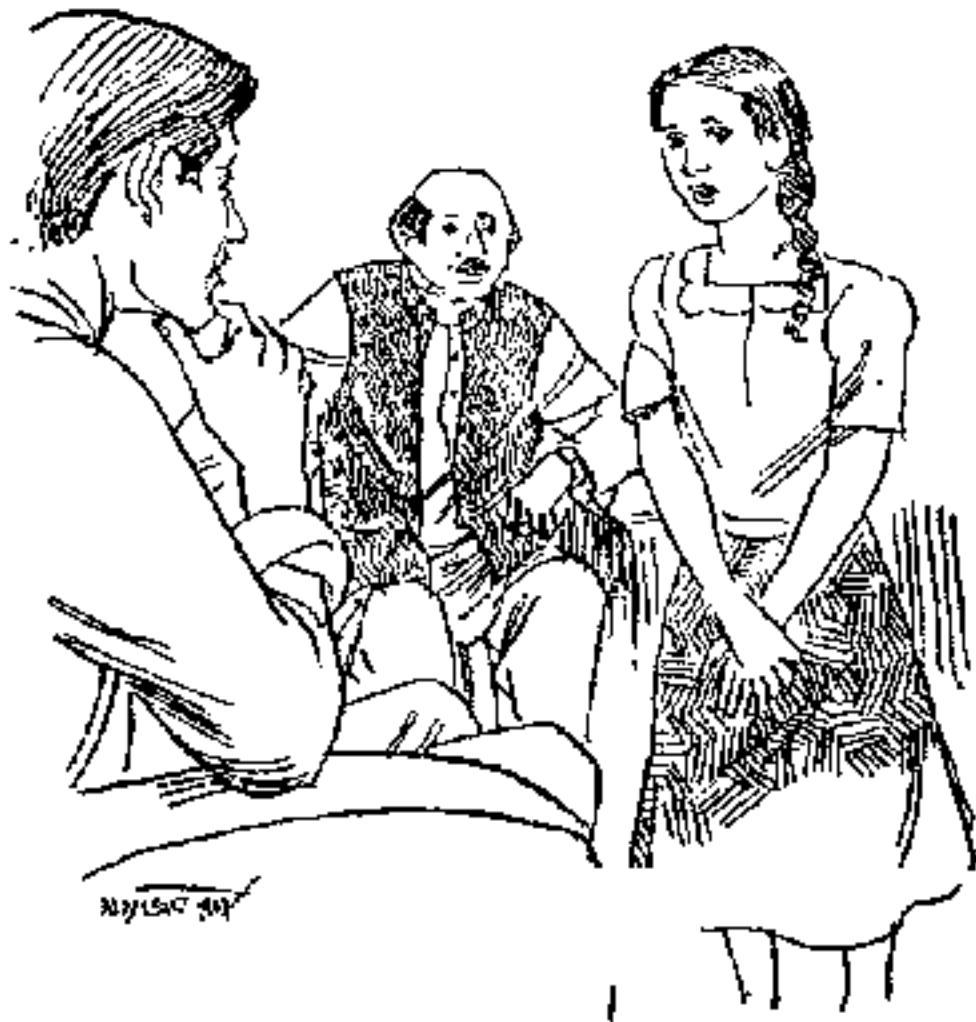
‘আমি পিয়ানো শিখছি।’

‘তার মানে তো বিলিতি বাজনা।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আমার রবিস্কুলসগীতও তাল লাগে, আর কাকার গানও তাল লাগত। আমি নিতেও গান করি একটু একটু।’

‘তোমার কাকা কোনওদিন ভাবত অপেরা ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন তোমাকে?’

‘বীণাপাণি জন্মের কল্পকে অনেক টাকা লিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয় না কাকা কোনওদিন ভাবত অপেরা ছাড়াবেন। আমরা



বলতেন, আমার শেকড় ভারত অপেরার, শেকড় তুলে অন্য জায়গায় গেলে কি আর আমি বাঁচব ?

‘কাকা একটা নতুন নাটক নিয়েছিলেন সেটা তুমি জান ?’

‘একটা কেন ; স্বার্ট অশোক তো শেষ হয়নি। তাছাড়া কক্ষার ঢারটে নাটক লেখা ছিল। এ ছাড়া তাঁর প্রের প্রক্রিয়া খুব ভাল ভাল গান লেখা ছিল যেগুলো এখনও যাত্রায় ব্যবহার হয়নি। আর নাটকের বসড়া যেগুলো ছিল—সেও প্রায় আট-দশটা ইঁধে—সেগুলো তো খসড়াই রয়ে গেল !’

লীনার সঙ্গে কথা বললাম প্রদৃষ্টব্যাবুর ঘরে। খুব সাদাসিধে ঘর,

লাইব্রেরির ঠিক পাশেই। ভদ্রলোক বললেন যে ঠের রিসার্চের কাজ আয় দেখ রয়ে গেছে, এর পর কাগজপত্র সব নিয়ে উনি বইটা সেখার অন্য শ্রীরামপুরে ঠের বাড়িতে চলে যাবেন। ঠের আবাস এক বছর লাগবে বইটা লিখতে।

‘অবিশ্য রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানে থাকতেই হবে সেটা বেথ হয় বুঝতেই পারছেন।’

‘সে কথা পুলিশ আগেই বলে দিয়েছে।’

‘আপনি চলে গেলে কীর্তিনারায়ণবাবুর সেক্রেটারির কী হবে?’

‘সে আমি অন্য একটি ছেলেকে বদলি দিয়ে যাব। জীবনী একবার শিখতে আরঙ্গ করলে অন্য কোনও দিকে ফির দিতে পারব না।’

ফেলুন্দা ঘূরে ঘূরে ঘরটা দেখছিল, আর ঘরের দরজা দিয়ে বাইরের কী অংশ দেখা যায় সেটাও দেখছিল। দেখলাম প্রদুর্মবাবুর শোবার ঘর থেকে ইন্দুনারায়ণবাবুর কাজের ঘরের দরজাটা দেখা যায়, কিন্তু লাইব্রেরি থেকে দুটোর একটা ঘরও দেখা যায় না। ঘরের পিছনের জনালা দিয়ে বাইরে গলি দেখা যায়—যদু নক্ষর লেন। বেসপুত্রের রোডটা হল বাড়ির সামনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের বাগানের পরে।

লীনা ইতিমধ্যে তার বাবা হিন্দুনারায়ণবাবুকে আমাদের কথা বলে রেখেছে; আমরা দোতলায় দক্ষিণ দিকের জাহানার পাশে একটা বৈঠকখানার পিয়ে হাজির হলাম। বেশ সুন্দর সাজানো ঘর, তাতে কিছু দামি পুরনো জিনিসও রয়েছে বলে মনে হল। যে সব জিনিস মানুষ কিউরিওজন সোকান থেকে কেনে। ঘরের এক পাশে একটা বড় তাকে হাই-ফাই যন্ত্র রেকর্ড আর ক্যামেট্রি চালনার অন্য, আর তাকের উপরে দু দিকে দুটো স্টিরিও স্পিকার।

হিন্দুনারায়ণবাবুকে দেখেই লীনার বাবা বলে বোঝ যায়; বেশ সুপুরুষ চেহারা, ৩৫ এ বাড়ির আর সকলের মতোই ফুরসা, খালি শপ্রীজে যাংসটা একটু দেশি।

ভদ্রলোক ফেলুন্দা আর লালমোহনবাবুকে বললেন, ‘আপনাদের মু অন্যের নামই শোনা বলে মনে হচ্ছে। এখন বলুন কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।’

ফেলুন্দা প্রথমেই কাত্তের বাধায় গেল না। একেব্বে কাত্তপেটান প্র

দেখছি বিভাটি গান বাজলার গালেকশন।'

'হ্যাঁ, তা বিশ বছর হল কৰছি ওয়েস্টার্ন মিউজিক। শুটাতেই গান
বসে গেছে, দিশি আৰ ভাল লাগে না।'

'আপনার কেনও ফেলারিট কম্পাঙ্গার আছে নাকি ?'

'চাইকোভন্সি শুব ভালো লাগে; সুমান, আমস, শোপাঁ।'

'অর্থাৎ রোম্যাটিক যুগটাই আপনার বেশি প্রিয় ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ছেট ভাই বেহলা বাজান্দেও বিলিতি সংগীতের দিকে
বোঁকেননি বোধ হয়।'

'না। ওৱা ব্যাপারটা ছিল একেবাৰে উলটো। কৰনেছি ওৱা নাকি
ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু যাজ্ঞা দেখাৰ কোনও তাগিদ কোনওদিন কৰুড়ব
কৰিবিনি। আমাৰ কুৰী আৰ মেয়ে গেছে কৰোকবাৰ।'

'ইন্দুনারাইজেন মতু সম্বন্ধে আপনার নিজেৰ কোনও খিওৱি
আছে ?'

'ব্যাপার কি জানেন, তা যে ক্লাসেৰ লোকেদেৱ সঙ্গে মেলামেশা
কৰত তাদেৱ তো আৰ ঠিক ভদ্রলোক বলা চলে না। যাজ্ঞাৰ
পৰিবেশটাই আৱাপ। কোথায় কাৰ সঙ্গে কী গোলমাল পাখিয়ে
জেখেছিল কে জানে ? তাৱই একজন এসে বসলা নিয়োছে—এ ছাড়া
আৰ কী ? জিনিসপত্ৰ যবন কিছুই চুৰি যায়নি তবন আৰ কী কাৰণ
থাকতে পাৱে তা তো আমি জানি না। ওৱা সন্দেহ ওৱা কথল হয়েছিল।
আপনি এমকেয়াৱি কৰতে চাইলে ওই যাজ্ঞা পার্টিগুলোতে গিয়েই
কৰুন। এখানে বিশেষ সুবিধে কৰতে পাৱকেন না।'

'পুলিশে ব্যব কি আপনার দাদা দেন ?'

'আমি, দাদা দু জনেই দিই। বাড়িতে খুন হলে সেটাই তো
স্বাভাৱিক। চৰ্ট কৰে কেউ আইভেট ডিটেকটিভ ভাকে কি ? বাবাৰ ভাই
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা চিৱকালই হিঁত্বেত। কি কৰে যে ব্যারিস্টাৰি
কৰেছেন এত দিন তা জানি না।'

'আপনার বাবা বোধহয় আপনার ছেট ভাইকে শুব ভালবাসতেন।'

'সেটাও ওই ছিটেৱই উদাহৰণ। বাবা গতানুগতিকৰ্তা পছন্দ কৰেন
না। এই ব্যাপারে বাবাৰ সঙ্গে আমাদেৱ পূৰ্বপুঁজৰ কন্দপৰ্মাৱায়নেৰ মিল

আছে।'

ফেলুন উঠে পড়ল। আমিও বুঝতে পারছিলাম যে এই ভদ্রলোকের
সঙ্গে আর কথা বলে কোনও ফল হবে না।

বড় তাই দেবনারায়ণ ছিলেন বাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দায়,
বেতের চেয়ারে বসে। সামনে বেতের টেবিল, তার উপর কোনও বিদ্যার
বাক্ষা। আমাদের অভিবাদন জনিতে ভদ্রলোক বিবার অফার করলেন,
আমরা স্বত্ত্বাবত্তই মাথা নেড়ে না জানালাম।

'আইতেটি ডিটেকটিভ এসপ্লান করা বৃঁধি বাবার প্র্যান ?'

ফেলুন হেনে বলল, 'বোধহৃত তাই, কারণ আর কারুরই শখের
গোমেন্দাৰ উপর আস্থা নেই।'

'এ জিনিস উপন্যাসে ৮লে, খিলেল লাইফে চলে না।'

ভদ্রলোক কথাগুলো বলছেন একেবাবে শুবনো মুখে। সত্তি বলতে
কি, এত গন্তীৰ লোক কমই দেখেছি।

দেবনারায়ণবাবু বললেন, 'আমার ভাইয়ের সঙ্গে জিগ্যেস করবেন
তো ? সেটা অনুমান করেই বলছি, ইন্দুনারায়ণ ছিল আমাদের
পরিবারের কলঙ্ক। আমাকে ক্লাবে অনেক সময়ই লোকে তার কথা
জিগ্যেস করেছে; তার যাত্রা কেমন চলছে, গান পপুলার হচ্ছে কিনা,
সে বেহালা কেমন বাজায়—ইত্যাদি। আমি মাথা হেঁটি না করে কোনও
কথার জবাব দিতে পারিনি। আমাদের আপন ভাই-এর এই দশা হবে
এ আমি স্বত্ত্বেও ভাবতে পারিনি। তার মৃত্যুৰ জন্মেও সে নিজেই দাখী।
তার উপর আমার কেনও সহানুভূতি নেই। আর আপনিও মে তদন্তের
ভাব নিয়েছেন, আপনার উপরেও আমার কেনও সিদ্ধপ্রাপ্তি নেই।
ওকে খুন করেছে যাত্রা দলের শুণ। দে আর জল পোটেনশিয়াল
ক্রিমিয়ালস। আপনি কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন ?'

দেবনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথাও এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

নীচে অসার সময় ফেলুন প্রদৃষ্টিনবাবুকে বলল, 'একটা জিনিস
দেখাব বড় কৌতুহল হচ্ছে আমার; কন্দর্পলারায়শের বিলেতের ভাবাই।
কটি বল ওছে সবশুন্ধ ?'

'দুটো! উনি বিলেতে ছিলেন এক বছরের কিছু বেশি।'

'ওটা সিন-তিনেকের জন্য ধার পাওয়া যাবে ?'

‘নিশ্চয়ই।’

ফেলুন্দা কার থলিতে বই দুটো সিয়ে নিল, আমরা আবার বাড়িয়েখো
রওনা দিলাম।

॥ ৭ ॥

‘কী বুকম মনে ইচ্ছে বলুন তো?’ জালমোহনবাবু প্রথম করলেন এক
মুঠো ডালমুটি ঘূঁথে পুরো।

আমরা বোসপুরুর থেকে ফিরেছি মিনিট পনেরো হল, আৰ্নাথ
সবেমাত্র চা-ডালমুটি দিয়ে গেছে।

ফেলুন্দা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, ‘ক্ষয় অশ্বেরা অশ্বেরাৰ
খাওয়া-খাওয়ি হলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। কিন্তু এখানে তা
হচ্ছে না। বাড়িৰ লোকদেৱ একেবারে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। অবিশ্বি
দু ভাইয়েৰ মেজাজ ছাড়া এখনও তাদেৱ বিশ্ব আৱ বিশ্বে কিছু জানা
যায়নি। দু জনেৰ মধ্যে কাৰুৰ যদি টাকাৰ টানাটানি দেখা দিয়ে থাকে,
তাহলে ছোট ভাই যাকে বাপেৰ টাকা দ্বাৰা পায় সে দিকে সে দৃষ্টি দিতে
পাৰে। কীভিনারায়ণ যদি তাঁৰ ছোট হেলেকে বেশি টাকা দিয়ে থাকেন
তাহলে তো তাঁকে সে তইল চেঞ্জ কৰতে হবে। তাৱ ফলে অবশিষ্ট দু
ভাইয়েৰ ভাগে নিশ্চয়ই দেশি কৰে পড়বে।’

‘আমাৰ কিন্তু মশাই দেক্কনারায়ণকে ভাল লাগল না। এ বুকম একটা
গাঁথোটা লোক সচেতাত দেখা যায় না।’

‘বাড়িতে দেৰে এদেৱ পুৱোপুৱি বিচাৰ কৰা যাবে না। আমাৰ
জনাব ইচ্ছে সক্ষেবেলা তওৰ ক্লাবে শিয়ে কী কৰেন।’

‘সেটা জানছেন কী কৰে?’

‘দুই ক্লাবেই আমাৰ জেনা লোক যেন্নাৰ আছে, বলুন যেলুন। ‘দু
জনেই আমাৰ সহপাঠী ছিল। বেঙ্গল ক্লাবে অলিম্পিয়ে লোক, আৰে
গুটার্ডে ক্লাবে ভাস্কেল দেৱ। দু জনেই বড় চাকুৱে। তাদেৱ ডিস্ট্রিক্ট
ক্লাবেই বলে দেবে।’

‘এই ক্লাবগুলিৰ খালি নামই শুনেছি ভেতৱে যে কী বড় জানিও
না।’



‘আপনার ফুর্তি হ্বার ঘতো তেমন কিছুই নেই। আপনি মদ্য পান
করেন না, তাস খেলেন না, বিলিয়ার্ড খেলেন না—আপনি ক্লাবে গিয়ে
কী করবেন?’

‘তা বটে।’

ফেলুদা আর সময় নষ্ট করল না। প্রথমে বেঙ্গল ক্লাবের মেহর
অনিয়ে সোমকে ফেন করল; অবিশ্যি সাতবার ডায়াল ক্লাবের পর
নব্বর পাওয়া গেল। এক তরফা কথা শুনে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে
পারলাম না; তাই ফেলুদা খুলে বলে দিল।

‘দেবলাল্যাম্বাবু ক্লাবে যান নিয়মিত এবং অধিকাংশ সময় মদ খেয়ে
চুর হয়ে থাকেন। খেলাধূলার মধ্যে নেই, লোকজনের সঙ্গে আড়ত আয়
মানেন না বলেই চলে, লজজনের ক্ষবরের কাগজ নিয়মিত পালেন।
আরেকটা ব্যাপার, ভদ্রলোকের আপিসে গুগুগোল হাতে, শ্রাইক হ্বার
সজ্জাকনা আছে।’

এরপর ফেলুদা তাকে দেবকে ফেন করে একবারে পেরে দেল।
ঝর্নানে শুধু ফেলুদার দিকটা শনেই মৌটিমুটি পুরো ব্যাপারটা আ

করে নিলাম।

‘কে, ভাস্তর কথা কলছিস? আমি ফেলু, প্রদোষ মিত্রিবা?’

‘—’

‘তুই তো স্যাটিরজ্জে ক্লাবের মেম্বার, তাই না?’

‘—’

‘তোমের একজন মেম্বার সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন দরকার ছিল। ইতিমারায়ণ অস্তাৰ্থা।’

‘—’

‘হাঁ হাঁ, যার ভাই খুন হয়েছে। এ লোকটা মানুষ কেমন? তোম
সঙ্গে অলাপ আছে সিক্রিয়?’

‘—’

‘ও বাবা, জুয়াড়ি? হেভি স্টেকসে পোকার খেলে? তার মানে প্রেট
গ্রাস্ট ফান্দারের বাতিকটা খেয়েছে আৱ কি?’

‘—’

‘তুইও খেলেছিস ওৱ সঙ্গে?’

‘—’

‘দেনা বেড়ে যাচ্ছে তাও খেলা থামায়নি? তার মানে তো খুবই দেশা
বলতে হবে।’

‘—’

‘এনিওয়ো, অনেক ৯০০০০ তাই। আমার উপর আবার তদন্তের ভাব
পড়েছে, তাই এদিক সেদিক থেকে তথ্য সংগ্রহ কৰছি। ঠিক আছে—
আসি।’

ফেলুদা কোন সেবে বলল, ‘বোৰো! লোকটা খুন কৰবে কি; বৱং
গুহবিল তছক্রপ কৰলে বুঝতে পায়তাম। দেবোৱ দেনা হয়ে গেছে
তাসের জুয়াতে, অথচ দেখে বোৰোৰ কেনও উপায় নেই।’

লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীবণ একসাইটেড হয়ে পড়লেন।

‘ও মশাই—এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! বাপ না মৰলে তো আৱ
ডেইল থেকে কোনও টাকা আসছে না। টাকার মদি দৱকৱেই হয়
হেলেৱ তাহলে তো এবাৱ কীভিনৱায়গেৱ খুন হণ্ডো উচিত।’

‘আপনাৰ গোয়েন্দাগিৰিতে মাত্ব খুলে যাচ্ছে, লালমোহনবাবু।

আপনি বুব ভুল বলেনকি।'

‘তাহলে তো এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হব।’

‘ভুন।’ ফেলুদা চাহের কাপটা নামিয়ে চেয়ারে এবাটু এগিয়ে বসে বলল, ‘আপনাকে আগেও বলেছি, বুন জিনিসটা অত সহজ নয়। ও বাড়িতে পুলিশ মোতাবেন আছে। একটা বুন ইতিবৰ্ষে হয়ে গেছে ছেট ভাই যে বাবার পর যদি বাবাও বুন হব, তাতে দু ভাইয়ের উপর যে পরিমাপ সন্দেহ বর্তাবে, তাতে তারা কেনওমতেই পার প্যাবে না। এক তো পুলিশ, তার উপর ফেলু মিনিট। তাদের নিজেদের কি প্রাপ্তের ভা নেই? উইলের জন্য যদি ইস্রায়েলিয়কে বুনও করা হয়ে থাকে, বাপকে ধারার কোমও তাজা নেই, কারপ ডম্বলোকের উন্মাদি বছর বয়স, ডায়াবেটিসের রুগ্নী, একটা ট্রোক ইতিবৰ্ষে হয়ে পেছে। ওর আর কুনিন? তবে হ্যাঁ—হরিনারায়নের সংকলে তখনটা জুরি তথ্য। বাড়িতে মানুষটাকে চেন্য যায়নি। আমি জানতাম ফারা গান-বাজনার ভজ্জ তারা সাধারণত কোমল প্রবৃত্তির লেক হয়। এ দেখছি একেবারে অসূচ করিনেশন।’

‘ওই পুরো ফ্যামিলিটাই তো তাই মশাই!'

কথাটা বলে সামনে পড়ে থাকা শিবারের স্টেটস্ম্যানটা হাতে তুলে নিলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদাও চোখ শুরিয়েছিল কাগজটার দিকে, হঠাৎ কী জানি দেখে সে কাগজটা লালমোহনবাবুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর মিনিট ধানেক ধরে পিছনের পাতায় চোখ বুলাল। তারপর কাগজটা হাত থেকে নাহিয়ে রেখে বলল, ‘আই সি।’

মিনিট ধানেক পর আবার বলল, ‘বুবলাম।’

তারপর আরও আর মিনিট পরে বলল, ‘এই ব্যাপার?’

লালমোহনবাবু আর থাকতে না পেরে বললেন, ‘কী বুবলেন মশাই?’

তাতে ফেলুদা বলল, ‘বুবলাম গোবেন্দা হলোও অদ্বার জ্ঞান কষ্ট সীরিত। বুবলাম এবনো আমার অনেক কিছু শেখার আছে।’

ফেলুদা হবন রহস্য করতে চাব তার জাল ভেদ করে এমন সাধ্য কারুর নেই। কাজেই ও যক্ষম মিনিট ধানেক পরে বলল, ‘আজ একটা

নতুন অভিজ্ঞতা হবে', তখন বুবালাম এটাও রহস্যেরই একটা অঙ্গ।

‘কী ব্যাপার?’ লালমোহনবাবু ব্যাধীতি জিজ্ঞাস করলেন।

‘আজ আমরা তিন জনেই বেসের মাঠে যাচ্ছি।’

‘সে কি? বেসের মাঠে? কেন যশাই?’

‘এটা আমার অনেক দিনের একটা শখ। আজ বিকেলটা আমরা ক্রি আছি। কলকাতার এমন একটা আকর্ষণ ঘটনা বটে চলেছে প্রতি শনিবার দেই কত কাল থেকে, কিন্তু আমরা তার ধারে-পাশেও যাব না এটা যোটেই ঠিক নয়। অন্তত একবারের জন্য সব রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকা ভাল।’

‘এ কথাটা আমারও অনেক দিন মনে হয়েছে যশাই’, চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলশেন লালমোহনবাবু। ‘আমলে ব্যাপারটা কী জানেন, সেনা কেউ যদি দেখে ফেলে ঝুঁঝাড়ি ভাবে, এইখনেই আঘাদের সঙ্গে।’

‘এবারে সেটা কেনও সজ্ঞাবন্ন নেই।’

‘কেন?’

‘কারণ আমরা তিনজনেই যাব ছিলবেশে।’

লালমোহনবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

‘ওঁ, দুর্মিঞ্চ ব্যাপার যশাই! আমাকে একটা ফ্রেঞ্চকচি দাঢ়ি দিতে পারবেন?’

‘আমি মনে মনে তাই ভাবছিলাম।’

‘গ্রেট!’

মেক-আপে ফেলুদার ঝুঁড়ি নেই সেটা আমেও বলেছি, কিন্তু এত দিন শুধু তুর নিজের মেক-আপই দেখেছি, এবার ও আমাকে আর লালমোহনবাবুকে যেভাবে মেক-আপ করল তাতে আঘানায় নিজের চেহারা দেখে নিজেরাই হ্রকচকিয়ে গেলাম। লালমোহনবাবুকে ফ্রেঞ্চ-কাট দাঢ়ি আর কেউ খেলামো চুল, আর আমার গৌঁফ দাঢ়ি আর পার্ক স্টিট-মার্ক বাঁকড়া চুলের কোনও তুলনা নেই।

ফেলুদা নিজে একটা চাড়া দেওয়া মিলিটারি গৌঁফ লাগিয়েছে, আর একটা পরচুলা পরেছে বাতে মনে হয় চুপটা ছেটে করে ছাঁটা। এই সামান্য ব্যাপারেই খুর চেহারার আকাশ পাতাল তফাত হয়ে গেছে।



রেসের ঘাটে যে কোনওদিন যাৰ সেটা ভাবতে পাৰিনি। রাস্তার ভিত্তিৰ থেকে রাজা মহারাজা অৰাধি সবাই যদি কোথাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই জায়গায় জমাহেতু হয় তো সেটা হল রেসের ঘাট। এমন দৃশ্য কলকাতা শহরে আৰ কোথাও দেখা যাব না, কোথাও দেখাৰ সন্তুষ্ণনাও নেই। একমাত্ৰ রেসের ঘাটই মুড়ি মিছৰি এক দৰ।

যোড় দৌড় এখনও শুন্দি হয়নি, আমৰা এদিক সেদিক দুৱে বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় একটা বেড়ায় দেৱা ঘাটের মধ্যে যে সব যোড়া রেসে দৌড়বে তাৰে ঘুৰিয়ে দেখানো হচ্ছে। ফেলুদা বলল জায়গটাকে বলে প্যাডক। আৱেকটা জায়গা—যেখানে একটা একতলা বাড়িৰ গাঁও সাব সাব জানালা, সেখানে বেটিং রেস কৰা হচ্ছে। সকলোৱ মতো আমৰাও একটা কৰে রেসের বই কিনে নিয়েছি। অভিনয় ভাল হবে বলে সালমোহনবাবু সেটা ভয়ংকৰ মনোযোগেৰ সঙ্গে পাতা উলটে দেখছেন।

আমৰা ছিলাম সব কুকু আধ ঘটা। প্ৰথম রেসটা দেখলাম, লোকদেৱ যৰিয়া হয়ে যোড়াৰ নামে ধৰে চিংকাৰ কৰা শুনলাম, তাৰপৰ ফেলুদা হঠাৎ এক সময় বলল, ‘যে প্ৰয়োজনে আসা সেটা যথন ছিটে গোছে তখন আৱ বৃথা মেক-আপেৰ বোৰা বয়ে কী জান?’

কী প্ৰয়োজনেৰ কথা বলছে জানি না, জিশ্বেস কৰলোও উপৰ পাৰ এমন ভৱসা নেই, তাই আমৰা তিন জন বাইৱে বেঁয়িয়ে এসে সালমোহনবাবুৰ গাড়ি ধূঁজে বাব কৰে তাতে চেপে কসলাম।

॥ ৮ ॥

গুৰিশৰ সকালে দায়োগা মণিলাল পোদ্বাৰেৰ ফোন এল। বললেন, ‘কিছু এগোলেন।’ ফেলুদা বলল, ‘আগে মানুষগুলোকে জেনাব চেষ্টা কৰছি, নইলে এগোত্তে পাৰব না। বেশ ভাট্টি কেস বলে হনে হচ্ছে।’

মণিলালবাবুৰ কথা বেকে জানা গেল যে আৱ একবাৰ আচাৰ্য বাড়িতে ভাক্কাত পড়লৈ উনি আশৰ্য হবেন না। প্ৰথমবাৰ তো কুনই কৰেছে, কোনও জিনিস তো নেচনি; খৰ ধাৰণা যাবাৰ যে দণ্ডটা খুন

করিয়েছে তারা ইন্দুনোয়ায়ণবাবুর অন্য নাটক আর গানগুলোও হাতাবার চেষ্টা করবে। বোসপুরুর কাছেই একটা গলি আছে, যাই পরামর্শিক লেন, সেটা নাকি নটোরিয়াস গুপ্তদের অঙ্গ। তা ছাড়া এটাও গণিলালাবাবু সন্দেহ করছেন যে অচার্য বাড়ির বেংগারা সঙ্গীয়ের সঙ্গে হয়তো এই শুভাদলের বোধনোজ্ঞ আছে।

ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি বাড়ির পিছনের যদু নশ্বরের গলিতে পুলিশ পাহারা রাখছেন ?'

'আ রাখা হচ্ছে বৈকি,' বললেন পোল্যারমশাই।

'তেমন দ্বিবার হলে এক বার অস্তু এক রাতের জন্য তুলে নেওয়া যেতে পারে কি ?'

'আপনি কি গুপ্তদের প্রলোভন দেখাতে চান ?'

'ঠিক তাই।'

'আ বেশ। আপনার অযোক্ষণ হলো বলবেন, আমরা পাহারা সরিয়ে নেব।'

পোল্যার মশাই-এর ফোনটা এসেছিল সাড়ে সাতটার সময়। তার পরেরো মিনিট পরেই ফোন করলেন প্রদুষ্যবাবু, বললেন আবু ঘন্টা থেকে নাকি চেষ্টা করছেন। ব্যাপার কুর্তুর। গতকাল রাতে বারেটার সময় নাকি চোর এসেছিল অচার্য বাড়িতে। ইন্দুনোয়ায়ণবাবুর ঘরে তুকেছিল নিশ্চয়ই কোনও চাকরের সহায়ে, করেন পিছনের গণিতে পুলিশ পাহারা আছে। একটা শব্দ পেয়ে প্রদুষ্যবাবু নাকি তাঁর কাজের খর থেকে বেঁচিয়ে আসেন বারপ্সার। তাতে চোরটা পালার। প্রদুষ্যবাবু দোড়ে গিয়ে লোকটাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে খাড়া দিয়ে প্রদুষ্যবাবুকে মাটিতে ফেলে দেয়। ফলে ভদ্রলোকের হাঁটুতে চোট লেগেছে, উনি নাকি ঝুঁঁচিয়ে হাঁচিস্তেন।

ফোন রাখার পর ফেলুদা বলল, 'এখন সত্তিই মনে হচ্ছে ওর কাগজপত্র সরাবার উদ্দেশ্যেই ইন্দুনোয়ারণবাবুকে খুন করা হয়েছিল। যে লেখকের নাটক আর গানের এত চাহিদা, সে পাঁচ-পাঁচ খালা নাটক আর পনের-বিশ খনা গান লিখে রেখে যাবে, আর তার উপরে চোখ পড়বে না অন্য যাত্রা দলের ? অবিষ্টি নিয়ম মতে এই সব গান আর নাটক ভারত অপেরারই প্রাপ্তি। তারা যাতে না পায় সেই জন্যেই

এগুলো হাতাবার এত উদ্যোগ।'

আরি বললাম, 'অন্য যাত্রার দল থিই ইন্দ্রনারায়ণের এই সব গুলি আর নাতিকের কথা জেনে থাকে, তাহলে সে কথা নিশ্চয়ই ইন্দ্রনারায়ণ নিজেই বলেছেন। তার মানে তিনি ভৱত অপেরার প্রতি যতটা লয়েন ছিলেন ভাবছিলাম, আগলে হয়তো ততটা ছিলেন না। সত্যই হয়তো তিনি অন্য দলে যাবার কথা ভাবছিলেন।'

'কিন্তু আহলে খুনটা বন্দল কে এবং কেন ?'

হয়তো বীণাপাণি অপেরাকে ইন্দ্রনারায়ণ কথা দিয়েছিলেন, তাই আর একটা দল সে পথ বন্ধ করেছে।'

ফেলুদা গঙ্গীরভাবে মাথা নেড়ে আমার কথায় সাম দিল। সত্য, এখনও পর্যন্ত রহস্যের কোনওই কিনারা হল না।

ফেলুদা গঙ্গীরভাবে মাথা নেড়ে আমার কথায় সাম দিল। সত্য, এখনও পর্যন্ত রহস্যের কোনওই কিনারা হল না।

ফেলুদা তার বিখ্যাত সবুজ খাতা খুলে কি হেন শিখতে শুরু করল। আজ সকাল থেকেই তাকে ভীষণ সিরিয়াস দেখছি। কী যেন একটা নতুন চিকিৎসার মাথায় এসেছে সেটা বুঝতে পারছি না।

ন-টার সময় বধারীতি লালমোহনবাবু এসে হাজির হলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনার মিউজিক এন্সেইক্লোপিডিয়াটা আরও দু-চার দিন রাখছি।'

'দু-চার দিন কেন, দু-চার মাস রাখলেও কোনও আপত্তি নেই।'

অনেক কিছু নতুন জ্ঞান অর্জন করছি বইটা থেকে। মেলভি, হারমনি, পলিফনি, কাউন্টার-পয়েন্ট—অনেক কিছু জানা গেল। মিউজিকের ইতিহাসেও দেখছি রহস্য রয়েছে—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্পোজার মোৎসার্টকে নাকি আর এক কম্পোজার সালিহেরি বিষ খাইয়ে হত্যা করেন। অথচ এই জাইমের কোনও কিনারা হ্যানি।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু আজ আমাদের প্ল্যানটা কী ?'

'আচার্য বাড়িতে নাকি কাল আবার ডাকাত পড়েছিল, কিন্তু প্রদুষবাবুর তৎপরতার জন্য সে কিছু করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস রাখিবে ও বাড়িটাকে একটু ঢাঁকে ঢাঁকে রাখা ভাল।'

'রাতিরে ?'

‘হ্যাঁ। এই ধরন সাড়ে এগারোটা থেকে তরুণ করে একটা দেড়টা পর্যন্ত।’

‘সেটা কি করে সম্ভব হচ্ছে?’

‘বাড়ির উত্তর দিকের গা ঘেঁষে গলি গেছে। উত্তর দিকেই পিছনের দরজা। ধরুন যদি সেই গলির ফুটপাথে বসে থাকা যায় বাড়ির দিকে চোখ দেখে।’

‘ফুটপাথে বসে থাকা? তিনজন ভদ্রলোক ফুটপাথে বসে থাকবেন আর রাস্তার লোক সন্দেহ করবে না?’

‘তা করবে না যদি তাদের আর ভদ্রলোক বসে না মনে হয়।’

ফেনুদার ফ্যানটা শুনে মাথা ঘূরে গেল। বোবাই যাচ্ছে ও আবার হ্রস্ববেশের কথা বলছে। কিন্তু কী হলুবেশ? উত্তরটা ফেনুদাই দিল।

‘আপনি কি তাস একেবারেই খেলেননি?’ লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করল ফেনুদা।

‘কু খেলতুম এক কালে, আর গোলাম চোর...।’

‘যাই হোক, তাস চেনেন তো? গোলাম দেখলে সাহেব বলে ভুল হবে না তো, আর চিড়িজন দেখলে ইঞ্চাপন?’

‘পাগল।’

‘তাহলে তিনজন পাস হরিপুরবাবু মিলে টোয়েন্টি-াইন খেলব। উৎকলবাসী চারজন চাকর হচ্ছে যাব আমরা। মেক-আপের ভার অবিশ্য আমার উপর। মেহাতই কথা বলার দরকার হলে বল। হবে, আর তখন অকরান্ত শব্দ হস্ত দিয়ে শেষ করা চলবে না। অর্থাৎ তাস হবে ‘ভস্ম’, সাহেব হবে ‘সাহেবস’। বুঝেছেন?’

‘বুঝেছি মিস্টারঅ মিডিরঅ।’

লালমোহনবাবু চোখে একটা ভাসা ভাসা চাহনি দেখে বুঝতে পারলাম তিনি খেল একটা অ্যাডভেক্টরের গুৰু পাছেন। আমি অবাক ভাবটা এখনো কঢ়িয়ে উঠতে পারিনি, তবে এটা বুঝেছি যে তদন্তটো কেশ জয়ে উঠছে।

লালমোহনবাবু বারোটা নাগাদ খাবার সময় বলে গেলেন আবার সক্ষা সাতটায় আসবেন, আমাদের বাড়িতেই আবেন। তারপর আমরা এখন থেকেই মেক-আপ নিয়ে এগারোটা মাগাত চলে যাব যদু সন্ধর

জেনে। গলিটা দেখে নিরিবিলি বলেই মনে হয়েছে, একটা লাম্প পোস্ট দেখে তার নীচে চাদর বিছিয়ে থাসে খেললেই চলবে। হরিপদবাবু তাঁর বাড়ি থেকে এক প্যাকেট পুরনো তাস এনে দেবেন বলেছেন। খেলটা সম্ভ্যাবেনাই লালমোহনবাবুকে মোটামুটি শিখিয়ে নেওয়া হবে।

ফেলুনার উৎসেজনা থাকলেও বোবার উপায় নেই, সে সারাদিন মিউজিক এন্সাইক্লোপিডিয়া পড়েছে। আর আমি প্রতিকার পাতা উলটোছি।

এই মেক-আপটা সহজ ছিল, তাই আমরা অন্যায়াসেই সাড়ে দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ধুতিশুলোকে চায়ের জলে ভিজিয়ে একটু ময়লা করে নিয়েছিলাম, চাদর আর তাস—দুটোই মোক্ষম এনেছিলেন হরিপদবাবু। লালমোহনবাবুকে টোয়েটি-নাইল শিখিয়ে দু হাত খেলে নেওয়া হয়েছে, ভদ্রলোক বালি যানে মনে বিড়বিড় করে চলেছেন—গোলাম নহলা টেক্কা দশ সাহেব বিবি আট সাত।

গাড়িটাকে বড় রাস্তায় অঙ্ককারে একটা জ্বায়গায় পার্ক করে আমরা চাইজন চাদর বগলে নিয়ে যদু নকশার লেনে শিরে হাজির হলাম। অন্যদিন এ রাস্তায় পুলিশ থাকে, অজ্ঞ ফেলুনার অন্যোন্য নেই। রাস্তার এক পাশে একটা বিরাট জ্বায়গা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আচার্ধদের বাড়ি। উত্তর দিকের অন্তর্গত পিছন দিকটা রাস্তার উপর পড়েছে, তার মধ্যে বাঁ দিকে, অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণে, প্রথম হল লাইব্রেরি, আর তার পরেই হল প্রদ্যুম্ববাবুর শোবার ঘর। ঘরের সারির শেষে হল বাড়ির পিছনের দরজা, সেটা এখন বন্ধ। লাইব্রেরি আর প্রদ্যুম্ববাবুর ঘর দুটোতেই বাতি ঝুলছে, তবে ভদ্রলোক যে কোন ঘরে বসেছেন সেটা রাস্তা থেকে বোবার কোনও উপায় নেই।

আমরা চার জনে লাম্প পোস্টের তলায় চাদর পেতে বসে গোলাম। ফেলুনা তার গায়ের চাদরের তলা থেকে একটা প্যানের ডিবে বার করে তার থেকে চার জনকে চারটে পান দিয়ে লালমোহনবাবুকে বলল, ‘গালে উঁজে রেখে দিন; আর বার বার পিক ফেলকেন না।’

আচার্য বাড়ি থেকে যোৎ হয় প্রাক্কান্দার ঝাকে এগারোটা বাজাতে শোনা গেল।



‘উদ্বিশত্তি’

লালমোহনবাবু ফেলুদাৰ প্রাণীৰ হয়েছেন, এখন ডাকাডাকি চলছে। ফেলুদা সঙ্গে এক প্যাবেন্ট বিড়ি এনেছে। তাৰ থেকে একটা হরিপদবাবুকে দিয়ে নিজে একটা ধৰিয়ে নিল। দিশ ফুটোৰ বেশি চওড়া গলি নম্বৰ, আৱ তাতে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। ও পাশে বিছু দূৰে একটা রিকশা দাঁড় কৰানো রয়েছে, তাৰ চালকটা ঘুমিয়ে কানা। আজ যোধ হয় অম্বাবস্যা, কাৰণ আকাশে মেঘ না থাকলেও বেশ ঘুটঘুটে। মাথাৰ উপৱ কালপুৰুষ দেখা যাচ্ছে।

‘তুরপত্তি মাঝটি কৈই?’

লালমোহনবাবু উড়িয়া ভাৰা বলতে চেষ্টা কৰে একটু বাড়াড়ি কৰছেন, তই ফেলুদা একটা ‘উঁ’ শব্দ কৰে ওঁকে সতৰ্ক কৰে দিল। আকৰ্ষণ্য এই যে যদিও আমাদেৱ প্ৰধান উদ্দেশ্য সময় কাটানো, টোয়েন্টি-নাইন বেলাটা এমনই যে এৱই মহে বেশ জয়ে উঠেছে। সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে টেইহ পাছি না। আচাৰ্য বাড়িতে একটা দু শব্দ পেছে সাড়ে এগ্যারোটা বেজেছে বুৰে বেশ অবাক জাগল। ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু একটা বিড়ি ধন্নাবার চেষ্টা কৰে বিশেষ যুৎ কৰতে না পোৱে স্টো আবাৰ ফেলে দিয়েছেন।

একটা কুকুৰেৰ ভাকে আৱ একটা সাড়া দিয়েছে এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ আমাৰ হাঁটুতে একটা হাত ঝাঁকল।

একটা লোক আসছে গলিৰ পশ্চিম দিক থেকে। পৱনে খুড়ি পাঞ্চাবি, তাৰ উপৱ একটা হেয়ে রংকেৰ চাদৰ জড়ানো। চাদৰ আমাদেৱ গায়েও আছে, কাৰণ অক্ষোবন মাসেৱ গাড়িতে বেশ চিনচিনে ঠাণ্ডা।

লোকটা আমাদেৱ ছাড়িয়ে চলে গোল খন্দ ফুটপাথ দিয়ে। সে হাঁটছে আচাৰ্য বাড়িৰ গা বেঁষে।

এবাৰ সে দৱজাৰ কাছাকাছি পৌছে হাঁটিৰ গতি কমাই;

তাৰপৰ দৱজাৰ সামনে এমে থামল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্...

তিনটে মদু টোকা দৱজাৰ উপৱ। কৰন পেতেছিলাম কলে শব্দটা শুনতে পেলাম। দৱজাৰ কুলে গোল। অঞ্চ ফাঁক, হিক বাতে একটা মানুষ

চুক্তে পারে। মানুষটা চুক্তে গেল। যে চুক্তি তাকে আমরা তিনি জনেই চিনি।

ইনি হচ্ছেন বীণাপাণি আপেরার ম্যানেজার অধিনী ভড়।

ঘড়িতে ১১ ১৫ করে বারোটা বাজল।

অর্থাৎ অধিনীবাবু চোকার পর পনেরো মিনিট হয়ে গেছে।

এবার ভদ্রলোক বেরোলেন। তার সঙ্গে যদি কিছু পেকে থাকে তো সেটা বোঝারা কেনও উপায় নেই, করণ হাত দুটো চাদরের নীচে।

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেদিক দিয়েই আবার চলে গেলেন।

আমাদের পাহারা সার্বক এবং শেষ। 'এই দমটা খেলে উঠব', ফেলুন কিস করে বলল।

॥ ৯ ॥

পরদিন সকালে ফেলুনা বোসপুকুরে ফোন করল প্রদ্যুম্ববাবুকে। আমি বসবার ঘরে ফেল টেলিফোনে কান লাগিয়ে কথা শুনলাম।

'কে, মিস্টার মলিক ?'

'হ্যাঁ, কী খবর ?'

'কাল গাত্রে কিছু হয়লি তো ?'

'কই, না তো !'

'এক কাজ করুন, আমি ফোনটা ধরছি, আপনি একবার ইন্দুনেরায়পবাবুর কাজের ঘরে গিয়ে দেখে আসুন তো সব ঠিক আছে কিমা।'

আব মিনিটের বেশি ধরতে হল না। এবারে প্রদ্যুম্ববাবুর গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে।

'ও মশাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে !'

'কী হল ?'

'সব নতুন নাটক আর গান হাঁওয়া !'

'আমি আন্দাজ করেছিলাম বলেই ফোন করলাম।'

'এস মানেটা কী ?'

‘অন্য রহস্যগুলোর সঙ্গে আর একটা ঘোষ হল।’

‘আপনি কি আজ একবার আসছেন?’

‘প্রদ্রোজন হলো যাব। তার আগে দারোগা সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।’

ফেনটা রেখে ফেলুন মণিলাল পোদ্দারের মন্তব্য শোয়াল করল।

‘শুনুন মি. পোদ্দার, পলি থেকে আপনার লেক সরিয়ে নেবোর জন্য ধন্যবাদ। কাল সত্ত্বাই কাজ হয়েছে। আপনি অশ্বিনীবাবুর দিকে দৃষ্টি রাখছেন তো? উনি কিন্তু কাল রাত বারোটায় আচার্য বাড়িতে পিষে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বহুমূল্য সব কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন।’

‘লোকটা খুব খেলমেলে’, বললেন মি. পোদ্দার। ‘খুনের টাইমের জন্য এর কোনও অ্যালিবাই নেই। সেদিন রাতে আচার্য বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরেনি। বলছে পথে ট্যাক্সি বিগড়ে যায় বলে আটকে পড়েছিল, কিন্তু সেটা বিষ্ণুসংযোগ নয়। আপনার প্রোগ্রেস কেমন?’

‘স্টেটমুটি ভালোই। অবিশ্য আমরা তো ঠিক এক রাস্তায় চলছিন, তাই আমার সিদ্ধান্তগুলো আপনার সঙ্গে ছিলবে না।’

‘তা না মিলুক। যে কোনও রকমে রহস্যের সমাধান হলোই হল।’

ফেলুন ফেন রাস্তায় চলছে সেটা জানতে চাইলে উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আর আমি শুধিকে গেলাম না। ফেলুন ফেন রেখে বলল, ‘আমি একটু বেরোচ্ছি। স্টেটসম্যানের পার্সেনাল ক্লায়ে একটা জরুরি বিষ্ণাপন দিতে হবে। একটা ভাল বেহালার দরকার।’

স্টেটসম্যানে প্রদিনই বেরোল যে একটা উৎকৃষ্ট বিদেশী বেহালার প্রয়োজন, অমুক বল্ব নাখারে লিখে খবর জানালো হোক।

এই বিষ্ণাপনের উত্তর এসে গেল দু দিনের মধ্যে। চিঠিটা পড়ে ফেলুন বলল, ‘আমাকে একটু লাউডন ট্রিটে যেতে হচ্ছে, বিশেষ দরকার।’

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে ফেলুন বলল, ‘বেজাৰ দাম চাইছে।’

আমি বললাম, ‘এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে তোমার কি এই বয়সে বেহালা শেখার স্বত্ত্ব হল?’

ফেলুন গাত্তীরভাবে বলল, ‘ইট ইজ মেন্টার টু সেট টু লার্ন।’

ঘর্থং আরও রহস্য।

এদিকে লালমোহনবুরু ঘন ঘন আসছেন আর ছটিট কয়ছেন। একবার আমায় একা পেছে বললেন, 'তেমনির দাদার সব ভাল তবু এক এক সময় চুপ মেরে ঘাওয়ার ব্যাপারটা ঘোটেই করবাস্ত করা যাব না।'

বুধবার পার্সেনাল বলাছে বিজ্ঞাপন ঘেরিয়েছিল, শুক্রবার উভয় পেছে ফেলুন জাউড়ন ছিটে শিয়েছিল, শনিবার সকালে দেখি ওর চেহারা একদম পালটে গেছে। শুশ শুশ করে গান গাইতে গাইতে বলল, 'আজ আচার্য বাড়ি যেতে হবে, কীর্তিনারায়ণকে এখনি ঘোন করা দরকার।'

কীর্তিনারায়ণ ঘোন পেছে বললেন, 'আপনার কাজ কি ঘটে গেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে', বলল ফেলুন, 'তবে সেটা সম্পূর্ণ মিটিবে একটা মিটিং করে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললে পরে। আর সেই কলাটা বলতে হবে সকলের সামনে। অন্তত আপনি, আপনার দুই ছেলে, আর প্রদুষবাবুকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।'

'সেটা আর এমন কঠিন কী? এরা তো সবই খাড়িতেই আছে। সে ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি চিন্তা করবেন না। কটায় আসছেন?'

'এই ধরন দশটা।'

কীর্তিনারায়ণের পর মণিলাল শোভারকে ঘোন করে ফেলুন দশটায় বোসপুরুরে আসতে বলল।

লালমোহনবুরু এলেন নটায়, আমরা সাড়ে নটায় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আচার্য বাড়িতে পৌছে দেখি দারেন্স সাহেব এসে গেছেন। ফেলুন বলল, 'আজই পটুনার ঝাইয়াজ, অন্তএব আপনার থাকার প্রয়োজন।'

দেওলায় যে বৈকল্যান্ত প্রথম দিন কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আজও সেখানেই ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তিনারায়ণে এসে গেলেন।

'কই, এদের সব ভাকো, প্রদুষ।'

প্রদুষবাবু বেরিয়ে গেলেন তুই হেলেকে ভাকতে।

তখনে এলেন দেবনারায়ণবুরু, যার এসেই বললেন, 'পুরিশ তো আমের দুর এপিয়েছে বলে শুনেছি, তাঁর আবার এই খন্দে...করু

বক্তৃতা বলতে হচ্ছে কেন ?

ফেলুদা বলল, 'পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এগিয়েছি, কিন্তু সেটা একটু অন্য পথে। আর মার্ডারি ইজ নট দ্য ওমলি গ্রাইব কম্পানিতে ইন্দিরা কেস—সেটাও আপনাকে জানানো দরকার। আমি পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করব।'

ইংরেজিতে যাকে বলে 'গ্রাউন্ট', সেই রকম একটা শব্দ করে দেবনারায়ণবাবু চুপ করে গেলেন। আসলে উদ্ধৃতোকের মুখে অষ্টপ্রহর পাইপ থাকে, বাপের সামনে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে বোধ হয় উনি আরও বাঁচা হয়েছেন।

হরিনারায়ণবাবু এসে কোনও তথ্য করলেন না, কিন্তু তাঁর অঙ্গুষ্ঠি দেখে বুঝলাম যে তিনিও ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না।

সকলে উপর্যুক্ত দেখে ফেলুদা আবস্থ করল।

সাড়ই অষ্টোববর রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য খুন হন। তাঁকে খুন করে কী লাভ হতে পারে এইটে বিচার করার সময় আমরা জানতে পারি যে তিনি ছিলেন তাঁর বাপের প্রিয় পুত্র। অনুমান করা যাব কে কীর্তনারায়ণের উইলে তাঁর ছেলের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাবে, এবং সেই ছেলে বা থাকায় সে উইল বদল হবে। এই বদলানো উইলে তাঁর অন্য দুই ছেলের প্রাপ্তি বেঁচে গেলেও, যতদিন কীর্তনারায়ণ বেঁচে আছেন ততদিন তাঁরা এই টাকা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ তাঁকে খুন করে তাঁদের ইমিডিয়েট কোনও লাভ নেই।

আর একটা তথ্য আমরা জানতে পারি সেটা এই যে বীণাপাণি অপেরা ইন্দ্রনারায়ণকে ভারত অপেরা হেডে তাদের দলে যোগ দেবারে জন্ম দেবাল্ল দেবাছিল, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ তাতে ব্রাঞ্জি হন নি। এই অবস্থায় ভারত অপেরাকে পদ্ধু করার জন্য ইন্দ্রনারায়ণকে খুন করার একটা কারণ থাকতে পারে। এ কাছটা বীণাপাণি অপেরা গুণ লাগিয়ে করতে পারে। খুনের দিন বাত এগারেটি পর্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণের দঙ্গে বেশী বলেন বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অফিসী ভড়। তিনি চলে যাবার স্থানেক পরে খুনটা হ্রস্ব।

'এখানে বাত একটা তথ্য আমাদের খুব কাজে লাগে। আমরা

লীনার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ইন্দুনারায়গের কাছে তাঁর লেখা পাঁচটি নতুন নাটক ও খান কৃতি গান ছিল। যাত্রার বাজারে যে এ জিনিসের দাম অনেক সেটা আর খলে দিতে হবে না। আমরা জানি যিনি ইন্দুনারায়শকে খুন করেছিলেন তিনি ইন্দুনারায়গের কাগজপত্র ঘটিঘাটি করেছিলেন, কিন্তু সময়ের অভাবেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, তার কিছুই সরাতে পারেননি। গত কল রাতে বীণাপাণি অস্পেরার ভালেজার এসে নাটক আর গানগুলো নিয়ে গেছেন।

‘তাহলে অনুমতি করা যায় যে খুনের একটা উদ্দেশ্য হতে পারে এই নাটক আর গানগুলি হাতে করা। এ কাজ কিন্তু বাহিরের লোকের পক্ষে সহজ নয়। কারণ ইন্দুনারায়গের কাগজপত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকার সংস্কার কম। ঘরের লোকের পক্ষে এ খবর জানা অসেক বেশি স্বাভাবিক। ঘরের লোক যদি খুনের সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো নাও নিতে পারেন, তার অন্য পক্ষে সময় পেতে কোনও অসুবিধা নেই, কারণ কাগজগুলো থেকেই যাচ্ছে। এখানে আমদের দেশ দরকার বাড়ির কোনও লোকের টাকার টানতিনি যাচ্ছিল বিনা।

‘এ ব্যাপারে খৌজ নিয়ে জানতে পারি যে হরিনারায়ণবাবু সম্পত্তি তাঁর ক্লাবে দেশি টাকার জুয়া খেলে অনেক লোকসান দিয়েছেন। কিন্তু তাহলেও হরিনারায়ণবাবুর পক্ষে ইন্দুনারায়গের নাটক আর গান চুরি করে সেগুলো অন্য স্বত্ত্ব দলে বিক্রি করাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। তাহলে আর কে অভাবী ব্যক্তি আছেন বাড়িতে?’

‘এখানে অক্ষয়াৎ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করার ঘটনা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই।

‘প্রদুষণবাবু যে দিন আমার বাড়িতে আসেন সে দিন তাঁর পক্ষে থেকে এক টুকরো কাগজ আমদের সোফাতে পড়ে যায়। এই কাগজে ডট পেন দিয়ে দু লাইন কথা লেখা ছিল—“হাপি বার্থডে” আর “হ্রস্ব চাঁদ”। প্রদুষণবাবুকে জিগ্যেস করাতে উনি বলেন কাগজটা তাঁর না। এর কিছু দিন পরে হঠাত শনিবারের কাগজের শেষ পাতায় একটি নামের তালিকা থেকে জানতে পারি যে হ্যাপি বার্থডে আর হ্রস্ব চাঁদ মুটোই হল রেসের ঘোড়ার নাম। তবু আমার ধারণা হয় যে, প্রদুষণবাবু রেস থেকেন, কিন্তু সে তত্ত্ব আমদের কাছে গোপন রাখতে চান।

আমরা সে দিনই রেসের ঘাটে থাই। সেখানে আমি প্রদুষবায়ুকে দেখি ভিড়ের মধ্যে জানানার সামনে দাঁড়িয়ে বেটিং করতে। অর্ধে প্রদুষবায়ু যে জুড়ড়ি সেটা প্রমাণ ইয়ে থাই। আমার ধারণা যাই নিম্নমিত রেস খেলে এবং যাদের রেজিস্ট্র স্থুব বেশি নয়, তাদের সব সময়ই টাকার টানটানি হয়। সুতরাং রেসে যদি বড় বকম হাব ইয়ে থাকে তাহলে খুলের মোটিভ প্রদুষবায়ুর ছিল, এবং সেই সঙ্গে সুযোগও ছিল। তিনি এলতে কি, তার চেয়ে বেশি সুযোগ এ বাড়ির কারস্র ছিল না। খুলের সময় প্রদুষবায়ু কাজ করছিলেন, তাঁর পক্ষে নাটমন্দিরের বারান্দা দিয়ে এসে ইন্দ্রনারায়ণের ঘাথের বাড়ি থেরে কাজটা করা ছিল অত্যন্ত সহজ বাপার।

‘প্রদুষ ময়িকের অবস্থাটা আরও তিলে হয়ে যায় এই কারণেই যে তিনি হলেন মিথ্যেবাদী। তিনি শুধু রেসের ব্যাপারেই মিথ্যে বলেন নি, তাঁর মতে কমিন আসে এ বাড়িতে আবার তোর আসে এবং সে তোরকে বাধা দিতে গিয়ে তিনি ধাক্কা খেয়ে ঘাটিতে পড়ে হাঁটুতে চোট পান— যার ফসে তাঁকে নাকি খৌজতে হল্লে। কিন্তু আজ সকালে তিনি অন্তত দু বার হাঁটার সময় খৌজাতে ভুলে গেছেন সেটা বোধহ্য তিনি নিজে খেয়াল করেননি।’

‘গত রবিবার রাত্তিরে ইন্দ্রনারায়ণের ঘর থেকে নটিক ও গানগুলি চুরি যায়। সেগুলো কার হাতে গেছে আমরা জানি, কারণ আমরা তখন বাড়ির পিছনের গালিতে লাম্প পোস্টের আলোট বসে তাস খেলছিলাম। বীণাপালি অপেরার ম্যানেজার আসেন পৌনে বারোটায়। তাঁকে বাড়ির পিছনের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রদুষবায়ুর ঘরের বাতি ঝলছিল। আমাদের ধারণা তাঁর সঙ্গেই হয় সেনদেরটা। অশ্বিনী জড় টাকা দেন, প্রদুষবায়ু তার বিনিময়ে তাঁকে নটিক ও গানগুলো দেন। যদি আমি ভুল বলে থাকি তাহলে প্রদুষবায়ু আমাকে শখের দিতে পারেন।’

প্রদুষবায়ুর দুখ ক্যাকাশে, মাথা হেঁট, শরীরে কাঁপুনি। দারোগা সাহেব এগিয়ে গিয়ে তাঁর টিক পিছনেই দাঁড়িয়েছেন, যের কানেছে আরও দু জন কলস্টেবল।

‘এই হল ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য খুনের ইতিহাস’, বলল ফেলুন।। কিন্তু

এখনেই অপরাধের শেষ নয়। এবার আমি দ্বিতীয় অপরাধে আসছি।

‘আমি প্রথম দিন যখন এ বাড়িতে আসি তখন একটা ব্যাপার দেখে আমার একটু খটকা লেগেছিল। সেটা হল ইন্দুনারায়ণবাবুর বেহালা। একশো বছরের পুরোনো বেহালা এত বক্রবাকে হৃথ কী করে? অবিশ্য আমার বেহালার অভিজ্ঞতা কম, কত বছরে তার কী রকম চেহারা হয় সেটা আমার জ্ঞান নেই, তাই ব্যাপারটা নিয়ে কখন আব যাথা যামাইনি। সে দিনই অবিশ্য শুনেছিলাম যে কন্দর্পনারায়ণ ভুসিকতা করে তাঁর বেহালাকে বলতেন আম আঁটির ভেঁপু। সংগতি দুটো জিনিস পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। এক হল পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে এক এনসাইক্লোপিডিয়া আর দুই হল কন্দর্পনারায়ণের বিলেভের ডায়ারি। প্রথম বই থেকে আমি জেনেছি যে বোড়শ ও সন্তুষ্য শতাব্দীতে বেহালা বা যত্ত্বের সংস্কার হয় ইতালিতে। তখন থেকে বেহালার চেহারা এবং আওয়াজ পালটে আরও সুন্দর ও আরও জোরালো হয়। ইতালির বেহালা প্রস্তুতকারকদের মধ্যে তিনি জনের নাম সবচেয়ে বিখ্যাত। এরা তিনি জনেই সন্তুষ্য শতাব্দীর লোক। প্রথম হল আনটন ট্রাভিভারি, দ্বিতীয় আন্দ্রেয়াস শুদ্ধারনেরি, আর তৃতীয় নিকোলো আমাটি। এর মধ্যে আমাটি প্রথম বেহালার সংক্ষার করেন ইতালির ক্রেমেনা শহরে।

‘তখনও আমার যাথায় আসেনি যে এই আমাটি আর কন্দর্পনারায়ণের “আম আঁটি” একই জিনিস। এটা পরিষার হয় কন্দর্পনারায়ণের ডায়ারি পড়ে। তাতে এক জ্বাগায়া তিনি লিখেছেন’, দেশুণি পকেট থেকে একটা কাগজ বাল করে পড়ল—“আই বট অ্যান আমাটি টুডে ফ্রে এ মিউজিশিয়ান হ ওয়াজ সাক্ষ ইন ডেট অ্যান্ড হ সোল্ট ইট টু যি ফ্রে টু থাউজ্যান্ড পাউল্স। ইট হাজ এ প্রেরিলাস টোন।” অর্থাৎ আমি আজ একটি দেশের জর্জরিত বাজিয়ের কাছ থেকে একটি আমাটি বেহালা বিলপ্লাম দু হাজার পাঁচশত। যন্তটির অ্যান্ড্রেজ অ্যান্ড্র্য সুন্দর।—তখনকার দিনে দু হাজার পাঁচশত মাত্রে বিশ হাজার টাকা। আজকে একটি আমাটি বেহালার দাম দেড়-দু লাখ টাকা।

‘এমন একটি বেহালা এই বাড়িতে এতকাল পড়েছিল, আর এই

বেহালা বাজার কলসার্টে বাজতেন ইন্দুনারায়প আচার্য। বেহালার আসল ব্যব কেউ জানতেন কি? আমার মনে হয় না কীভিনারায়ণবাবু বা দেবনারায়ণবাবু জানতেন, কিন্তু দ জনের জানোর কথা। এক হল প্রদুষ মন্ত্রিক, যিনি নন্দপুরাজারামের ভায়রি পড়েছিলেন, আর এক হল হরিনারায়ণবাবু। তিনি বিদেশী সংগীত সঙ্গকে জানেন, তাল বেহালার দান জানেন, এবং এটাও মিশচ্ছিত জানেন যে বেহালার গানে দু দিকে যে ইংরিজি এন-এল ভটো ফাঁক থাকে, তার একটীয় চোখ লাগালে ভিতরে বেহালা প্রস্তুতকারকের নাম সমেত লেবেল দেখা যায়।

‘এই আমাটির কাণ্ঠ জানার পরেই আমার সন্দেহ বন্ধনূল হয় যে ইন্দুনারায়পের বুন্দে পর তাঁর বেহালাটি সরানো হয়েছে এবং তার জায়গায় একটি সন্তুষ্ট ভূমি বেহালা কিনে এনে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বেহালা সরিয়েছে কে, এবং যে সরিয়েছে সে তো টাকার জন্মই সরিয়েছে?’

‘আমার সন্দেহটি বর্তাবতই হরিনারায়ণবাবুর উপর পড়ে এবং এটাও বুঝতে পারি না বেহালা পাচন হয়ে ঘরে টাকা এসে গেছে। তখন আমি তাল বিদেশী বেহালা লিঙ্গতে চাই দলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই। তার উত্তরে আমার চিঠি লেখেন জনক মি. রেবেলো। এই রেবেলোর বাঁ, যিয়ে দেখি তিনি একজন ক্রিয়াট প্রাচীন দ্রব্য বিক্রেতা—যাকে বলে অ্যানাটিক ডিলার। তিনি বলেন তাঁর কাছে একটি আমাটি বেহালা আছে যেটা তিনি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করতে আজি আছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি বেহালাটি তিনি মি. আচার্যের কাছ থেকে কিনেছেন কিনা। তাতে তিনি হাতী বলেন এবং বলেন ‘ইট ইত্য দ্য ওললি আমাটি ইন ইন্ডিয়া।’

‘এই হল হরিনারায়ণবাবুর অপরাধের কাহিনী, এবং আমার কঢ়ুতারও এখানেই থাকা।’

আচার্য এই যে ফেলুদার একটা কথাতেও কোনও প্রতিবন্দ শোনা গেল না। প্রদুষবাবু এখন মি. পোকারের জিম্মারে। হরিনারায়ণবাবু ইপ টিপে বসে আছেন যাখা ছেট করে। দেবনারায়ণবাবু লজ্জায় লাল হয়ে ঘর থেকে চলে গেছেন। কীভিনারায়ণ দোর্ধৰাস ফেলে বললেন, ‘হরি যদি আমার বলত তাহলে আমি তাকে জুঁোর দেনা শোধ কর্যার টাকা

দিয়ে দিতাম। মিছিমিছি আমাদের পরিবারের একটা আশ্চর্য সম্পত্তি সে বেহাত করল। কিন্তু প্রদূষ যে এত অসৎ তা আমি ভাবতে পারিনি। তাকে এইচুকুই বলতে পারি হে সে আমার পূর্বপুরুষের জীবনী লেখার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ। তার উপর্যুক্ত শান্তি হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

কীর্তিনারায়ণের বোধ হয় খুবই শব্দ হিল যে কন্দপুরানারায়ণের একটা জীবনী লেখা হোক। না হলে আর সালমোহনবাবুকে তিনি অফারটা করেন?

'আপনি তো লিখিলে মানুষ—রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক—তা কন্দপুরায়ণের জ্যে বড় রহস্য আর রোমাঞ্চ একই লোকের জীবনে কিন্তু আর পাবেন না।'

সালমোহনবাবু অভ্যন্ত খিলয়ের সঙ্গে ঘাস কাঁ করে বললেন, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমি অতি লগ্ন্য ব্যক্তি, আমার লেখার কেনও ধূলাই নেই।'

পরে অবিশ্বি উনি ফেলুন্দাকে বলেছিলেন, 'রক্ষে করুন মশাই—ওই খুন হওয়া বাড়িতে কেমে আমি কন্দপুরানারায়ণের জীবনী নিয়ে রিসার্চ করব!—বেঁচে থাকুক আমার রহস্য-রোমাঞ্চ, বেঁচে থাকুক ও'খন কন্দপুরান্ত খঁজ দ্বা শ্রি মাসকেটিয়ারস।'

অসম থিয়েটারের মামলা

Pradosh C. Mitter
Private Investigator



ঝঙ্গরা থিয়েটারের মামলা

॥ ১ ॥

টিভি-তে শার্লক হোম্স দেখে ফেলুন মুঝ। বললেন, 'একেবারে বহুয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে হোম্স আর গ্যাটসন। জানিস তোপ্সে—আমাদের যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা ওই শার্লক হোম্সের কাছে। সব প্রাইভেট ডিটেকটিভের গুরু হচ্ছে হোম্স। তাঁর সৃষ্টিকর্তা কল্পনা ডয়েলের জবাব নেই।'

জটাদু সায় দিয়ে বললেন, 'লোকটা কত গল্প লিখেছে ভাবুন তো! এত প্লট কি করে যে মাথায় আসে সেটা ভেবে পাই না। সাধে কি আমার টাক পড়েছে? প্লট বুঁজতে গিয়ে মাথার চুল ছিড়ে!'

বাইরে বৃষ্টি পড়েছে, তার মধ্যে চা আর ভালমুটো জমেছে ভাল। আসলে লালমোহনবাবুও একচলিপ্তি রহস্য উপল্যাস লিখেছেন, কিন্তু তার বেশির ভাগই ফেলুদার ভাস্তব থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। তবে প্লটের জন্য আঝ্যা-কুড়লেও ভদ্রলোকের উৎসাহের অভাব নেই। আর সত্যি বলতে কি, ফেলুদার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ্যার পার থেকে তরুণ গল্পও অনেক ইম্প্রুভ করে গেছে।

'শ্রীনাথকে একটু বল না ডাই তপেশ,' বললেন লালমোহনবাবু, 'আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।'

আমি শ্রীনাথকে চাহের ফরমাশ দিয়ে আসতেই দরজায় টেকা পড়ল। তার আগে অবশ্য ট্যাঙ্কি খামার শব্দ শেয়েছি।

দরজা খুলে দেখি ছাতা মাথায় এক ভদ্রলোক, মাঝারি হাইট, ফরসা রং, দাঢ়ি গোঁফ কামানো, বয়স চলিশ-পঁয়তালিশ।

বললাম, 'কাকে চাই?' অবিশ্য এ অশ্বটা না করলেও চলত, কারণ

দেখেই বুঝেছি মকেল।

‘এটা কি প্রদোষ মিত্রের বাড়ি?’ প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

এবারে ফেলুদাই বলে উঠল, ‘আপনি আসুন ভিতর।’

ভদ্রলোক ছাতটা বন্ধ করে চুকলেন।

‘ওটাকে দরজার পাশে রেখে দিন,’ বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক তাই করলেন, তারপর সোফার এক পাশে এসে বসলেন।
ফেলুদা বলল, ‘আমার নাম প্রদোষ মিত্র; আর ইনি আমার বন্ধু
লালমোহন গান্ধুলী।’

‘ফাক, তবু আপনাকে বাড়ি পাওয়া গেল,’ বললেন ভদ্রলোক,
‘টেলিফোন করে কানেকশন পাইমি। আজকাল যা হয় আর কি।’

‘কী ব্যাপার বলুন।’

‘বলছি। আগে আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম মহীতোষ খার।
নাম শুনে চিনবেন ততটা আশা করি না, যদিও খিয়েটার লাইনে আমার
কিছুটা খ্যাতি আছে।’

‘আপনি তো অস্তরা খিয়েটারে আছেন, তাই না?’

‘ঠিকই ধরেছেন। এখন প্রফুল্লতে অভিনয় করছি।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি।’

‘আপনার কাছে এসেছি একটা সুরক্ষাট্টেলিরে।’

‘কী সংকট?’

‘কদিন থেকে ভার্মিলিন চিঠি পাইছি। কার কাছ থেকে তা বলতে
পারব না।’

‘ভূমিক চিঠি?’

‘তার কিছু বন্ধুনা আমি সঙে করে নিয়ে এসেছি। এই দেখুন।’

ভদ্রলোক প্রকেট থেকে চারটে কাগজ বার করলেন, তারপর
সেগুলো টেবিলের উপর রাখলেন। আমি দেখলাম একটায় লেখা
‘স্বাধ্যান।’ আর একটায় ‘তোমার দিন মুরিয়ে এল’, আরেকটায়
‘তোমার দুর্ভুতির ফল ভোগ কর’, আর চার নম্বরটায় ‘আর সময় নেই।
এবার ইষ্টনাম জপ কর।’ গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লেখা, আর সবই
যে এক সোকের লেখা তা বোঝাবার উপায় নেই।

‘এ সব কি ডাকে এসেছে?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘এগুলো কদিনের মধ্যে পেয়েছেন?’

‘সাতদিন।’

‘কে লিখেছে কিছু অনুমান করতে পেরেছেন?’

‘একেবারেই না।’

‘আপনার প্রতি বিজ্ঞপ্তি এখন কোনও লোকের কথা মনে করতে পারছেন না?’

‘দেখুন, আমি থিয়েটারে কাজ করি। আমাদের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া, মনোমালিন্য—এ লেগেই আছে। আমি দু বছর হল অল্পরায় আছি, তার আগে কুপমত্তে ছিলাম। আমাকে নেওয়া হয় একটি অভিনেতার জায়গায়। স্বভাবতই সে অভিনেতা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। সে নিশ্চয়ই ঈর্ষ্য ভুগছে।’

‘এই অভিনেতার নাম কী?’

‘জগন্নায় ভট্টাচার্য। ভয়ানক ড্রিস করতে শুরু করেছিল। তাই তাকে আর রাখা যায়নি। তিনি এখন কী করছেন কোথায় আছেন তা জানি না।’

‘এই জগন্নায় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কারুর কথা মনে পড়ছে?’

‘আমার একটি ছোট ভাই আছে, তার সুস্ক্রীপ্তির বনে না। সে অবিশ্বা আলাদা থাকে। আমার বাবার মৃত্যুতে সম্পত্তি সব আমি পাই। আমার ছোট ভাই অসৎ সঙ্গে পড়ে স্থানে হয়ে যায়। বাবা তাই তাকে উইল থেকে বাদ দেন। ছোট ভাই স্বভাবতই খুব অসন্তুষ্ট হয়। এছাড়া শুরু বলতে আর স্বাক্ষরকে মনে পড়ে না।’

‘আপনি সাবধানে আছেন তো?’

‘তা তো আছি, কিন্তু আপনি যদি একটু পথ বাতলে দেন।’

‘এ-ব্যাপারে সাবধানে থাকতে বলা ছাড়া তো আর কিছু বাতলাবার নেই। আপনি থাকেন কোথায়?’

‘বালিগঞ্জে। পাঁচ নম্বর পাঞ্জিরা প্রেস।’

‘একাই থাকেন?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। একটি চাকর আর একটি বাস্তার লোক আছে। আমি এখনও বিয়ে করিমি।’

‘সত্য বলতে কি, এ অকস্থায় আমার আর কিছুই করার নেই। এ বকম হমকি কেস আমার কাছে আসেও এসেছে। চিঠিগুলো থেকে কিছু ধরা যায় না। এখানে চারটে চিঠিতে দেখছি চার রকম পোস্টমার্ক, কাজেই কোথেকে এসেছে তাও বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। তবে আপনাকে কেউ উৎকঠায় ফেলতে চাষ্টে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি বলি কি আপনি পুলিশে যান। তারা এ সব ব্যাপারে আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারে।’

তত্ত্বালোক যেন একটু শুসড়ে পড়লেন, বললেন, ‘পুলিশ?’

‘কেন, পুলিশের বিষয়ে আপনার কোনও অভিযোগ আছে নাকি?’

‘না, তা নেই।’

‘তবে আর কি। আপনি সোজা খানায় গিয়ে রিপোর্ট করুন। আমায় যা বললেন তাই বলুন।’

তত্ত্বালোক অগত্যা উঠে পড়লেন। ফেলুন তাঁকে দরজা অবধি পৌছে দিল। তারপর ফিরে এসে বসে পড়ে বলল, ‘তত্ত্বালোকের ডান হাতের আঙুলে একটা আংটির দাগ দেখলাম। সেই আংটিটা কোথায় গেছে কে জানে?’

‘বেচে দিয়েছেন বলছেন?’ জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

‘দিলে আশ্চর্য হব না। পায়ের জুতো জ্বালাই অবস্থাও বেশ খারাপ। অফুলতে উনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন না সেটা জানি। সেটা করছেন অঙ্গরার স্তোর অভিজ্ঞতা নেপাল লাহিড়ী।’

‘কিন্তু কে ওর পিছনে লেগেছে বল তো’, আমি প্রশ্ন করলাম।

‘কী করে বলব বল। উনি যে দু জনের কথা বললেন তাদের এক জন হতে পারে। মোট কথা এ কেস আমার দেওয়া চলে না। আর অনেক সময় এগুলো শ্রেফ ভাঁওতার উপর চলে। আমার কত টেলিফোন এসেছে বল তো হমকি দিয়ে। সে সব মানতে হলে তো বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।’

কিন্তু এই চিঠির ব্যাপারটা যে ভাঁওতা নয় সেটা তিনি দিন পরেই জানিলাম।

খবরটা জনা গেল খবরের কাগজ মারফৎ। ছেটি করে লেখা খবর—অপরা খিয়েটারের অভিজেতা নিখোঁজ। মহীতোয় রায় মাকি সঞ্চাবেলা খিয়েটার না থাকলে লেকের ধারে বেড়াতে যেতেন। শুভ পরশু, অর্ধাংশ সেমবার, তিনি ব্যথারীতি বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেন নি। বাড়ির চাকর থানায় গিয়ে খবর দেয়। পুলিশ এই নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

ফেলুন্দা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘লোকটাকে পই পই করে বলেছিলাম সাবধানে থাকতে, তার লেকে বেড়াতে যাবার কি দরকার ছিল? যাই হোক, আমার কাছে হখন এসেছিলেন উপরোক, তখন একবার উঁর বাড়িতে যাওয়া দরকার। ঠিকানাটা মনে আছে?’

‘পাঁচ নম্বর পাঞ্জিয়া প্রেস।’

‘ওড়। তোর শ্বরপুরণকি পরীক্ষা করছিলাম।’

ন-টা নামাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

পাঁচ নম্বর পাঞ্জিয়া প্রেস একটা ছেটি দোতলা বাড়ি, তার একতলায় থাকতেন মহীতোববাবু। চাকর দরজা ক্ষুলে দিলে আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভিতরে চুকলাম। ফেলুন্দা চাকরকে বলল, ‘তোমার মনিব আমার কাছে এসেছিলেন সাহীয় চাইতে। উনি মাঝে মাঝে হৃষি তিথি পাঞ্জিলেন সেইব্বৰ তুমি জান?’

‘জানি বইকী রাবু। আমি বাইশ বছর জ্ঞার কাজ করছি। আমাকে সব কথাই বলতেন। আমি উঁকে অনেক করে বলেছিলাম—আপনি বেড়াতে যাবেন না, বাড়িতে থাকুন, সাবধানে থাকুন। তা উনি আমার নিয়ে শুলেন না। যখন দেখলাম রাত সাড়ে ন-টা হয়ে গেল তাও আসছেন না, তখন আমি নিজেই গেলাম লেকে। কোনখানটায় উনি বসতেন, কোনখানটায় বেড়াতেন, সেটা আমি জানতাম। কিন্তু কই, তাঁকে তো কোথাও দেখতে পেলাম না। তারপর পুরো একটা দিন কেটে গেল, এখনও কোনও খবর নেই। আমি থানায় গেলাম। তেনারা সব লিখে-টিখে নিলেন, কিন্তু এখনও পর্দন তো কিছুই হল না।’

ফেলুন্দা বলল, ‘তুমি এখন আমাদের সঙ্গে একবার আসতে পারবে?’



লেকে যে জাফগাটায় বসতেন সেটা যদি একবার দেখিয়ে দাও।'

'চলুন বাবু, যাচ্ছি।'

'তোমার নাম কী ?'

'দীনবন্ধু, বাবু।'

আমরা তিন জন ট্যাক্সি করে লেকে গিয়ে হাজির হলাম।

জলের ধারে একটা আমলকি গাছের পাশে একটা বেঁকি, তাতেই
নাকি হাঁটা সেরে বসতেন তত্ত্বজ্ঞ। হাঁটার অভ্যাসটা ডাঙ্গারই বাল
বলে করিয়েছিলেন। এখন চতুর্দিকে কেন্দ্রে লোক নেই, ফেলুদা খুব
মন দিয়ে বেঁকি আর তার চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখল। প্রায় মিনিট
পাঁচেক তব তব করে খুঁজে ঘাসের মধ্যে একটা শিতলের কৌটো
পেল। দীনবন্ধু সেটা দেখাহুর বলে উঠল, 'এ কৌটো তো বাবুর ছিল।'
কৌটোটা খুলে ভিতরে এলাচ আর সৃপুরি পাওয়া গেল। ফেলুদা সেটা
পকেটে পুরে নিল। আরপর দীনবন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি
তবানীপুর থানায় খবর দিয়েছিলে ?'

'আজে হ্যাঁ বাবু।'

ঠিক আছে। চল তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমরা একটু
খানায় খবর দিয়ে আসি।'

মোটামুটি কলকাতার বেশির ভাগ থানার ও.সি.এর সঙ্গেই ফেলুদার
আলাপ আছে। তবানীপুর থানার ও.সি. হচ্ছেন সুবোধ অধিকারী।
আমরা দীনবন্ধুকে পজিভিয়া সেসে নামিয়ে দিয়ে গেলাম অধিকারীর
সঙ্গে দেখা করতে। যাশভারী হসেও মেশ মাইডিয়ার লোক, আর
ফেলুদাকে খুব পছন্দ করেন। আমাদের দেখে একটু অবাক হয়েই
বললেন, 'কী ব্যাপার, এত সকাল সকাল ?'

আমরা দুটো চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা বলল, 'একটা ডিসাপিয়ারেসের ক্ষে আপনাদের কাছে
রিপোর্টেড হয়েছে। মহীতোষ রায়।'

'হ্যাঁ। এটা বোধহয় সত্যবান দেখছিল। দাঁড়ান, ওকে ডাকি। একটু
চা চলবে ?'

'তা আপনি নেই।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ইনসপেক্টর সত্যবান ঘোষ এসে গেলেন।

ইনিও ফেনুদার ঘন্টে চেনা; দু জনে হ্যাণ্ডেক করার পর সত্যবান
বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন।'

'মহীতোয় রায় বলে একটি অভিনেতা বোধহয় নিরবেশ
হয়েছেন?'

'নিরবেশ কেন, আমর তো মনে হব তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।
তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা হৃষকি চিঠি পাওয়া গেছে। আর
লেকের ধারে মেরে ফেলে গায়ে কিছু ভারী জিনিস বেঁধে লাশ জলে
ফেল দিলে সে তো আর পাওয়াও যাবে না। আপনি এ ব্যাপারে কী
করে ইটারেস্টেড হলেন?'

ফেনুদা মহীতোয়বাবুর আসার কথাটা বলল। তারপর প্রশ্ন করল,
'আপনারা কোনওরকম এগোবার রাস্তা খুঁজে পাননি বোধহয়?'

ঘোষ বললেন, 'ভদ্রলোক অঙ্গরা থিয়েটারে অভিনয় করতেন।
আমরা সেখানে খোজ করেছি, কিন্তু কিছু এগোতে পারিনি।
থিয়েটারের কসরুর সঙ্গে এমন শক্ততা ছিল না যে খুন হতে পারে।
পেটি ভেলাসি সব সময়ই ধোকাতে পারে, কিন্তু সেটা খুনের কারণ হয়
না।'

'ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?'

'মোটামুটি। বারো-শ টাকা মাইলে পৈকেন্ট। একা মানুষ, তাই চলে
যেত। অবিশ্য খুনই যে ইঞ্জাহে একথা জোর বিয়ে বলা যায় না।
ভদ্রলোককে কেড়ে ছান্তো ফুসলে নিয়ে গেস্ল, কিংবা ভদ্রলোক
হয়তো নিজেই কেন্দ্র কারশে গাঢ়াকা দিয়েছেন।'

'আমি আজ লেকের ওখানে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক যে বেঁধিতে
বসতেন তার পাশেই ঘাসে ওর একটা মশলার কৌটো পাই।'

'তাই খুঁঠি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো খুন বলেই মনে হচ্ছে। আতঙ্গীর সঙ্গে স্টাগলের
সময় পকেট থেকে কৌটো পড়ে গেছেন।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। আমাদের এদিক থেকে কোনও থবর পেলে আপনাকে
জানাব।'

‘ভেবি শুড়। আমিও আপনাদের টাচে থাকব।’

মি. ঘোষ চলে গেলেন। তা এসে গিয়েছিল, আবরা তা থেরে উঠে পড়লাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফেলুন্দা বন্দুল, ‘একবার আমরা থিয়েটারে যাওয়া দরকার। ওই কেমিস্টের দেৱান থেকে লালমোহনবাবুকে একটা ফোন করে বলে দে উনিও যেন চলে আসেন।’

ফোন করে আমরা আবার ট্যাক্সি ধূকলাম। যেতে হবে সেই শ্যামবাজার।

॥ ৩ ॥

অসমা থিয়েটারে পৌছে দেখি লালমোহনবাবু অপেক্ষা করছেন।

‘কী ব্যাপারে মশাই?’ ভদ্রলোক জিজেস করলেন।

‘আজ কাগজ দেখেননি?’

‘দেখেছি বইকী। মহীতোব রায় তো হাওয়া।’

‘হাওয়া কেন, বোধহয় খতম।’

সংক্ষেপে লালমোহনবাবুকে সকালের ঘটনাটা বলে দিল ফেলুন্দা।

‘তাহলে এখন কি আমরা থিয়েটারে তদন্ত চলিবো?’

‘একবার অন্তত ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি।’

আমরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার গিয়ে ভিতরে চুকলাম। গেটে দারেঞ্জাল বলল ম্যানেজারের নাম কৈলাস বাঁজুজো। তিনি তাঁর অফিসেই আছেন।

ম্যানেজারের আপিসে পৌছতে গেলে একটা ঘর পেরোতে হয়। সেখানে একজন ভদ্রলোক একটা টেবিলের সামনে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন, জিগ্যেস করলেন আমাদের কী দরকার।

ফেলুন্দা এবার তার একটা কার্ড বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল, ‘একবার যদি কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি।’

ভদ্রলোক আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেলেন ভিতরের দিকে। মিলিখানেক পরে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘আপনারা আসতে পারেন।’

আমরা তিন জনে গিয়ে ম্যানেজারের ঘরে চুকলাম। বেঁটে, মোটা,



কালো ভদ্রলোক। নাকের নীচে একটা সরু গৌঁফ, বয়স আন্দাজ
পঞ্চাশ। বললেন, 'আপনার নাম তো জনেছি, কিন্তু হঠাতে আমার
এবাবে আসার প্রয়োজন হল কেন সেইটেই ভাবছি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার একজন অভিনেতা সম্বন্ধে কিন্তু আনার
ছিল—যিনি দু দিন হল নিখোঁজ।'

'মহীতোবের কথা বলছেন ন সে ব্যাপারে তো পুলিশ এসে এক দফা
করকোয়ারি করে গেছে।'

'ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন। ব্যক্তিগতে দুর্মুক্তি চিঠি
পেয়েছিলেন সেই নিয়ে আমার পরামর্শ নিতে।'

'দুর্মুক্তি চিঠি? তাহলে কি ও কুন হয়েছে নাকি? আমি তো ভদ্রলাল
পাওনাদারের কাছ থেকে গাঢ়কা দিয়েছে।'

'না। ঠিক সে রকম মনে হচ্ছে না।'

'অবিশ্বিত ও গিয়ে যে আমাদের একটা খুব বড় রকম ক্ষতি হয়েছে
তা বলতে পারছি না। প্রশাস্ত মোটামুটি চালিয়ে নিচ্ছে। পুলিশ
কাজকেই এসেছিল। আমরা বিশেষ ফোনও ইলফরমেশন নিতে
পারিনি। মহীতোব একটু চাপা টাইপের চরিত্র ছিল। ওর কানুন সঙ্গে
খুব একটা মাথামাথি ছিল না। অভিনয়টা মোটামুটি ভালই করত। তবে
ওর ইচ্ছে ছিল প্রকৃততে হেন রোল করুনোরঁ সে ক্ষমতা ওর ছিল না।'

'ওঁর কেন্দ্র শক্র ছিল না বলছেন ন।

'বলছি তো—শক্রও নাকুলও না।'

'জগন্মহ ভট্টাচার্য রিসে এককালে আপনাদের একজন অভিনেতা
ছিলেন?'

'ছিল, কিন্তু তাকে তো অনেক দিন আগেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তাঁর জায়গাতেই মহীতোবকে নেওয়া হয়, তাই না?'

'তা বটে। এটা আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বেয়াল হয়নি।'

'এই জগন্মহ ভট্টাচার্যের বাড়ির ঠিকানা আপনার কাছে আছে?'

'পুরনো ঠিকানা আছে, সে তো এখন সেখানে নাও থাকতে পারে।'

কৈলাসবাবু একটা ঘণ্টা টিপালেন। পাশের ঘর থেকে একটি বছৱ
পৰিশ বয়সের ছেলে এসে দাঁড়াল।

'ঁদের জগন্মহের ঠিকানাটা দিয়ে দাও তো।'



এক মিনিটের মধ্যেই ঠিকনা এসে গেল। সাতাশ নম্বর নির্মল বোস স্ট্রিট। লাঙমোহনবাবু বললেন রাস্তাটা ওঁর জানা। আমরা উঠে পড়লাম।

নির্মল বোস স্ট্রিট শ্যামবাজারেরই একটা গলি। অগ্নিময়বাবুর বাড়ির ঠিকনায় গিয়ে ঘোঁজ করে জানলাস ভদ্রলোক এখনও সেখানেই আছেন। ফেলুন্দা চাকরের হাতে তার কাঠটা পাঠিয়ে দিল। অলঙ্কনের মধ্যেই আমাদের ডাক পড়ল। আমরা একটা তঙ্গপোষ পাতা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তাতে একটি রোগা-রোগা কেন, কৃষ্ণ বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে—ভদ্রলোক খসে আছেন। আমরা ঘরে ঢেকাতেও তিনি বসেই রইলেন।

‘হঠাৎ আমার সঙ্গে ডিটেকটিভের কী প্রয়োজন পড়ল?’—
ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন।

ফেলুন্দা বলল, ‘আপনি কি মহীতোষ রায় বলে একজন অভিনেতাকে চিনতেন?’

‘চিনতুম বললে ভুল হবে। সে এল, আর আমি বুবাদ হয়ে গেলুম—এই চেনা। কিন্তু সে তো দেখছি উধাও হয়ে গেছে।’

‘উধাও নয়, খুব সভ্যত খুন হয়েছেন।’

‘খুন? অবিশ্য আমার তাতে বুক কেটে রাখা আসবে তা নয়। সে আমার ভাত মেরেছিল, সেটাই হচ্ছে আমার কাছে সব চেয়ে বড় দ্রুত।’

‘তার মৃত্যুর আগে মহীতোষবাবু কতকগুলো হমকি চিঠি পেয়েছিলেন। সেই ব্যাপারে আপনি কেনও আলোকপাত করতে পারেন?’

‘আমি চিঠিগুলো লিখেছিলাম কিনা সেইটাই জানতে চাইছেন তো?’

‘আপনার তার উপরে এখনও যথেষ্ট আক্রোশ আছে দেখছি।’

‘সেটা আপনি কথাটা তুললেন বলে। মহীতোষ রায়ের ব্যাপার অতীতের ব্যাপার। এই নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। আমি তারপরে দীপ্তি খিয়েটারে কাজ পেয়ে যাই, এখনও সেখানেই আছি, যা পাছি তাতে আমার চলে যায়। মদ হেঁড়ে দিয়েছি। আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কেবলমাত্র একটা সমস্যা আছে সে হল হাঁপের কষ্ট। এ

ছাড়া আমি দিব্যি আছি। মহীতোষের কথা আপনি মনে করিয়ে দিলেন
বলে। নইলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'আপনি অঙ্গরা ছাড়ার পর মহীতোষবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা
হয়নি?'

'নো স্যার। একবারও না। এমনকী মধ্যে পর্যন্ত ওকে দেখিনি।
অঙ্গরা থিয়েটারে আমি যাই না।'

॥ ৪ ॥

এরপর তিনি মাস কেটে গেছে এর মধ্যে মহীতোষবাবুর কোনও
খবর পাওয়া যায়নি। তিনি যে আতঙ্গায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন
তাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। অঙ্গরা থিয়েটারে আর
একবার যাওয়া হয়েছিল ওখানে যদি কোনও খবর থাকে জানবার
জন্য, কিন্তু তাতেও কোনও সুবিধা হয়নি। শুধু এই খবরটা পাওয়া
গেছে যে মহীতোষ রায়ের জায়গায় আর এক জন অভিনেতা বহাল
হয়েছে। এই নাম সুন্দেশ চক্রবর্তী। ইনি প্রকৃতে অভিনন্দন করছেন
মহীতোষের জায়গায় এবং বেশ ভাল করছেন।

ফেলুদা এর মধ্যে মহীতোষ রায় সম্পর্কে আরও খবর নিয়েছে। ওঁর
ছোট ভাই শিবতোষের সুস্থে কৃত্যাবুলো জেনেছে যে সে দাদার সঙ্গে
কোনও সম্পর্ক ব্যাবেলি।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দাদার সঙ্গে আপনার বিরোধের
কারণ কি শুধু সম্পত্তি?'

শিবতোষবাবু বললেন, 'তার বেশি আর কারণের দরকার আছে
কি দাদা বাবাকে খোশামোদ করতেন। আমি সে দিকে যাইনি।
খোশামোদ আমার ধাতে নেই। ছোট হেলে বলে আমাকে সব সময়
ছোট করে দেখা হয়েছে। বাবাও তাই করেছেন—দাদা তো বটেই।
তাই আমি সম্পত্তি থেকে বক্ষিত হলাম। এতে বিরোধের সৃষ্টি হবে
তাতে আর আশ্চর্য কী?'

কথাগুলো শনে আমার মনে হচ্ছিল শিবতোষবাবুর এখনও
পুরোধার্মায় আক্রেশ হয়েছে দাদার উপর।

ফেলুদা বলল, 'আপনি মহীতোষবাবুর মৃত্যু সপ্তকে কোনও মন্তব্য করতে চান কি? এটা হবাতো আপনি বোবেন যে তিনি যদি আতঙ্গায়ীর হাতেই প্রাণ হারান, তাহলে সেই আতঙ্গায়ী আপনি হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।'

'আমি গত পাঁচ বছর দাদার মুখ পর্যন্ত দেখিনি। তাঁর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছুকে গিয়েছিল। আর তাঁর খিয়েটারের জীবনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না।'

'যে দিন মহীতোষবাবু নির্বোজ হন সে দিন সন্দ্বাবেলা ছাঁটা থেকে আটটার মধ্যে আপনি কী করছিলেন মনে পড়ে?'

'রোজ যা করি তাই করছিলাম; আমার বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলাম।'

'কোথায়?'

'সর্দার শক্তির বোড়। এগারো নম্বর। অনুপ সেনজনপ্তের বাড়ি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারবেন।'

ফেলুদা এটা চেক করার জন্যে সর্দার শক্তির বোড়ে শিবতোষবাবুর বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি বলে দেন যে তাদের বাড়িতে রোজ তাদের আজগা হয় এবং শিবতোষবাবু নিয়মিত স্বাস্থ্যেন।

একটা বড় সাসপেন্সকে তাই ফেলুদাকে আকৃত করে দিতে হল।

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু 'অসে' বললেন, 'মশাই, এ কেসটা কোনও কেসই না। আপনি মিথ্যে এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তার জেয়ে চলুন আমরা দ্বিন-চারেকের জন্য কোথাও ঘুরে আসি। আমারও মাথায় একটা খুঁটি আসছে বলে মনে হচ্ছে, আর আপনিও মাথাটা একটু সাফ করে নিতে পারবেন।'

'কোথায় যাবেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'দীঘা গেলে কেমন হয়? এটা তো এখনও দেখা হয়নি।'

'বেশ তাই হোক। আমারও মনে হয় এ কেসটার কোনও সিপ্পতি হবে না। মহীতোষের ইত্যাকারী আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যাবে।'

আমরা পরদিনই দীঘা দিয়ে হাজির হলাম। ট্রিনিং লজে রুকিং ছিল, দিবি আরামে থাকা যাবে বলে মনে হল। আর তার উপর সমুদ্রে জান।



লালমোহনবাবু একটা নতুন লাল সুইমিং ক্ষেত্রাম কিনে এনেছিলেন।

দীঘাতে কলকাতার খবরের কাগজ আসতে আসতে সঙ্গে হয়ে যায়। তিনদিনের দিন অংলবাজারটা হাতে নিয়ে প্রথম পাতা দেখেই ফেলুন্দা প্রায় লাখিয়ে উঠল।

‘সর্বনেশে খবর।’

‘কী ব্যাপার?’ লালমোহনবাবু আর আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম।

‘অপরা খিয়েটারের প্রধান অভিনেতা খুন?’ বলল ফেলুন্দা, ‘এ কি আরও হয়েছে বল্ল তো দেখি।’

খবরটা পড়ে দেখলাম। বলেছে অঙ্গরা খিয়েটারের প্রধান অভিনেতা নেপাল লাহিড়ী দু দিন আগে খিয়েটারের পর ট্যাঙ্গিতে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে এক বন্দুর বাড়িতে যাবেন বলে ট্যাঙ্গি থেকে নামেন। বন্দুর বাড়ি একটা গলির মধ্যে। সেই গলিতেই তাকে ছোরা হেরে ঘুন করা হয়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা তদন্ত চালাচ্ছে। নেপালবাবুর স্ত্রী ও একটি বাণো বছরের ছেলে আছে, তাঁরা এ বিষয় কোনও আলোকপাত করতে পারেননি।

‘তাহলে কী হবে?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘তাহলে একবার আপনাকে দেতে হবে অঙ্গরা খিয়েটারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে।’

‘কেন, আমাকে কেন?’

‘কারণ আমার পা-টা আজ মচকেছে সমুদ্রে জ্বান করার সময়। কাল ভাল রকম খুঁথা হবে বলে মনে হচ্ছে।’

‘তাহলে চলুন আজই ফেরা যাক। কলকাতায় গিয়ে চুন-হলুদ দিয়ে পা-টা বেঁধে ফেলবেন।’

‘আপনি পারকেন তো আমার ভূমিকা নিতে?’

‘তা অ্যাদিন যখন আপনার সঙে রয়েছি তখন কিছুটা জ্ঞানগুলি তো হয়েইছে।’

আমরা সে দিনই কলকাতায় ফিরে এলাম। কথা হল পরদিন সকাল ন-টায় লালমোহনবাবুর আঘাদের বাড়ি আসবেন, ফেলুদা তাঁকে কিছুটা তালিম দিয়ে দেবে, তারপর দশটা নাগাদ আমরা দু জনে যাব অঙ্গরা খিয়েটার।

পরদিন সকালে ফেলুদার কাছে তালিম নিয়ে আমরা ঠিক দশটায় পৌছে গোলাম অঙ্গরা খিয়েটারে। লালমোহনবাবুর গদগদ ভাব, বললেন, ‘আমার অনেক দিনের আপশোষ ছিল যে তোমার দাদাকে আর একটু সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে পারি না। এইবারে তার সুবোধ এসেছে।’ ভদ্রলোক আজ ধূতি পাঞ্জাবির বদলে প্যান্ট শার্ট পরে এসেছে; বললেন এতে কাজটা অনেক চটপটে হয়। ‘ওভারনাইট কার্ড ছাপিয়ে নিলুম আমার নামে, দেখতে কেমন হয়েছে।’

কার্ড নিবে দেখি তাতে ইংরিজিতে লেখা রয়েছে ‘লালমোহন

গান্ধুলী, রাইচার্জ।'

'দিয়ি হয়েছে', আমি বললামঃ

দারোয়ানের হাতে একটা কার্ড ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তিনি রিমিটের মধ্যে আমাদের ভাক পড়ল।

কৈলাসবাবুকে দেখে মনেই হল না আমাদের উনি চিনতে পেরেছেন। বেশ কুক্ষভাবেই বললেন, 'কুনুন, আমার এখানে এখন বিশেষ গোলমাল। আপনি যদি নতুন নাটক নিয়ে এসে থাকেন তো অন্য সময় হবে। এই কটা দিন বাদ দিন।'

লালমোহনবাবু জিভ কেটে বললেন, 'নতুন নাটক নয় সার; আমি এসেছি প্রদোষ মিত্র প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের প্রতিভু হয়ে। উনি অসুস্থ, তাই নিজে আসতে পারলেন না। উনি এর আগে মহীতোষ রায়ের ব্যাপারে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন আমিও এসেছিলাম ওঁর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ—মনে পড়েছে। তা আপনি কী জানতে চাহিছেন? খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তার বেশি কিছু বলার নেই।'

'একটা প্রশ্ন ছিল—নেপালবাবুও কি মহীতোষবাবুর ছিল হমকি চিঠি পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিল, তবে সে বিষয় প্রশ্নের পরিমাণে চেপে রেখেছিল। কোনও পাত্তা দেয়নি। তারপর তিনদিন আগে প্রথম আমাকে বলে। চিঠি পাছিল প্রায় দশদিন ধোকে।'

'সে চিঠি আপনি দেখেছেন?'

'দু তিনটে দেখেছি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। হমকি চিঠি যে রকম হয় সে রকমই আরকি। আমি ওকে সাধানে ধাকতে বলি, কিন্তু নেপাল মকে হিরে সাজত বলে নিজেকেও একটা হিরো বলে মনে করত। সে বলে, "এসব হমকিতে আমি ঘাবড়াই না"।'

'তিনি ধাকতেন কোথায়?'

'নতুনলেন্সের উট্টোচার্য লেনে; সাড়াশ নম্বর।'

'উনি কি বিবাহিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

কাগজে লিখেছে উনি ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি যাবেন বলে ট্যাক্সি

থেকে নেমেছিলেন। এই বক্তৃতি কি আপনি জানেন?

‘গলিতে বাড়ি বলে যখন বলছে তখন শশধর চাঁচুজো বলে মনে হয়। সেও অভিনেতা, রূপমুখ হিয়েটারে অভিনয় করে।’

‘অঙ্গরা হিয়েটারে তাঁর কোনও শক্তি ছিল না?’

‘সে অন্ধ আমি কি করে বলব বলুন। প্রধান অভিনেতাকে সকলেই ইর্ষা করে। সে অর্থে শুধু আমাদের হিয়েটারে কেন, অন্য হিয়েটারেও নেপালের শক্তি ছিল। তাকে সরাতে পারলে আমার হিয়েটার কানা হয়ে যাবে এটা অনেকেই জানত।’

‘আপনাদের হিয়েটার কি তাহলে এখন বক্তৃ?’

‘আজ প্রফুল্লর লাস্ট শো ছিল—সেটা আর হবে না। আমরা তো নতুন নাটক আলমগীর নামাব বলে তোড়জোড় করছিলাম। নাম ভূমিকায় তো নেপালেরই করার কথা ছিল। এখন অন্য অ্যাকটরকে ঢাই করা হচ্ছে। একজন নতুন লোক এসেছে।’

‘কেমন?’

‘মন্দ নয় বোধহয়। দাড়ি গোঁফ নিয়ে আলমগীর সাজবার চেহারা নিয়ে চলে এসেছে। তার মেক-আপ লাগবে না।’

এবার আমার একটা কথা মনে পড়ল। বললাম, ‘এখনকার মেন অ্যাকটরদের বাড়ির ঠিকানাগুলো নিয়ে নিষ্ঠা ফেলুন হলেও ওদের কারুর কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে?’

‘হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছি। বললেন লালমোহনবাবু।

কৈলাসবাবুকে বলতে আবার ঘটা টিপে ওঁর সেক্রেটারিকে আনিয়ে আমাদের সব নাম ঠিকানাগুলো আনিয়ে দিলেন।

‘যেই বক্তৃর বাড়িতে সে দিন নেপালবাবু যাচ্ছিলেন, তিনি কেথায় থাকেন বলতে পারেন?’

‘কাগজে দেখেননি। খুনটা হয়েছে মতি মিঞ্চি লেনে। কাজেই তিনিও সেখানেই থাকতেন।’

আমরা ভদ্রলোককে আর বিরক্ত না করে উঠ্যে পড়লাম। একবার মতি মিঞ্চি লেনে শশধর চাঁচুজোর বাড়ি যাওয়া দরকার।

॥ ৫ ॥

হতি মিত্রি লেন তিন জনের বেশি লোক পাশাপাশি হাঁচিতে পাবেন না। আমরা পাড়ি বড় ঝাঙ্কায় দাঁড় করিয়ে গলির দিকে এগালে—, যেতে একটা পান বিড়ির দোকান। মালিককে জিপ্পেস করতে বলে দিল শশুর চাঁচুজে তিন নবর বাড়িতে থাবেন।

তিন নবরের দুরজায় টোকা মারতে এক জন ভদ্রলোক দুরজাটা খুললেন।

‘কাকে চাই?’

‘আমরা শশুর চাঁচুজের খৌজ করছিলাম।’

‘আমিই সেই লোক। আপনাদের প্রয়োজন?’

লালমোহনবাবু একটা কার্ড বাব করে দিতে ভদ্রলোকের ঢোখ জুলজুল করে উঠল। ‘আপনিই কি সেই বিখ্যাত রহস্য ওমার্ক কাহিনীর লেখক?’

লালমোহনবাবু একটু বিনয় করলেন।

‘বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমিই সেই লোক।’

‘আরে বাবা! আপনার সব বই যে আমার পাড়া! তা হঠাৎ এ গরিবের বাড়িতে কী ফনে করেন?’

‘আমি এসেছি আবরণপত্র হ্যায়েদা প্রদোষ মিত্রের তরফ থেকে।’

‘তাঁর নামও তো শুনিছি। আপনারা ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন।’

একক্ষণে ঘরের ভিতর চুকলাম আমরা। একটা তজ্জপ্তেই প্রায় ঘরটা ভয়ে আছে, তবে তার সঙ্গে দুটো কাঠের চেয়ার রয়েছে।

লালমোহনবাবু চেয়ারে বসে বললেন, ‘আপনার বন্ধুর খুনের ব্যাপারে আমরা তদন্ত করছি। সে সম্বন্ধে আপনি শব্দ কিছু বলেন।’

‘আমি আর কী বলব। সে আমার বাড়িতে তোকার আগেই খুন হয়। পাড়ার একটি ছেলে আমাকে খবর দেয়। বাইশ বছর ইল আমাদের বন্ধুত্ব, যদিও রাইভাল থিয়েটারে আমরা অভিনয় করতাম।’

‘ওঁর কোনও শক্তি ছিল বলে জানেন?’

‘নেপালের শক্তি থাকবে না। সে এত বড় একটা হিরো—তার সব

অভিনেতার মে টৈর্সার পাত্র। তার তো শুরু থাকবেই।'

'বিশেষ কারুর নাম মনে পড়ছে না?'

'না। তা পড়ছে না। সে রকম কোনও নাম মেপাল করেনি আমার কাছে। সে কাউকে বিশেষ তোয়াক্তা করত না। একটু বেপরোয়া গোছের লোক ছিল। তার পেশায় তার সমকক্ষ খুব কমই ছিল। অন্য বহু থিয়েটার তাকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু অঙ্গরায় তার অভিনয় জীবনের শুরু বলে সে আর কোথাও যায়নি।'

'তিনি যে হৃষকি চিঠি পাচ্ছিলেন সে কথা আপনাকে বলেছিলেন?'

'বলেছিল বইকী, কিন্তু সে পার্ডাই দেয়নি। এক নাম করা জ্যোতিষী তাকে বলেছিল সে বিশাপি বছর বাঁচবে। সেটা সে বিশাপি করত। বলত ওই বয়স অবধি সে অভিনয় চালিয়ে যাবে, আর খকের উপর শেষ নিখাস ত্যাগ করবে।'

শশ্পুরবাবু একটা দীর্ঘসাম ফেললেন।

'এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই, জানেন। আর আমার মন মেজাজও ভাল নেই। আপনারা বরং আসুন।'

আমরা উঠে পড়লাম।

এক সকালের পক্ষে অনেক কাজ হয়েছে মনে করতে আমরা বাড়ির দিকেই রওনা দিলাম। ফেলুদাকে সব রিপোর্ট করতে হবে।

ফেলুদা সব শুনেছুনে ল্যালম্যালম্যালুর খুব তারিফ করল। বলল, 'আপনি তো একেবারে শ্রেষ্ঠদলী গোয়েন্দার মতো কাজ করেছেন। যেটা বাকি স্লাইল সেটা হচ্ছে অঙ্গরা থিয়েটারের অন্য প্রধান অভিনেতাদের জেরা করা। বিশেষ করে টপ অভিনেতা—যাদের সঙ্গে মেপাল লাহিড়ীর হৃদ্দাতাও ছিল, রেষারেফিও ছিল।'

'তোমার পা কী বলে?' আমি জিগোস করলাম।

'এখনও নট নড়ন-চড়ন। আরও দু দিন অন্তত জাগবে সারতে। ভাল কথা অভিনেতাদের সঙ্গে যখন কথা বলবেন তখন নতুনটিকেও বাদ দেবেন না।'

'না না, তা তো নয়ই।'

জালমোহনবাবু ফেলুদার কাজটা করে খুব খেশমেজাজে ছিলেন। বললেন, 'এ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। আসলে আপনার কাজটা যত

কঠিন বলে মনে হয় তত কঠিন নয়।'

'কঠিন কেবল রহস্যদ্বাটন।'

'তা বটে, তা বটে। সেটা এখনও পারব না নিশ্চয়ই। আর সে রকম দাবিও করছি না। তবে একটা কথা বলতে পারি—আজ ওখানে আমাকে দেখলে আপনি চিনতেই পারতেন না।'

'বটে ?'

'মেন্ট পারমেন্ট।'

'ওখানে কি মহড়া চলছে ?'

আমি বললাম, 'চলছে বোধ হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তো অলমগীর শুরু হবে।'

'তাহলে যানেজারকে টেলিফোন করে কোন সময় গেলে সকলের সঙ্গে দেখা হবে আর কথা বলা যাবে সেটা জেনে নিব।'

'ভেরি গুড়।'

'পুলিশ দেখলি ?'

'কই না তো।'

আছে নিশ্চয়ই। কাগজে তো নিখেছে তারা ক্ষমতা চালাচ্ছে। একবার ইনসপেক্টর ভৌমিককে ফেন করেন্ত। তার আভারেই কেসটা পড়বে বলে মনে হচ্ছে।'

॥ ৬ ॥

ইনসপেক্টর ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলে ফেলুনো জানল যে পুলিশ একটা গুণার দলকে সন্দেহ করছে। নেপালবাবুর নাকি একটা সোনার ঘড়ি ছিল সেটা খুনের পুর পাওয়া যায়নি। খুবই দামি ঘড়ি, এবং সেটাই হ্যাতো খুনের কারণ হতে পারে। ফেলুনো বলল, 'তাহলে থিয়েটারের সঙ্গে এ-খুনের কোনও সম্পর্ক নেই বলছেন।' তাতে ভৌমিক বললেন ওর তাই ধারণা। একটা গুণার দল কিছু দিন থেকেই নাকি ওই অঞ্চলে উৎপাত করছে। তারা প্রায় সকলেই দাগি আসামি। ছুরিটা নেপালবাবুর গায়েই বিবে ছিল, কিন্তু তাতে কোনও আঙুলের হাপ পাওয়া যায়নি। সব শেষে ভৌমিক বললেন, তিনি আশা করছেন দিন



তিনিকের মধ্যেই কেসটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। 'এবার আর আপনাকে কোনও ভূমিকা নিতে হবে না', বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদা টেলিফোনটা রেখে বলল, 'ম্যানেজারকে ওই ফোনটা করে নে। অভিনেতাদের একবার জেরা করা দরকার।'

আমি তখনই অঙ্গরা হিয়েটারে ফোন করলাম। বার তিনিক ডায়াল করবার পর লাইন পেলাম। ম্যানেজার বললেন, 'পুলিশ এক দফা জেরা করে গেছে সকলকে। সবে আপনারা যদি আবার করতে চান তা হলে বিশুদ্ধবার সকাল সাড়ে দশটায় আসুন। সে দিন এগারোটায় রিহাসাল আছে; আপনাদের আধ ঘণ্টায় কাজ শেষ করতে হবে।'

আমি ফেন্টা নামিকে রাখার প্রয় ফেলুন্দা বলল, টপ তিন জন আর ওই নতুন অ্যাকটরটিকে জেরা করলেই হবে।'

বিশ্বাদবার সাড়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা পৌছে গেলাম। অকরা থিয়েটারে। ফেলুন্দাকে দেখে এসেছি তার আজও পায়ে বাধা রয়েছে। লালমোহনবাবু আজ আরও শার্ট; তার শুটা চলা এবং কথা বলার চেই বদলে গেছে।

আমরা প্রথমে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললাম বে আমরা তিন জন টপ অভিনেতা আর নতুন অভিনেতাটিকে প্রশ্ন করতে চাই।

‘তাহলে ধরণীকে দিয়ে শুরু করুন। ধরণী সান্যাল। সে এখানের সিনিয়ারমেস্ট আটিস্ট; ছাবিশ বছর হল ক্ষমতা করছে।’

আমাদের জেরার জন্য ম্যানেজারের পাশের ঘরটা খালি করে দেওয়া হল। ঘরে একটা সোফা আর তিনটে চেয়ার রয়েছে।

এক জন বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। সিংহের কেশের মতো চুল—তার বেশির ভাগই সাদা—চুলচুলু চোখ, গায়ের খৎ মাঝারি।

‘আমার নাম ধরণী সান্যাল,’ বললেন ভদ্রলোক। ‘আপনারা গোয়েন্দা?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ,’ সোজাসুজি বলচুল লালমোহনবাবু। ‘আমরা নেপাল লাহিড়ীর বাপারে তদন্ত করছি।’

‘নেপাল হ্যাকি ছিঁড়ি পাইল,’ বললেন ধরণীবাবু। ‘তাকে বললুম সাবধান হতে, সে কথা বলনেই তুললে না। এর মধ্যে গেছে মতি মিঞ্চি লেনে। আরে বাবা, বন্ধুর সঙ্গে কদিন না হয় নাই দেখা করলে। আমি তো তাকে পুলিশে খরব দিতে বলেছিলাম, কিন্তু ও গা-ই করেনি। ঠিক এ রকম হয়েছিল আমাদের আর এক অভিনেতা—মহীতোষ রায়। অবিশি মহীতোষের মৃত্যুটা থিয়েটারের পক্ষে তত বড় লস্নয়।’

‘নেপালবাবুর কোনও শক্তি ছিল বলে জানেন?’

‘থিয়েটারের টপ পোজিশনে বসে থাকলে তার শক্তি থাকবেই। মানুষের ছয় রিপুর মধ্যে একটি হল মার্স্য। নেপালের শক্তি থাকবে না? তবে যদি জিগ্যেস করেন কোন শক্তি এই কুকীর্তি করেছে, বা শক্তি ছাড়া অন্য কেউ করেছে কিনা, তা বলতে পারব না।’



‘আপনার বাড়িতে তাঁর ঘাতাঘাত ছিল?’

‘আজে না। এমনিই খিয়েটারে হস্তায় তিন দিন দেখা হচ্ছে, তার উপর সে আমার এমন বস্তু ছিল না যে অন্য দিনও দেখা করব।’

‘যে দিন খুন ইয়া দে দিন সন্ধাবেলা আপনি কী করেছিলেন?’

‘কালিকিন্দর ঘোষের বাড়ি কেন্দ্রে শুনছিলুম। ইচ্ছে করলে যাচাই করে নিতে পারেন।’

‘ঠিক আছে; আপনাকে আর কোনও প্রশ্ন করার নেই।’

এবার এলেন দীপেন বোস। বছর পঁয়তালিশ বছস, মাথা ভক্তি কৌকড়া চুল, ঠোঁটের কোশে একটা সিগারেট, দাঢ়ি-গোঁফ নেই।

ভদ্রলোক প্রথমেই বললেন, ‘আমি আর নেপাল প্রায় এক সঙ্গেই অঙ্গরা খিয়েটারে জনেন করি। সে ছিল জাত অভিনেতা। আমারও অ্যাসিশন ছিল, কিন্তু দেখলাম নেপালের সঙ্গে পেরে উঠব না।’

‘তাতে আপনার মনে ঈর্ষা জাগেনি?’

‘তা জ্ঞেছে বইকী। বিলক্ষণ জ্ঞেছে। অনেকদিন মনে মনে ভেবেছি—এই লোকটা আমার পথে কাঁটা হয়ে রয়েছে—এটাকে স্মরণো যায় না?’

‘এই চিন্তাকে কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা হলুমি কোনটৈদিন?’

‘গাগল। আঘৰা ছাপোষা লোক। অম্বুদের দিয়ে কি খুনখারাপি হয়। নাটক করি, তাই নান্দনিক মন্ত্রিবৰ্ষীয় চিন্তা মাথায় আসে—বাস্তু ওই পর্যন্ত।’

‘যে দিন খুনটাক্ষয় সে দিন সন্ধেবেলা আপনি কী করেছিলেন?’

‘বায়কেপ দেখছিলাম। তবে প্রয়োগ দিতে পারব না। তিকিটের অর্ধাংশ আমি কখনও রাখি না।’

‘কী ছবি দেখলেন?’

‘মনের মনুষ।’

‘কেমন লাগল?’

‘ডার্জ ক্লাস।’

‘ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন।’

তৃতীয় অভিনেতার নাম ভুজঙ্গ বায়। এর বয়স পঞ্চাশের উপর, চোখ্য নাক, চোখ কেটেরে বসা, গাল তোবড়ানো, মাথার চুল পাতলা,

হয়ে এসেছে।

‘আপনার সঙ্গে নেপালবাবুর সন্তাব ছিল কি?’

‘এই খিয়েটারে নেপালই ছিল আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।’

‘তাঁর মৃত্যু সবকে আপনার কিছু বলার আছে?’

‘এর চেয়ে বড় ট্যাঙ্গেডি খিয়েটার মহলে অনেক দিন হয়নি। নেপাল ছিল আশ্চর্য অভিনেতা। আমার সঙ্গে কোনওদিন ঝুঁঝু হয়নি, কারণ ও কর্তৃত নায়কের রোল আর আমি কর্তৃম ক্যারেক্টার পাঁট।’

‘উনি হ্যাকি চিঠি পাইলেন সেটা আপমাকে বলেছিলেন?’

‘প্রথম দিনই। আমি তাকে উজ্জ্বাল দিই—এ সব চিঠি উড়িয়ে দিও না, আর বিশেষ করে মতি মিতি লেনে কিছুদিন ঝাওয়া বন্ধ কর। ও পাড়টা নটোরিয়াস। কে কার কথা শোনে? নেপালের বিশ্বাস ছিল তার আয়ু বিরাশি বছৰ—সেটা কেউ খণ্ডতে পারবে না।’

‘তাহলে আপনার ধারণা তাঁর হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়?’

‘তাই তো মনে হয়, কারণ তার দামি ধড়িটাও তো পাওয়া যায়নি। সোনার ওমেগা ধড়ি, দাম ছিল সাত হাজার টাকা।’

ভুজঙ্গবাবুকে ছেড়ে দিলাম। উনি আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

এবার এলেন নতুন অভিনেতা, নাম সুজেন্ট চুক্রলতী। প্রথম দেখে একটু হকচকিয়ে যেতে হয়, ক্লাবণ মোহিলাই দাঢ়ি আর গোঁফ দেখে মনে হয় উনি মেক-আপ নিয়ে দ্রব্যেছেন। বললেন, অসমীয়া খিয়েটারে আলগগীর হচ্ছে জনিত কিনি দাঢ়ি রাখতে আরম্ভ করেন। আগে শুধু গোঁফ ছিল।

‘আপনি এর আগে কোথায় অভিনয় করতেন?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘কোথাও না। দু একটা আপিস ঝাবে করেছি। আমার প্লাইটডের ব্যবসা ছিল। তবে অভিনয় আমার নেশা। আর কিছু না করার থাকলে আমি নাটকের বই খুলে পাঁট মুখস্থ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতাম। এখন অবশ্য তার আর দরকার হবে না।’

‘আপনি কি আলগগীরে পাঁট পেঁয়ে গেছেন?’

‘সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কোনু পাঁট সেটা এখনো খির হয়নি।

মেন পার্টও হতে পারো।'

'আপনি থাকেন কোথায় ?'

'আমহাস্ট রো।'

'ব্যবসা কি এখন হেডে দেবেন ?'

'হ্যাঁ। অ্যাকটিংই আমার খ্যান ছিল; সুযোগ পাইলি বলে ব্যবসা চালাচ্ছিলাম।'

ফেলুদাকে যাতে ঠিকভাবে রিপোর্ট দিতে পারি তাই আমি কথোপকথনটা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করে নিছিলাম। বুকতে পারচিলাম লালমোহনবাবু প্রশংসনে করছিলেন নিজেকে ফেলুদা হিসেবে কঁজনা করেই। এটা আমাদের কাছে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।

সুধেলুবাবুকে আর একটাই প্রশ্ন করার ছিল।

'আপনার সঙ্গে নেপালবাবুর আলাপ হয়েছিল ?'

'সামান্যই। তবে তবে অভিনয় আমি আগে অনেক দেখেছি। খুব ভাল লাগত।'

॥ ৭ ॥

ফেলুদা খুব মন দিয়ে আমাদের রিপোর্ট শুনল। তারপর বলল, 'আমার আবসেকে তো তোরী বেশ চালিয়ে নিতে পারছিস।'

লালমোহনবাবু জালিলেন, 'প্রশ্ন করটাতে খুব একটা বুদ্ধি লাগে না, আসল কথা হচ্ছে উত্তরগুলো থেকে কী বোঝা গেল। আমি তো মশাই এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আর গুণ্ডা যদি মেরে থাকে লাহিড়ীকে তাহলে তো পুলিশ তার বিস্তার করবেই।'

'গুণ্ডা হ্মকি চিঠি দিয়ে খুন করে না।'

'তা বটে। তা আপনার কি মনে হয় নেপাল লাহিড়ী আর মহীড়োষ রায়কে একজন লোকই খুন করেছে ?'

'এক জন বা একই দল। সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু মোটিভটা— ?'

'ধরন যদি অন্য থিয়েটারের লোক খুনটা করে থাকে, সেখানে তো

স্পষ্ট মোচিত রয়েছে। অঙ্গরা খিয়েটারে এখন টপ দু জন অভিনেতাই চলে গেল। এদের আবার মাথা ভুলে দাঁড়াতে কি কম সময় লাগবে?’

ফেলুদার পায়ে এখনও বেশ ব্যথা। বোধহয় এক্স-রে করাতে হবে। ব্যাডেজ-বাঁধা পা কফি টেবিলের উপর ভুলে ও সোজায় হেলান দিয়ে বসেছিল। বলল, ‘তোরা তো অনেক কাজ করলি, এবার আমার একটু নিরিবিলি কাজ করাতে দে।’

‘কী কাজ করবে তুমি?’

‘চিন্তা করব। একটা আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি অঙ্ককারোর মধ্যে। সেইটে আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনি ভাবুন; আমি আপনাকে কোনওরকম ডিস্টার্ব না করে এক কাপ চা খাব। তপেশ ভাই, তেতরে একটু বলে দিয়ে এসো না।’

ফেলুদা দেখলাম ভুকুটি করে চোখ বুজে ফেলেছে। শেষটায় কি ও ঘরে বসেই রহস্যের সমাধান করে ফেলবে নাকি?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ও একটা প্রশ্ন করল।

‘এই সব অভিনেতাদের সঙ্গে যে কথা বললি, এদের কারুর মধ্যে কোনও বাতিক লক্ষ করলি?’

আমি বললাম, ‘ডুঞ্জিশ গায় নসি দেন; ক্ষেত্রীক্ষণ্যাল বিড়ি থান আর সুধেন্দু চক্রবর্তী মশলা খান।’

‘ওড়।’

আবার ক্ষিতিজে নিষ্কৃত। ইতিমধ্যে শ্রীমাখ লালমোহনবাবুকে চা এনে দিয়েছে ভদ্রলোক বেশ তৃপ্তি সহকারে পান করছেন। আমি একটা পত্রিকার পাতা উলটে যেতে লাগলাম। ফেলুদার কাছে নানা ঝরক্ষ পত্রিকা আসে, তার বেশির ভাগই অবিশ্বা ওয়েস্ট পেপার বাক্সে চলে যায়।

মিনিট পাঁচেক নিষ্কৃতার পর ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি ও চোখ খুলেছে, আর সেই চোখ ঝুলঝুল করছে।

‘লালমোহনবাবু’, চাপা স্বরে বলল ফেলুদা।

‘আজে?’

‘এই যে সুধেন্দু চক্রবর্তী—ইনি কি মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক?’



‘হ্যাঁ’

‘ফরসা রং?’

‘হ্যাঁ’

‘বছর চলিশ-পঁয়তালিশ বরস?’

‘হ্যাঁ—কিন্তু আপনি একে চেনেন নাকি?’

‘শুধু আমি নয়, আপনারাও চেনেনা’

‘চেনেন কি?’

‘এবার বোধহয় ঘরে বসেই রহস্যোদ্ঘাটন হয়ে গেলা।’

‘আর্যা!’

‘দাঁড়ান, আগে ইনসপেক্টর ভৌমিককে একটা ফেন করিব।’



আমি ফেনুদার হয়ে নম্বুরটা ভায়াল করে ফোনটোকে দিকে এগিয়ে দিলাম। ফেনুদা বলল, ‘কে, হরিদাসবাবু! আমি অদোষ মিত্র কথা বলছি।—শুন, ওই অস্রা খিয়েটাৱেৰ মামলাটা—আমার মনে হয় গুণ্ডাদেৱ পিছনে সময়লাট না কৰাই ভাল, কাৰণ আমি জেনে গেছি কে খুনটা কৰেছে। আমি তো চলৎশক্তিৱহিত। কাজেই আপনাকেই আসতে হবে আমার কাছে। আমি নাইনটি নাইন পার্শ্বে সিৱে... হণ্টা খানেকেৱ মধ্যে এলেই হবো।’

ফেনুদা কেৱল রেখে দিল। আমুৰা ওৱ মুখেৱ দিকে চেঁচে উঠেছিল।

‘খুব জানতে ইচ্ছে কৰছে, তাই নাঃ ঠিক আছে। তোদেৱ আৱ সাসপেক্সে রাখব না। ব্যাপৰটা জলেৱ মতো সোজা, অথচ জিলিপিৰ মতো পৌচলো। একটা কথা বলতেই হবে হ্যাট্স অফ টু দ্য মার্ডারার। আশৰ্য্য ফনি এঁটেছিল। ফেনু মিত্রৰে পৰিষ্ঠ ধৌকা লেগে গিয়েছিল। আসলে এটা ব্ৰেফ ঈধাৰ ব্যাপৰ। লেপাল লাহিড়ীকে সৱিয়ে প্ৰধান অভিনেতাৰ স্থান দখল কৰাৰ চেষ্টা; তাৰ জন্যেই খুন।’

‘কিন্তু মহীতোব রায়?’

‘তিনি খুন হননি।’

‘আঁ!’

না। তিনি এমনভাবে ঘটনাটাকে সাজিয়েছিলেন—হ্যাকি চিঠি থেকে আরম্ভ করে—হাতে মনে হয় তিনি খুন হয়েছেন। আসলে তিনি এখনও জীবিত এবং বহাল তবিয়তে রয়েছেন ছদ্মবেশে এবং নতুন শিকান্য। নেকে গিয়েছিলেন তিনি শুধু মশলার কৌটোটা ফেলে আসতে। তারপর গা ঢাকা দিলেই লোকের সন্দেহ হবে যে তিনি খুন হয়েছেন এবং তাঁর মৃতদেহ লেকের জলে ডুবে রায়েছে।’

‘আশ্চর্য মাথা বটে লোকটার।’

‘তারপর তিনি খাসে দাঢ়ি গৌঁফ গজিয়ে অঙ্গুলা খিয়েটারে আগমন। দাঢ়ি গৌঁফে শানুবের চেহারা একদম বদলে যায়। তাই আপনারা চিনতে পারেননি। অস্বাতে অভিনেতা দরকার—সুতরাং ওকে না মেওয়ায় কোনও কারণ নেই, খিশেষত যখন সুপুরুষ চেহারা আর কঠিন ভাল।’

‘সুখেন্দু চক্রবর্তী।’

ইয়েস স্যার। মশলার অভ্যাস এখনো যায়নি—যদিও আপনাদের সামনে যেযে লোকটা কাঁচা কাজ করছেন আই হোক, তাঁর প্রাপ্ত একেবারে ষেলো আনা সম্ভব ন্তু। যদি না আপনারা আমাকে সাহায্য করতেন। লোকটা একটা পাকা খুনি বনে গিয়েছিল সেফ উচ্চাভিলাখের বশেই আংটি চুরিটা অবশ্য সেফ ভাঁওতা। কিন্তু ফেলু মিতিরকে তো সে চেনে না। আমার কাছে এসে যে কত বড় ভুন করেছে এবার সে বুঝতে পারবে।’

ফেলুদা যে ব্যাপারটা কিছি ধরেছিল সেটা অবিশ্য পরদিনই ইনসপেক্টর তোমিকের টেলিফোনে জানা গেল।

লালমোহনবাবু আমাকে আলাদা পেয়ে বললেন, ‘তোমার দাদার সঙ্গে আমাদের জৰুতটা কেওধা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।’

‘কোথায় তক্তা?’

লালমোহনবাবু তাঁর টাকের উপর ডান হাতের তর্জনীর ডগা দিয়ে টোকা মেরে বললেন—‘মাথায়।’

ভূমি ভয়ংকর

Pradosh C. Mitter

Private Investigator



চুম্বক ভয়ংকর

১

‘এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?’ এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়—‘যা গন্গনে গরম পড়েছে, আর তো এখানে থাকা যায় না ।’

‘কোথায় যাওয়া যায়, সেটা আপনিই বলুন না’, বলল ফেলুদা । ‘অমগ্নের নেশা তো আপনার আরও প্রবল । আমি তো ইচ্ছা করলে বারো মাস কলকাতায় পড়ে থাকতে পারি ।’

‘আপনার হাতে এখন কোনও কেস নেই তো ?’

‘তা নেই ।’

‘তা হলে চলুন বেরিয়ে পড়ি ।’

‘কোথায় যেতে চাইছে আপনার মন ?’

‘পাহাড় তো বটেই ; আর পাহাড় বলতে আমি হিমালয়েই বুঝি । বিস্ত্র, ওয়েস্টার্ন ঘাটস—এ সব আমার কাছে পাহাড়ই লম্বা । আমার মন যেখানে যেতে চাইছে, সেখানে না গেলে নাকি জগ্নাই বৃথা ।’

‘কোথায় ?’

‘এত হিন্টস দিলুম তাও বুঝতে পারবেনআ ?’

‘ভূম্বর্গ ?’

‘এগজ্যাস্টলি ! কাশীর ! প্যারাডাইজ অন আর্থ । রোজগার তো বলতে নেই, দুজনেরই অনেক হল । সংসার আপনারও নেই, আমারও নেই । এত টাকা জমিয়ে রাখছি কার জন্য ? চলুন বেরিয়ে পড়ি—ক্যালকাটা টু ডেল্হি, ডেল্হি টু শ্রীনগর ।’

‘শ্রীনগরই তো কাশীরের একমাত্র দেখার জায়গা নয় । আরও আছে ।’

‘সবই দেখা যাবে একে একে ।’

‘পাহালগাম, গুলমার্গ, খিলেনমার্গ—অনেক কিছু দেখাব
আছে ।’

‘তা কেশ তো ; দিন পলোরো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি । একটু
ঘোরাঘুরি না করলে আমার মাথায় প্লট আসে না । পুজোর জন্য
একটা কিছু লিখতে হবে তো ।’

‘আপনার অন্ত অনেস্টির প্রয়োজন কী জানি না । আর পাঁচ জন
যাবা লিখছে, সব বিদেশি খিলাফ থেকে প্লট সগ্রহ করছে । ত্বর
ভাষায় বললাম, আসলে শ্রেফ চুরি ছড়া আর কিছুই না । আপনিও
এখার লেগে পড়ুন ।’

‘হ্যাঁ, আমি চুরি করি আর শেষটায় আপনিই গালমন্দ করুন ।
আপনার কথার শেষ ভুজালির চেয়েও তীক্ষ্ণ ।’

‘তা হলে যেভাবে চলছে চলুক—থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি
থোড় ।’

‘তা না হয় হল, কিন্তু কাশীর যাবার ব্যাপারটা কোথায়
দাঁড়াচ্ছে ?’

‘হাউসবোটে থাকবেন তো ?’

‘শ্রীনগরে ?’

‘শ্রীনগর ছাড়া আর হাউসবোট নেই । ঝুল লেকের উপরে
থাকা যাবে ।’

‘সেই তো ভালো—তাই নয় কি ? ক্ষেত্র একটা নতুন অভিজ্ঞতা
হবে ।’

‘অনেক খরচ কিন্তু । তার চেয়ে বেধ হয় হোটেল শস্তা ।’

‘ও সব খরচের কথা শুনতে চাই না । ব্যাকে অনেক জমে
আছে—ইনকাম ট্যাক্স দিয়েও । যাৰ—গিয়ে ম্যাঞ্জিমাম ফুর্তি যাতে
হয়, তাই কৰব ।’

‘তা হলে শ্রীনগরে হাউসবোট, পাহালগামে তাঁবু আৰ শুলমার্গে
সংগ ক্যাবিন ।’

‘চমৎকার ! টুরিস্ট অফিস থেকে সিটারেচের নিয়ে আসব, তাৰপৰ
দিন ক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাবে ।’

কাশ্মীরের প্রস্তাবটা ফেলুন্দারও মনে ধরেছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম। লালমোহনবাবু ঘন্টা দু-এক আজড়া মেরে চলে যাবার পর ফেলুন্দা টুরিস্ট অফিসে গিয়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে চলে এল। বলল, 'মনস্তির যথন করেই ফেলা হয়েছে, তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ সোমবার; শনিবার নাগাত বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'ঠাণ্ডা হবে না ওখানে ?'

'তা হবে, এবং তার জন্যে তৈরি হয়ে যেতে হবে।'

'লালমোহনবাবু সেটা জানেন তো ?'

'নিশ্চয়ই জানেন। তবে সাবধানের মার নেই। কাজেই ওঁকে সেটা ফেলে জানিয়ে রাখা দরকার। এমনিতেই তো শীতকাতুরে।'

দু দিনের মধ্যে লাঙ্গি থেকে আমাদের শীতের কাপড় এসে গেল। ঠিক হল, প্রথমে শ্রীনগরেই দিন সাতেক থাকা হবে, তার পর অন্য জায়গাগুলো দেখা যাবে। হাউসবোট কাশ্মীর টুরিজ্ম থেকে ব্যবস্থা করা হল। একটা হাউসবোটে একটা পুরো ফ্যামিলি থাকতে পারে। তাই তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। আমিস্সা গিয়ে পড়া পর্যট কল্পনাই করতে পারছিলম না 'ব্যাপারটা' কি বকম হয়। নৌকোয় থাকা। তাও আবার লাঞ্চারি নৌকো। বোধ হয় জমিদারি আমলের বজরার মতো। পুস্তিকায় ছবি দেখে বুঝলাম যে হাউসবোটগুলো কটেজের মতো দেখতে। সেই সঙ্গে আবার ছেট ছেট নৌকোর ছবিও দেখা যাচ্ছে, যাতে করে ডাল লেকে ঘুরে বেড়ানো যায়; কারণ হাউসবোটগুলো নড়েচড়ে বেড়ায় না।

ফেলুন্দাকে বললাম, 'যা বুঝছি শ্রীনগর শহরটায় দেখবার জিনিসের মধ্যে আছে কিছু বিখ্যাত মোগল বাগান। তবে পাহাড়ের উপত্যকা, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে ঝিলাম বয়ে চলেছে, তা ছাড়া দু'-তিনটে লেক, পপলার, ইউক্যালিপটাস, চিনার গাছের সারি—মনে হয় জায়গাটা খুব সুন্দর। তবে গুলমার্গ পাহাড়গামও কিছু কম যায় না। পরে যদি ১১,০০০ ফুট খিলেনঘার্গে ওঠা যায়,

তা হলে সেখান থেকে নাঙ্গা পর্বতের নাকি একটা অন্তর্ভুক্ত ভিড় পাওয়া যায়। পনেরো দিনের জন্য খুব দুব জমজমাট টুর, কাজেই চিন্তা করার কিছুই নেই।'

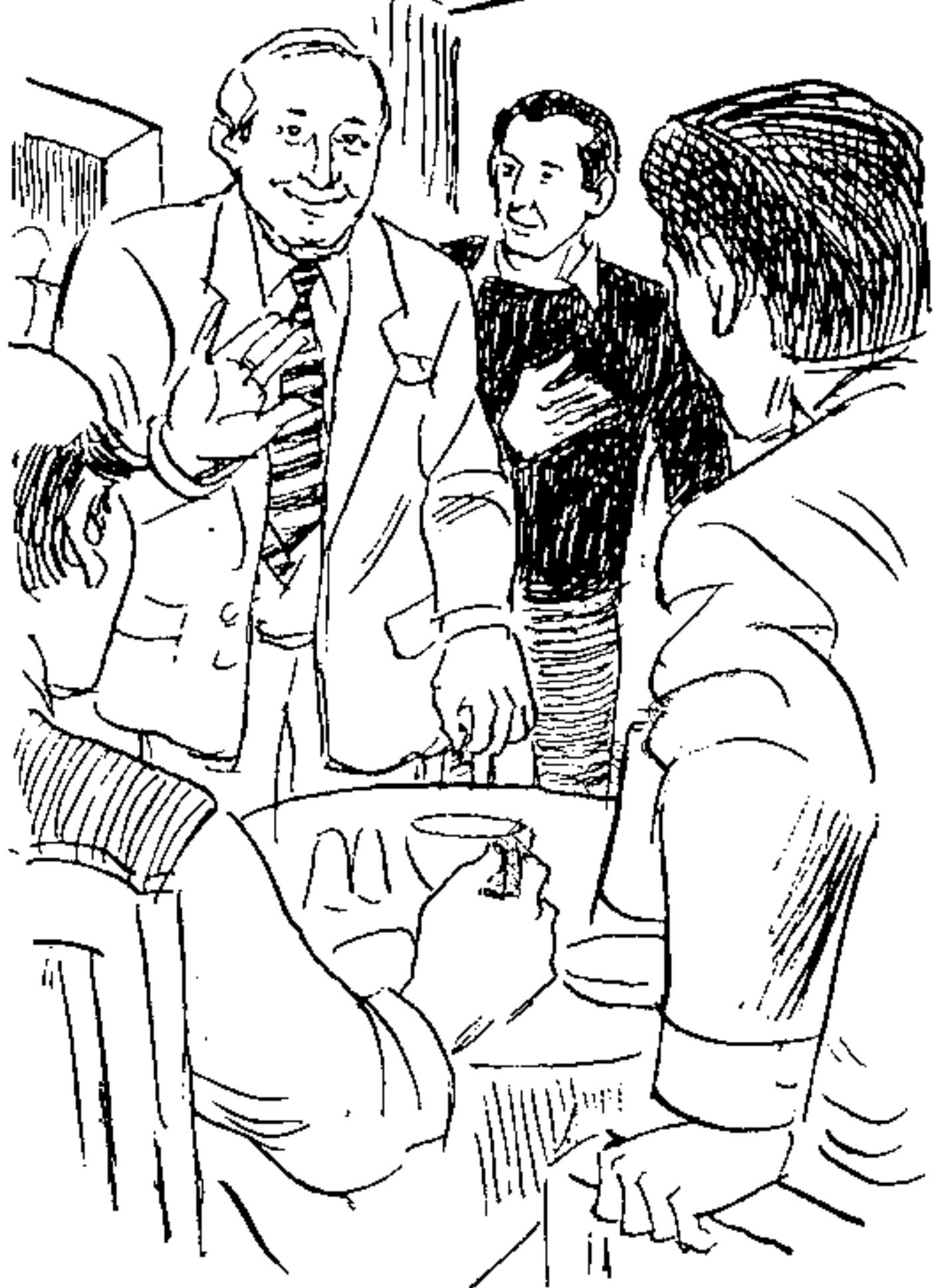
প্র্যানমাফিক আমরা শনিবারই বেরিয়ে পড়লাম। এবার প্লেনে তিনজনের এক লাইনে সিটি পড়েনি বলে লালমোহনবাবুকে আলাদা বসতে হল। ভদ্রলোক দেখলাম তাঁর পাশের একটি বাঙালির সঙ্গে খুব আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। দিল্লীতে এয়ারপোর্টে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সহযাত্রীটি কে ছিলেন মশাই?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'নাম সুশান্ত সোম, এক বিটায়ার্ড জজের সেক্রেটারি। দলেবলে কাশীর চলেছেন। তাঁরাও হাউসবোটে থাকবেন। ভদ্রলোক তোমার দাদাকে দেখেই চিনেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোনও তদন্তে যাচ্ছি কি না। একবার মনে হল বলি হ্যাঁ, তারপর মাইন্ড চেঞ্জ করে সত্ত্ব কথাটাই বলে দিলুম।'

চারিদিকে বাঙালির ভিড়, তাদের অনেকের কথাবার্তা শনেই মনে হল, তাঁরাও কাশীর যাচ্ছেন। শ্রীনগরের প্লেন ছাড়তে আরও তিন ঘণ্টা দেরি। তার মধ্যে আমরা আর এক ঘণ্টা চা খেয়ে নিলাম। রেস্টোর্যান্টে লালমোহনবাবুর আলাপী ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। উনি আমাদের ফ্লাইসের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'আমার নাম সুশান্ত সোম,' ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন—'আপনার বন্ধু মিঃ পাস্কুলির সঙ্গে আলাপ হল, তাই ভাবলাম সুযোগ যখন মিলেছে। তখন আপনার সঙ্গেও আলাপটা সেরে নিই। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। আপনার তদন্তের কথা অনেক পড়েছি। দাঁড়ান, আমার বস্ত্র ইয়তো আপনাকে দেখলে খুশি হবেন।'

রেস্টোর্যান্টের দরজা দিয়ে আরও দল চুকেছে। সুশান্তবাবু তাদের দিকেই এগিয়ে গেলেন। জনা চারেক ভদ্রলোক, তার মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, প্রায় বৃদ্ধ বলশেই চলে। সুশান্তবাবু তাঁকে ফিস ফিস করে কী বলতে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।



ফেলুদা উঠে দাঁড়াল ।

‘বসুন বসুন—উঠছেন কেন?’ বললেন ভদ্রলোক । ‘আমার নাম সিদ্ধেশ্বর মল্লিক । আমি প্রায় সারা জীবন কাইমের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই প্রথম একজন প্রাইভেট ডিটেক্টিভকে দেখলাম ।’

ফেলুদা বলল, ‘কাইমের সঙ্গে যুক্ত মানে—?’

‘আমি একজন রিটায়ার্ড জজ । বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি । এখন সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছি । শরীরও কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে পড়েছে—সঙ্গে ডাক্তার নিয়ে ঘুরতে হয় । ছেলেও আছে, বেয়ারাও আছে । আর আছে প্রাইভেট সেক্রেটারি । এই ইনি । সুশাস্ত্র খুব কাজের ছেলে । একে ছাড়া চলে না আমার ।’

‘আপনারা শ্রীনগরেই থাকবেন?’ জিজেস করল ফেলুদা ।

‘আপাতত । তবে ইচ্ছে আছে কাশ্মীরটা একটু ঘুরে দেখার ।’

‘আমাদেরও এই একই প্ল্যান’, বলল ফেলুদা । ‘শ্রীনগরে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে । আপনারা কি হাউসবোটে থাকবেন?’

‘হ্যাঁ । হাউসবোটটা একটা ইউনিক ব্যাপার । আমি সিঙ্গাটি ফোরে একবার এসে থেকে গেছি । ইয়ে, এন্নাৰ সঙ্গে তো আলাপ হল না—’ ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে ঝিঁকে রেখেছেন ।

‘আমিও কাইম’, বলল জটায়ু । ‘আমি একজন বাহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক ।’

‘ওরে বাবা ! তা হলে তো ক্রিমিনাল ছাড়া সবাই উপস্থিত দেখছি...ঠিক আছে । দেখা হবে শ্রীনগরে । আমরাও একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি গিয়ে ।’

২

আকাশ থেকে শ্রীনগর উপত্যকার এক রূপ, আর মাটিতে লেমে আর এক রূপ । চোখ জুড়িয়ে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই । আর এও ঠিক যে, এ জায়গার সঙ্গে দার্জিলিং-সিমলার কোনও মিল নেই । শ্রীনগরের দৃশ্য একেবারে অনন্য । সেটা আরও বেশি করে

বুঝতে পারলাম ট্যাঙ্কিতে করে শহরে আসার সময়। শহর থেকে এয়ারপোর্ট সাত মাইল। একবার মনে হয়েছিল উপত্যকা বলে বুঝি অনেকটা কাঠমান্ডুর মতো হবে, কিন্তু তার পর লেক আর বিলাম নদী দেখে সে ধারণা একদম পাপেটে গেল।

আমাদের যেতে হবে ডাল লেকের দক্ষিণে শহরের বাস্তা বুলেভার্ড। আধ ঘণ্টায় বুলেভার্ডে পৌছে গেলাম। লেকের এ দিকটা পাকা গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা। ঘাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছেট নৌকোয় গিয়ে উঠতে হয়। এই নৌকোকে এখানে বলে শিকারা। ভেনিসে যেমন জলপথে যাতায়াতের জন্য গঙ্গোপা, এখানে তেমনি শিকারা। আমাদের ইউসবোটের নাম ‘ওয়াটার লিলি’। ‘ওয়াটার লিলি’র শিকারাও ঘাটেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা মালসমেত তাতে গিয়ে উঠলাম। তার পর পক্ষাশ হাত খানেক গেলেই পাশাপাশি সার বাঁধা আর হাউসবোট নেই। যা আছে, সবই লেকের পশ্চিম অংশে।

শিকারা থেকে বোটে উঠতে কোনও কসরতের দরকার হয় না, খুবই সহজ ব্যবস্থা। বোটের সামনের দিকে খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে ইচ্ছা করলে বস্য যায়, আবার সিঁড়ি-সিঁড়িয়ে উপরের ডেকে ওঠার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে চেয়ারে বসে চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করা যায়, চা খাওয়া যায়, আর স্নেক-জার্ভাও মারা যায়।

ভিতরে চুকলে প্রথমেই বসবার ঝর, তাতে সোফা, চেয়ার, কাপেটি ইত্যাদি বৈঠকখানার ঘাবতীয় সঞ্চার রয়েছে, দেয়ালে ছবি রয়েছে, ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আবার একটা ছেট লাইব্রেরি ও রয়েছে। বসবার ঘরের পরে খাবার ঘর, দুটো বেডরুম, বাথরুম ইত্যাদি। সব মিলিয়ে জলের উপর একটি বাংলো বাড়ি, যাতে সব রুকম ব্যবস্থা আছে। কিনেও আছে, তবে সেটা পিছন দিকে একটা ছেট আলাদা নৌকোয়।

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি লেগেই আছে, বললেন, ‘ভাগিয়স ডিসিশনটা নিয়েছিলাম। এর ক্রেতিটি কিন্তু সবটাই আমার পাণ্ডা। তোমার দাদা ভুবগের কথা ভাবেননি।’

ফেলুদা বলল, ‘আমি তো আপনার মতো লেখক নই।

আইডিয়া আসা উচিত আপনার মাথা থেকে । ধাকগে, এখন আগে একটু চা খেয়ে শিকারায় করে লেকটা একবার ঘুরে দেখা যাক ।’

দুজন চাকর রয়েছে হাউসবোটের সঙ্গে, নাম মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা ।

চা খেয়ে বেরোতে সূর্য হলে এল পশ্চিমে । মে মাস হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা ; আমাদের কলকাতায় শীতের সময় যে পোশাক পরতে হয়, এখন এখানেও তাই পরতে হয় । ফেলুদা বলল, ‘আজ শুধু লেকটা ঘুরে দেখা যাবে, কাল থেকে সাইট সিইং আরও হবে । বুলেভার্ডের পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় রয়েছে, এক হাজার ফুট উচু । ওর মাথায় রয়েছে শঙ্করাচার্যের মন্দির । সন্তু অশোকের ছেলে জালুকের তৈরি । তা ছাড়া লেকের পুর দিকে খোগল খাগনে রয়েছে—নিশদবাগ, শ্যালিমার চশমা শাহি—এগুলোও দেখা চাই । চশমা শাহির স্প্রিং-এর জল নাকি একেবারে অমৃত—যেমনই স্বাদ, তেমনি কৃধার্ধক ।’

‘লেকের মাঝখানে একটা ছোট ঝীপ দেখা যাচ্ছে, ওটা কী ?’ অমি জিজ্ঞেস করলাম । অমি জনতাম ফেলুদা কাশীর সম্বন্ধে সব পড়াশুনা করে এসেছে ।

ফেলুদা বলল, ‘ওটাকে বলে চার মিনার । ঝীপটি ইঞ্জের কোণে চারটে চিনার গাছ রয়েছে ।’

মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা শিকারা চালাতে আরও করল, আমরা বাঁয়ে গোটা দশেক হাউসবোট পেরিবে, আসল লেকে গিয়ে পড়লাম । দুটো পাশাপাশি হাউসবোট-লিঙ্গে রয়েছেন রিটায়ার্ড জঙ্গ সিঙ্কেন্সের মল্লিক আর তাঁর সাঙ্গপ্রাঙ্গ । আমরা খোলা লেকে পড়বার আগে একটা বোট থেকে সুশাঙ্ক-সোম আমাদের দিকে হাত নেড়ে বললেন, ‘ফেরার পথে একবার টু মেরে যাবেন । চায়ের নেমন্তন্ত্র রইল ।’

ডাল লেকের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই । স্বচ্ছ কাচের মতো জল, হাওয়া নেই বলে চেড় নেই, তাই আয়নার মতো চারিদিকের পাহাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে । এখানে-ওখানে পদ্ম শালুক শাপলা ফুটে আছে, শিকারা সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে

চলেছে। লালমোহনবাবুকে কবিতায় পেয়েছে, বললেন, 'কাশীর
সম্পর্কে আমাদের এথিনিয়াম ইন্ডিয়ার মাস্টার কৈকুঠ মলিকের
একটা আট লাইনের কবিতা আছে। ভদ্রলোক বহু জায়গায়
ঘূরেছিলেন, আর সেই সব জায়গা নিয়ে পদ্য লিখে গেছেন।
কাশীরেরটা শুনুন ফেলুবাবু, কি রুকম ডিসেন্ট—

করি নত শির
তোমারে প্রণমি কাশীর
কুমারী কার অপর প্রান্তে
অবস্থান তব ভারতের উত্তর সীমান্তে
রাজধানী শ্রীনগর
বিলাম্বের জলে ধোয়া অপূর্ব শহর
কত হৃদ, কত বাগ, কত বাগিচা
অন্য নগরের সাথে তুলনা করিতে যাওয়া মিছ। ...'

'বাং, দিবি', বলল ফেলুদা—ঘদিও বুঝালাম সেটা জটায়ুর মনে
কষ্ট না দেবার জন্য। কবিতায় লালমোহনবাবুর কঢ়িটা যে একটু
গোলমেলে, তার পরিচয় এর আগেও অনেকবার পেয়েছি।

শুধু কবিতা নয়, ডাল লেকের দৃশ্যে ভদ্রলোককে গানেও
পেয়েছে। শুনগুন করে কী গাইছেন জিজেস করাত্তে বললেন উর্দু
গজল।

এদিকে সন্ধ্যার আলো অনেক বেশিক্ষণ থাকে—অন্তত বছরের
এই সময়টায়। আমরা সাড়ে সাতটুয়া ব্যথা/কিবর্ছি, তখনও পুরো
অঙ্ককার হয়নি।

সুশান্ত সোম তাঁদের হাঁটসবোটের সামনের বারান্দায়
দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'আসুন, একটু আভ্যন্তর মারা যাক।'

আমরা এঁদের বোটের সামনে শিকারা দাঁড় করিয়ে ওপরে
উঠলাম। এঁদের বোটের নাম 'রোজমেরি'। এঁদের পাঁশেই রয়েছে
ঁদের অন্য বোট, সেটার নাম 'মিরান্তা'। 'রোজমেরি'-তে থাকেন
সুশান্ত সোম আর জ্জ সাহেবের ছেলে, নাম বিজয় মলিক।
'মিরান্তা'-তে আছেন মিঃ মলিক, তাঁর ডাকনাথ মজুমদার

আর বেয়ারা প্রয়াণ।

চায়ের অর্ডার দিয়ে উপরের ডেকে উঠে সুশান্ত ফেলুদাকে
বললেন, 'আপনার তাস চলে ? তিন-তাস ?'

'অভ্যন্তর নেই', বলল ফেলুদা, 'তবে তাসের প্রায় সব যেলাই
মেটামুটি জানা আছে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

'মীচের বৈঠকখানায় তাসের আভাজ জমেছে।'

'এত লোক পেলেন কোথায় ?'

'প্রেমে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিজয়ের। একজন
বাঙালি, নাম সরকার; আর একজন পাঞ্চাবি। তিনি জনেই
জুয়াড়ি।'

আমরা চারজনে বসলাম। সত্তি, কলকাতা যে কোন সুদূরে
চলে গেছে, তার কোনও হিসাবই নেই। হাউসবোটের টপ ডেকে
বসে তা খাওয়ার আয়োজন—এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের
ডান দিকের হাউসবোটে সাহেবেরা এসে উঠেছে—সেখান থেকে
বিলিতি বাজনার শব্দ আসছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে
সাহেব-মেম সেই বাজনার সঙ্গে নাচছে সামনের বৈঠকখানায়।

ফেলুদা সুশান্তবাবুকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'মিকেশ্বরবাবু
ক'দিন হল রিটায়ার করেছেন ?'

'পাঁচ বছর', বললেন সুশান্তবাবু। 'ওর তখন ষাট বছর বয়স।'

'কিন্তু জজের তো রিটায়ার করার কোনও অধিকার্যকতা নেই।'

'ওর শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অ্যানজাইন।
ভদ্রলোকের রিটায়ার করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাক্তারের কথায়
বাধ্য হয়ে করতে হয়। উনি বহু অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।
এক-এক সময় বলেন, 'আমার শেষ জীবনে দুঃখ আছে। এত
লোককে ফাঁসিতে পাঠালে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। উনি
ভায়েরি লিখতেন; সে ভায়েরি সব এখন আমার হাতে, কারণ আমি
ওর একটা জীবনী লিখছি—যদিও সেটা আমাজীবনী হিসেবেই
বেরোবে। সেই ভায়েরিতে উনি যেদিনই কারুর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন
সেদিনই সাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে রেখেছেন। শাবে শাখে
জসের সঙ্গে একটা প্রথমোধিক চিকিৎসায়েছে। সেটাতে বুরাতে হবে,

প্রাণদণ্ড দিয়ে নিজেরই মনে একটা প্রয় জেগেছে এটা ঠিক হল কি না। এখন কী করছেন জানেন? ওর যে ডাক্তার—মজুমদার—তিনি তালো মিডিয়াম—তাঁর সাহয়ে প্ল্যানচেট করছেন, আর ফাঁসির আসামীর আত্মাদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞেস করছেন, তারা সত্যিই খুন করেছিল কিনা। আত্মা যদি বলে যে হ্যাঁ, সে সত্যিই খুন করেছিল, তা হলে উনি খানিকটা নিশ্চিন্তবোধ করেন। এখন পর্যন্ত ওর জাজমেন্টে কোনও ভুল বেরোয়নি।’

‘আপনারা কি এখনে এসেও প্ল্যানচেট করবেন নাকি?’

‘সেই জন্যেই তো ডাক্তারকে একই হাউসবোটে রেখেছেন। ওর অ্যানজাইনটা এখন অনেকটা কন্ট্রোলে এসেছে। আসলে ডাক্তার সঙ্গে এসেছেন প্ল্যানচেটের জন্য।’

‘আজ রাত্রেও কি আপনাদের প্ল্যানচেট হবে।’

‘আজ হয়তো হবে না, কিন্তু দু’-এক দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। ...কেন বলুন তো?’

‘আমি ইন্টারেস্টেড’, বলল ফেলুন। ‘অবশ্যি উনি আমার উপস্থিতি বরদাস্ত করবেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন।’

‘সেটা আমি বলে দেখতে পাবি। উনি আপনার প্রতি বেশ প্রসন্ন, সেটা আমি এর মধ্যেই বুঝেছি। আর ওঁর নিতে প্ল্যানচেটের ব্যাপারে উনি কোনও গোপনতা অবলম্বন করবেন না। যা ফলাফল হয়, সবই তো ওর আত্মজীবনীতে ঘূরবে।’ আমি তো সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখছি।’

‘তা হলে আপনি একটু জিজ্ঞেস করে জানাবেন।’

‘নিশ্চয়ই।’

আমরা চা খাওয়া শেষ করে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে নিজেদের বোটে চলে এলাম। বৈঠকখানায় ঢুকে সোফায় ধপ করে বসে পড়ে লালমোহনবাবু বললেন, ‘হাত্তিলি ইন্টারেস্টিং ম্যান—দিস্ জজ সাহেব।’

‘ইন্টারেস্টিং তো বটেই’, বলল ফেলুন, ‘তবে উনিই একমাত্র জজ নন, যাঁর এইরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ রকম ঘটনা

দেশে-বিদেশে আগেও শোনা গেছে ।'

‘ভালো কথা—আপনার সঙ্গে আমার পারমিশনটাও চেয়ে
রাখবেন। প্র্যানচেট দেখার সুযোগ ছাড়া যায় না।’

৩

দেখতে দেখতে ঢার দিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন
শহরটা ঘুরে দেখলাম। লালমোহনবাবু একটা ‘হটেল’ ক্যামেরা
কিনেছেন, তাই দিয়ে পটাপট ছবি তুলছেন। সেগুলো শহরের
মাহস্তা অ্যান্ড কোম্পানিতে ডেভেলাপ আর প্রিস্ট করে দেখা গেল
মন্দ ওঠেনি। যদিও লালমোহনবাবুর নিজের মন্তব্য ‘হাইলি
প্রোফেশনাল’ মোটেই মানা যায় না।

নিশাদবাগ, শালিমার আর চশমা শাহিও এক সকালে বেরিয়ে
দেখে এলাম। মন্টা চলে গেল সেই জাহাঙ্গির শাজাহানের
আমলে। এই ট্রিপটা আমরা করেছিলাম মল্লিক ফ্যামিলির সঙ্গে,
ফলে তাদের সঙ্গে আলপটাও আরও জ্যে উঠল। সিঙ্গেরবাবু
ফেলুদাকে বললেন, ‘আপনি শুনছি আমার প্র্যানচেট সমক্ষে
কৌতুহল প্রকাশ করেছেন। আপনি প্র্যানচেটে বিশ্বাস করেন?’

‘আমার মন্টা খুব খোলা, জানেন, বলল ফেলুদা। ‘প্র্যানচেট,
স্পিরিচুয়ালিজম ইত্যাদি সমক্ষে আমি অনেক পড়েছি। পরলোকের
সঙ্গে যোগাযোগ করা যে সম্ভব, সেটা ব্রহ্মজ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলে
গেছেন; সেক্ষেত্রে প্র্যানচেট সমক্ষে অবজ্ঞা প্রকাশ করার কোনও
মানে হয় না। তবে যেমন সর্বক্ষিণী মধ্যে থাকে তেমনই এর মধ্যে
ধাপ্তাবাজি চলে। আসলে মিডিয়ম যদি বাঁচি হয়, তাহলেই ব্যাপারটা
বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।’

‘ডাঃ মুফামদার ইজ এ ফার্স্ট রেট মিডিয়ম। আপনি একদিন
বসে দেখুন না।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আমার বক্স আর আমার ভাইও আসতে চায়।’

‘মনে বিশ্বাস থাকলে কোনও লোকের আসাতেই আমার আপত্তি
নেই। আজই আসুন। ভালো কথা, আমি কাদের আস্তা নামাছি,

জানেন তো ?'

'যে সব লোককে আপনি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন, তাদের তো ?'

'হ্যাঁ । আমি জানতে চাইছি, আমার জাজমেঝে কোনও ভুলে হয়েছে কি না । এখন পর্যন্ত সে রকম ভুল পাইনি ।'

'আপনারা বোজ একটি করে আস্বা নামান ?'

'হ্যাঁ । একটাৰ বেশিতে ডাক্তারেৰ ট্ৰেইন হয় ।'

'তা হলৈ ক'টাৰ আসব ?'

'আসুন রাত দশটায় । ডিনারেৰ পৰ বসা যাবে । তখন চারিদিকটা বেশ নিষ্ঠৰ্জু হয়ে যাব ।'

ডিনারেৰ পৰ আমরা মিঃ মল্লিকেৰ হাউসবোটে গিয়ে হাজিৰ হলাম । বসবাৰ ঘৰে প্ল্যানচেটেৰ ব্যবস্থা হয়েছে । একটা টেবিলকে ঘিৰে পাঁচটা চেয়াৰ রাখা হয়েছে ; বুৰুলাম চেয়াৰগুলো খাৰাৰ ঘৰ থেকে আনা হয়েছে । আমরা আৱ সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেলাম । মিঃ মল্লিক বললেন, 'আজি আমরা রামস্বৰূপ রাউত বলে একটি বিহারী ছেলেৰ আস্বাকে নামাব । এই ছেলেটিৰ আজি থেকে দশ বছৰ আগে ফাঁসি হয়, এবং আমিই সে ফাঁসিৰ জন্য দায়ী ছিলাম । আমাৰ বিশ্বাস : এৰ ফাঁসিৰ দণ্ড হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু জুৱিৰ ভাস্তিক ছিল গিল্টি, আৱ খুনটাখুনি ছিল একটু নশংস ধৰনেৰ । তাই আমি সাময়িক ভাস্তিবশত জেনেগুনেও প্রাণদণ্ডেৰ আদেশ দিই । যদিও আমাৰ ঘনে এইজ্ঞানদেশেৰ যথাৰ্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল । কেসটা এমন্তৰে ভাবে সাজানো হয়েছিল, যাতে ছেলেটিকে অপৰাধী ঘৱেলাই ঘনে হয় । ...মজুমদাৰ তুমি তৈৰি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ।'

জানালাৰ সব পৰদা টেনে দিয়ে ঘৰটাকে একেবাৰে অন্ধকাৰ কৰে দেওয়া হয়েছিল । আমরা সকলে যে যাৱ জায়গায় বসেছি । আমাৰ ডান দিকে ফেলুদা, বাঁ দিকে লালমোহনবাবু, ফেলুদাৰ ডান পাশে মিঃ মল্লিক আৱ তাৰ পাশে—লালমোহনবাবুৰ বাঁ দিকে—তাৰ মজুমদাৰ ।

মিঃ মল্লিক গভীরভাবে বললেন, 'ছেলেটির বয়স ছিল উনিশ। শার্প চেহারা, নাকের নীচে সরু গোঁফ, গায়ের রং পরিষ্কার। বিহারের ছেলে—নাম রামসুজপ রাউত। ছুরি দিয়ে খুনের মামলা, ঘটনাস্থল কলকাতার বাগবাজারের একটা গলি। ছেলেটিকে দেখে কিন্তু খুনি বলে মনে হয়নি। আপনারা নিজেদের কঞ্চন অনুযায়ী একটা চেহারা স্থির করে নিয়ে তাতে মনসংযোগ করতে চেষ্টা করুন। প্রশ্ন আমিই করব, উন্নত মজুমদারের মুখ দিয়ে আসামীর কষ্টস্বরে বেরোবে।'

পনেরো মিনিট এইভাবে অন্ধকারে বসে থাকার পরই বুঝালাম টেবিলটা আস্তে আস্তে নড়তে আবস্ত করেছে। তার পর আরও জোরে দোলানি শুরু হল। আমি কন্ধশাসে অপেক্ষা করতে আগলাম।

মিনিট থানেক পরে, মল্লিকমশাই প্রশ্ন করলেন—হিস্তিতে।

'তুমি কে ?'

'আমার নাম রামসুজপ রাউত।'

ডাক্তারের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, কিন্তু কষ্টস্বর সম্পূর্ণ অলাদা। শুনে কেশ গা শিউরে ওঠে।

মিঃ মল্লিক আবার প্রশ্ন করলেন—

'তোমার ফাঁসি হয়েছিল ১৯৭৭ সালে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্ম দায়ী ক্ষতুমি জানো ?'

'জানি।'

'খুনটা কি তুমিই করেছিলে ?'

'না।'

'তবে কে করেছিল ?'

'ছেদিলাল। সে ভয়ানক ধূর্ত ছিল। তার অপরাধ সে অতঙ্গ চতুরভাবে আমার ঘাড়ে ফেলে। পুলিশ আমাকেই দোষী সাবাস্ত করে।'

'আমি সেটা জানি। আমি তোমায় দেখেই বুঝেছিলাম যে, তোমার দ্বারা এ খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি

তোমাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করি ।’

‘সে নিয়ে এখন আর ভেবে কী হবে ?’

‘আমি চাই তুমি আমাকে ক্ষমা করো ।’

‘সেটা আমি খুব সহজেই করতে পারি । তবে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যারা জীবিত আছে, তারা ক্ষমা করবেন কি না জানি না ।’

‘তাদের কথা আমি ভাবছি না । তোমার ক্ষমাটাই আমার প্রয়োজন ।’

‘মৃত্যুর পর আর কারুর ওপর কোনও আক্রেশ থাকে না ।’

‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ।’

মিঃ মল্লিক উঠে গিয়ে ঘরের বাতিটা জালিয়ে দিলেন । ডাঃ মঙ্গুমদারের জ্ঞান আসতে আরও মিনিট দু’-এক লাগল ।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল বটে ।

‘মন্টা অনেকটা হালকা লাগছে’, বললেন মিঃ মল্লিক, ‘এই একটি মৃত্যুদণ্ডে যে আমি ভুল করেছিলাম, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই । এবং এখন তো বুঝতেই পারছি যে আমার ধারণাই ঠিক ।’

ফেলুদা বলল, ‘এই প্ল্যানচেট করে কি আপনি বিজের মন্টাকে হালকা করতে চান ?’

‘শুধু তাই নয়’, বললেন মিঃ মল্লিক, ‘আমার মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ জাগে যে, আদৌ একজন মানুষ আর একজনের প্রাণদণ্ড দিতে পারে কি না ।’

‘কিন্তু তা বলে খুনির শাস্তি হবে না ?’

‘হবে—কিন্তু প্রাণদণ্ডের দ্বারা নয় । কারাদণ্ড নিশ্চয়ই চলতে পারে । তা ছাড়া অপরাধীর সংস্কারের জন্য রাস্তা বার করতে হবে ।’

ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে, তাই আমরা উঠে পড়লাম । মল্লিক বলেন, ‘আমরা গুলমার্গ যাচ্ছি পরশু ! আপনারা আসুন না আমাদের সঙ্গে ।’

ফেলুদা বলল, ‘সে তো খুব ভালোই হয় । ওখানে কি

থাকবেন ?'

‘এক রাত’, বললেন ভদ্রলোক। ‘গুলমার্ক থেকে খিলেনমার্গ যাব—তিন মাইল পথ—হেঁটেও যাওয়া যায়, ঘোড়াতেও যাওয়া যায়। তার পর ফিসে এসে এক রাত থাকা। এখান থেকেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে; আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্সিই আপনাদেরটা করে দেবে।’

সেই কথা রইল। আমরা তিনজনে আমাদের হাউসবোটে ফিরে এলাম।

ফেলুদা শুতে যাবার আগে বলল, ‘মলিকমশাইয়ের ধারণাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। একজন যুনিয়ন প্রাপ্তদণ্ড হবে না, সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। ভদ্রলোকের আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে। অবিশ্য একজন জজের এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।’

‘তবে ভেবে দেখুন’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘এক কথায় একটা লোকের ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে। কতখানি ক্ষমতা দেওয়া থাকে একজন জজের হাতে। এই ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়লে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের মনে সংশয় আসতে পারে বইকি।’

‘সেটা অবশ্য ঠিক’, বলল ফেলুদা।

8

শ্রীনগরের সঙ্গে গুলমার্গের কোনও প্রিলাই নেই। এখানে হুদ, নদী, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি কিছুই নেই; যা আছে, তা হল তেওঁ খেলানো পাহাড়ের গায়ে মসৃণ হন সবুজ ঘাস—যা দেখতে একেবারে ঘনমলের মতো; আর আছে ঝাউ বন আর পাইন বন আর ইত্তেও ছড়ানো কিছু কাঠের ঘর বাড়ি। সব মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর। এই পাহাড়ের গায়েই গল্ফ খেলা হয়। আর শীতকালে যখন ঘাস বরফে ঢেকে যায়, তখন কিংবিং হয়।

শ্রীনগর থেকে টাঁঁমার্গ পর্যন্ত আঠাশ মাইল ট্যাঙ্কি করেই আসতে হয়, তার পর শেষের চড়াই চার মাইল যেতে হয় ঘোড়াতে।

কলকাতায় থাকতেই ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল যে, কাশ্মীরে ঘোড়ায় চড়তে হবে। —‘ভয় নেই, উটের চেয়ে অনেক সহজ।’ লালমোহনবাবু একেবারে পাকাপোক রাইডিং ব্রিচেস করিয়ে এনেছিলেন। গুলমার্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বললেন ঘোড়া চড়ার মতো সহজ ব্যাপার আর নেই।

আমাদের সঙ্গে মল্লিক মশাইরাও এসেছেন। আমরা আজকের রাতটা গুলমার্গে থেকে কাল এখান থেকে তিনি মাইল দূরে আর দু’ হাজার ফুট ওপরে খিলেনমার্গ দেখে বিকেলেই শ্রীনগর ফিরে যাব।

থাকার জন্য আমরা পাশাপাশি দুটো ক্যাবিন নিয়েছি। আমাদেরটা ছেট, ওদেরটা বড়। বিকেলে ক্যাবিনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় তিনজন ভদ্রলোক এসে হাজির—সুশান্তবাবু, সিঙ্কেশ্বর মল্লিকের ছেলে বিজয়বাবু ও আর একজন—যাকে আমরা চিনি না, সুপুরুষ চেহারা, টক্টকে রং, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। সত্য বলতে কি, তিনজনেই মোটামুটি এক বয়সী।

সুশান্তবাবু নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এই নাম অরুণ সরকার। ইনি কলকাতায় ব্যবসা করেন। আমাদের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ। জুয়াডিদের একজন বললে বোধ হয় আপনার চিনতে আরও সুবিধে হবে।’

সকলেই হেসে উঠল। সুশান্তবাবু বললেন, ‘আমরা এসেছি কেন বোধ হয় বুঝতেই পারছেন। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের সঙ্গে আলাপ করতে এরা দুজনেই খুব স্কার্ট। তা ছাড়া শুনছিলাম, আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলিও তো একজন নামী লেখক—ওর সব বই-ই নাকি বেস্ট-সেলার।’

লালমোহনবাবু মাথা হেঁট করে হেঁ হেঁ করে একটু বিনয়ের ভাব দেখলেন।

বিজয় মল্লিক আর অরুণ সরকারের থাতিরে ফেলুদাকে তার গোটা দু’-তিনি বিখ্যাত কেন্দ্রের বর্ণনা দিতে হল। শেষ হয়ে যাবার পর সরকার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কী কাশ্মীরে এই প্রথম ?’

ফেলুদা বলল, ‘হ্যাঁ, এই প্রথম। আমি কিন্ত আপনাকে প্রথমে



দেখে কাশ্মীরী ভেবেছিলাম। আপনি বোধ হয় এখানে আর একবার এসেছেন ?'

'তা এসেছি, বললেন সরকার। 'ইন ফ্যাট্ট, আমার হেলেবেলার কয়েকটা বছর শ্রীনগরেই কেটেছে। বাবা এখানে একটা হোটেলে ম্যানেজারি করতেন। তার পর বছর কুড়ি আগে আমরা কলকাতা চলে যাই।'

'এখানকার ভাষা আপনার জানা নেই ?'

'তা অল্পবিস্তর আছে বইকি।'

এবার ফেলুদা বিজয় মলিকের দিকে ফিরল।

'আপনার বাবার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে আপনার কেনও কৌতুহল নেই ?'

বিজয়বাবু বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

'বাবার ভীমরতি ধরেছে, বললেন বিজয়বাবু। 'একজন খুনি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না।'

'আপনি সে কথা বাবাকে বলেননি ?'

'বাবার সঙ্গে আমার সে রকম সম্পর্ক নয়। উনি আমার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেন না, আমিও ওর ব্যাপারে কিছু বলিবো নি।'

'আহি সি।'

'তবে বাবা যা করছেন তা করে যদি শান্তি পৌরুষ তা হলে আমার বলবার কিছু নেই।'

'আপনার মা নেই ?'

'না। মা বছর চারেক হল মাঝে পেছেন।'

'আর তাই বোন ?'

'এক দাদা ছিল, আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং করত, সে গত বছর মারা যায়। তার মেমসাহেবে বড় আর এদেশে আসেনি। এক বোন আছে, তার স্বামী ভূপালে কাজ করে।'

'আমার বিশ্বাস আপনার কাশ্মীরের দৃশ্য সম্পর্কে খুব একটা কৌতুহল নেই।'

'কী করে বুঝলেন ?'

‘কারণ যে পরিমাণ সময় ঘরে বসে তাস খেলে কাটান !’

‘আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে কাব্য নেই। আমি কাঠখোটা মানুষ। আমার দু’-একজন বন্ধু আর দু’ প্যাকেট তাস হলেই হল !’

সরকার একটু হেসে বলল, ‘আমি কিন্তু তাসও খেলি, আবার দৃশ্যও দেখি। সেটা বোধহয় ছেলেবেলায় কাশ্মীরে থাকার জন্ম হয়েছে।’

‘যাই হোক’—বিজয়বাবু উঠে পড়লেন—‘আমাদের কিন্তু তাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। আজ সুশান্তকে দলে টেনেছি। আপনারা কেউ— ?

‘আমরা ভাবছিলাম একটু ঘুরতে বেরোব। আপনারা এখন কিছুক্ষণ খেলবেন তো ?’

‘এগারোটা পর্যন্ত তো বটেই।’

‘তা হলে ফিরে এসে একবার টুঁ মারব।’

‘বেশ। কাল আবার দেখা হবে।’

তিনি ভদ্রলোক গুডবাই করে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, ‘এখন না বেড়িয়ে আকটার ডিনার ওঝাঝে বেরোলে ভালো হত না ?’

‘তথাক্ত’, বলল ফেলুন।

এখানে ক্যারিনের সঙ্গে বাবুটি রয়েছে, তাকে বলে দিয়েছিলাম রাত্তিরে ভাত আর মুরগির কাবি খাব। স্টেলাম দিবি রান্না করে। সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া হবে গেল। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না, তাই তিনজনেই কেশ উৎসাহের সঙ্গে রাতের গুলমার্গ শহর দেখতে বেরোলাম।

নিরিবিলি শহর, তার মধ্য দিয়ে তিনজন হেঁটে চলেছি। পথে যে লোক একেবারে নেই, তা নয়। ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশি টুরিস্টও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সত্তি বলতে কি, হিসেব নিলে বোধহয় বিদেশি টুরিস্টই সংখ্যায় বেশি হবে। জালমোহনবাবু এখনও গুনগুন করে গজল গাইছেন, খালি শীতের জন্ম গলায় মাঝে মাঝে অযথা পিটকিরি এসে যাচ্ছে।

‘শীত লাগছে ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ।

‘তা লাগছে, তবে মনে হয় যুব স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা ।’

‘তা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এ সব জায়গায় বেশি রাত না করাই ভালো । চ’ তোপ্সে, ফেরা যাক ।’

আমরা উপ্টোমুখে ঘুরলাম । শহর আর আমাদের ক্যাবিনের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে । সেখনটা বসতি নেই বললেই চলে । আমরা সেই জায়গাটা দিয়ে হাঁটছি । এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল । কী যেন একটা জিনিস শন্শন্শন শব্দে আমাদের মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা গাছের গায়ে লেগে মাটিতে পড়ে গেল । ‘আমাদের মাথা’ বলছি, কিন্তু আসলে সেটা ঠিক ফেলুদার কান ধৰ্য্যে বেরিয়ে গেল । ফেলুদার কাছে টর্চ ছিল, সেটা জালিয়ে গাছের তলায় ফেলতেই দেখা গেল বেশ বড় একটা পাথর । সেটা ফেলুদার মাথায় লাগলে নির্ধার একটা কেলেক্ষারি কাণ হত ।

প্রশ্ন হচ্ছে—কে এই লোকটা, যে-এভাবে অক্রমণিকা করল ? আর এর কারণই বা কী ? আমরা তো সবে এখানে এসেছি । এখনও গোলমেলে ব্যাপার কিছু ঘটেনি, তদন্তের ক্ষেত্রে প্রশ্নই উঠছে না, তাহলে এই স্থূলকির মানে কী ?

ক্যাবিনে ফিরে এসে ফেলুদা গভীরভাবে বলল, ‘ব্যাপারটা যোটেই ভালো লাগছে না । আমাকে পছন্দ করছে না কেউ ; এবং গোয়েন্দাকে হটানোর চেষ্টার একটাই ক্ষমতা হতে পারে—কেনও কুকুরি হতে চলেছে । অথচ সেঁজ কৈ কী, সেটা আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই ।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনার সেই ৩২ কোণ্ট রিভলভারটা আশা করি এনেছেন ।’

ফেলুদা বলল, ‘ওটা বাস্তেই রাখা থাকে । কিন্তু রিভলভার ব্যবহার করার সময় এখনই এল কই ? কেনও জাইম তো ঘটেনি এখনও !’

‘হাই হোক, রাত্তিরে দরজা-জানালা সব ভালো করে বক্স করে শুভে হবে । এখানে রিস্ক নেওয়া চলবে না । আশ্চর্য ব্যাপার

মশাই !—আপনার সঙ্গে ছুটিতে কোথাও বেরোলেই কি গঙ্গোল
শুরু হবে ?

ফেলুদা একটু ভেবে বলল, ‘হাই, ওদের সঙ্গে একটু তাস পিটিয়ে
আসি । আমি ঘণ্টা ধানেকের মধ্যেই ফিরব । আপনারা শুয়ে
পড়ুন ।’

৫

আগেই বলেছি যে, খিলেনমার্গ যেতে হলে তিন মাইল পাহাড়ি
রাস্তা দিয়ে দু’ হাজার ফুট উপরে উঠতে হয় । আমরা দুই ক্যাবিনের
বাসিন্দারা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, তাড়াতাড়ি
ব্রেকফাস্ট খেয়ে ন’টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব । সেটাই করা হল ।

আমাদের মধ্যে এক মিঃ মল্লিকই ঘোড়া নিলেন, আর-সকলে
হেঁটে যাওয়া হ্রিয় কলরাম । শুনেছি, পথের দৃশ্য অতি চমৎকার,
আর দু’ পাশে অনেক ফুল গাছ ।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘এই সাত দিনেই এনার্জি বেড়ে গেছে
মশাই । হেঁটে দু’ হাজার ফুট পাহাড়ে ওঠাটা কোনও ব্যাপ্তারই বলে
মনে হচ্ছ না ।’

সত্তিই পথের দৃশ্য অপূর্ব । আমরা তিনজনে মেটামুটি একসঙ্গে
হাঁটছি, বাকি ওদের দল ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে । আমরা দলে
আছি সব সুন্দর ন’ জন—আমরা তিন জন, মিঃ মল্লিক, বিজয় মল্লিক,
ডাঃ মজুমদার, সুশান্তবাবু, মিস্টার সরুকান্ত আর বেয়ারা প্রয়াগ ।

প্রায় দু’ ঘণ্টা লাগল দু’ হাজার ফুট উঠতে ; আর উঠেই এক
আশচর্য দৃশ্য আমাদের হকচকিয়ে দিল । আমরা একটা পাহাড়ের
পিঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, মাটিতে ধৰফ, সামনে বরফের পাহাড়
আর উচ্চে-দিকে ছড়িয়ে আছে গাছপালা নদী হুম-সমেত দিগন্ত
বিস্তৃত উপত্যকা, আর তারও পিছনে আকাশের গায়ে যেন খোদাই
করা রয়েছে নাঙ্গা পর্বত ।

ফেলুদা বলল, ‘এই বোধ হয় ক্লাইম্যারি । কাশ্মীরে এর চেয়ে
সুন্দর আর কিছু আছে কি ?’

লালমোহনবাবু ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বার বার বলছেন, ‘আসুন, একটা গ্রুপ তুলি, একটা গ্রুপ তুলি এই বরফের উপর দাঢ়িয়ে।’

হঠাতে বাকি দল থেকে একটা শোরগোল শোনা গেল। সেটা একটা প্রশ্নের আকার নিয়ে আমাদের কানে এল।

‘মন্টু কই?’

প্রশ্নটা করেছেন মিঃ মল্লিক, অত্যন্ত ব্যস্ত কষ্টে। বুবাতে অসুবিধা হল না যে, মন্টু হল বিজয় মল্লিকের ডাক-নাম। কারণ দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই অনুপস্থিত।

কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? এতই পিছিয়ে পড়েছেন কি? না, তা তো হতে পারে না। এঁরা একটু ছাড়া-ছাড়া ভাবে হাঁচিলেন ঠিকই, কিন্তু বিজয়বাবু কি একেবারে দলচুট হয়ে গিয়েছিলেন?

এবার সুশান্ত সোমের গলা শোনা গেল। ‘আপনি এখানেই থাকুন মিঃ মল্লিক। আমরা নীচে থেঁজ করে আসছি।’

যেমন কথা তেমন কাজ, আর এই অনুসন্ধানের পার্টিতেও আমরা যোগ দিলাম।

যে পথ দিয়ে উপরে উঠেছি, এবার সেই পথ দিয়েই নেমে যাওয়া। আমার বুকের ভিতরটা টিপ-টিপ করছে, স্লোকটা গেল কোথায়?

সুশান্তবাবু গলা তুলে চিংকার দিলেন।

‘বিজয়বাবু! বিজয়বাবু!’

কোনও উত্তর নেই।

মিনিট পনেরো নামার পরেই হঠাতে লালমোহনবাবু এক জায়গায় এসে থমকে থেমে গেলেন, তাঁর দৃষ্টি একটা ঝোপের দিকে।

ফেলুদা আর এক মুকুর্ত দ্বিধা না করে দৌড়ে গেল ঝোপটার দিকে, কারণ পাতার ফাঁক দিয়ে একটা জুতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ে গঠার বুট।

‘মিঃ সোম! ফেলুদা হাঁক দিল।

মিঃ সোম দৌড়ে পৌছে গেল ফেলুদার পাশে, তাঁর পিছনে বাকি চারজন।



ବୋପେର ପିଛନେ ମାଟିତେ ମୁଖ ଥୁବଡ଼େ ପଡ଼େ ଆଜେନ ବିଜ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ ।

ଫେଲୁଦା ନାଡ଼ି ଟିପେଇ ବଲଲ, 'ହି ଇଙ୍କ ଅୟାଲାଇଭ । ମନେ ହୟ ମାଥାର ଚୋଟ ଲେଗେ ଅଞ୍ଜାନ ହୁୟେ ଗେଛେ ।'

କାହେଇ ଏକଟା ଝରନା ଛିଲ, ତାର ଥେକେ ଆଁଜଳା କରେ ଜଳ ଏଣେ ମୁଖେ ଝାପଟା ଦିତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଚୋଥ ଥୁଲେ ଏଦିକ-ଓଦିକ ମାଥା ନାଡ଼ିଲେନ । ତାର ପର ଅନ୍ଧୁଟସ୍ବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ, 'କୋଥାଯ— ?'

ଫେଲୁଦା ଏଗିଯେ ଗିଯେ ବଲଲ, 'ଆପନାର ଏ ଅବଶ୍ଵା କି କରେ ହଲ ?'
'କେଟୁ...ଧାରା...'

'ଆପନି ଯେଥାନେ ପଡ଼େଇବେ, ମନେ ହୟ ଆପନାକେ ଅନେକ ଉପର ଥେକେ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ତେ ହୁୟେଛେ ।'

'ହଁ...ତାଇ...ଏକଟା ଫୁଲ ଦେଖଛିଲାମ ବୁକେ ପଡ଼େ...'

'ଅଞ୍ଜାନଟା ହୁୟେଇବେ ଏଇ ଗାହେର ଗୁଡ଼ିତେ ମାଥା ଠୋକା ଖେଯେ ?'

'ତାଇ ହବେ ।'

'ଆପନି ଦେଖୁନ ତୋ ଉଠିତେ ପାରେନ କି ନା ।'

ଫେଲୁଦା ଭଦ୍ରଲୋକେର ଦୁ' ହାତ ଧରେ ନିଜେର କାଁଧେର ଉପର ରେଖେ ଉଠି ଦ୍ଵାରାଳ । ଏକଟୁ ଟଳେମଳେ ଅବଶ୍ଵାର ପର ଭଦ୍ରଲୋକେ ଦେଖିଲାମ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଲେନ ।

ଫେଲୁଦା ଏବାର ମାଥାଟା ଦେଖେ ବଲଲ, 'ଏକଟି ଜ୍ଞାନଗାୟ ଚୋଟ ଲେଗେଇଁ, ରଙ୍ଗ ବେରୋଯନି, ତବେ ଜ୍ଞାନଗାୟକୁଳେ ଗେଛେ । ଦୁ'ତିନ ଦିନ ଏକଟୁ ଭୋଗାବେ ଆପନାକେ । ଏଥାନ ଆପନିକି ଫିରେ ଚଲୁନ । ଏକଟା ବୋଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ପାରିଲେ ସବଚେଯେ ଭାଲୋ ହୁଯ । ତା ନା ହଲେ ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ହେଠେ ଚଲୁନ । ପରେ ଏକ ସମୟ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଏକଟୁ କଥା ବଲାର ଇଚ୍ଛେ ରହିଲ ।'

ବିଜ୍ୟବାବୁ ଏତଙ୍କଣେ ଘୋଟାମୁଟି ଚାଙ୍ଗ ହୁୟେ ଗେଇବେ, କେବଳ ଦୁ'ଏକ ବାର ମାଥାର ଏକଟା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନଗାୟ ଆଲାଦା କରେ ହାତ ବୋଲାଲେନ ।

ଆମି ମନେ ମନେ ଭାବଛି—ଭଦ୍ରଲୋକେର ଏ ଦଶା କରିଲ କେ ଏବଂ କେବଳ ?

ଶୁଳମାର୍ଗ ଫିରତେ ଫିରତେ ବିକେଳ ହୁୟେ ଗେଲ । ଆମରା ଯେ ଯାର କ୍ୟାବିନେ ଚଲେ ଗେଲାମ । ଫେଲୁଦା ବଲଲ, 'ଆଗେ ଏକଟୁ ଚା ଥାଓଯା

দরকার ।'

খানসামাকে চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর লক্ষ করলাম, ফেলুদার
ভুক্টা অস্বাভাবিক রকম ঝুঁচকে আছে ।

চায়ের পর দেখি, বিজয়বাবু নিজেই এসে হাজির, সঙ্গে সুশান্তবাবু
আর মিঃ সরকার ।

'বাধ্য হয়েই আপনার কাছে আসতে হল', বললেন বিজয়বাবু ।
'আমি এত হতভম্ব আর কথনও হইনি ।'

'আপনার উপর আক্রোশ থাকতে পারে এমন কেউ নেই
এখানে ?'

'কে থাকতে পারে বলুন ! তাহলে তো সুশান্ত বা ডাঃ মজুমদার
বা মিঃ সরকারের কথা বলতে হয় । সে তো হাস্যকর ব্যাপার হত !'

'কাশীরে এসে পূর্বপরিচিত কাকুর সঙ্গে দেখা হয়নি ?'

'না ।'

'কলকাতাতে এমন কেউ নেই, আপনার উপর যার কোনও
আক্রোশ থাকতে পারে ।'

'আমি তো সে রকম কাকুর কথা জানি না ।'

'আপনি তো কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছেন ?'

'হ্যাঁ ।'

'প্র্যাঞ্জুয়েট ?'

'হ্যাঁ । স্টিশ চার্চ কলেজ ।'

'মোটামুটি নির্বাঙ্গাট ছাত্রজীবন ছিল ?'

'ঠিক তা বলা যায় না ।'

'কেন ?'

'কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে কুসঙ্গে পড়ি, নেশা ধরি,
ড্রাগস ।'

'হার্ড ড্রাগস ?'

'হ্যাঁ—কোকেন, মার্ফিন...'

'তুর পর ?'

'বাবা টের পেয়ে ঘান ।'

'বাবা তো তখনও জঙ্গিয়তি করতেন ?'

‘হ্যাঁ।’

‘তার পর ?’

‘তিনি আমার এই অভ্যাস ছাড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তার পর আশা ছেড়ে দেন।’

‘এই অবস্থাতেও আপনি গ্যাজুয়েট হতে পেরেছিলে ?’

‘আমি খুবই ভালো ছাত্র ছিলাম।’

‘আপনি বাড়িতেই থাকতেন ?’

‘কিছু দিন ছিলাম, তার পরে আর পারিনি। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কানপুরে এক আশ্চর্য লোকের সংস্পর্শে আসি। সাধুই বলতে পারেন। নাম আনন্দবামী। তখনও আমি নেশায় মন্ত্র, কিন্তু ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে আমার নেশা চলে যায়। একে মিরাক্ল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই।’

‘তার পর বাড়ি ফেরেন ?’

‘হ্যাঁ। বাবা আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেন।’

‘তখন আপনার বয়স কত ?’

‘সাতাশ-আটাশ হবে।’

‘তার পর ? আপনি চাকরি করেন ?’

‘বাবাই একটা ফার্মে চুক্তিয়ে দেন। আমি এক্সও সেখানেই আছি।’

‘আপনার জুয়ার প্রতি একটা আসক্তি আছে না ?’

‘তা আছে।’

‘সেটা কোনও সমস্যার সৃষ্টি করছে না তো ?’

‘না।’

‘আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, আপনার কোনও শক্তি আছে কি না, আপনি কী বলবেন ?’

‘যত দূর জানি, আমাকে খুন করতে চাইবে এমন কোনও শক্তি আমার নেই। ছোটখাটো শক্তি বোধ হয় সকলেরই থাকে—তার পিছনে ঈর্ষা থাকতে পারে। এটা যে অস্বাভাবিক নয়, সেটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।’

‘একশোবার।...এবার আরও দু’-এক জন সহকে আপনাকে আরও দু’-একটা প্রশ্ন করে নিই। ডাঃ মজুমদারকে আপনি কদিন থেকে চেনেন?’

‘উনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আজ প্রায় পনেরো বছর হল।’

‘বেশ। আবার সুশান্তবাবুকে একটা প্রশ্ন।’

সুশান্তবাবু বললেন, ‘বলুন।’

‘আপনি কতদিন হল মিঃ মল্লিকের সেক্রেটারির কাজ করছেন?’

‘ওর রিটায়ার করার সময় থেকেই। তার মানে পাঁচ বছর।’

‘বেয়ারা প্রয়াগ কত দিন আছে?’

ও-ও আন্দাজ পাঁচ বছর। মিঃ মল্লিকের পুরনো বেয়ারা মকবুল হঠাৎ মারা যায়। তার পর উনি প্রয়াগকে রাখেন।’

‘বেশ, আজ এই পর্যন্তই থাক। তবে পরে দরকার হলে আবার প্রশ্ন করতে পারি তো?’

‘নিশ্চয়ই, বললেন বিজয়বাবু।

৬

‘কী মশাই, আবার যেই কে সেই?’

শ্রীনগর ফিরে এসে আমরা সকালে বোটের উপরের ডেকে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু খস্কর্যটা করলেন।

‘যেই কে সেই’, বলল ফেলুন। ‘যা কুরাই, ছুটি-ভোগ মানেই দুর্ভেগ। কাইম যেন আমাদের পিছনে ওত পেতে থাকে, একটু আরাম করলেই ঘাড়ের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তবে এবার যে রকম হতভস্ত হয়েছি, সে রকম কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না। কোনও খুটিই যেন খুঁজে পাইছি না, যেটা ধরে একটু এগোব। সব অঙ্ককার।’

তার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে চা-টা শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, ‘সুশান্তবাবুকে বলতে হবে একবার যদি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো দেন।’

‘ও ডায়েরি দিয়ে আপনার কী লাভ ?’ জিজ্ঞেস করলেন
লালমোহনবাবু।

‘কিসে কী কাজ দেয় তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে ?
অবশ্য মিঃ মলিকের রাজি হওয়া চাই। সেটা সুশান্তবাবুকে একবার
জিজ্ঞেস করতে হবে।’

‘তা, সে তো এখনই পারেন—ওই তো সুশান্তবাবু।’

সত্যিইদেখি, ভদ্রলোক শিকারা করে বুলেভার্ডের দিক থেকে
ফিরছেন, সঙ্গে কিছু খবিদ করা জিনিসপত্র।

ফেলুদা ডেকের রেলিং-এর পাশে বুঁকে পড়ে ডাক দিল।

‘ও মশাই, এক মিনিট এদিকে আসতে পারেন ?’

শিকারাটা আমাদের বোটের কাছে চলে এল। ফেলুদা বলল,
‘মিঃ মলিকের ডায়েরিগুলো কি আপনি সঙ্গে এনেছেন ?’

‘সবগুলো’, বললেন সুশান্তবাবু, ‘চবিষ্টটা আছে।’

‘ওগুলো দু’-তিনটে করে ধার নিতে পারি ? মলিক ফ্যামিলি
সমক্ষে আর একটু জানতে না পারলে আমি এই নতুন পরিস্থিতির
ঠিক কিনারা করতে পারছি না। আমার মনে হয় ডায়েরিগুলো
পড়লে কিছুটা সুবিধা হতে পারে।’

সুশান্তবাবু বললেন, ‘আমি একবার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি।’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আমার মনে হয় না উনি কোনও অপস্থিতি করবেন, কারণ
আপনারা তো সবই শুনেছেন ওর মুখ ঘোঁটে।’

আধ ঘণ্টার মধ্যে সুশান্তবাবু চারটৈ পুরনো ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে
আমাদের হাউসবোটে এসে উঞ্জিল। বললেন, ‘এক কথায় রাজি
হয়ে গেলেন। বললেন, “জীবনী যখন বেরোবে, তখন তো সবই
জ্ঞানাঙ্গনি হয়ে যাবে। কাজেই এখন পড়তে দিতে আর কী
আপস্থি থাকতে পারে ? আর ক্রাইমের কথাই যদি হয়, তা হলে
সবই তো খবরের কাগজের রিপোর্টে বেরিয়েছে”।

ফেলুদা বলল, ‘ওগুলো দেখা হয়ে গেলে আর এক সেট আমি
আপনারা কাছ থেকে চেয়ে আনব। ...তোপ্সে—তুই আর
লালমোহনবাবু বরং যা, মানসবল লেকটা দেখে আয়। আমি এখন

একটু ঘরে বসে আজ করব । ’

‘ভালো কথা’, বললেন, ‘সুশান্তবাবু, ‘আপনার পাহালগাম যাবেন না ?’

‘ইচ্ছে তো আছে । ’

‘কবে যাবেন ? আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে গেলেই ভাল । আমরা পরও যাচ্ছি । ’

‘ভেরি গুড় । ’

মানসবল লেকের মতো স্বচ্ছ জল আমি আর কোনও লেকে দেখিনি । জলের একেবারে তল অবধি উদ্ধিদ দেখা যায় : ভারি অঙ্গুত লাগে দেখতে ।

লালমোহনবাবু দৃশ্য উপভোগ করলেন ঠিকই কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, মাঝে মাঝে খুঁর ফেলুদার তদন্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে । একবার বললেন, ‘তোমার দাদা ওই ডায়েরিওলো পড়ছেন কেন জানি না । যাদের একবার ফাঁসি হয়ে গেছে, তারা তো আর খুনখারাপি করতে পারবে না । ’

আমি বললাম, ‘সেটা ফেলুদাকেই বুঝতে দিন না । ’

মানসবল শ্রীনগর থেকে আঠারো মাইল দূরে ; আমারজ্জন্ম ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সর্থ্যা সাড়ে ছাঁটা । ফেলুদা দেখছুঁ বৈঠকখানার সোফায় বসে তখনও ডায়েরি নিয়ে পড়ছে । বলল, ‘সারা দিনে বারোটা ডায়েরি পড়ে শেষ করেছে এবং সব কটাই নাকি ইন্টারেস্টিং । ’

‘কোনও কাজ হল কি ?’ জিজেস করলেন জটায়ু ।

ফেলুদা বলল, ‘কাজ কিসে ইহুঁ সেটা অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না । আপাতত আমার কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা । নতুন তথ্য কিছু বেরিয়েছে—গুরু ডায়েরি থেকে নয় । যেমন বিজয়বাবু বলেছেন যে, সেদিন যে উনি ঘাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন তখন একটা ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ অনুভব করেছিলেন । আমার মতে সেটা আংটি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না । তবে তাতেও যে খুব সুবিধে হচ্ছে তা নয়, কারণ আংটি এখানে তিনজন পরেন—সুশান্তবাবু, মিঃ সরকার আর প্রয়াগ । আর যদি এ দলের

বাইরে কেউ থাকে, তা হলে তো চমৎকার। তা হলে আমাদের কোনও তদন্তই কাজ দেবে না।'

'কিন্তু সে রকম দল কি বেশি ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'তা ছিল না ঠিকই।'

'আমার তো একটিও মনে পড়ছে না।'

'একটি ছিল—পাঞ্জাবি দল—তবে তাদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই ছিল ঘোড়ার পিঠে।'

'আশা করি আর কোনও গোলমাল হবে না।'

'আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ভূমর্গে এসে এ সব বামেলা ভালো লাগে না—বিশেষ করে যখন বুদ্ধি খাটাবার কোনও ক্ষেপ পাওয়া যাচ্ছে না।'

পাহালগাম যাবার আগে আমরা শ্রীনগরে আর এক দিন ছিলাম, তার মধ্যে ফেলুদা মিঃ মল্লিকের বাকি ডায়েরিগুলো পড়া শেষ করে ফেলল।

'কী বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, 'অন্তত ছ'টা প্রাণদণ্ড সম্পর্কে উমির্খিপ্তি যে, সেগুলো অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং স্ক্রেণেতে তিনি ভুল করেছেন। এই ছ'টা কেনেই কারাদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। একটি বিশেষ কেস—সেখানে আবার আসান্তী হচ্ছেন কাশীবী, নাম সপ্ত—সেখানে ফাসির শুরু দেওয়ার পরে মল্লিকের খুব অনুশোচনা হয়। তার পরেই অবিশ্য ওঁর অ্যামজাইনার পেইন আরজি হয় এবং উনি কিছু দিনের মধ্যে রিটায়ার করেন।'

পাহালগাম শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল। লিদর উপত্যকায় হোটেল শহর। এক পাশ দিয়ে খরচোতা লিদর নদী বয়ে গেছে। তাতে সাহেবরা ট্রাউট মাছ ধরে। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে বরফের পাহাড় দেখা যায়। আগে এখানে হোটেল-টোটেল ছিল না, এখন অনেক হয়েছে। তবে এখনও ইচ্ছে করলে তাঁবু ভাড়া নিয়ে নদীরে ধারে থাকা যায়। আমরা সেভাবেই থাকব বলে ঠিক করলাম।

চারটে ট্যাঙ্গি করে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে বারোটাৰ মধ্যে আমরা পাহালগাম পৌছে গেলাম। শহরটা একপেশে ; নদীৰ পশ্চিম দিকে শুধু পাহাড়, বাড়ি ঘরদোৱ কিছুই নেই। আৰ পূব দিকে পাহাড়েৱ গায়ে ছড়িয়ে আছে হোটেল, রেস্টোৱ্যান্ট, দোকান-পাটি নিয়ে ছবিৰ মতো শহৱ।

আমাদেৱ তাৰুৰ জন্য আগেই বলা ছিল, গিয়ে দেখি যে তাৰু খাটোৱাৰ তোড়জোড় শুৰু হয়ে গেছে। এ তাৰু স্পেশ্যাল ধৰনেৱ মজবুত তাৰু, এতে ডাইনিং রুম, বেডৰুম, অ্যাটাচ্ম বাথরুম সবই আছে। আমাদেৱ একটা তাৰু আৱ মালিকদেৱ দুটো। সামনে বিল হাতেৱ মধ্য দিয়ে তোড়ে বয়ে চলেছে লিনুৰ নদী, তাৰ একটানা শব্দ কখনও থামে না। লালমোহনবাবু হলিউডেৱ ছবিৰ কথায় চলে গেলেন ; বললেন, 'মশাই, একমাত্ৰ ওয়েস্টাৰ্ন ছবিতেই এ রকম আড়টডোৱ লাইফ দেখেছি ; আমাদেৱ আবাৱ কোনও দিন এ রকমভাৱে থাকতে হবে, ভাৰতে পারিনি।'

দুপুৱে তাৰুতে লাক্ষ খেয়ে (এখানেও সঙ্গে কিচেন রয়েছে) সবে বাইৱে বেরিয়েছি, এমন সময় দেখি শুশান্ত সোম আমাদেৱ তাৰু দিকে আসছেন।

'লাক্ষ শেষ ?' জিজ্ঞেস কৰলেন উদ্বলোক।

'হ্যাঁ, বলল ফেলুনা।

'এখান থেকে আট মাইল দূৱে চন্দনওয়াড়ি-বলে একটা জায়গা আছে, জানেন তো ?'

'ঘেৰানে একটা বৰফৈৱ ব্ৰিজ আছে--ঝেটা সাবা বছৰ থাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা দেখতে যাবাৰ মতলব কৰছেন নাকি ?'

'গেলে সবাই একসঙ্গে গেলেই তো ভাল হয় ?'

'তবে আজই সবে এলাম, আজ ভাৰতিলাম পাহালগামটাই ঘূৱে দেখব ! চন্দনওয়াড়ি কাল গেলে হয় না ?'

'আমাদেৱও সেই আইডিয়া ! আমি শুধু আপনাদেৱ ইনভাইট কৰতে এলাম।'

ফেলুনা বলল, 'অবশাই একসঙ্গে যাব। আমাকে ছাড়া বোধ হয়

আপনাদের আর চলবে না । এর মধ্যেই যা একটা কেলেক্টরি কাও ঘটে গেল । এটাকে তো অ্যাটেম্প্টেড মার্ডারি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না । বিজয়বাবুর খুব ভাগ্য ভল যে, উনি বেঁচে গেলেন ।’

‘তা হলে কাল দুটো নাগাদ যাওয়া যাক । এখান থেকে অটি মাইল ঘোড়া করে যেতে হয় । লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়া যাবে ।’

‘প্রয়াগ ! প্রয়াগ !’ মিঃ মল্লিক ডাকতে ডাকতে তাঁর থেকে বেরিয়ে এসেছেন । তাঁর চোখে ভুকুটি । এ দিকে প্রয়াগ সামনেই নদীর ধারে হাত-মুখ ধুচ্ছে ।

‘বোধ হয় নদীর শব্দের জন্য শুনতে পাচ্ছে না, বলল ফেলুন ।

‘না’, বললেন মিঃ মল্লিক, ‘ও এমনিতেই কানে একটু খাটো, তিনবার না ডাকলে উপর দেয় না ।’

প্রয়াগ এবার ডাক শুনে মনিবের কাছে দৌড়ে গেল ।

‘ঘাও, আমার লাঠিটা নিয়ে এসো ।’

‘হজুর’, বলে প্রয়াগ তাঁর ভিতর চলে গেল ।

কিছুক্ষণ থেকেই দেখছিলাম, ফেলুন প্রয়াগকে একদৃষ্টে লক্ষ করছে । কেন, সেটা ঠিক ধূঁধতে পারলাম না ।

ইতিমধ্যে অন্য তাঁর থেকে বিজয়বাবু আর মিঃ সরকারও বেরিয়ে এসেছেন । সরকার এদের সঙ্গ ছাড়েননি । ঘনে হয় পুরো টুরটাই এদের সঙ্গে ঘুরবেন ।

‘আমরা কাল চন্দনওয়াড়ি যাচ্ছি, বললেন সুশান্তবাবু ।

সকলে প্রস্তাবে সায় দিল ।

ফেলুন বলল, ‘তোরা দু’-জনে ট্রেক-চেয়ার নিয়ে নদীর ধারে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ কর, আমি একটু পাহাড়ি পথে ঘুরে আসি । মাথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার ।’

‘কতক্ষণের জন্য যাবে ?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম ।

‘এই ঘণ্টাযানেক,’ বলল ফেলুন ।

‘সঙ্গে আপনার বিশ্বাস অস্ত্রটি আছে তো ?’

‘তা আছে ।’

ফেলুন চলে গেল ।

কালমোহনবাবুর মাথায় একটা নতুন গল্লের পট এসেছে, সেটা



আমাকে শনিয়ে পরব করে দেবে নিলেন। আমি আবার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সাজেস্ট করলাম। এই করতে করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে বসে থাকলে বোরিং লাগে না, তাই সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'দু' ঘণ্টা হতে চলল, তবু তোমার দাদা এলেন না—'

সত্যিই তো ! এটা আমার ব্যোলই হয়নি ।

'কী করা যায়, বলো তো ?'

ফেলুদার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও অভ্যাসে হয়ে গেছে মুহূর্তে ডিসিশন নেবার ।

আমি উঠে পড়লাম ।

'চলুন, ওকে খুঁজতে বেরোই ।'

'চলো ।'

ফেলুদা কোনু রাস্তা ধরেছে সেটা আমরা জানতাম। আমরা দু' জনে সেই পাহাড়ি পথে চড়াই ধরে রওনা দিলাম। পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ, পরিবেশ চমৎকার, কিন্তু আমাদের সে সব উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। ফেলুদা বলেছিল এক ঘণ্টায় ফিরবে ; এ বিষয়ে ওর কথার নড়চড় হয় না। কিছু একটা গওগোল নিশ্চয়ই হয়েছে ।

আধ ঘণ্টা হাতির পরেই যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। একটা ঝোপের ধারে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে প্রকৃত আছে ফেলুদা। আমার গলা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল ।

লালমোহনবাবু পালস ধরেই বললেন, 'বেঁচে আছেন—কোনও চিন্তা নেই ।'

ফেলুদাও নড়েচড়ে উঠল। তার পরেই উঠে বসে শাথার পিছনে হাতটা দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলল, 'এবার যিস্ করেনি বে। একেবারে মোক্ষমভাবে লক্ষ্যভেদ ।'

'উঠতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই। ব্যথা তো মাথায় ।'

ফেলুদা উঠে পড়ে আমাদের দু' জনের কাঁধে ভর করে কয়েক পা হেঁটে বলল, 'ঠিক হ্যাঁ, হাঁটতে পারব ।'

‘কিন্তু কাউকে কি দেখতে পেলেন ?’

‘তা হলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেতে । সে লোক অত কাঁচা নয় । ক'টা দিন যাক । আর একটু মাথা না খাটালে চলছে না ।’

রাত্তিরে মিঃ মল্লিকের তাঁবুতে আবার প্ল্যানচেটে হল । বল্লা হয়নি, এর মধ্যে শ্রীনগরে আর একদিন প্ল্যানচেটে হয়েছিল, যাতে আমরাও উপস্থিত ছিলাম । শাসমল বলে এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আস্তা এসে বলল যে, সে সতিই খুন করেছিল ।

আজকের প্ল্যানচেটে ফেলুদা ডায়েরি পড়ে যার কথা বলেছিল, সেই কাশ্মিরি মিঃ মনোহর সপ্তুর আস্তা নামানো হল । আক্ষর্য মিডিয়ম ডাঃ মজুমদার—দশ মিনিটের মধ্যেই আস্তা চলে আসে ।

সপ্তুর আস্তা প্রশ্ন করল, ‘আমাকে কেন ডেকেছ ?’

মিঃ মল্লিক বললেন, ‘তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলাম আমি । যে খুনের মামলার আমি ছিলাম জজ ।’

‘সেটা আমি জানি ।’

‘আমার বিশ্বাস হয়েছিল খুনটা তুমি করোনি ।’

‘খুন করেছিল হরিদাস ভগত । পুলিশ ভুল তদন্ত করেছিল । কিন্তু এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না ।’

‘কিন্তু আমি যে সেই সেভেনটি এইট থেকে দুষ্ক্ষিণায় ভুগছি ।’

‘তুমি কি আমার কাছে ক্ষমা চাও ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘বেশ, করলাম তোমাকে ক্ষমা । কিন্তু আমার যে সব আত্মীয়বন্ধু জীবিত আছে, তারা তোমায় ক্ষমা করেনি বা করবে না ।’

‘তাতে কিছু যায় আসে না । আমি তোমার ক্ষমা চাই ।’

‘বেশ, ক্ষমা করলাম । আমি আসি ।’

প্ল্যানচেট শেষ হল ।

মিঃ মল্লিক আবার স্বত্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ।

আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এলাম ।

বালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল ।

সকাল কাঁধ ধরে ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ফেলুন। তার মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম কোনও একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

‘মিঃ মল্লিক খুন হয়েছেন।’

‘আর্য়।’

এবার আমার চিৎকারে লালমোহনবাবুরও ঘুম ভেঙে গেল।

‘কাল মাঝরাত্রিয়ে,’ বলল ফেলুন। ‘বুকে ছুরি মেরেছে। শুধু তাই না, খুনটাকে আরও পাকা করার জন্য মাথায়ও একটা ভারী কিছু দিয়ে দেরেছে। সব মিলিয়ে বিশ্রী ব্যাপার।’

এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুও উঠলেন। গায়ে দুটো গরম কাপড় চাপিয়ে দুজনেই তাঁবুর বাইরে চলে এসাম। ফেলুন আমাদের খবরটা দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল। মিঃ মল্লিক খুন! ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে দেখি সকলেই প্রায় তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেরই মুখ কালো। কথাবার্তায় বুঝলাম বিজয়বাবু পুলিশকে খবর দিতে গেছেন। এখান থেকে শহর বেশি দূরে নয়, তাই পুলিশ আসতে বেশি সময় লাগা উচিত না।

ডাঃ মজুমদারই সকালে উঠে প্রথমে ব্যাপারটা দেখেন। বিছানার চাদর রক্ষণ। সেটা ছুরির আঘাতের ফলে, কারণ মাথায় বিশেষ রক্তপাত হয়নি। অন্তর্টাঙ্গব্যশ্য পাওয়া যায়নি। মনে মনে বললাম, এমন চমৎকার লিদুর নদী থাকতে অন্ত ফেলার জায়গার অভাব কোথায়? নদী এখন সে ছুরিকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে?

তবে শুধু যে খুন, তা নয়; তার সঙ্গে ছুরিও আছে। মিঃ মল্লিকের ডান হাতের অনামিকায় একটা বহুমূল্য হিরের আঁটি ছিল—তাঁর এক গুজরাটি মক্কলের দেওয়া। খুনি সেইটিও খুলে নিয়ে গেছে।



ফেলুনা ডাঃ মজুমদারকে প্রশ্ন করছিল ।
 ‘কাল রাত্রে ভদ্রলোক শয়েছেন কখন ?’
 ‘আমাদের অনেক আগে । উনি নটার মধ্যে থেঁয়ে শয়ে
 পড়তেন ।

‘আপনি তো ডাক্তার, দেখে বুঝতে পারছেন না কখন খুনটা
 হয়েছে ?’

‘মনে হয় রাত দুটো, আড়াইটে নাগাদ ; তবে সেটা পুলিশের
 ডাক্তার এলে আরও সঠিকভাবে বলতে পারবে ।’

‘রাত্রে কোনও শব্দটুকু শোনেননি ? ঘুমের কোনও ব্যাঘাত
 হয়নি ?’

‘উহু । আমার সচরাচর এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যায় । আমি
 একটু তাড়াতাড়ি উঠি । সাড়ে ছটাট উঠেই দেখি এই কাণ ।
 আমার আগে প্রয়াগ উঠেছিল, কিন্তু ও এই দুর্ঘটনাটা লক্ষ করেনি ।
 ও উঠেই তাঁবুর বাইরে চলে গিয়েছিল ।’

‘কে খুন করতে পারে, সে সবকে আপনার কোনও ধারণা
 আছে ?’

‘একেবারেই না ।’
 একটা পুলিশের জিপ এসে তাঁবুর কাছে থামলুক বিজয়বাবু
 নামলেন, তাঁর পিছনে একজন ইনস্পেক্টর । বিজয়বাবুর নির্দেশ
 অনুযায়ী ইনস্পেক্টরটি এগিয়ে গেলেন মিঃ মলিকের তাঁবুর দিকে ।

‘আমার নাম ইনস্পেক্টর সিঃ’, বললেন ‘ভদ্রলোক । ‘আমি এই
 কেসটার চার্জ নিছি । হোয়ার ইজ স্ট্রাইডবডি ?’

‘বিজয়বাবু মিঃ সিঃকে নিজে তাঁবুর ভিতর চুকলেন । আমরা
 বাইরেই খয়ে গেলাম ।

ইনস্পেক্টরের পিছন পিছন কয়েকজন কনস্টেবল, ফোটোগ্রাফার
 ইত্যাদি এ সব ব্যাপারে যেমন হয়ে থাকে—ঠিক তেমনি ভাবেই
 কাজ শুরু করে দিল । এ জিনিস অনেকবার দেখেছি, তাই
 কোতুহল মিটে গেছে । আর মিঃ মলিকের মৃতদেহ দেখবার কোনও
 ইচ্ছে আমার ছিল না । খালি মনে হচ্ছিল—কী আশ্চর্য, এই মস্তিষ্ক
 কতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আর হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর

হত্যাকারীরও মৃত্যুদণ্ড হবে ।

ফেলুদা একা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে লালমোহনবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার বলুন তো ?’

ফেলুদা বলল, ‘আমার মনের ভিতরের জটিটা আরও বেশ ভাল করে পাকিয়ে গেল—এই তো ব্যাপার ! এখন পুলিশ যদি কিছু করতে পারে ।’

‘আপনি নিজে কি হাল ছেড়ে দিলেন ?’

‘তা কি হয় ? আমি তো প্রথম থেকে সবগুলো ঘটনাই দেখেছি ; পুলিশ তো আর তা দেখেনি । অবিশ্য ঘটনাগুলোর পরম্পরের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন । আমাকে যে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, আর বিজয়বাবুকে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, দু’ জনেই কি এক লোক ? আর সেই লোকই কি এই খুনটা করেছে ? হি঱ের আংটি চুরি যদি মোটিভ হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো বাইরের থেকে খুনটা করে থাকতে পারে । কিন্তু আমার—’

ফেলুদা চুপ করে গেল । তার পর কিছুক্ষণ পরে বলল, ‘ডাকাতির আইডিয়াটাকে অবিশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না । কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের চেনা লোকই বুকীর্তিটা করেছে ।’

‘চেনা লোক বলতে— ?’

‘মিঃ মাল্লিকের সঙ্গে যারা এসেছেন । ইনক্লিভিং মিঃ সরকার । কারণ তাঁর ডান হাতের আঙুলে ‘S’ লেখা অংকটিটার কথা তুললে চলবে না ।’

ইনস্পেক্টর সিং তাঁর থেকে বাইরে বেরোলেন । ভদ্রলোক তিনটে তাঁর দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘এই সবগুলোই কি একই পার্টির তাঁবু ?’

বিজয়বাবু বললেন, ‘না ; এই দুটো আমাদের, আর শুইটা মিঃ মিস্টিরদের ।’

‘মিঃ মিস্টির ?’

‘হি ইভ এ ওয়েলনোন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ঝর্ম ক্যালকাটা ।’

মিঃ সিং ভুক্তিষ্ঠিত করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলেন । তার

পর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি রাজগড়ের খুনের কেসটা সল্ভ করেছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ।'

'মিঃ সিং হাত বাড়ালেন করম্বন্দনের জন্য ।

'ইনস্পেক্টর বাজপাই ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন । তার কাছে আপনার খুব প্রশংসন শুনেছি । আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম ।'

ফেলুদা বলল, 'আমি কিন্তু এখানে ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি । কোনও কেস-টেস সল্ভ করতে নয় । আপনি আপনাদের কাজ চালিয়ে যান ।'

'আমি তো চালিয়ে যাবই আমার কাজ, কিন্তু আপনিই বা চুপচাপ বসে থাকবেন কেন, বিশেষ করে এই ফ্যামিলির সঙ্গে যখন আপনার আলাপ হয়েছে । খুন্টা তো বাইরের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে । ছুরি যে বসিয়েছে, সে তো লেফট হ্যান্ডেড ; এখানে তো সবাই দেখছি রাইট হ্যান্ডেড । যাই হোক, ইউ আর ফ্রি টু ক্যারি অন ইওর ওন ইনভেস্টিগেশন ।'

'অনেক ধন্যবাদ । আসলে আমার উপরও একটু আটেম্ট হয়েছিল, কাজেই আমি ব্যাপারটাকে খুব ঠাণ্ডা মান্ত্রের নিতে পারছি না ।'

'ভাল কথা', মিঃ সিং বিজয়বাবুর দিকে বিবলেন । 'ডেড বডির কী হবে ? ওটা কি আপনি কলকাতায় রিয়ে যেতে চান ?'

'তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না । আমি ছাড়া তো বাবার আর কেউ নেই । মা মারা গেছেন, দাদা বিলেতে ছিলেন, দাদাও মারা গেছেন ।'

'ভেরি শয়েল, তা হলে এখানেই সংকার হোক । তবে, বুঝতেই পারছেন, আপনাদের এখনও কিছু দিন পাহালগামে থাকতে হবে । অন্তত যত দিন না কেসটাৰ সুরাহা হচ্ছে তত দিন । কাৰণ ইউ আৱ অল আস্তাৱ সাসপিশন । আমি একে একে প্রত্যোককেই জেৱা কৰতে চাই ।'

পুলিশ ঘণ্টা তিনেক ধরে জেরা চালাল। জেরা শুরু করার আগে মিঃ সিং ফেলুদাকে দু'-একটা প্রশ্ন করে নিলেন। 'আপনি কাল রাত্রে কোনও সন্দেহজনক শব্দ পাননি ?'—

'না। তাহাড়া এখানে নদীর শব্দে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।'

'জানি। সেটা ক্রিমিন্যালের পক্ষে একটা অ্যাডভান্টেজ। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর সঙ্গে তো আলাপ হয়নি।'

'ইনি মিঃ গাঙ্গুলি। হি ইং এ রাইটার।'

এর পর আমরা তিনজন শহরের দিকে গিয়ে একটা রেস্টোরান্টে বসে চা আর অমলেট খেলাম। সকালে গোলমালে আর ব্রেকফাস্ট হয়নি।

বেতে বেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য দেখছি যে, প্রথমে ছেলেকে খুন করতে চেষ্টা করে না পরে শেষটায় বাবাকে খুন করল।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা যে একই লোক করেছে তার কী গ্যারান্টি ? একজনের ছেলের উপর আক্রমণ থাকলে পারে, আর একজনের বাপের উপর ! নট ভেরি সারপ্রাইজিং।'

'আমার কিন্তু একটি লোক সম্বন্ধে কি রকম সন্দেহ হয়।'

'কে ?'

'ডাঃ মজুমদার। এ দিকে ডাক্তার তার উপরে আবার আঘানামাছে। কবিনেশনটা অস্তুতি লাগছে।'

'খুন করার সূযোগ অবশ্য ডাক্তারেরই বেশি ছিল, কারণ পাশের খাটে ঘুমোছেন। কিন্তু মোটিভ কী ? হিরের আঁটি যদি নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বলতে হয় ডাক্তারের খুবই আর্থিক দুরবস্থা। কিন্তু সে রকম তো কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আর বিজয়বাবু ?'

'বিজয়বাবু অবশ্য তাঁর বাপের মৃত্যুতে খুবই লাভবান হবেন। অবিশ্য মিঃ মল্লিক যদি উইল করে থাকেন, এবং সে উইল থেকে

যদি ছেলেকে বাদ দিয়ে থাকেন, তা হলে বিজয়বাবুর কোনওই লাভ নেই। তা না হলে বিজয়বাবু মেটা টাকা পাবেন, কারণ মিঃ মল্লিক নিসন্দেহে ধনী ব্যক্তি ছিলেন।'

'কিন্তু বিজয়বাবু তো তাঁর অফিস থেকে রোজগার করছেনই। তাঁর হঠাৎ এতটা টাকার দরকার পড়বে কেন যে, সে খুন করবে? খুন করা তো চান্তিখানি কথা নয়।'

'দ্যাট ইজ ট্রু।'

'সুশান্ত সোম সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার?'

'কাজের ছেলে সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। আর বেশ কোঝালিফাইড। মিঃ মল্লিক সুশান্তবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। আর সুশান্তবাবুর কোনও খনের মোটিভ খুজে পাওয়া যুক্তিল।'

'আচ্ছা মিঃ মল্লিকের উপর কি কেউ প্রতিশোধ নিয়ে থাকতে পারে?'

'তা তো পারেই। আমি তো সেই কথাটাই বার বার ভাবছি। কত জনের প্রাণ নিয়েছেন লোকটা, তেবে দেখুন।'

'কিন্তু বিজয়বাবুর বেলা তো প্রতিশোধ খাটে না।'

'তা তো খাটেই না, আর সেই ব্যাপারেই বারুক্তির ধারা থেতে হচ্ছে।'

দুপুর বেলা লাঞ্ছের পর ফেলুদা বল্লুক একটু শহরের দিকে যুরে আসবে। একটু না হাতিলে নাকি ওরুমাঝা খোলে না।

'শহর হোক আর যাই হোক সঙ্গে আপনার অঙ্গটি রাখবেন', বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা দু' জন নদীর ধারে গিয়ে বসলাম।

'সুশান্তবাবু তাঁর থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত', বললেন ভদ্রলোক।

আমরাও সামন দিলাম। সত্যিই এমন যে হবে তা ভাবতেও পারিনি।

'ইন্স্পেক্টর কী বলেন?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

সুশান্তবাবু বললেন, যত দূর মনে হল, ডাকাতের সভাবনাটা

একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আংটিটার বিস্তর দাম ছিল, মাঝখানে হিরে বসানো, তাকে গোল করে পাখা দিয়ে ঘেরা। আর এখানে যে ডাকাতির কেস একেবারে হয় না তা নয়। যত টুরিস্ট বাড়ছে, তত এ সবও নাকি বাড়ছে। বছর ত্রিশেক আগে পাহালগাম অনেক নিরাপদ জায়গা ছিল।

‘আপনারা কি তাঁবুতে বন্দী ?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘না’, বললেন সুশান্তবাবু, ‘তবে পাহালগাম ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না।’

‘মতদেহের সৎকার হবে কখন ?’

‘বিকেলের মধ্যেই।’

বিকেলে জানতে পারলাম যে, মল্লিকরা ত্রান্ত ছিলেন। তাই বিজয়বাবুকে আর অশৌচ পালন করতে হবে না।

ফেলুদা পাঁচটার মধ্যে ফিরে এল। ও যতক্ষণ না ফিরছিল। ততক্ষণ আমার অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু ও বলল, যারা ওর পিছনে লাগতে পারত, তারা সকলেই এখন পুলিশের নজরে রয়েছে। তাই চিন্তা নেই।

‘কিন্তু এই যে সুরে এলেন, এর কোনও ফল পেলেন ?’

‘পেয়েছি বাইকি’, বলল ফেলুদা, ‘তবে এখানে বন্দে থেকে সব ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে না। আমাকে একবার শ্রীনগর যেতে হবে।’

‘কবে যাবেন ?’

‘কালই সকালে।’

‘আর আমরা ?’

‘আমার দু’ দিন আন্দাজ লাগবে। সে দু’ দিন আপনারা এখানেই থাকবেন। চেঞ্জের পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা তো আর হ্যান্তি না।’

‘কিছু আলো দেখতে পেলেন ?’

‘তা পেয়েছি। সত্যিই অস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।’

‘কিন্তু এখনও কিছুটা অস্তকার রয়েছে।’

‘সেই জন্যেই তো শ্রীনগর যাওয়া দরকার। তবে যাবার আগে

আমার দিক থেকেও কয়েক জনকে একটু জেরা করা দরকার। নিচু
স্তর থেকে ওপরে ওঠাই ভাল। আগে প্রয়াগকে কয়েকটা প্রশ্ন
আছে।'

সুশান্তবাবুকে দিয়ে খবর পাঠাতেই প্রয়াগ তার তাঁবু থেকে
বেরিয়ে এল।

'ব'সো এখানে,' বলল ফেলুন।

প্রয়াগ এখন আমাদের তাঁবুতে।

'শোনো প্রয়াগ,' বলল ফেলুন, 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব,
তুমি তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

'পুছিয়ে বাবু।'

কথাবার্তা হিন্দিতেই চলল, আমি বাংলায় লিখছি।

'তুমি মল্লিক সাহেবের বাড়িতে কবে থেকে আছ?'

'পাঁচ বছর হয়েছে।'

'তার আগে কোথায় ছিলে?'

'জেকব সাহেবের বাড়িতে বেয়ারার কাজ করতাম। পার্ক
স্ট্রিটে।'

'মল্লিক সাহেব তোমাকে কি করে পেলেন?'

'আমি জেকব সাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে মল্লিক সাহেবের
সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জেকব সাহেব বিলেত ছলে যাচ্ছিলেন,
তাই আর আমাকে দরকার লাগছিল না।'

'মল্লিক সাহেব জেকব সাহেবকে চিনতেন না?

'ওরা দু'জনে এক ফ্লাবের মেমোর ছিলেন।'

'তোমার পুরো নাম কী?'

'প্রয়াগ মিসির।'

'তোমার সংসার নেই?'

'বড় ঘারা গেছে, মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কাল রাত্রে তুমি কোনও রকম শব্দ পাওনি, যার জন্য তোমার
ঘুম ভেঙে যেতে পারে?'

'না বাবু।'

'বাবুকে কে খুন করতে পারে, তাই নিয়ে তোমার কোনও ধারণা

আছে ?

‘না বাবু । এ রকম হবে আমি কল্পনাই করতে পারিনি ।’
‘ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো ।’

এবার ফেলুদা সুশান্তবাবুকে বলল ডাঃ মজুমদারকে খবর দিতে ।
ডাঃ মজুমদার এলেন আমাদের তাঁবুতে ।
ফেলুদা বলল, ‘আমি আপনাকে দু’-একটা প্রশ্ন করতে চাই ।’
‘করুন ।’
‘মিঃ মল্লিক যেভাবে প্লানচেট করেছিলেন, সেটা কি ডাক্তার
হিসাবে আপনার কাছে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় ?’
ডাঃ মজুমদার মাথা নাড়লেন ।

‘না । আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে, এই সব পুরনো ঝগার
নিয়ে যেশি ঘাটাঘাটি না করাই ভাল । আর জজ যদি এক-আধটা
ভুল ভাড়িষ্ট দিয়ে থাকে, তাতেই বা কী এসে গেল । ভুল তো
সকলেরই হতে পারে ।’

‘আপনার নিজের মধ্যে যে ক্ষমতাটা রয়েছে, সেটা কবে থেকে
প্রকাশ পেল ?’

‘তা অনেক দিন । পঁচিশ বছর তো বটেই ।’

‘ওঁকে কে খুন করতে পারে, সে সম্বন্ধে অংশব্লুর কোনও ধারণা
আছে ?’

‘একেবারেই নেই ।’

‘ওঁর ছেলে সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ?’

‘ছেলে এক কালে ড্রাগসের প্রভাবে খুব গোলমালের মধ্যে
পড়েছিল । আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি । কিন্তু
সেই সাধুর প্রভাবেই হোক, আর অন্য কোনও কারণেই হোক, ও
একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে ।’

‘জ্যার প্রতি ওর আসক্তি রয়েছে না ?’

‘সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ আমি ও রসে
একেবারেই বক্ষিত ।’

‘ও কোন অফিসে কাজ করে ?’

‘চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং—ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।’

‘কোথায় অফিস?’

‘গণেশ এভিনিউ। দশ নম্বর।’

‘ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।’

ডাঃ মজুমদার চলে গেলেন। সুশান্তবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন ফেলুদার দিকে।

‘এবার মিঃ সরকারের সঙ্গে একটু কথা বলব।’

‘মিঃ সরকার?’

সুশান্তবাবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ফেলুদা বলল, ‘হ্যাঁ। কেন, আপনার অবাক লাগছে?’

‘উনি তো ঠিক আমাদের দলের মন; এক রকম বাইরের লোক।’

‘তাঁর যে টাকার দরকার নেই সেটা আপনি কি করে জানলেন সুশান্তবাবু? টাকার জন্য মানুষে খুন করে না?’

‘ঠিক আছে। আমি ডাকছি উঁকে।’

মিঃ সরকার এলেন।

‘আসুন, বসুন’, বলল ফেলুদা।

‘কাশীর এসেছিলাম বেড়াতে, আর কিসের ঘেকে কী হয়ে গেল দেখুন।’

‘কী করবেন বলুন—মানুষের কপালইঁ শেই-রকম।’

‘এখন বলুন, আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে চান।’

‘আপনি কত বছর পর্যন্ত শ্রীনগরে ছিলেন?’

‘বছর বারো।’

‘তাঁর পর কলকাতায় যান?’

‘হ্যাঁ।’

‘সেইখানেই পড়াশুনা করেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার বাবা কি কলকাতাতেও হোটেল ম্যানেজারি করতেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোন হোটেল ?’
‘ক্যালকাটা হোটেল ।’
‘আপনি এ্যাজুয়েট ?’
‘বি কম ।’
‘এখন কী করেন ।’
‘একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে আছি ।’
‘কোম্পানির নাম ?’
‘ইউনিভারসাল ইনসিওরেন্স ।’
‘আপিস কোথায় ?’
‘পাঁচ নম্বর পোলক স্ট্রিট ।’
‘আপনি জজ মিঃ মল্লিকের কথা জানতেন ?’
‘না । এখানে এসে আলাপ । বিজয়ের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে
মিলে গেল, তাই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ।’
‘আপনি কি জুয়ার ভঙ্গ ?’
‘আই লাইক গ্যাসলিং, তবে বিজয়ের মতো নয় ।’
‘হঠাৎ কাশীর আসার ইচ্ছে হল কেন ?’
‘হেলেবেলার শৃঙ্খির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ।’
‘ক’ দিনের জন্য এসেছেন ?’
‘দশ দিন—তবে এখন কী হয় জানি না । এ রকমভাবে আটকে
পড়ব, কে জানত !’
‘আপনার হাতের আংটিটা একবার দ্রেষ্টতে পারি ?’
‘নিশ্চয়ই ।’

সরকার তাঁর আংটিটা খুলে ফেলুদার হাতে দিলেন, সোনার
আংটি, উপরে একটা ছ’ কোনা পাতের উপর মিলে করে নীলের
উপর সাদা দিয়ে S লেখা ।

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে আংটিটা ফেরত দিয়ে দিল ।
‘ঠিক আছে । আপনার জেরা শেষ ।’
‘ঝাঙ্ক ইউ ।’

পরদিন সকালে ফেলুদা ব্রেকফাস্টের পর ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীনগরে চলে গেল। বলল, 'মনে হচ্ছে, পরশু ফিরে আসতে পারব; তবে দু'-এক দিন দেরি হলে চিন্তা করিস না।'

নটা নাগাত পুলিশের জিপ এল, ইনস্পেক্টর সিং নামলেন। অন্য তাঁবুতে কাজ শেষ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'হোয়ার ইজ মিঃ হোমস?' হেসে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আমি বললাম, ফেলুদা একটু শ্রীনগর গেছে।

'এই কেসের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? এই কেস তো জলের মতো সোজা।'

'কি রকম?'

'বেয়ারাটাই হচ্ছে অপরাধী। তার সুযোগ ছিল। সে একই তাঁবুতে শুত। তাছাড়া এ সব লোকের লোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। বেয়ারাগিরি করে আর কত রোজগার হয়?'

'আপনি কি ওকে আরেস্ট করছেন?' লালমোহনদাবু জিজেস করলেন।

'আপাতত থানায় নিয়ে যাচ্ছি জেরারুস্কিয়। তা ছাড়া, ও যে লেফট হ্যান্ডেড তাও প্রমাণ হয়ে গেছে। ওকে ওর নাম লিখতে বলেছিলাম। ডান হাতে লিখতেই পারল না, কিন্তু বাঁ হাতে বেশ পারল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অঙ্গীকার করছে, সুতরাং ওকে বেশ ভাল রকম জেরা করা দরকার।'

'আঁটিটাও পেতে হবে', বললেন জটায়ু।

'সেটাও জেরার জোরে বেরিয়ে যাবে। পুলিশের পক্ষে খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল। এই পাহাড়ি পরিবেশে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে?'

'ফেলুদা কি তাহলে বুঝাই গেল শ্রীনগর? কেসটা এতই

সোজা ? আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছিল না । অত সহজ হলে ফেলুন্দা অত কাঠখড় পোড়াত না । আমি জানি ও কলকাতায় খৌজ করবে । ওর লোক আছে, যাদের বলে দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা যে কোনও খবর জোগাড় করে দিতে পারে ।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয়ে যাচ্ছে, বেঘারা লেফট-হ্যান্ডেড ।

কিন্তু এত সাহস হবে লোকটার ? ও কি জানে না যে ওর ওপরেই প্রথমে সন্দেহ পড়বে ?

ইনস্পেক্টর সিং বিদায় নিয়ে প্রয়াগকে সঙ্গে করে চলে গেলেন । লোকটাকে দেখে আমার কষ্ট হল, কারণ ও কানাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে । পুলিশরা স্বীকারণোক্তি আদায় করবার জন্য কত কী যে করতে পারে, সে আমার জানতে বাকি নেই । ফেলুন্দাও এ নিয়ে বহুবার আক্ষেপ করে বলেছে । ও বলে পুলিশরা কাজ জানে, ওরা কর্মসূল, কিন্তু দয়ামায়া বলে কিছু নেই ওদের মধ্যে । অবিশ্বাস্য উপায়ও নেই । অনেক সময় জরুরি তথ্য সংগ্রহ করতে কড়া রাস্তা নিতে হয় । সে কাজটা প্রাইভেট গোয়েন্দার চেয়ে পুলিশে অনেক বেশি ভাল পারে ।

সুশাস্ত্রবাবু এবার দেখি আমাদের দিকে আসুচ্ছেন । বললেন, 'মিঃ মিস্টির তো বোধহয় শ্রীনগর গেছেন ।'

আমি 'হ্যাঁ' বলতে বললেন, 'আচ্ছা কিছু না বলতেই উনি আমাদের জন্য এত করছেন, এটা যুক্ত আশ্চর্য বলতে হবে ।'

'আসলে উনি এটাকে একটী ক্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন । রহস্য জিনিসটা ওঁর কাছে অসহ্য । যতক্ষণ না সেটার কিনারা করতে পারছেন, ততক্ষণ ওঁর সোয়াস্তি নেই ।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনি কি মিঃ মিস্টিরের জীবনী লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন ?'

'তা এক রুক্ম দিয়েছিলাম বই কি । খানিকটা করে লিখছিলাম, আর উনি সেটা দেখে দিচ্ছিলেন । যুবই চিন্তাকর্ত্তক বই হত বলে মনে হয় ।'

'এখন তো কাজটা বন্ধ হয়ে গেল ।'

‘তা তো হলই ।’

‘আপনিও কি প্রযাগকে সন্দেহ করেন ?’

‘মোটেই করিনি । ওর অত সাহস হবে বলেই আমার মনে হয়নি । কিন্তু পুলিশ যেভাবে চলছে...’

‘মিঃ মিত্রের উপর আর একটা অ্যাটেম্ট হয়ে গেছে, সেটা বোধ হয় জানেন না ?’

‘সে কি !’

‘হ্যাঁ । এবার মাথায় বাড়ি মেরেছিল পাথর-টাথর কিছু দিয়ে । সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে । কিন্তু কেউ যে ওর উপস্থিতি পছন্দ করছে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।’

‘তা, উনি তো পুলিশ প্রোটেকশন নিতে পারেন ।’

‘সেটা উনি মরে গেলেও নেবেন না, যদিও উনি পুলিশকে সাহায্য করতে সব সময়ই প্রস্তুত ।’

‘আপনাদের তাস খেলা বন্ধ বোধ হয় ?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন ।

‘মৃত্যুর ছায়া এখনও ঘনিয়ে আছে ; এর মধ্যে কি ও সব চলে ?’

‘তা বটে ।’

ফেলুদার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে, অথচ ত্রিতীয় দিনেও ও এল না । দিনটা আমরা সাইট সিই-এ কাটাল্যাম্প টুরিস্ট আপিস থেকে থবর নিয়ে আড়াই মাইল দূরে শিকারপুর লেক আর এক মাইল দূরে একটা পুরনো শিবমন্দির দেখে অঙ্গাম । তাঁবুতে থাকার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল বুঝতে পারছিলাম । কারণ তাঁবুকে ঘিরে এখনও খুনের গন্ধ, ভাবতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে ।

তৃতীয় দিন সকাল দশটায় ভাবছি কী করা যায়, এমন সময় ফেলুদার ট্যাঙ্কি এসে হাজির । আমরা দুজনেই উদ্ধীৰ হয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম । ও হাত তুলে বলল, ‘সবুরে মেওয়া ফলে ।’

‘আপনার মাথা পরিষ্কার কি না সেইটে শুধু বলে দিন’, বললেন লালমোহনবাবু ।

‘পরিষ্কার, তবে অনেক জট ছাড়াতে হয়েছে । এমন একটা কেস

সচরাচর পাওয়া যায় না।'

‘রহস্য উদ্ঘাটনের টাইমটা কী?’

‘সেটা ইনস্পেক্টর সিং-এর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে।’

‘উনি কিন্তু খুনি ধরে ফেলেছেন এর মধ্যেই।’

‘মানে?’

‘বেয়ারা প্রয়াগ।’

‘সর্বনাশ! তা হলে তো আর সময় নষ্ট করা চলে না। আমি চললাম থানায়।’

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শহরের দিকে চলে গেল।

ও যখন ফিরল, তখন আমাদের লাঙ্গ খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এসে বলল, ‘আজ তিনটোর মিটিং। ওঁদের তাৰুতে।’

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদার রহস্যোদ্ঘাটন যে না দেখেছে, সে কঙ্গনা করতে পারে না সেটা কত নাটকীয় হতে পারে।

তিনটোর পাঁচ মিনিট পরেই পুলিশের জিপ এসে গেল। ইনস্পেক্টর সিং ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে, একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ক্লাইম্ব স্টেশনের ভক্ত হতে পারে?’

‘আপনি ও সব বই পড়েন নাকি?’

‘ও ছাড়া আর কিছুই পড়ি না। বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভের গল্প হলে তো আর কঢ়াই নেই। আজ আপনার রহস্যোদ্ঘাটনের ব্যাপারেও আঘাত পড়া অনেক গল্পের কথা মনে পড়ছে। অবিশ্য আপনি যে কী বলতে যাচ্ছেন, সে সহজে আমার কোনও খারগা নেই।’

‘সেটা তো অল্পক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন।’

‘তাৰুতে সকলে জমায়েত। দুটো তাৰু থেকে চেয়ার এনে সকলের কসবার জায়গা করা হয়েছে। বিজয় মল্লিক, মিঃ সরকার, সুশান্ত সোম, ডাঃ মজুমদার—এঁরা সব চেয়ারে বসেছেন, আর তাৰুৰ এক কোণে দাঢ়িয়ে আছে বেয়ারা প্রয়াগ। এই শেষের লোকটির

চেহারার মধ্যে একটা ক্লিষ্ট ভাব দেখে মনে হয়, পুলিশ তাকে বেশ ভালোভাবেই জেরা করেছে।

১০

কেলুদা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একবার সকলের দিকে দেখে নিল। তার পর এক গেলাস জল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিয়ে থেরে তার কথা শুরু করল—

‘মিঃ মল্লিক আজ আমাদের মধ্যে নেই, আমি তাঁকে দিয়েই আমার কথা আরও করছি। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ত্রিশ বছর জজিয়তি করে তার পর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই রিটায়ারমেন্টের কারণ ছিল অসুস্থতা। তা ছাড়া হয়তো মিঃ মল্লিক তাঁর পেশায় কিছুটা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। প্রাণদণ্ড নিয়ে হয়তো তাঁর মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমি এই সিদ্ধান্তের সত্যতা-অসত্যতার ভিতর যেতে চাইছি না। যা ঘটেছিল শুধু তাই বলছি।

‘মিঃ মল্লিক দৈনিক ডায়েরি লিখতেন। এই ডায়েরির একটা বিশেষত্ব ছিল। যে দিন তিনি কাউকে ফাসির আদেশ দিতেন, সেই দিন ডায়েরিতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম লিখে তার পাশে লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে দিতেন। আর যে দিন এই দণ্ডের যথার্থতা সম্পর্কে তাঁর মনে একটা গভীর সন্দেহ দেখা দিত, সেদিন ক্রসের পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লিখে দিতেন।

‘আমি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলি দেখেছি। সবসূক্ষ ছটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। তার মানে ছটি প্রাণদণ্ডের সমীচীনতা সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন।

‘এইবার আমি আর এক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মিঃ মল্লিকের মনে দুব্দ হচ্ছিল কি না হচ্ছিল সেটা সম্পর্কে জনসাধারণ কিছুই জানতে পারত না। কিন্তু যারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কি মিঃ মল্লিক কখনও ভেবেছিলেন? মনে তো হয় না, কারণ তাঁর ডায়েরিতে এর কোনও

উল্লেখ নেই। ছেলের মৃত্যুদণ্ডে বাপ-মা কী ভাবছে, বাপের মৃত্যুদণ্ডে ছেলের বা ভাইয়ের বা স্ত্রীর বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের কী মনোভাব হতে পারে, সেটা নিয়ে মিঃ মল্লিক বোধ হয় কথনও চিন্তা করেননি। কিন্তু আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব যে, এই সব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন বক্তু-বাক্তব অনেকেই নিশ্চয়ই গভীর বেদনা অনুভব করেছে।

‘এইটে উপলক্ষি করার পরেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে—এই রকম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনও ব্যক্তির আত্মীয়ই কি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিঃ মল্লিককে হত্যা করে ?

‘যত ভাবি, ততই মনে হয় এটা খুবই সাভাবিক। বিশেষ করে যেখানে দণ্ড সংবক্ষে জজের মনেও সন্দেহ আছে, সেখানে তো বটেই।

‘এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে—এই ঘরে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি কেউ আছেন ?’

‘এখানে প্রথমেই যাকে বাদ দেওয়া যায়, তিনি হলেন ডাঃ মজুমদার, কারণ তিনি আজ পনের বছর হল মল্লিকদের প্যারিবারিক চিকিৎসক।

‘বাকি থাকেন আর চারজন—বিজয় মল্লিক, সুশান্ত সোম, মিঃ সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

‘এখানে বিজয় মল্লিককে এই বিশেষ তারিক্তা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁরও কোনও আত্মীয়ের প্রাণদণ্ড হয়নি।

‘সেই রকম সুশান্ত সোমকেও এই একই মর্মে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁরও কোনও লিঙ্কটি জনের প্রাণদণ্ডের কথা আমরা ডায়েরিতে পাচ্ছি না।

‘বাকি রইলেন মিঃ সরকার ও প্রয়াগ বেয়ারা।

‘এখানে প্রয়াগকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।’

প্রয়াগ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ফেলুদা বলল, ‘প্রয়াগ, সে দিন তুমি যখন মনীতে হাত ধুঁচিলে, তখন আমি তোমাকে লক্ষ করছিলাম। তোমার ডান হাতে একটি ছেঁট উলকি আছে—দুটি ইংরেজি অক্ষর—H.R.। এটার মানে

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।'

প্রয়াগ গলা থাকরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওর কোনও ঘানে নেই
বাবু। উল্কি করাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাই করিয়েছিলাম।'

'তুমি বলতে চাও, এটা তোমার নাম আৰ পদবিৰ প্রথম অক্ষর
নয় ?'

'নেহি বাবু। মেৰা নাম হ্যায় প্রয়াগ মিসিৱ।'

'আমি যদি বলি, তোমার নাম প্রয়াগ নয়। কাৰণ প্রয়াগ বলে
ডাকলে তুমি চট্ট কৰে উন্তুৰ দাও না—অথচ অন্য ব্যাপারে মোটেই
তুমি কালা নও।'

'আমাৰ নাম প্রয়াগ মিসিৱ, বাবু।'

'না !' ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি জানতে চাই ওই R
অক্ষরটা কিসেৰ আনন্দকৰ : কী পদবি তোমাৰ ?'

'আমি আৰ কী বলব বাবু !'

'সত্যি কথাটা, বলবে। এখানে জীবন-মৃত্যু নিয়ে খেলা হচ্ছে,
এখানে মিথ্যা চলবে না।'

'তবে আপনিই বলুন।'

'আমি বলছি। ওই R হচ্ছে রাউত। এবাৰ জেকেৰ পুৱো
নামটা বলো।'

প্রয়াগ হঠাৎ কেমন যেন ভেঙে পড়ল। তাজ পুৱো কান্নাৰ মধোই
বলল, 'ও আমাৰ একমাত্ৰ ছেলে ছিল বাবু। আৱ ও খুন কৱেনি।
ওৱ মামলা এমনভাৱে সাজানো হয়েছিলঃ বাস্তু ওকে খুনি বলে মনে
হয়। আমাৰ একমাত্ৰ ছেলে—ফাঁসি-কুল !'

'তা হলে তোমাৰ পুৱো নামটী কী দীঢ়াচ্ছে ?'

'হনুমান রাউত, বাবু। কিন্তু আমি বাবুকে খুন কৱিনি, ওঁৰ আংটি
আমি নিহুনি !'

'সেটা কি আমি একবাৰও বলেছি ?'

'তা হলে বাবু আমাকে মাপ কৰে দিন।'

'পুৱোপুৱি মাপ কৰা কি চলে ?' সত্যি কথা বল তো।'

হনুমান রাউত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল কৰে ফেলুদাৰ দিকে
চাইল।

ফেলুদা বলল, 'তুমি খুন করনি, কিন্তু খুনের চেষ্টা করেছিলে ।'

'না বাবু—'

'আলবৎ !' ফেলুদা গর্জিয়ে উঠল ।' তোমার নিজের ছেলের মৃত্যুর জন্ম যিনি দায়ী, তুমি তাঁর ছেলেকে মারতে চেয়েছিলে যাতে, তিনিও তোমার মতো পুত্রশোক ভোগ করেন । খিলেনমার্গ যাবার পথে তুমি বিজয়বাবুর ঘাড়ে ধাক্কা মারেনি ? ঠিক করে বল তো । বাঁ হাতে তোমার আংটি রয়েছে, আর বাঁ হাত দিয়ে তুমি ডান হাতের কাজ করো, তাই না ?'

'কিন্তু উনি তো বেঁচে আছেন বাবু : উনি তো মরেননি ।'

'খুনের অভিপ্রায়েরও শান্তি আছে হনুমান রাউত—সে শান্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে !'

দু' জন কনস্টেবল এসে বেয়ারাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল ।

ফেলুদা আর এক গেলাস জল খেয়ে নিল । তার পর আবার শুরু করল—'এবাবে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি । এটা আরও অনেক বড় প্রসঙ্গ । এখানে একজন ব্যক্তির প্রাণ নেওয়া হয়েছে । এ হল হত্যা । আর এর জন্ম আমার মতো প্রাণদণ্ডন উচিত দণ্ড ।'

সকলে একদৃষ্টি ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে । তাঁরুতে পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যেত নিশ্চয়ই, যদি না বাইরের লিদুর নদীর শ্রেতের অবিশ্রান্ত শব্দ থাকত ।

ফেলুদা বলল, 'আমি এক জনকে এর অঙ্গেও কয়েকটা প্রশ্ন করেছি—এবাব আর একবাব করতে চাই । মিঃ সরকার ।'

সরকার নড়েচড়ে বসে বললেন, 'করুন ।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কবে শ্রীনগর এলেন ?'

'আপনাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে এলাম ।'

'আচ্ছা, আপনার আঙুলের আংটির 'S' টা কিসের আদাক্ষয় ?'

'আমার পদবির অফকোর্স—সরকার ।'

'কিন্তু, মিঃ সরকার, আমি ইত্তিয়ান এয়ারলাইনসে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, সে দিন যাত্রীর তালিকায় সরকার বলে কেউ ছিলেন না । সেন ছিলেন, দু' জন সেনগুপ্ত ছিলেন, একজন সিং ছিলেন আর একজন সপ্তু ছিলেন ।'

‘বাট—বাট—’

‘বাট হোয়াট, মিঃ সরকার ? আপনার নাম বদলানোর দরকার হল কেন, জানতে পারি কি ?’

‘মিঃ সরকার চূপ !

ফেলুদা বলল, ‘আমি বলি ? আমার ধারণা আপনি মনোহর সপ্তর ছেলে । আপনার চেহারার মধ্যে একটা পরিষ্কার কাশ্মীরী ছাপ রয়েছে । মিঃ মল্লিক মনোহর সপ্তরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন । মিঃ মল্লিককে প্রেমে দেখেই আপনি নাম বদল করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তখন থেকেই আপনার মনে প্রতিশোধের ইচ্ছা জাগে । আপনি ওই ফ্যামিলির সঙ্গে যিশে যান, এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন—টু স্ট্রাইক । সেই সুযোগ আসে পাহালগামে ।’

‘কিন্তু...কিন্তু...দিস ক্রাইম ইজ কমিটেড বাই এ লেফ্ট-হ্যান্ডেড পার্সন ।’

‘আপনি ভুলবেন না, মিঃ সপ্ত—আমি আপনাকে তাস বাটতে দেখেছি । আর কেউ লক্ষ না করলেও আমি করেছি যে, আপনি বী হাতে তাস ডিল করেন ।’

মিঃ সপ্ত হঠাতে কেমন যেন ক্ষেপে উঠলেন ।

‘বেশ, ঠিক কথা—আমি ওকে ছুরি মেরেছি, কিন্তু তার জন্য আমার একটুও অনুশোচনা নেই । আমার স্বর্ণন মাত্র পনেরো বছর বয়স, তখন উনি আমার বাবাকে ফাঁসিকৃতি পোলান—আজও মাই ফাদার ওয়াজ নট গিল্টি ! কিন্তু...কিন্তু...’

সপ্ত যেন হঠাতে একটা নতুন কাহিনীনে পড়ল ।

‘আমি ওর আংটি তো নিইনি । আই ওনলি কিলড হিম ।’

‘না’, বলল ফেলুদা । ‘আপনি ওর আংটি নেননি । সেই নিয়েছেন আর একজন ।

ঘরে আবার সেই অসুস্থ নিষ্ঠুরতা ।

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেল ।

‘বিজয়বাবু—জুয়াতে আপনার অনেক লোকসান হয়েছে । তাই না ? আমি কলকাতায় খবর নিয়েছি । আমার লোক আছে খবর দেবার, পুলিশেও আমার বক্স আছে । আপনার বিস্তর দেনা হয়ে

গেছে।'

বিজয়বাবু চুপ।

ফেলুন্দা বলে চলল, 'আর আপনার বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল যে, বাবা আপনাকে উইলে কিছু দিয়েছেন কিনা। সেই জন্য তাঁকে মেরে তাঁর আংটিটি আপনি হাত করেছিলেন।'

'মেরে মানে ?'

'মেরে মানে কোনও ভাবী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত মেরে। আপনার বাবাকে আসলে দু' জন খুন করে। কার দ্বারা তিনি হত হয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায় বিছানায় রাজ্ঞি দেখে। ছুরির আঘাতই আগে পড়ে, তার পর আপনি মাথায় বাড়ি মেরে হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে যান। আপনি খুনি না চোর, সেটা অবশ্য আইন বুবাবে, কিন্তু হাতকড়া বোধ হয় তিনি জনের হাতেই পড়বে।'

মল্লিকদের তাঁবু থেকে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু ধশাই, আপনি একটা ব্যাপারে তো কোনও আলোকপাত করলেন না। আপনাকে দু' বাব মারার চেষ্টা করল কে ?'

সে ব্যাপারে আলোকপাত করিনি, কারণ আমি নিজেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে শিওর নই। তিনজন অপরাধীর এক জুলা করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এবং সুযোগের দিক দিয়ে বিচার খরলে প্রয়াগের কথাই মনে হয়। সপ্তু বা বিজয়বাবু দল থেকে শ্রেষ্ঠিয়ে এসে এটা করবেন, বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক, অর জন্য মূল রহস্যোদ্ঘাটনে কোনও এ দিক ও দিক হচ্ছে না। ধরে নিন, এটা ফেলু মিত্রের একটা অক্ষমতার পরিচয়।'

'যাক, বাঁচা গেল। আপনার ভুল হতে পারে, এটা জানতে পারলে একটু ভরসা পাওয়া যায়।'

'আপনি অযথা বিনয় করছেন। আমি কিন্তু বল চেষ্টা করলেও আপনার মতো লিখতে পারতাম না।'

'থাকস ফর দা খোঁচা।'

প্রদোশ মিট্টে প্রকাশনা

Pradosh C. Mitter
Private Investigator



শকুন্তলার কঠহার

॥ ১ ॥

শেষ পর্যন্ত লালমোহনবাবুর কথাই রইল । ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে বলছেন, 'মশাই, সেই সোনার কেলার অ্যাডভেঞ্চার থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে রইচি, কিন্তু তার আগে লখনৌ আর গ্যাংটকে আপনাদের যে দুটো অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে তখন তো আর আমি ছিলাম না । কাজেই সে দুটো জায়গাও আমার দেখা হয়নি । বিশেষ করে লখনৌ-এর মতো একটা ঐতিহাসিক শহর । আপনারা তো গেছেন সেই কবে, চলুন না এবার পুজোয় আরেকবার যাওয়া যাক ।'

ফেলুদার লখনৌ ভীষণ ভাল লাগে জানি, আর সেই সঙ্গে আমারও । আইডিয়াটি খন্দ আ । অথবার যখন যাই, আর আমাদের বাদশাহী আংটির অ্যাডভেঞ্চারটা হয়, তখন আমি খুব ছেট । এখন গেলে লখনৌ আরও ভাল লাগবে সেটা আমি জানি ।

ফেলুদা বলল, 'আমারও লখনৌ-এর কথা হলৈ মনটা চনমন করে ওঠে । আর অত সুন্দর শহর ভারতবর্ষে কমই আছে । শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে এ রকম কটা জায়গা পাবেন আপনি ? বিজের একদিকে শহরের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক অন্য দিকে । তা ছাড়া নবাবি আমলের গঞ্চটা এখনও যাইনি । চারিদিকে তাদের কীর্তির চিহ্ন ছড়ানো । তার উপর সেপাই বিদ্রোহের চিহ্ন । নাঃ—আপনার কথাই শিরোধৰ্য । কদিন থেকে ভাবছি কেথায় যাওয়া যায় এবার পুজোয় । লখনৌই চলুন ।'

ফেলুদা আজকাল ভাল রোজগার করে । প্রাইভেট গোয়েন্দাদের মধ্যে ওর নামডাকই সবচেয়ে বেশি । মাসে অন্তত সাত-আটটা কেস আসে, আর প্রতি তদন্তের জন্য দু হাজার করে পায় । অবিশ্য

রোজগারের দিক দিয়ে লালমোহনবাবুকে টেকা দেওয়া মুশকিল। একবার বলেছিলেন ওর বইয়ের থেকে বার্ষিক আয় নাকি প্রায় তিন লাখ টাকা। তার উপরে নতুন নতুন বই প্রতি বছরই বেরোচ্ছে।

অধিকার্য আর দ্বিতীয় না করে লখনৌ যাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। দুন এক্সপ্রেসে তিনটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট—রাত নটায় বেরোনো, পরদিন সকার্হা সাড়ে ছাটায় পৌছানো। সেই সঙ্গে অবিশ্বিত হোটেল বুকিংও টেলিগ্রাম করে ফেলা হল। ফেলুদা বলল, ‘যাবই যখন তখন আরামে থাকব, নইলে ক্লাস্টি যাবে না।’

‘কোন হোটেলে উঠবেন?’ জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

‘হোটেল ক্লার্ক্স-আওয়াধ।’

‘আওয়াধ? আওয়াধ ব্যাপারটা কী?’

‘আওয়াধ হল অযোধ্যার ডর্দু নাম।’

‘লখনৌ বুঝি অযোধ্যায়?’

‘সেটাও জানেন না? লখনৌ নামটাও এসেছে লক্ষ্মণ থেকে।’

‘রামের ভাই লক্ষ্মণ?’

‘ইয়েসু স্যার! আওয়াধ হল লখনৌ-এর সেরা হোটেল। একেবারে গুরুত্বীর উপরে। হোটেলের পাশ দিয়ে মদী বয়ে গেছে।’

‘বাঃ—আইডিয়াল। আওয়াধ অন দি গুরুত্বী। ঠাণ্ডা কেমন হবে?’

‘সক্ষের জন্য একটা পুলোভার নিয়ে নেবেন। অথবা আপনার গরম জহর কোট। আপনি সাহেব সাজবেন না বাঙালি সাজবেন তার উপর নির্ভর করছে।’

‘দুটোই নেব।’

‘ডেরি গুড়।’

‘ওখানে তো বাঙালি অনেক?’

‘বিস্তর। ছ-সাত পুরুষ থেকে লখনৌতে প্রবাসী এমন বাঙালিও আছে। বেঙ্গলি ক্লাব আছে—সেখানে পুজো হয়। বলা যায় না—আপনার অনুরাগী পাঠকও সেখানে কিছু পেয়ে যেতে পারেন।’

‘তা হলে আমার লেটেস্ট বই “সাংঘাইয়ে সংঘাত” কয়েক কপি সঙ্গে নিলে বোধহয় মন্দ হয় না।’

‘কয়েক কপি কেন—এক ডজন নিয়ে নিন।’

‘ই অস্টোবর শনিবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে প্রচুর ভিড়। রিজার্ভেশন ক্লার্ক দেখলাম ফেলুদাকে দেখে চিনলেন—বললেন, ‘চলুন স্যার, আপনাদের বোগি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা ফোর্থ-বার্থ কম্পার্টমেন্টে তিনটে বার্থ—এই তো? এই যে আপনাদের বোগি। তিন নম্বর কামরা আপনাদের জায়গা—একটা লোয়ার, দুটো আপার বার্থ।’

আমরা গিয়ে আমাদের জায়গা দখল করলাম। বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে এসেছি, তাই ট্রেনে খাবার বামেলা নেই। একটা লোয়ার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক বসে আছেন, বছর পঞ্চাশ বয়স, মাঝারি হাইট, টোঁটের উপর একটা সরু গেঁফ। আমাদের দেখে একটু সরে বসে পাশে জায়গা করে দিলেন। ফেলুদা সেখানে বসল, আমরা দুজন উলটো দিকের বার্থে। দশ দিন থাকব আমরা লখনৌ। মালপত্র বেশি নিইনি; আমার আর ফেলুদার জিনিস একটা বড় সুটকেসে আর লালমোহনবাবুর জিনিস তাঁর বিশ্বাস লালমোহনবাবুর সুটকেসে। বলেন ঘটা নাকি ওঁর পাড়ার এক ধৰ্মী ব্যক্তিস্থানের বন্দু ধৰ্মীকেশ চৌধুরী জাপান থেকে স্পেশালি লালমোহনবাবুর জন্য এনে দিয়েছেন।

আমাদের সহযাত্রীটি বাঙালি কি না সে বিষয় একটু সন্দেহ ছিল। সেটা দূর হল ভদ্রলোক যখন নিজে আলাপ করলেন।

‘আপনারা কদূর যাবেন?’ জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

‘লখনৌ’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘আপনি?’

‘আমিও লখনৌ যাচ্ছি। ওখানেই থাকি। আমরা তিন পুরুষ ধরে ওখানেই আছি। আপনারা কি বেড়াতে যাচ্ছেন?’

‘আজ্জে হ্যাঁ, বললেন লালমোহনবাবু।

এবার ফেলুদা বলল, ‘আপনার সুটকেসে দেখছি তিনটি ইংরিজি হ্রফ লেখা রয়েছে—এইচ. জি. বি। এরকম অস্তুত ইনিশিয়ালস তো বড় একটা দেখা যায় না। আপনার নামটা জিজ্ঞেস করলে আশা করি আপনি বিরজ্ঞ হবেন না।’

‘মোটেই না। আমার নাম জয়ন্ত বিশ্বাস। এইচ-টা হল হেন্টের। আমি ক্রিশ্চান। আমাদের পরিবারের সকলেরই একটা করে ক্রিশ্চান নাম আছে।’

‘ধনবাদ’, বলল ফেলুন। ‘আপনার নামটা যখন বললেন তখন আমাদের নামও বলা সমীক্ষিন। আমি প্রদোষ যিত্র, এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি আমাদের বক্তু লালমোহন গান্দুলী।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘আমার শাশ্বতির নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। উনি সাইলেন্ট যুগে ফিল্মে আবটিং করতেন। খুব পপুলার ছিলেন।’

‘কী নাম বলুন তো?’ জিজেস করলেন লালমোহনবাবু।

‘শকুন্তলা দেবী।’

‘আরেকব্যাস’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘তিনি তো যাকে বলে তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত স্টার! আমার এক প্রতিবেশী আছেন, নরেশ বোস—এখন বয়স হয়েছে, তবে যুবা বয়সে তিনি ফিল্মের পোকা ছিলেন। তাঁর কাছে বাঁধানো “বায়োঙ্কাপ” পত্রিকা দেখেছি। তাতে শকুন্তলা দেবীর বিত্তর ছবি রয়েছে। তাঁর সমস্কে লেখাও রয়েছে অনেক। তিনি বোধহয় বাঙালি ছিলেন না।’

‘ন্যুঁ অ্যাঞ্জেলো ইন্ডিয়ান বলতে পারেন। আমস নাম ছিল ভার্জিনিয়া রেনচস। তাঁর বাবা টমাস রেনচস ছিলেন আর্মিতে। তিনি লখনৌতেই পোস্টেড ছিলেন। চোল্ল উর্দু বলতে পারতেন। তিনি একজন মুসলমান বাসিজিকে বিয়ে করেন। তাঁরই মেয়ে হলেন ভার্জিনিয়া।’

‘হাইলি ইন্টারেস্টিং’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘কিন্তু তিনি তো বোধহয় টকিতে অভিনয় করেননি।’

‘না। এদেশে টকি আসার আগেই তিনি বিয়ে করে ফেলেন একজন বাঙালি ক্রিশ্চানকে। তারপর প্রথম সন্তান হার পরই শকুন্তলা দেবী ছবির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম দুটি সন্তান ছিল মেয়ে, তৃতীয়টি ছেলে। আমি দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার বড় শালী বিয়ে করেন একটি গোয়ানকে। আমার ছোট শালা বিয়ে করেননি।’

এতদিন লখনৌতে থাকবার জন্যাই বোধহয় ভদ্রলোকের বাংলায় একটা পশ্চিমা টান এসে গেছে। যদিও ভাষায় কোনও গুণগোল নেই।

এবার ফেলুন একটা প্রশ্ন করল।

‘কোনও এক মহারাজা শকুন্তলা দেবীকে একটা মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, তাই না?’

‘আপনি ঠিকই বলেছেন,’ বললেন জয়স্তব্দু। ‘মাইসোরের মহারাজা। শকুন্তলার অভিনয়ে মুক্ষ হয়ে তিনি তাঁকে একটি বহুমূল্য কঠিহার উপহার দেন। তখনকার দিনেই দাম ছিল লাখ খানেকের মতো। কিন্তু এটা আপনি কী করে জানলেন? যদুর মনে হয় শকুন্তলা অভিনয় করতেন আপনার জন্মের আগে।’

‘তা তো বটেই, বলল ফেলুন। কিন্তু বছর পনেরো আগে আমি খবরের কাগজে একটা খবর পড়ি। এই হার চুরি হয়েছিল, তারপর পুলিশ সেটা উদ্ধার করে।’

‘ঠিক কথা। তখনও শকুন্তলা দেবী বৈঁচে। তিনি মারা গেছেন তিন বছর আগে আটাশের বছর বয়সে। মারা যাবার পরেও এই হারটার কথা কাগজে বেরিয়েছিল। কিন্তু আপনার সেই পনেরো বছর আগের খবরের কথা মনে আছে—আপনার মেমরি তো খুব শার্প দেখছি।’

‘জাইমের খবর আমি বজ্জিনি থেকেই খুব উৎসাহ নিয়ে পড়ি। আর পড়লে আমার মনেও র্থাকে। আসল কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি। আমার পেশাটিও হচ্ছে জাইমের সঙ্গে জড়িত।’

ফেলুন পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে জয়স্তব্দুর হাতে দিল। তদ্দেশীকের চোখ কপালে উঠে গেল।

‘প্রাইভেট ইনভেন্টিগেটর! তাই বলুন। আপনার নামটা চেনা চেনা লাগছিল। আপনার তো একটা ডাকনামও আছে।’

‘হ্যাঁ। ফেলু।’

‘ফেলু। ইয়েস—ফেলুন। আমার মেয়ে আপনার বিশেষ ভক্ত। আপনার সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তার পড়া। বাংলা সে এমনিতে একেবারেই পড়ে না, কিন্তু আপনার বইগুলো পড়ে। যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।’

এবার ফেলুন লালমোহনবাবুর পরিচয়টাও দিয়ে দিল। বলল, ‘ঁর নাম লখনো অবধি পৌছেছে কি না জানি না, তবে ইনি বাংলার একজন বিশেষ জনপ্রিয় খ্রিস্টান রাইটার। জটায়ু ছব্বনামে এর উপন্যাস বেরোয়।’

‘বাঃ দুজন বিশ্যাত লোকের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়ে



মনি মনি

গেল এ তো আশ্চর্য ব্যাপার। লখনৌতে আপনারা উঠছেন কোথায়?

‘ক্লার্কস-আওয়াখ।’

‘আমি থাকি নদীর তুদিকে—বাদশাবাগে। আমি আপনার সঙ্গে মোগায়েগ করব। একদিন আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে হবে আপনাদের। আমার শ্রী শুভ ভাল মোগলাই রান্না রাঁধেন। তা ছাড়া আমার মেয়ে তো ফেলুদাকে দেখে খিল্ড হয়ে যাবে। আপনাদের তিনজনেরই আসা চাই কিন্তু।’

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলল ফেলুদা। ‘আর সেই সঙ্গে আশা করি বিখ্যাত কঠহারটাও একবার দেখা যাবে।’

‘সে তো খুব সহজ ব্যাপার। কারণ হারটা আমার কাছেই আছে। অর্থাৎ আমার স্ত্রীর কাছে।’

‘কেন? ছোট মেয়ের কাছে কেন? বড় মেয়ের কাছে নয় কেন?’

‘কারণ ভার্জিনিয়ার তাঁর ছোট মেয়ের উপর বেশি টান ছিল। আর অনেক গুণ ছিল এই ছোট মেয়ের—অর্থাৎ আমার স্ত্রী সুনীলাৰ। অবিশ্বাস সে সব গুণের সম্মতবহুর সে করেনি। বিয়ের পর পুরো গৃহিণী বনে গিয়েছিল। বিয়ে না করলে হয়তো ফিল্মে চাল নিত, কারণ তাঁর অভিনয় দক্ষতা ছিল যথেষ্ট।’

‘আপনার স্ত্রীর নাম সুনীলা বললেন। ওনার কোনও ক্রিপ্চান নাম নেই?’

‘হ্যাঁ। ওর পুরো নাম প্যামেলা সুনীলা।’

॥ ২ ॥

বাত্রে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে সকালে সাড়ে ছাঁচায় উঠে মুখ-টুখ ধূঁয়ে বক্সারে ব্রেকফাস্ট খেলাম। মোগলুনগাই আসবে পৌনে নটায়। লাঞ্চ থাব প্রতাপগড়ে সাড়ে বারোটার সময়।

জয়ন্তবাবু দেখলাম খুব সকালেই ওঠেন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বললেন, ‘কাছেই কুপেতে আমার এক চেনা ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর সঙে একবার দেখা করে আসি।’

লালমোহনবাবুও স্নানটান করে দাঢ়ি কামিয়ে একেবারে ফিটফাট। উনি ‘বিক’ রেজার দিয়ে দাঢ়ি কামান। এগুলো বার তিন-চার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়। কলকাতায় পাওয়া যায় না। লালমোহনবাবুর এক বন্ধু কাঠমানু থেকে ওর জন্য চার প্যাকেট অর্থাৎ কুড়িটা এনে দিয়েছেন। বললেন, ‘ভারী আবামে শেভ করা যায় মশাই।’

ফেলুদা বলল, ‘দু মাস পরে তো আবার দিশি ক্লেড ফিরে যেতে হবে।’

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, ‘নো স্যার। দাঢ়ি কামানোৱ ব্যাপারে আমি একটু লাঞ্চারি পছন্দ কৰি। আমি নিউ মার্কেট থেকে ডাইলকিনসন ক্লেড কিনি।’

‘সে তো অনেক দাম ।’

‘সংসার করিনি, টাকা কার জন্যে জমাব বলুন তো ? তাই নিজের পেছনেই থরচ করি ।’

‘আমাদের পেছনেও কম থরচ হয় না আপনার । আপনার গাড়ি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি ।’

‘ইশাই, তিনজনের একজন মাস্টেটিয়ারের গাড়ি আর দুজন চড়বে না—এ কেউ শুনেছে কখনও ?’

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বাইরের প্যাসেজে পায়চারি করতে গেল । মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, ‘এক নম্বর কুপেতে জয়স্তবাবু তাঁর আলাপীর সঙ্গে দিব্যি গম্ভীর মেতে আছেন । ইংরিজিতে কথা হচ্ছে অর্থাৎ ভদ্রলোক অবাঙালি । দেখে আংলো ইত্তিয়ান বলে ঘনে হল, যদিও রং আমাদেরই মতো ।’

‘কী কথা হচ্ছে শুনতে পেলেন নাকি ?’ জিঞ্জেস করলেন জটিল ।

‘আলাপী বললেন, “আই গিভ ইউ জাস্ট প্রি ডেজ ।” এর বেশি আর কিছু শুনিমি ।’

‘কথাটা কি হ্যাকি বলে ঘনে হল ?’

‘টেনের শুভের জন্য গল্প তুলতে হয় বলে সব কথাই হ্যাকির মতো শোনায় ।’

একটু পরেই জয়স্তবাবু তাঁর আলাপীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কামরায় এসে ফেলুদাকে বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই । দিস ইজ মিঃ সুকিয়াস—এ ওয়েলনোন বিজলেসম্যান অফ লাক্নাউ । তা ছাড়া আর্টের সমবাদারও বটে ।’

সুকিয়াস ইংরিজিতে বললেন, ‘আশা করি আমাদের আবার লখনৌতে দেখা হবে । মিঃ বিসওয়াস আমার অনেকদিনের পুরানো বন্ধু ।’

সুকিয়াস চলে গেলেন । জয়স্তবাবু তাঁর বার্থের আধখানা দখল করে বসলেন । বাকি আধখানায় যথারীতি ফেলুদা বসেছে ।

ফেলুদা জয়স্তবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, ‘আপনার শাশুভির আসল নাম বলছিলেন ভার্জিনিয়া রেন্ডস । এই রেন্ডস পরিবার কবে থেকে আছে ভারতবর্ষে ?’

জয়স্তবাবু বললেন, ‘ভার্জিনিয়ার ঠাকুরদাদা জন রেন্ডস



মুক্তিযুদ্ধ

ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ১৮৫৭-র সেপাই বিদ্রোহের সময় তিনি লখনৌতে পোস্টেড ছিলেন। যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়ে একেবারে শেষদিকে সেপাইদের কামানের গোলায় প্রাপ্ত দেন। তাঁর ছেলে টমাসও বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। তিনি উর্দু শিখে একদম ভারতীয় বনে গিয়েছিলেন। রাজাৰ হালে থাকতেন। নিজেৰ বাড়িতে রেঙ্গুলাৰ বাস্তিনাচেৰ আয়োজন কৰতেন। ফৰসিতে তামাক খেতেন, পান খেতেন, আতৰ

মাথতেন। এমনকী মাঝে মাঝে দিশি পোশাকও পরতেন। অবশেষে তিনি ফরিদা বেগম নামে এক কথক নাচিয়েকে ভালবেসে ফেলে তাকে বিয়ে করেন। বাড়িতে মুলসমান কেতা চালু ছিল। লোকে টমাসকে বলত “টমাস বাহাদুর”। টমাসের প্রথমে দুটি ছেলে হয়, নাম এডওয়ার্ড আর চার্লস। এরাও ছেলেবেলা থেকেই উর্দু বলত। এরা কেউই আর্মিতে যোগ দেয়নি। এডওয়ার্ড উকিল হয়, আর চার্লস আসামের চা-বাগানে ম্যানেজারি করতে চলে যায়। সে আর লখনৌতে ফেরেনি। টমাসের তৃতীয় সন্তান অবশ্য ছিল ভার্জিনিয়া। উনি ছেলেবেলা থেকেই উর্দু আর ইংরিজি একসঙ্গে শিখেছিলেন। গায়ের রংটা ছিল সাহেবের মতো ফরসা, কিন্তু চুল আর চোখ ছিল কালো। তাই যখন ছবিতে দিশি চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাঁকে বেমানান লাগত না।

‘আগেই বলেছি ভার্জিনিয়া একজন বাড়ালি ক্রিচানকে বিয়ে করেন। এর নাম ছিল পার্সিভ্যাল মতিলাল ব্যানার্জি। আসলে ইনি ছিলেন শকুন্তলার ছবির প্রোডিউসর। ইনিই আমার শাশ্বত্তিকে ছবিতে নামান। ত্রীর ছবি থেকে উনি অনেক টাকা করেন। সত্য বলতে কী, ভার্জিনিয়ার বাবা টমাস নোবি করে শেষ জীবনে বেশ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। তখন ভার্জিনিয়া তাঁর ফিল্মের রোজগার থেকে বাবাকে সাহায্য করেন।

‘পার্সিভ্যাল আর ভার্জিনিয়ার তিনটি সন্তান জন্মায়। বড় এবং মেজো হল মেয়ে, ছোটটি ছেলে। বড়টির নাম মার্গারেট সুনীলা। ইনি যে একজন গোয়ার অধিবাসীকে বিয়ে করেন সে কথা আগেই বলেছি। এর নাম স্যামুয়েল সালভান্থ। এনার একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান রয়েছে।

‘তৃতীয়া মেয়ে প্যামেলা সুনীলাকে আমি বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে। আমার মেয়ের কথা তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আমার একটি ছেলেও আছে। তার নাম ভিট্টের প্রসেনজিং। মেয়েটির নাম মেরি শীলা। ছেলেটিকে আমার আপিসে ঢোকাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সে নিজের পথে নিজের মর্জিমতো চলে। শীলা দুবছর হল ইজাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছে। ভাল অভিনয় করতে পারে—বাংলা ইংরিজি দুইই। তবে ওর আসল ইন্টারেন্স হল

জানলিঙ্গমে । দু একটা ইংরিজি লেখা কাগজে বেরিয়েছে—বেশ ভাল লেখা ।'

ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরালেন । লালমোহনবাবু যে সিগারেট খান না সেটা উনি জানেন ।

ফেলুদা বলল, 'অন্তুত ইতিহাস ।'

'হাইলি রোম্যান্টিক', বললেন লালমোহনবাবু ।

'শকুন্তলা দেবীর কষ্টহারটা কি আপনার শ্রী কখনও পরেছেন ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল ।

'দু একটা পার্টিতে পরেছেন । তবে সচরাচর ওটা সিল্ককেই তোলা থাকে । দেখলে বুঝবেন জিনিসটার কী মহিমা ।'

'আমি তো না দেখে থাকতে পারছি না', বললেন লালমোহনবাবু ।

'আর দিন চারেক ধৈর্য ধরুন', বললেন জয়স্বরাবু ।

চ ৩ ॥

আমরা তিন দিন হল লখনৌতে এসেছি । প্রথমবারের কথা বার বার মনে পড়ছে । সেই বাদশাহী আংটি, মিঃ শ্রীবাস্তব, বনবিহারীবাবুর আশ্চর্য চিত্তিযাখানা, হরিহার, আর লহুমন্দুলার পথে আয়াদের অ্যাডভেঞ্চারের শিহরন-জাগানো ফ্লাইম্যাকস ।

সেবার অবিশ্য আমরা হোটেলে থাকিনি । খুব সন্তুষ্ট ক্লার্কস-আওয়াখ হোটেল তখনও তৈরিই হয়নি । হোটেলটা সত্যই ভাল । আমরা পাশাপাশি একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুমে আছি । দু ঘরের জানালা দিয়েই গুম্ভুজী নদী দেখা যায় । নদীর ওপারে পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায়, সে দৃশ্য দেখবার মতো । হোটেলের খাওয়াও দুর্দান্ত ভাল । আমরা অনেক জায়গায় অনেক হোটেলে থেকেছি, কিন্তু এত ভাল খাওয়া কেবলও হোটেলে থাইনি ।

এই তিন দিনে লালমোহনবাবু লখনৌ-এর প্রায় বেশির ভাগ দ্রষ্টব্যই দেখে নিয়েছেন । আমরা প্রথম গেলাম বড়া ইমামবড়ায় । এর থাম-ছাড়া বিশাল হলঘর দেখে এবারও মাথা ঘুরে গেল ।

লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, কথা বেরোচ্ছে না, শুধু একবার বললেন, 'ত্রাভো নওয়াবস অফ লখনৌ।'

তারপর ভুলভুলাইয়া দেখে ভদ্রলোকের ভির্মি খাবার জোগাড়। এই গোলোকধীধায় নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন শুনে শুঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

আরও চমক এল রেসিডেন্সিতে। 'এ যে ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠছে মশাই। গোলাগুলির শব্দ পাছি, বারুদের গন্ধ পাছি। সেপাইদের এত এলেম ছিল যে এরকম একটা বিস্তৃতকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ?'

চতুর্থ দিনে সকালে একটু বাজারে গিয়েছিলাম এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি ভুনা পেঁড়া কিনতে, হোটেলে ফিরে এসে দেখি ঘরে ছাপানো নেমস্তুর চিঠি রয়েছে। পাঠিয়েছেন হেন্টের জয়স্ত বিশ্বাস। আগামী শুক্রবার, অর্থাৎ পরশু, তাঁদের বিয়ের রৌপ্য জয়স্তী উপলক্ষে মিঃ অ্যান্ড মিসেস বিশ্বাস আমাদের ভিনারে ডেকেছেন। নেমস্তুর চিঠির সঙ্গে একটা আলাদা কাগজে রাস্তার প্র্যান আর কোনখানে বাড়ি সেটা ছাপা রয়েছে। বাড়িটা যে নদীর ওদিকে সেটা ভদ্রলোক আগেই বলেছিলেন। প্র্যান দেখে বাড়ি খুঁজে বালু করায় কোনওই অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিকেলবেলা জয়স্তবাবু নিজে ফোন করলেন। ফোনের পর ফেলুন্দাকে জিজেস করাতে বলল ভদ্রলোক বলে দিলেন যেন আমরা অবশ্যই যাই। ওখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে, তা ছাড়া শকুন্তলার হারটাও দেখা যাবে। ফেলুন্দা আরও বলল যে ভদ্রলোক বলে দিয়েছেন যে একেবারে ইনফরম্যাল বাপার, কোনও বিশেষ পোশাক পরবার দরকার নেই।

'এইটৈই আমার ভয় ছিল', বলল ফেলুন্দা। 'নেমস্তুরে আপত্তি নেই, কিন্তু তার জন্য যদি সাহেব কিংবা বাবু সাজতে হয় তা হলেই গোলমাল।'

আমাদের হাতে একদিন সময় ছিল, তার মধ্যে ছোটা ইমামবড়া, ছন্দর মঞ্জিল আর চিড়িয়াখানা দেখে নিলাম। খাঁচার বাইরে বাঘ সিংহ দেখে লালমোহনবাবু ভয়ানক ইমপ্রেস্ড। বললেন কলকাতাতে এরকম হওয়া উচিত।

শুক্রবার একটা ট্যাঙ্কি নিয়ে আমরা পৌনে আটোয় বেরিয়ে

পড়লাম। প্র্যান দেখে বাড়ি বার করতে ক্ষেনও অসুবিধা হল না। একতলা ছড়ানো বাড়ি, সামনে বেশ বড় ফুলের বাগান। তার মধ্য দিয়ে নুড়ি ঢালা পথ চলে গেছে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। আমরা দরজায় বেল টিপলাম, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একজন উর্দি পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল। বাড়ির ভিতর থেকে লোকজনের গলার শব্দ পাচ্ছিলাম, বেয়ারা ভিতরে গিয়ে বলতেই জয়স্তবাবু চটপটি বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘আসুন, আসুন, মিঃ মিত্র, আই অ্যাম সো প্র্যান্ড ইউ হ্যাভ কাম।’

আমরা ডিনজন জয়স্তবাবুর পিছন পিছন বৈঠকখানায় গিয়ে চুকলাম। দেখলাম পাঁচ-সাত জনের বেশি লোক নেই। হয়তো পরে আরও আসবে।

এর পর আলাপ পর্ব। প্রথমে জয়স্তবাবুর ঝী। দেখে বুঝলাম মহিলা এককালে সুন্দরী ছিলেন। তারপর তাঁর দুই হেলেমেয়ে। মেয়েটি—নাম মেরি শীলা দেখতে সুন্দরী। চোখে মুখে বৃক্ষির ছাপ; হেলেটির একেবারে পার্ক স্টিট মার্ক চেহারা—দাড়ি, গোঁফ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তাঁতে চিমিনি পড়েনি। এরই সাম কিটের প্রসেসজিং। তারপর জয়স্তবাবুর বড় শালী এবং তাঁর স্বামী। ভদ্রমহিলা মেটা হয়ে গেছেন, ভদ্রলোক আবার তেমনই রোগা, দাড়ি গোঁফ কামানো, ঘাটের কাছাকাছি বয়স। এই সাল্ডান্হারই বাজনার দোকান আছে—ইনি গোয়ার অধিবাসী। আপাতত এই কজনই রয়েছেন ঘরে।

ঘরটা বেশ বড়, আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল দেখে যে ঘরের একদিকে একটা সিনেমা ক্লিন টাঙ্গানো রয়েছে আর অন্যদিকে রয়েছে একটা প্রোজেক্টর। জয়স্তবাবুকে জিজেস করাতে বললেন উদ্দের কাছে শকুন্তলা দেবীর শেষ ছবির একটা প্রিন্ট আছে, সেটার একটা রিল নাকি ডিনারের আগে দেখানো হবে। এই ছবিতে নাকি শকুন্তলা দেবী তাঁর বিষ্যাত হারটা পরেছিলেন। গঞ্জটা কপালকুণ্ডলা, আর শকুন্তলা দেবী সেজেছিলেন লুতফ-উল্লিসা। আমার তো শুনেই মনটা চনমন করে উঠল।

ফেলুদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ শুনে সকলের মধ্যে একটা চাঞ্জল্য

পড়ে গিয়েছিল। মেরি শীলা এসে বলল, ‘আমি আপনার একজন ভীষণ অ্যাডমায়ারার। দুর্ঘের বিষয় আমার কোনও অটোগ্রাফ থাতা নেই। আমি আজকালের মধ্যেই একটা থাতা কিনে নিয়ে আপনার হোটেলে গিয়ে সই নিয়ে আসব।’

বালার মধ্যে অনেকগুলো ইংরিজি কথা ব্যবহার করছিল শীলা। সেটা এখানে প্রায় সকলের মধ্যেই সক্ষ করছিলাম।

বেয়ারা পানীয় পরিবেশন করছিল। আমরা তো মদ খাই না, তাই তিনজনে তিন গেলাস ফলের সরবত নিয়ে মাঝে মাঝে চুমুক দিছিলাম। স্যামুয়েল সাল্ভান্ত্রা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘হজরতগঞ্জে আমাদের মিউজিক শপ। একদিন দোকানে এলে আমি খুব খুশি হব।’

‘আপনার দোকানে দিশি যত্রও বিক্রি হয়?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘আমরা এখন সেতারও রাখছি’, বললেন ভদ্রলোক।

এবার একজন ভদ্রলোক এলেন তাঁকে দেখেই বুবালাম তিনি জয়স্তবাবুর শালা, কার্প তাঁর চেহারার সঙ্গে সুলীলা দেবীর খুব সাদৃশ্য। ইনি আমি সামুহের অঙ্গেই দেখতে, কার্প এর চুল আর চোখও কঢ়া।

ইনি একটা হাইক্সির গেলাস তুলে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘আমার নাম বতনলাল ব্যানার্জি। আমি জয়স্তব আদার-ইন-ল। আপনাদের পরিচয়...?’

এই সময় জয়স্তবাবু এগিয়ে এসে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিলেন।

‘প্রাইভেট ডিটেকটিভ?’ বতনলাল ভুক্ত কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন। ‘আপনি কি কোনও ক্ষেত্রে ব্যাপারে লখনোতে এসেছেন?’

ফেলুদা হেসে বলে, ‘না, শ্রেফ ছুটি।’

এই সময় একজন ভদ্রলোক ঘরে এসে চুকলেন বাড়ির ভিতর থেকে। বৃক্ষে বলা চলে। সঙ্গবত ঘাটের উপর বয়স নিশ্চয়ই। বুবালাম তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। ভদ্রলোকের চেহারাটা কী রকম যেন অপরিচ্ছন্ন। এই পাটিতে তাঁকে মানাচ্ছে না। পোশাক অপরিক্ষার, দাঢ়িও অন্তত দুদিন কামাননি, মাথার চুল সম্বা হয়ে কাঁধ

পর্যন্ত নেমেছে ।

জয়স্তবাবু ভদ্রলোকের পিঠে হাত দিয়ে আমাদের দিকে নিয়ে এলেন ।

‘আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, বললেন জয়স্তবাবু । আমা গোল ইনি হচ্ছেন একজন চিকিৎসী । নাম সুদৰ্শন সোম । এককালে খুব নাম করা পোত্রের পেন্টার ছিলেন, শকুন্তলা দেবীর অনেকগুলো ছবি একেছিলেন । এখন রিটায়ার করে জয়স্তবাবুর বাড়িতেই গেস্ট হয়ে থাকেন । আটিস্টকে এই বয়সে রিটায়ার করতে শুনিনি কখনও, তাই একটু অবাক লাগল । এবার লক্ষ করলাম বৈঠকখানার দেয়ালে একটা ছবি—এক মহিলার, বছর চাইশেক বয়স—তার জ্বার কোণের দিকে দেখা এস. সোম । ইনিই কি শকুন্তলা দেবী ? বয়স বেশি হলেও তেহরায় বেশ একটা জৌলুস রয়েছে । তখন অবিশ্য শকুন্তলা দেবী আর ছবি করেন না । সুদৰ্শন সোম এবার বেয়াদার টে থেকে একটা হাইক্সির গেজাস তুলে নিলেন । ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি কষ্ট হচ্ছিল ।

ঘরের মধ্যে সর্বচেয়ে বেশি কথা বলছিলেন স্বামুয়েল সালভানহু । তিনি রাজনীতি নিয়ে উচ্ছেষ্ণে তর্ক কুড়ে দিয়েছেন গুরুতন্ত্রাত ধ্যানার্জির সঙ্গে । সেই তর্কে দেখলাম সুদৰ্শন সোমও যোগ দিলেন ।

আমি খালি ভাবছিলাম শকুন্তলা দেবীর হারটা কখন দেখা যাবে । দুই গিমিকে দেখছি অতিথিদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলেছেন । জয়স্তবাবুর শ্রী সুনীলা দেবী ফেলুদাকে এসে বললেন, ‘আপনি অরেঞ্জ প্রেয়াশ খাচ্ছেন, ব্যাপার কী—আপনি ড্রিক করেন না বুঝি ?’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘না, আমাদের পেশায় মাথাটা সব সময় ঠাণ্ডা রাখাই ভাল ।’

‘কিন্তু আমি তো জানতাম প্রাইভেট ডিটেকটিভরা ভীষণ ড্রিক করে ।’

‘সেটা আপনার ধারণা হয়েছে বোধহয় আমেরিকান জাইম উপন্যাস পড়ে ।’

‘তাই হবে । আমি ভীষণ গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত ।’

‘ভাল কথা’, ফেলুদা আর না বলে পারল না, ‘আপনার স্বামী

বলছিলেন আজ শকুন্তলা দেবীর হারটা একবার আমাদের দেখাবেন।'

'ও হাঁ—তা তো বটেই—দেখেছেন, আমি একদম ভুলে গেছি। শীলা।'

শীলা তার মা-র দিকে এগিয়ে এল।

'কী মা ?'

'যাও তো সোনা—তোমার দিদিমার হারটা একবার নিয়ে এসো তো। জানো তো চাবি কোথায় আছে। মিঃ মিত্র একবার দেখতে চাইছেন।'

শীলা তঙ্কুনি চলে গেল আদেশ পালন করতে।

'চাবি বুঝি আপনার কাছে থাকে না ?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'না। ওটা থাকে আমার ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে। হারটা থাকে সিন্দুকে। এ বাড়িতে চুরি হ্বার কোনও ভয় নেই। আমার চাকরো সব পুরনো। সুলেমান—যে আপনাদের দরজা খুলে দিল—সে আছে আজ ত্রিশ বছর। অন্য চাকরও সব পুরনো আর বিশ্বস্ত।'

তিনি জিনিসের মধ্যে শীলা কিন্তু ফেলে—তার হাতে একটা গাঢ় নীল মখমলের বাজ্র। মেয়ের হাত থেকে বাজ্রটা নিয়ে নিলেন সুনীলা দেবী। তারপর 'এই যে' বলে বাজ্রটা খুলে এগিয়ে দিলেন ফেলুদার দিকে।

আমি আর লালমোহনকাবু বাজ্রটার দুদিকে দাঁড়ালাম, আর দুজনের মুখ থেকে একই সঙ্গে একটা বিশ্বাসসূচক নিশ্চাস টানার শব্দ বেরিয়ে এল।

এমন অপূর্ব গয়না আমি কখনও দেখিনি। নকশাদার সোনার হার। তাতে হিরে থেকে শুক করে যত রুকম মণিমুক্তে হয় সব বসানো।

'আশ্চর্য জিনিস', বলল ফেলুদা। 'এরুকম হার দুটি হয় না। এটার আজকের দর কত হতে পারে তা আন্দাজ আছে আপনার ?'

'তা দুই আড়াই লাখ হবে নিশ্চয়ই।'

'থাক—এটা আর বেশিক্ষণ বাইরে রাখা ভাল না। নাও, শীলা, এটা আবার রেখে দিয়ে এসো।'

শীলা হারটা নিয়ে চলে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম যে জয়স্তবাবুর ছেলে আমাদের দিকে বেশি ঘেঁষছে না। দেখে মনে হল ছেলেটি মিশুকে নয়। আর পাটিটাও যেন সে বিশেষ উপভোগ করছে না। অবিশ্যি এই টাইপের এই বয়সী ছেলেরা এরকমই হয়, এটা কলকাতাতেও লক্ষ করেছি। এরা নিজেরা দল ছাড়া কোনও দলের সঙ্গেই মিশতে পারে না।

ত্রিংকসের পর্ব বোধহয় শেষ হল, কারণ এবার একজন ভদ্রলোক এসে এক রোল ফিল্ম নিয়ে প্রোজেক্টরে চাপাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, ‘আমি রেডি আছি।’

জয়স্তবাবু এবার খোঝগা করলেন যে শকুন্তলা দেবী অভিনীত কপালকুণ্ডলা ছবির একটা রিল দেখানো হবে। ‘সুলেমান, ঘরের বাতিগুলো নিবিয়ে দাও তো।’

ঘর অঙ্ককার হয়ে গেল। তারপর ঘর্যর শব্দ তুলে প্রোজেক্টর চলতে শুরু করল। পর্দায় ছবি নড়ে উঠল। সেই আদ্যিকালের ছবি। জয়স্তবাবু বললেন, ‘এটা ১৯৩০ সালের ছবি। ভারতবর্ষে টকি আসার ঠিক আগে।’

আমি অবাক হয়ে মেঠছিলাম ‘শকুন্তলা (দেবীকে)।’ দেখলে মেঘসাহেব মনে হয় না। চেহারা সত্যি খুবই সুন্দর—আজকের দিনেও পর্দায় এত সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সাইলেন্ট ছবির যা দোষত্বটি আর থিয়েটারি অভিনয় সেটাও যে নেই এই কপালকুণ্ডলায় তা নয়। তবুও জানা গেল শকুন্তলা দেবীর পপুলারিটির খানিকটা কারণ। মহারাজা থেকে শুরু করে পানবিড়িওয়ালা পর্যন্ত সকলকেই মুক্ত করেছিলেন তিনি। সকলেই তাঁর ছবি দেখত আর বাহবা দিত।

দশ মিনিট চলে ছবি বন্ধ হল।

ঘরের বাতি জলে উঠল। সকলে আবার কথাবার্তা শুরু করল।

এই অঙ্ককার অবস্থাতেই যে আরেকজন ঘরে চুকেছে তা টের পাইনি। এঁকে আমরা চিনি। ইনি হলেন মিঃ সুকিয়াস। ইনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন পাটির দিনে এসে পড়ার জন্য। অর্থাৎ ইনি নিমন্ত্রিত হননি—এমনি বোধহয় জয়স্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বেয়ারা এসে থবর দিল পাত পড়েছে—ডিনার ইজ সার্ভড।





চমৎকার মোগলাই রান্না খেয়ে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম
তখন বেজেছে সোয়া এগারোটা । পাটি যে আরও কিছুক্ষণ
চলেছিল তাতে সন্দেহ নেই ।

॥ ৪ ॥

প্রদিন সকালে ফেলুদা আমার কাঁধ ধরে বাঁকুনি দিয়ে আমাকে
ঘুম থেকে তুলল । আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম ।

‘কী ব্যাপার ফেলুদা ?’

ফেলুদার মুখ গন্তবীর ।

‘জয়স্তবাবু ফোন করেছিলেন । এক্ষুনি । শকুন্তলা দেবীর
কঠহার মিসিং ।’

‘সর্বনাশ ।’

‘তুই চট করে তৈরি হয়ে নে । আমি লালমোহনবাবুকে খবরটা
দিয়ে আসছি । আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়েই যেতে হবে ওখামে ।
তখু মিঃ সুকিয়াস ছাড়া আর সকালেই এসেছে পুরানে খবরটা
পেয়ে ।’

‘পুলিশে খবর দেয়নি ?’

‘দিয়েছে, কিন্তু আমাকেও চায় ।’

আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে জয়স্তবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম ।
বাড়ির সবাই কেমন যেন পাথরের মতো চুপ । ফেলুদা ক্ষমা
চাইল । ‘কাল আমাদের দেখানোর জন্যই হারটা বার করা
হয়েছিল । তার সঙ্গে এ চুরির কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি
না, কিন্তু আমি নিজে খানিকটা অসোয়ান্তি বোধ করছি বলে কথাটা
বললাম ।’

পুলিশের লোক আগেই এসে গিয়েছিল । তাদের মধ্যে যিনি
কর্তা তিনি ফেলুদার দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘আমি
ইনস্পেক্টর পাতে । আপনি তো বোধহয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর
মিঃ মিটার ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ,’ বলল ফেলুদা ।

‘আই আম ফ্যামিলিয়ার উইথ ইয়োর নেম’, বললেন পাণ্ডে।
 ‘আপনার কয়েকটা সাঙ্গেসফুল ইনভেস্টিগেশনের কথা আমার মনে
 আছে। তা আপনি তো বোধহয় জেরা করতে চান ?’

‘আগে আপনার কাজ শেষ হয়ে যাক,’ বলল ফেলুন। ‘তারপর
 আমার।’

‘থ্যাক্স ইউ স্যার।’

প্রশ্ন করে জানা গেল যে কাল বাত্রে সবাই চলে যাবার পর
 বারোটা নাগাদ জয়স্তবাবুর জী তাঁর বেডরুমে গিয়ে শুভে যাবার
 আগে কেন জানি আরেকবার হারটা দেখার ইচ্ছা অনুভব করেন।
 হয়তো কপালকুণ্ডলা ছবিতে শকুণ্ডলা দেবীকে হার পরা অবস্থায়
 দেখেই সে ইচ্ছেটা জাগে। ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন, ‘এটা একটা
 ভ্যানিটির ব্যাপার। আমার মা-র গলায় হারটা এত সুন্দর মানাত ;
 সেটা দেখেই আমার মনে একটা ইচ্ছে হল হারটা একবার পরে
 আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি। মেয়েরা শুভে যাবার আগে বেশ
 বানিকটা সময় ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কাটায়। সেই
 সময়ই দেরাজ থেকে চাবিটা ঝাঁক করে সিন্দুর খুলে দেখি হারটা
 নেই। আমি তৎক্ষণাত আমার মেয়েকে ডাকি। মেয়ে জোর দিয়ে
 বলে যে সে সিন্দুরেই রেখে ছিল হারটা। সেখানে ছাড়া আর
 কোথায়ই বা রাখবে ? সিন্দুরেই তো চিরকাল থেকেছে হারটা।’

‘আপনারা ভাল করে খুঁজে দেখেছেন হারটা ?’ পাণ্ডে জিজ্ঞেস
 করল।

‘কোথায় আর খুঁজব বলুন,’ বললেন সুনীলা দেবী, ‘ওটা যে
 কেউ সিন্দুর থেকে বার করে নিয়েছে তাতে তো কোনও সন্দেহ
 নেই !’

‘আপনাদের বাড়িতে কাল পার্টি ছিল, তাই না ?’ পাণ্ডে প্রশ্ন
 করলেন।

‘হ্যাঁ, বললেন জয়স্তবাবু।

‘কটা থেকে কটা পর্যন্ত ?’

‘আটটা থেকে পৌনে বারোটা।’

‘মিসেস বিশ্বাস, আপনি কি পার্টির পরেই আপনার ঘরে চলে



যান ?

‘হ্যাঁ ।’

‘আর তার কতক্ষণ পরে আবিকার করেন যে হারটা মেই ?’

‘মিনিট পনেরো ।’

‘এর মধ্যে আপনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোননি ?’

‘না ।’

‘অর্থাৎ হারটা চুরি হয়েছে ডিউরিং দ্য পার্টি ?’

‘তাই তো মনে হয়,’ বললেন জয়স্বামু। ‘এখানে একটা কথা
বলি—পার্টির মধ্যে হারটাকে আমার মেয়ে একবার সিল্পুক থেকে

এই ঘরে আনে—মিঃ মিত্রকে দেখানোর জন্য।’

‘তার পরেই—তখনই কি আপনার মেয়ে হারটাকে আবার সিন্দুকে তুলে দেয়?’

‘হ্যাঁ, বলল মেরি শীলা। ‘আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি।’

‘এখানে একটা জরুরি কথা বলা দরকার,’ বললেন জয়স্বামু। ‘হারটা তুলে রাখার কিছু পরেই এ ঘরে একটা দশ মিনিটের ফিল্ম দেখানো হয়।’

‘তার জন্য তখন বাতি লেবানো হয়েছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘এ বাড়িতে চাকর কজন?’

‘তিনজন। একজন রাস্তা করে। আর দুজন বেয়ারা।’

‘কতদিনের লোক এরা?’

‘কেউই পনেরো বছরের কম না। এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী। সুলেমান তো আমার শ্বশুরের আমল থেকে আছে।’

‘তা হলে একটাই সিন্দুতে পৌঁছানো যাচ্ছে’ বললেন পাণ্ডে। ‘জিনিসটা শুনতে আরাপ সাগাবে, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। এই বাড়ির লোক সমেত এই পার্টিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরই একজন হারটা নিয়েছেন।’

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল, আর আমার মনে হয় ফেলুদা আর লালমোহনবাবুরও তাই।

পাণ্ডে এবার ফেলুদার দিকে ফিরলেন।

‘মিঃ মিটার, আপনার সঙ্গে যে দুজন এসেছেন, তাঁদের পরিচয় পেতে পারি কি?’

‘নিশ্চয়ই’, বলল ফেলুদা। ‘ইনি আমার কাজিন তপেশ মিত্র, আর ইনি আমার বন্ধু—বিখ্যাত লেখক লালমোহন গান্ধুলী।’

‘এই লেখকটিকে আপনি কতদিন হল চেনেন?’

‘বছর পাঁচ-ছয়।’

আমি লালমোহনবাবুর দিকে দেখছিলাম। ভদ্রলোক ঘ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমি ওকে কষ্টহার চোর হিসেবে কল্পনা করলাম। এই সংকটের অবস্থাতেও আমার হাসি পেয়ে গেল।

এবার পাণ্ডে অন্য প্রশ্নে গেলেন ।

‘এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কজন এ বাড়িতে থাকেন ?’

জয়স্তবাবু বললেন, ‘আমি, আমার স্ত্রী, আমার দুই ছেলেমেয়ে এবং আটিস্ট মিঃ সোম ।’

মিঃ সোম আজও দাঢ়ি কামাননি । তাই তাঁকে আরও অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে ।

‘আর সকলেই বাইরের সোক ?’ পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন ।

‘হ্যাঁ । মিঃ সালভান্হা থাকেন ক্লাইভ রোডে । উনি আমার ব্রাদার-ইন-ল । ওর স্ত্রী আমার স্ত্রীর বড় বোন ।’

‘আরেকজনকে দেখছি’ রতনলালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন মিঃ পাণ্ডে ।

‘উনি রতনলাল ব্যানার্জি—আমার স্ত্রীর ছেট ভাই ।’

‘এ ছাড়া আর কেউ ছিল ?’

‘একজন ছিলেন । লাটুশ রোডের মিঃ সুকিয়াস । উনি অবশ্য নিম্নিতদের মধ্যে ছিলেন না, এমনিই এসে পড়েন । তিনি এসেছিলেন যখন কিঞ্চিটা দেখানো হচ্ছে জরুর মায়থারে । আলো জ্বালার পরে আমি তাঁকে দেখি ।’

‘এই সুকিয়াসের প্রোফেশন কী ?’

‘হি ইজ এ কালেক্টর অফ আর্ট অবজেক্টস । তা ছাড়া তেজারতির কারবার আছে ।’

‘ইনি কি এই হারটা সহকে কোনওদিন ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলেন ?’

‘উনি ওটা কিনতে চেয়েছিলেন আমরা বিক্রি করিনি ।’

‘আই সি ।’

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে একটুক্ষণ গভীর থেকে বললেন, ‘এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে কাল এখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন হারটা নিয়েছেন । এখন কথা হচ্ছে, সেই হারটা কোথায় ।’

জয়স্তবাবু গলা ঝাঁকরে নিয়ে বললেন, ‘আপনি যদি সার্চ করতে চান তা হলে করতে পারেন । এমনকী ব্যক্তিগত খানাতলাশিতেও আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ।’

পাণে বললেন, 'তা তো করতেই হবে। সার্চ থেকে মহিলারাও বাদ পড়বেন না। এবং তার জন্য আমি মেয়ে পুলিশের বন্দোবস্ত করছি। তা ছাড়া বাড়িটাও ভাল করে সার্চ করা দরকার।'

সার্চের ব্যাপারে দেখলাম কেউই আপত্তি করলেন না। খালি সাল্ডান্হা বললেন, 'আমার দোকান খুলতে হবে দশটার সময়। তার মধ্যে আমার সাটো হয়ে গেলে ভাল।'

ফেনুদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, 'এখানে সার্চ চলুক। আমি তা হলে এখন আসি। যদি হারটা পাওয়া যায় তা হলে আশা করি জয়স্তবাবু আমাকে মেন করে জানিয়ে দেবেন। না হলে আমি ও বেলা আবার আসব।'

আমরা তিনজনে হোটেলে ফিরে এলাম। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে আমাদের ঘরেই এলেন। ভদ্রলোক চুকেই বললেন, 'এ নিয়ে কবার হল বলুন তো, যে আমরা বেড়াতে গিয়ে কেসে জড়িয়ে পড়েছি? এ জিনিস টেলিপ্যাথি ছাড়া হয় না।'

ফেনুদা বলল, 'দেখি আপনার শ্বরণশক্তি কতদুর। তোপসেকে তো এর আগে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেছি, আপনাকে কখনও করা হয়নি।'

'ভেরি ওয়েল স্যার, আই অ্যাম রেডি', বললেন জটায়ু।

'আগে শকুন্তলা দেবীর ফ্যামিলি স্থানে জিজ্ঞাসা করি।'

'ব্যর্থন।'

'তদ্মহিলার তিন সন্তানের নাম বলুন তো।'

'বড় মেয়ে সুশীলা—'

'তার আগে একটা ক্রিশ্চান নাম আছে।'

'ও হ্যাঁ—ক্রিশ্চান নাম...ক্রিশ্চান নাম...'

'তোপসে বলতে পারিস ?'

আমার মনে ছিল। বললাম, 'মার্গরিট।'

'ভেরি শুভ। তার পরের মেয়ে, অর্থাৎ জয়স্তবাবুর স্ত্রী? এই প্রশ্নটা কিন্তু লালমোহনবাবুকে করছি।'

লালমোহনবাবু এটা ভোলেননি। বললেন, 'প্যারেলা সুশীলা।'

'গুড়। তাঁর পরের ভাই ?'

'ইয়ে—রতনলাল। অ্যালবার্ট রতনলাল।'
 'এবার সুশীলা দেবীর স্বামীর নাম ?'
 'স্যামুয়েল সালভান্থ।'
 'ভেরি গুড। সুনীলা দেবীর ছেলেমেয়ে ?'
 'মেয়ে শীলা—মেরি শীলা। আর ছেলে প্রসেনজিৎ। ক্রিস্টান
 নাম ভুলে গেছি।'
 'ভিট্টের। আর কে ছিলেন কাল পার্টিতে ?'
 'সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক। নামটা মনে পড়ছে না।'
 'তোপ্সে ?'
 'সোম। সুদৰ্শন সোম।'
 'গুড।'
 'কিছু মাইন্ড করবেন না মশাই', লালযোহনবাবু বললেন,
 'ভদ্রলোককে কিন্তু আমার ভাল লাগল না।'
 'কেন ?'
 'কীরকম পাগলাটে চেহারা। দাঢ়ি কামাননি।'
 'আর্টিস্টরা সব সময় ক্ষমাজৈক বিয়মকানুন ব্যবেচনে চালেন।'
 'তা হতে পারে। মোট কথা, উনি আর আরেকজন আমার কাছে
 এই চুরির ব্যাপারে প্রাইম সাসপেন্টস।'
 'আরেকজন কে ?'
 'জয়ন্তবাবুর ছেলে প্রসেনজিৎ। একেবারে কলকাতার পার্ক
 ট্রিটের বাড়িভুলেদের মতো চেহারা। অবশ্য মদ তো দেখলাম খায়
 না ছেলেটি।'
 'খেলেও হয়তো বাপের সামনে খায় না।'
 'এনিওয়ে, পার্টিতে কিন্তু আরেকজন ছিলেন।'
 'মিঃ সুকিয়াস তো ?'
 'হ্যাঁ। এঁর কিন্তু হারটার উপর লোভ ছিল।'
 'যে কোনও আর্ট কালেক্টরেই থাকবে। সেটা কিছুই আশ্চর্য
 না। আর্ট কালেক্টর হলে কিনতে চাইবে। আর অভাবী লোক হলে
 হাতাতে চাইবে। এন্দের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কোনও
 কিছুই জানি না। কাজেই এখন অঙ্ককারে হাতড়ে লাভ নেই।'

বিকেলে জয়স্তবাবু ফোন করবেন, তার আগে পর্যন্ত আমরা ক্ষি ।
চলুন, আপনাকে কাইজার-বাগটা দেখিয়ে আনি ।’

‘ডেরি গুড আইডিয়া’, বললেন লালমোহনবাবু । ‘তদন্তের চাপে
যদি লখনৌ শহরটা দেখা সম্পূর্ণ না হয় তা হলে খুব আপসোস
থেকে যাবে ।’

॥ ৫ ॥

বিকেলে কথামতো জয়স্তবাবু ফোন করলেন । পুলিশ সার্চ করে
কিছু পায়নি । বাড়ির চাকরদের জেরা করা হয়েছে, তাতেও কোনও
ফল হয়নি । যেন্দুরা বলল, ‘চল, এবার একবার জয়স্তবাবুর বাড়ি
যাওয়া যাক । এবার ফেলু মিস্টারের কাজ শুরু । অবিশ্য পুলিশ
তাদের তদন্ত চালিয়েই যাবে, কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে
না ।’

হোটেলেই টাঙ্গি ছিল, একটা নিয়ে গম্ভীর ত্রিভু পেরিয়ে
জয়স্তবাবুর বাড়ি গিয়ে ছাঁজির ছলাম । আর বাড়িটাকে গম্ভীর
দেখাচ্ছিল, বেশ বোকা যাচ্ছিল ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ।

সুলেমান এসে দরজা খুলে দিল, আমরা তিনজন ভিতরে
যুক্তাম । জয়স্তবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন
বৈঠকখানায়, আমাদের দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে এলেন ।

‘ওটা পাওয়া গেল না’, প্রথম কথাই বললেন ভদ্রলোক ।

ফেলুদা বলল, ‘সেটা অব্যাক্তিক নয় । আমারও মনে হয়েছিল
ওটা পাওয়া যাবে না । যে নিয়েছে সে তো আর বোকা নয় যে
হাতের কাছে রেখে দেবে জিনিসটা ।’

‘আপনিও কি আলাদা করে সার্চ করতে চান ?’

‘না,’ বলল ফেলুদা । ‘আমি আপনার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে
একটু কথা বলতে চাই । এখন এ বাড়িতে কে কে রয়েছেন ?’

‘আমার শ্রী, আমার মেয়ে, ছেলে বোধহয় এখনও ফেরেনি ।
আর আছেন সোম—যাঁর সঙ্গে কাল আপনাদের আলাপ করিয়ে
দিয়েছিলাম ।’

‘আমার কিন্তু মিঃ সাল্ভান্হার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। আর মিঃ সুকিয়াস।’

‘সেটা কোনও অসুবিধা নেই। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দেব, আপনি ফোনে আপয়েন্টমেন্ট করে চলে যাবেন।’

‘তা হলে আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক।’

‘বেশ তো।’

আমরা সকলেই সোফায় বসলাম।

‘একটু চা খাবেন তো?’ জয়স্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘তা খেতে পারি।’

জয়স্তবাবু সুলেমানকে ডেকে চার কাপ চার্লের অর্ডার দিলেন। তারপর ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে তার প্রশ্ন শুরু করল।

‘আপনি বলছিলেন সুকিয়াস আপনার শাশুড়ির হারটা কিনতে চেয়েছিলেন। সেটা কতদিন আগে?’

‘বছরখানেক হবে।’

‘সুকিয়াস জানলেন কী করে এই হারের কথা?’

‘এটার কথা জানেকেই জানে। এককালে ব্যবরের কাগজে খেরিয়েছিল তো। আমার শাশুড়ি মারা যাবার পর তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানকার “প্যারোনিয়ার” কাগজে খেরিয়েছিল। তাতে হারের কথাটা ছিল। সুকিয়াস এমনিতে মানিলেভার, তেজারতির কারবার করে। ভাবলে মনে হয় এমন লোকের শিখের দিকে কোনও বৈধিক থাকবে না। কিন্তু সুকিয়াস এ ব্যাপারে একটা বিরাট ব্যতিক্রম। আমি ওর বাড়িতে গিয়েছি ওর সংগ্রহ দেখেছি। দেখবার মতো সব জিনিস আছে ওর কাছে। ওর কুঠি অনবদ্য।’

‘আপনি যখন হারটা বিক্রি করলেন না, তখন ওর প্রতিক্রিয়া কী হয়?’

‘ও যুবই হতাশ হয়েছিল। ও দু লাখ টাকা অফার করেছিল। আমি নিজে হলে কী করতাম জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী হারটার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। কোনও মতেই ওটা হাতছাড়া করবে না। আর সেই হারই...’

জয়স্তবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

‘আপনি কাউকে সন্দেহ করেন এই ব্যাপারে ?’

‘আমি সম্পূর্ণ হতভম্ব । চাকরবাকর কাউকেই আমার সন্দেহ হয় না । ওরা বেইমানি করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না । অর্থাৎ তার বাইরে কে যে এটা নিতে পারে, এবং কেন, সেটা বোঝার সাধ্য আমার নেই ।’

‘আপনি তো ব্যবসাদার’, ফেলুদা বলল ।

‘ব্যবসাদার মানে আমার একটি ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের আপিস আছে ।’

‘কেমন চলে আপিস ?’

‘ভালই । আমাদেরই কোম্পানি । আমার একজন পার্টনার আছে ।’

‘কী নাম ?’

‘তিতুবন নাগর । এখানকারই লোক । আমার প্রথম জীবনে আমি ব্যবসায় ছিলাম না, একটা সওদাগরি আপিসে চাকরি করতাম । নাগর ছিল আমার বাস্তু । তিশ বছর আগে নাগর আর আমি মিলে আপনাদের ব্যবসা শুরু করি ।’

‘আপনাদের কোম্পানির নাম কী ?’

‘মডার্ন ইমপোর্ট আন্ড এক্সপোর্ট ।’

‘কোথায় আপনাদের আপিস ?’

‘হজরতগঞ্জে ।’

ইতিমধ্যে আমাদের চা এসে গেছে, আমরা থেতে শুরু করে দিয়েছি । ফেলুদা বলল, ‘আরেকটা প্রশ্ন আছে ।’

‘কী ?’

‘কাল যখন ফিল্মটা চলছিল তখন আপনি কাউকে চলাফেরা করতে, কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন ?’

‘উহ ।’

‘আপনার ছেলে কোনও চাকরি করে ?’

‘এখনও না । ওকে আমার আপিসে ঢোকানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু ও রাজি হয়নি ।’

‘ওর বয়স কত ?’

‘পঁচিশ।’

‘ওর কোনদিকে ঝোঁক ?’

‘সৈক্ষণ্য জানেন।’

‘থ্যাক ইউ স্যার। একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যায় কি ?’

‘নিশ্চয়ই। ও খুবই ডিপ্রেস্ড হয়ে পড়েছে, বুঝতেই পারেন।’

‘আমি বেশি বিরক্ত করব না ওঁকে ?’

চা খাবার পর জয়স্তবাবু গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। ভদ্রমহিলা কান্নাকাটি করেছেন সেটা এখনও দেখলে বোধ যায়। দিনের বেলা দেখে আরও বেশি করে মনে হল যে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে এর আশৰ্য্য চেহারার মিল। ভদ্রমহিলা চাপা গলায় বললেন, ‘আপনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিলেন... ?’

ফেলুন্দা বলল, ‘হ্যাঁ। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না। সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন।’

‘বলুন।’

‘আপনাকে যা যে হারটা আপনার দিনিকে সাঁ দিয়ে আপনাকে দিলেন তাতে আপনার দিদির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?’

‘তিনি বোধহয় এ ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন।’

‘কেন ?’

‘দিদি ছিল আমার ধাবার ফেভারিট, আর আমি ছিলাম মা-র। মা মারা যাবার তিন বছর আগে হারটা আমাকে দেন। দিদির মনের অবস্থা কী হয়েছিল বলতে পারব না, কারণ এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথনও কোনও আলোচনা হয়নি।’

‘আপনার দিদির সঙ্গে আপনার সন্তাব আছে ?’

‘হ্যাঁ। যত দিন যাচ্ছে আমরা দুজনে তত আরও কাছাকাছি এসে পড়ছি। যখন ইয়াঁ ছিলাম তখন দুজনের মধ্যে একটা রেবারেবির ভাব ছিল।’

‘আপনি তো অভিনয় করতে খুব ভালবাসেন ?’

‘হ্যাঁ। তাই তো মা আমাকে নিয়ে এত প্রাইড ছিলেন। এ

ব্যাপারে দিদির কোনও শব্দ ছিল না।’

‘আপনার মেয়ের ?’

‘শীলা কুলে কলেজে অ্যাকটিং করেছে, ক্লাবে-ট্লাবেও দু-একবার করেছে। তার বেশি নয়। ও ফিল্মে অফার পেয়েছে, কিন্তু নেয়নি।’

‘ও কী করতে চায় ?’

‘ও শয়ার্কিং গার্ল হতে চায়। আপিসে কাজ করবে, নিজে রোজগার করবে। ও তো সবে বি-এ পাশ করেছে। এর মধ্যে কিছু জানালিঙ্গম করেছে, খবরের কাগজে ওর দু একটা লেখা বেরিয়েছে।’

‘আপনি কি এই চুরির ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন ?’

‘কাউকেই না। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না।’

‘কাল যখন ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল তখন কাউকে হাটোচলা করতে দেখেছিলেন ?’

‘না। মনে হল সবালেই তমার হয়ে ছবিটা দেখছে ?’

‘ঠিক আছে, মিসেস বিশ্বাস। আপনার ছুটি।’

মিসেস বিশ্বাস ধন্যবাদ দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

ফেলুদা জয়স্তবাবুর দিকে ফিরল।

‘আমি একবার মিঃ সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘বেশ তো, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

জয়স্তবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

দু মিনিটের মধ্যে সুদর্শন সোম এসে হাজির হলেন। আজ তিনি দাঢ়ি কাঘিয়েছেন কোনও একটা সময়, তাই তাঁকে একটু ভদ্রস্ত লাগছে। তিনি ফেলুদার সামনের সোফায় বসলেন, তাঁর মুখে চুরুট। কাল পাটিতে একে চুরুট খেতে দেখেছি। কড়া গজ্জে ঘরটা ভরে গেল।

ফেলুদা প্রশ্ন শুরু করল।

‘আপনি কত দিন এ বাড়িতে রয়েছেন ?’

‘বছর পনেরো হল। শকুন্তলা দেবীই আমাকে এ বাড়িতে



থাকতে বলেন । ’

‘আপনি এক কথায় রাজি হয়ে যান ? পরের আশ্রিত হতে
কেনওরকম দ্বিধা-সংকোচ বোধ করেননি ?’

‘তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আসছে । এখন আমার
বয়স সাতষটি । তখনই আমি পঞ্জাশের উপর । ডান হাতের বুড়ো
আঙুলে আরওয়াইটিস, তাই ছবি আঁকতে পারছি না । শকুন্তলা
দেবীর অনুগ্রহে আমার তবু একটা সংস্থান হল । তা না হলে আমি
যে কী করতাম জানি না । আমায় না খেয়ে মরতে হত । অবশ্য
পরের চ্যারিটি ভোগ করছি এই নিয়ে অনেকদিন খুব সচেতন

ছিলাম, মনটা খচখচ করত। কিন্তু এঁরাও আমার উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন, শীলা আর প্রসেনজিৎ আমাকে খুব ভালবাসত, তাই ব্যাপারটা ক্রমে অভ্যন্তর হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনার নিজের রোজগার বলে তো কিছুই নেই।'

'দু একটা পুরানো ছবি মাঝে মাঝে অঙ্গ দামে বিক্রি হয়। সে তেমন কিছুই না। সত্যি বলতে কী, আই আয় পেনিলেস। জয়স্তবাবু আমাকে প্রতি মাসে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দেন, আর থাকা-ঝাওয়ার ব্যবস্থাটা রয়েছে। চুরুটের অভ্যাসটা অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারিনি। তবে অনেক কমিয়ে দিয়েছি।'

'এই চুরির ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?'

মিঃ সোম একটু ভেবে বললেন, 'চাকরদের কাউকে হয় না।'

'তবে কাকে হয় ?'

মিঃ সোম আবার চুপ করে গেলেন। ফেলুন বলল, 'আপনি ইতস্তত করলে কিন্তু আমার কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। আপনি নিশ্চয়ই চান যে শব্দস্থলা দেবীর হারটা আবার উদ্ধার হোক।'

'তা তো বটেই।'

'তা হলো বলুন আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কি না।'

'একজনকে হয়।'

'কে সে ?'

'প্রসেনজিৎ।'

'কেন এ কথা বলছেন ?'

'প্রসেনজিৎ আর আগের মতো নেই। সে অনেক বদলে গেছে। আমার ধারণা সে কুসঙ্গে পড়েছে। হয়তো জুয়া খেলে, নেশা করে, তার জন্য তার টাকার দরকার পড়ে। চাকরি-বাকরি তো কিছুই করে না। বাপ তাকে যা দেন তাতে তার চলে না। সে আমার কাছ থেকে পর্যন্ত টাকা ধার চায়। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার কথায় সে কানই দেয় না।'

'আই সি...। কাল যখন সিনেমা হচ্ছিল তখন কাউকে নড়াচড়া করতে বা জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন ?'

‘আজ্জে না । আমি পর্দায় ছবি ছাড়া আৱ কিছুই দেখিনি ।’

‘ঠিক আছে, মিঃ সোম । অনেক ধন্যবাদ । এবাৱ আপনি যদি শীলাকে একটু পাঠিয়ে দেন ।’

মিঃ সোম শীলাৰ খৌজে চলে গেলেন ।

অলঞ্চণেৱ মধ্যেই শীলা এসে পড়ল । তাৱ পৱনে সালওয়াৱ কমিজ, গায়ে কোনও গয়না নেই । একেবাৱে আধুনিকা ।

‘কী কৱছিলে, শীলা ?’ শীলা সোফায় বসাৱ পৱ ফেলুদা প্ৰশ্ন কৱল ।

‘একটা আণ্টিক্ল লিথচিলাম ।’

‘বৰৱেৱ কাগজেৱ জন্ম ?’

‘হাঁ ।’

‘কী বিষয় ?’

‘বৰ কী কৱে সাজাতে হয় তাই নিয়ে ।’

‘তুমি কি ইন্টিভিয়াৰ ডেকোৱেশন ইন্টারস্টেড নাকি ?’

‘হাঁ । ওটাকেই আমাৱ প্ৰোফেশন কৱাৱ ইচ্ছে আছে ।’

‘ও বিষয় শিখিব কিছু ?’

‘এমনি কিছু শিখিনি, কিন্তু ও বিষয় অনেক বই পড়েছি ।’

‘আৰমতে পাৱ ?’

‘মোটামুটি । ছেলেবেলায় সুদৰ্শনকাকু আমাকে খুব এনকাৱেজ কৱতেন । যখন আমাৱ বাবো-তেৱো বছৰ বয়স ।’

‘তোমাৱ দাদাৱ সঙ্গে তোমাৱ সম্পর্ক কীৱকম ?’

‘আগে দুজনে খুব বক্সু ছিলাম । এখন দাদা বদলে গেছে । আমাৱ সঙ্গে প্ৰায় কথাই বলে না ।’

‘তাতে তোমাৱ থারাপ লাগে না ?’

‘আগে লাগত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে ।’

‘কাল রাত্ৰে হৃষ্টা আমাদেৱ দেখিয়ে আবাৱ ঠিক জায়গায় রেখেছিলে তো ?’

‘নিশ্চয়ই । চাৰিও ঠিক জায়গায় রেখেছিলাম ।’

‘তাৱপৱ সেটা কী ভাবে উধাও হল সে বিষয়ে তোমাৱ কোনও ধাৰণা আছে ?’

‘আমার কী করে থাকবে?’ শীলা একটু হেসে বলল। ‘বরং
আপনার থাকা উচিত। আপনি তো ডিটেকটিভ।’

‘ডিটেকটিভরা তো প্রশ্ন করেই তাদের তদন্ত করে, সেটা নিশ্চয়ই
তুমি জান।’

‘তা জানি।’

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় বেলের শব্দ হল।
সুলেমান দরজা খুলে দিতে প্রসেনজিং চুক্ল। সে আমাদের দেখে
যেন একটু হকচকিয়ে গেল, কিন্তু তার পরেই সামলে নিয়ে বলল,
‘ডিটেকটিশন চলছে বুবি?’

ফেলুদা বলল, ‘তোমার বোনকে প্রশ্ন করছিলাম কালকের ব্যাপার
নিয়ে। এবার ভাবছি তোমাকে করব, যদি তোমার আপত্তি না
থাকে।’

‘আপত্তি আছে বই কী। পুলিশও আমাকে জেরা করার চেষ্টা
করেছিল। আমি কোনও কথার জবাব দিইনি।’

‘কিন্তু আমি তো পুলিশ নই।’

‘ইট মেক্স রেড ডিফারেন্স কোর্পোরেশন আমি দেব
না।’

‘তা হলে কিন্তু তোমার উপর সন্দেহ পড়তে পারে।’

‘পড়ুক। আই ডোন্ট কেয়ার। শুধু সন্দেহে তো আর কিছু হবে
না। প্রমাণ চাই, সেই হারটা শুঁজে পাওয়া চাই।’

‘বেশ, তুমি যখন কো-অপারেট করবে না তখন আমাদের দিক
থেকেও বলার কিছু নেই। আমরা তোমাকে ফোর্স করতে পারি
না।’

ফেলুদা উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমরা দুজনও।

কিন্তু ফেলুদার কাজ শেষ হয়নি। সে বলল, ‘আমি এবার বাড়ির
প্ল্যানটা দেখতে চাই।’

শীলা বলল, ‘চলুন, আমি আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।’

যা দেখলাম তা মোটামুটি এই—বৈঠকখানার পরেই খাবার ঘর,
তারপর জয়ন্তবাবু আর সুনীলা দেবীর বেডরুম, তার সঙ্গে
বাথরুম। এই বেডরুমের দুপাশে আরও দুটো বাথরুম সংযোগ

বেজরম, সে দুটোর একটাতে থাকে শীলা, অন্যটায় প্রসেনজিং। জয়স্তবাবুর ঘর থেকে দুটো ঘরে যাবার জন্ম দরজা আছে। প্রসেনজিতের ঘরের পাশে একটা ছোট গেস্টরম আছে তাতে থাকেন মিঃ সোম।

প্ল্যানটা দেখে বৈঠকখানায় ফিরে এলে শীলা ফেলুদাকে বলল, 'আমি কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আসছি।'

'আমি তো বসেইছি।' ফেলুদা বলল, 'যখন ইচ্ছে এসো—তবে একটা ফোন করে এসো। আমি তো এখন তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি—কখন কোথায় থাকি বলতে পারি না। ভাল কথা—তোমার বাবাকে একবার আসতে বলবে ? একটু দরকার ছিল।'

শীলা জয়স্তবাবুকে পাঠিয়ে দিল।

'হল আপনার কোয়েশ্চনিং ?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'তা হল, তবে আপনার ছেলে কোনও প্রশ্ন করতে দিল না।'

জয়স্তবাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'প্রসেনজিং ওরকমই। ওর আশা আমি আর ছেড়ে দিয়েছি।'

'যাই হোক—আপনাকে ডাকার কারণ—মিঃ সাল্ভান্হা কি এখনও দোকানে থাকবেন ?'

'এখন তো সাড়ে পাঁচটা—এখনও নিশ্চয়ই থাকবে।'

'তা হলে ওর দোকানের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা যদি দেন।'

জয়স্তবাবু তখনই টেলিফোনের পাশে রাখা প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে ফেলুদার হাতে দিলেন।

'এখান থেকেই ফোন করে নিই ?' বলল ফেলুদা।

'সার্টেন্সি।'

ফেলুদা ফোন করতেই ভদ্রলোককে পেয়ে গেল। উনি তখনই ফেলুদাকে চলে আসতে বললেন।

'আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা বাকি থেকে যাচ্ছে', বলল ফেলুদা, 'তিনি হলেন আপনার শালা রত্নলালবাবু।

মিঃ সুকিয়াসকে কাল প্রশ্ন করব ।'

‘রত্নলাল থাকে ফ্রেজার রোডে একটা ফ্ল্যাটে । তার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি । তাকে পাবার ভাল সময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার পর ।’

॥ ৬ ॥

হজরতগঞ্জে সাল্ভান্হা অ্যান্ড কোম্পানিতে পৌঁছে একটু হকচকিয়েই গেলাম । এত পুরনো দোকান সেটা ভাবতে পারিনি । আর পনেরো মিনিট পরেই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে । ভদ্রলোক একটা ভেক্সের পিছনে বসে ছিলেন, দোকানে কোনও ঘদের নেই, খালি একজন কর্মচারী এদিক ওদিক ঘূরছে । সাল্ভান্হা আমাদের দেখেই হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন ।

‘আসুন, বসুন, মিঃ মিটার ।’

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম ।

‘এখানে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেললাম না তো ?’
ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা ।

‘মোটেই না । এখন তো ক্লোজিং টাইম এসে গেল । এখানে আপনার কী কথা আছে বলে নিন, তারপর আপনাদের আমার গাড়িতে করে আমার বাড়ি নিয়ে যাব । সেখানে কফি খাবেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন ।’

‘তা হলে ভালই হবে,’ বলল ফেলুদা, ‘কারণ আপনার স্ত্রীকেও দু একটা প্রশ্ন করার আছে । কালকের পাটির সকলকেই আমরা প্রশ্ন করছি ।’

‘দ্যাট্স অল রাইট । আই ডোন্ট থিংক সি উইল মাইন্ড ।’

‘আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনার এ দোকান কতদিনের ?’

‘তা প্রায় সপ্তাহ বছর হল । আমার ঠাকুরদাদা দোকানটার পতন করেন । লখনো-এর প্রথম মিউজিক শপ ।’

‘কিন্তু এখন মিশ্যই আরও মিউজিক শপ হয়েছে ?’

‘আরও দুটো হয়েছে—দুটোই আমাদের জাতভাইদের করা ।

একটাৰ মালিক ডিমেলো, আৱেকটাৰ নৱোন্থা । এদেৱ মধ্যে
একটা আৱাৰ হজৱতগঞ্জেই—আমাৰ দোকানেৰ কাছেই । দুঃখেৰ
বিষয় আমোৱা ঠিক সময়েৰ সঙ্গে তাল বৈয়ে চলতে পাৱিনি । সেটা
বোধহয় দোকানেৰ চেহাৱা দেখেই বুঝতে পাৱছেন । ’

‘আপনাদেৱ ব্যবসা তাৰ মানে ভাল চলছে না ?’

‘কী আৱ বলব, মিঃ মিটাৰ । এটা কম্পাটিশনেৰ যুগ । আমাৰ
ছেলোকে যদি দোকানে বসাতে পাৱতাম তা হলে তাৰ ইয়াং
আইডিয়াজ অনেক কাজে দিত । কিন্তু সে ডাঙুৱি পাশ কৰে চলে
গোল আমেৰিকা । এখন অবশ্য সে মেখানে খুব ভালই ৰোজগার
কৰছে । আৱ আমি বুড়ো মানুষ একাই দোকান সামলাচ্ছি । বিক্ৰি
যে একেবাৱে হয় না তা নয়, আমাৰ কিছু ফেইথফুল কাস্টমারস
আছে । কিন্তু আজকাল যুগ অনেক বদলে গেছে । অনেকিৰ আৱ
দাম নেই ; লোকে চায় চটক । ’

ফেলুন্দা সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰে আসল প্ৰশ্নে চলে গোল ।

‘কাল যে দুষ্টিলা ঘটে গেল, সেটা সুৰক্ষে আপনাৰ কিছু বলাৰ
আছে ?’

‘কী আৱ বলব বলুন । ও হার যখন আমাৰ স্ত্ৰী না পেয়ে আমাৰ
শালী পেল, তখন মাৰ্গৱেট একেবাৱে ভেঙে পড়ে । সি লাভড
দ্যাট নেকলেস । কাৱ না ভাল লাগবে বলুন—এমন একটা আশৰ্ব
সুন্দৰ প্ৰাইসলেস জিনিস ।’

‘আপনি বলছেন ঈশ্বৱেৰ চোখেও এটা একটা অন্যায় বলে মনে
হয়েছিল ?’

‘তা না হলে প্যামেলাৰ এ ক্ষতি হবে কেন ? শকুন্তলা দেবীৰ
পক্ষপাতিত ভগবানেৰ চোখেও দৃষ্টিকৃত বলে মনে হয়েছিল
নিষ্পয়ই ।’

‘কিন্তু কে এই হারটা নিতে পাৱে সে বিষয় আপনাৰ কোনও
ধাৰণা আছে ?’

‘নো, মিঃ মিটাৰ । সে বিষয় আমি আপনাকে কোনওৱকম ভাবে
সাহায্য কৰতে পাৱব না । আমাৰ কোনও ধাৰণা নেই ।’

‘সুনীলা দেবীৰ ছেলে যে কুপথে যাচ্ছে সেটা আপনি জানেন ?’

‘আমি সেটা আন্দাজ করেছি ।’

‘সে বোধহয় মেশা করে । আর তার জন্য তার প্রায়ই টাকার দরকার হয় ।’

সাল্ভান্হা চুক্তুক্ত করে আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন । তারপর বললেন, ‘দ্যাট মে বি সো । কিন্তু তাই বলে সে তার শা-র এমন একটা সাধের জিনিস চুরি করবে ? এটা আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলে ঘনে হচ্ছে ।’

‘কাল ফিল্মটা চলার সময় কাউকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিলেন ?’

‘নো । বাট আই স সুকিয়াস কামিং ইন ।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ ।’

দোকান বক্স করার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম ।

মিঃ সাল্ভান্হার গাড়িতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম যখন, তখন সোমা ছটা—সরে সরে হয়েছে ।

সাল্ভান্হার ঘাড়ি জয়স্তবাদুর বাড়ির পুলনায় অনেক ছোট । এটাও এক-তলা বাংলো টাইপের বাড়ি । ভেতরে চুকে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম । এ বৈঠকখানায় জয়স্তবাদুর বাড়ির বৈঠকখানার বাহার নেই । বোবাই যায় সাল্ভান্হার অবস্থা তেমন ভাল না । এবং তাঁর গৃহিণীর বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দিকে তেমন ঝৌক নেই ।

‘মার্গারেট— ইউ হ্যাত ভিজিটরস’ বলে একটা হাঁক দিয়ে সাল্ভান্হা আমাদের পাশের সোফায় বসে পড়লেন । আমাদের অবিশ্য পরম্পরাতেই দাঁড়াতে হল । কারণ ঘরে মিসেস সাল্ভান্হা, অর্থাৎ মার্গারেট সুশীলা দেবী, এসে চুকেছেন ।

‘ও—মিঃ মিরি !’

ভদ্রমহিলার ঠোটের কোণে হাসি দেখা দিল । তবে সে হাসি মুখ আলো করা হাসি নয় । কারণ হাসা সত্ত্বেও একটা অবসাদের ভাব মুখে থেকে গেল ।

ফেলুদা বলল, ‘বসুন, সুশীলা দেবী । আপনি বোধহয় জানেন

না যে জয়স্তবাবু কালকের চুরির ব্যাপারে আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন।'

'সেটা আজ সকালেই আন্দাজ করছিলাম।'

'সেই ব্যাপারেই আমি আপনাকে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

সাল্ডান্হা এই সময় উঠে পড়ে বললেন, 'আমি আপনাদের জন্য কফি বলছি, আর আমার পোশাকটা বদলে একটু মুখটা ধুয়ে আসছি। ততক্ষণ আপনারা কথা বলুন।'

সাল্ডান্হা চলে গেলেন ভিতরে।

সুশীলা দেবী বললেন, 'কী প্রশ্ন করবেন করুন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন ?'

'পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আপনার একটি ছেলে আমেরিকায় আছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

'এ ছাড়া আর কোনও সন্তান আছে ?'

'একটি হয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে কুলুতে থাকে। তার স্বামীর সেখানে অ্যাপ্ল অচর্জ আছে।'

'আপনার বোনের চেয়ে আপনি কত বড় ?'

'দু বছরের।'

'তার মানে আপনারা প্রায় পিঠোপিঠি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বোনের প্রতি আপনার কীরকম মনোভাব ছিল ?'

'একেবারে ছেলেবয়সে আমরা দুজন ভীষণ বক্ষ ছিলাম। প্যামের আমাকে ছাড়া চলতই না। আমরা দুজনে একসঙ্গে পুতুল খেলতাম, নাসারি স্কুলে যেতাম, একরকম জামা কাপড় পরতাম।'

'ভারপুর ?'

'আমার যখন বছর পনেরো বয়স তখন থেকেই আমি বুঝতে পারি যে মা-র টান আমার চেয়ে প্যামের উপর বেশি। তা ছাড়া প্যামের মধ্যে তখন থেকে অনেক গুণের প্রকাশ পেতে থাকে। ও খুব ভাল আবৃত্তি করত, অভিনয় করত, পড়াশুনায় আমার চেয়ে ভাল ছিল, দেখতেও আমার চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছিল।'

দেশলাম প্যামই মা-র আদরের হয়ে উঠছে। আমার উপরে
ভালবাসা করে যাচ্ছে। অবিশ্যি বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন,
কিন্তু মা-র ভালবাসা পেলাম না বলে আমার মনে একটা হিংসার
ভাব জেগে ওঠে যেটা আমি তখন কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সব
শেষে মা যখন তাঁর হারটা প্যামকে দিয়ে দিলেন তখন আমার
পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এ দুঃখ ভুলতে আমার অনেক
সময় লেগেছে।'

'এখন মনে হিংসের ভাব নেই ?'

'না। এক এক সময় ছেলেবেলার কথা মনে হলে জেলাস
লাগে। কিন্তু এমনিতে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট সংজ্ঞাব আছে। কাল
তো দেখলেন আমাদের—কী মনে হল ?'

'দিব্যি সংজ্ঞাব।'

'শুধু তাই না। ওর সম্বন্ধে একটা অনুকম্পার ভাবও বোধ
করি।'

'তাঁন শুনুন যেন ?'

'প্রথম অসম তাঁর পত্নি। তাঁর টেকার টেক্টারি যাচ্ছে।'

'ওই বুরুব ?'

'এটা কিন্তু আপনাকে গোপনে বলছি।'

'আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

'আমার ভগ্নীপতি অনেক দেনা করে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে
ড্রিকিং বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু কাল ওরকম পার্টি দিলেন ?'

'কী করে দিলেন জানি না। আমি এবং আমার স্বামী নেমন্তন্ত্র
পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।'

'হয়তো এর মধ্যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু আমি দু মাস আগের কথাও জানি।
আমার বোন আমার কাছে এসে কাঙাকাটি করেছে। তার উপর
ওদের ছেলের গোলমাল তো আছেই। সে ব্যাপার জানেন তো ?'

'শুনেছি।'

'আশা করি আপনার কথাই ঠিক—ওদের অবস্থার উন্নতি

হয়েছে।'

‘হারটা কে চুরি করতে পারে সে সমস্কে আপনার কোনও বক্তব্য আছে?’

‘একেবারেই না। ওটা আমার কাছে একটা বিরাট বহস্য।’

‘প্রসেনজিৎকে আপনার সন্দেহ হয় না?’

‘প্রসেনজিৎ?’

ভদ্রমহিলা যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘একটা ব্যাপার আছে। ফিল্মটা যখন দেখানো হচ্ছিল তখন প্রসেনজিৎ আমার কাছেই ছিল। ফিল্ম চলা অবস্থায় সে উঠে কোথায় যেন যায়।’

‘অন্য কোনও লোককে জায়গা বদলাতে দেখেছিলেন?’

‘না। তা ছাড়া আমার দৃষ্টি পদর উপর ছিল। আয় কুড়ি বছর পরে দেখছিলাম ছবিটা।’

‘থ্যাক ইউ, সুশীলা দেবী—আমার প্রশ্ন শেষ।’

আমরা কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ির বাইরে এসে ফেলুদা বলল, ‘এবার অ্যালেবার্ট রত্নলাল। তা হলোই আজকের মতো আমার কাজ শেষ।’

সাল্ভান্হার বাড়ি থেকে আমরা রত্নলালের ফ্ল্যাটে গেলাম। অত্যন্ত সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, আর একজনের পক্ষে বেশ বড়। ভদ্রলোক সোফায় বসে একটা হাই-ফাই স্টেরিওতে গজল শুনছিলেন, পরনে একটা বেগুনি ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ। ভদ্রলোক যে আতর ব্যবহার করেন সেটা জানতাম না। ঘরে বেশ বাঁঝালো আতরের গুরু।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে স্টেরিওটা বন্ধ করে বললেন, ‘কী ব্যাপার?’

ফেলুদা বলল, ‘কালকে চুরির ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। আমরা সকলকেই করেছি।’

‘এভরিওয়ান?’

‘শুধু মিঃ সুকিয়াসকে বাকি। সেটা কাল করব।’

‘আপনার কি ধারণা আমি চুরিটা করে থাকতে পারি?’

‘মোটেই না। তবে চোর ধরতে আপনি সাহায্য করতে পারেন।’



‘আই আম নট ইন দ্য লিস্ট বিট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য থেক্ট ।’

‘এত দামি আৱ ভাল একটা জিনিস চুৱি ইল, আৱ তাতে
আপনার ইন্টারেস্ট নেই ?’

‘মাইসোৱেৰ দেওয়া জিনিস তো দামি হবেই, তাতে আকর্ষণৰ কী
আছে ?’

‘আপনার মা-ৱ এত সাধেৰ জিনিস ছিল ?’

‘আমাৱ মা-ৱ ফিল্ম কেৱিয়াৰ সম্বন্ধেও আমাৱ কিছুমাত্ৰ উৎসাহ

নেই। আই থিংক অল ফিল্মস আর রাট্ন। সাইলেন্ট ফিল্মস তো বটেই।'

‘আপনার পেশাটা কী জানতে পারি?’

‘তা পাবেন। আমি একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।’

‘তা হলে আপনি আর কোনওরকমে সাহায্য করতে পারছেন না আমাদের?’

‘আই আম ভেরি সরি। আমার কিছু বলার নেই।’

‘একটা শেষ প্রশ্ন আছে।’

‘কী?’

‘কাল ফিল্মটা চলার সময় আপনি কাউকে জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন?’

‘আমি তো ফিল্ম দেখেছিলাম না। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। আই স মিঃ সুকিয়াস কাম ইন।’

‘ধন্যবাদ। আপনি দেখছি আপনার পিতামহের মতো হিন্দি গানের ভজন।’

‘কুতুলাল। কোমও যান্ত্রা না করে। আবার স্টেরিওটা চালিয়ে দিলেন। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ফেলুদা বলল, ‘তোরা বরং দিলখুশাটা দেখে আয়। আমার একটু চিন্তা করার আছে, তা ছাড়া দু একটা টেলিফোন করারও আছে। সুকিয়াসের সঙ্গে একটা আপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেকেও একটা ফোন করব।’

আমরা দুজনে আজ ট্যাক্সির বদলে একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরোলাম। লালমোহনবাবুর ভীষণ শব্দ টাঙ্গা চড়ার কারণ উনি জানেন বাদশাহী আংটির সময় আমরা টাঙ্গা চড়েছিলাম।

টাঙ্গা রওনা হবার পর লালমোহনবাবু বললেন, ‘দিলখুশার ইতিহাসটা একটু জেনে নিই।’

আমি বললাম, ‘দিলখুশা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নবাব সাদাত আলিইর তৈরি একটা বাগানবাড়ি ছিল। এর আশেপাশে

হারিণ চরে বেড়াত । এখন শুধু ব্যাপারটার ভগ্নাবশেষ রয়েছে, তবে তার পাশে একটা সুন্দর পার্ক রয়েছে যেখানে লোকে বেড়াতে যায় । দিলখুশার উন্নরে বিখ্যাত লা মার্টিনিয়ার ইস্কুল । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রুড মার্টিনের তৈরি । মার্টিন ছিলেন মেজর জেনারেল । দিলখুশা থেকে এই স্কুলটা দেখতে পাবেন ।'

টাঙ্গাতে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল—সত্তি, লখনৌ-এর মতো বাহারের শহর ভারতবর্ষে কমই আছে । লালমোহনবাবু অবশ্য বার বারই বলছেন, 'ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ।'

দিলখুশার ভগ্নাবশেষ দেখতে বেশি সময় লাগে না । তাই আমরা সে কাজটা শেষ করে পার্কটায় একটু বেড়াতে গেলাম, আর সেখানে গিয়েই একটা বিশ্রী ঘটনায় আমাদের জড়িয়ে পড়তে হল ।

প্রথমে মনে হচ্ছিল পার্কে কোনও লোকজন নেই । লোক সচরাচর হয় বিকেলের দিকে । আমরা ফুলবাগানের মধ্যে দিয়ে আনিকদূর হাঁটার পর একটা গাছের পিছনে একটা বেঞ্চির আনিকটা অংশ দেখলাম, আর সেই সঙ্গে মানুষের গল্যার অ্যওয়াজ পেলাম । গাছটা পোরোতেই হে দৃশ্যটা দেখলাম, কাতে আমাদের বুকের ভিতরটা ঝাঁঁ করে উঠল ।

দেখি কী, প্রসেনজিৎ আর দুটি তারই ধাঁচের ছেলে বেঞ্চিতে বসে কী যেন থাচ্ছে । তিনজনেরই চুল উস্কো খুস্কো আর চোখ ঘোলাটে । ওরা যে নেশা করছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর এই নেশা বড় সহজ নেশা নয় । এ হল ড্রাগের ব্যাপার, যা খেয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হুঁশ হারিয়ে খুন পর্যন্ত করতে পারে ।

প্রসেনজিৎ এত মশ্শুল ছিল যে সে আমাদের প্রথমে দেখতেই পায়নি । তারপর যখন দেখল তখন তার মুখে এক অস্তুত কুর হাসি ফুটে উঠল ।

'ডিটেকটিভের চেলাদের দেখছি, ডিটেকটিভ কোথায় ?' অন্ন করল সে জড়ানো গলায় ।

'তিনি আসেননি, বললেন লালমোহনবাবু ।

'আহা, এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন না ।'

আমরা চুপ ।

'চোর ধরা পড়ল ?' বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল প্রসেনজিৎ ।



‘এখনও পড়েনি।’

‘আমাকেই তো সকলে সন্দেহ করছে, তাই না? কারণ আমার টাকার অভাব। লোকের কাছে ধার চাইতে হয় ঘণ্টাখানেক খর্গবিদ্যাসের জন্য। তনুন—আই ক্যান টেল ইউ দিস—হার চুরি করার মতো বোকা আমি নই। আমার লাক খুলে গেছে। আমি বেশির ভাগ টাকা পাই জুয়া খেলে। মাঝে মাঝে লোকের কাছে ধার করতে হয়, কারণ এ জিনিস একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। আপনি ধরলে আপনিও আর ছাড়তে পারতেন না, মিস্টার প্রিলার বাইটার। একবার টাই করে দেখুন না—আপনার দেখা অনেক ইমপ্রুভ করে যাবে। মাথার মধ্যে গলের প্রট ভিড় করে আসবে। কী, মিস্টার রাইটার—কী বলেন?’

আমরা দুজনেই নির্বাক । এরকম একটা দৃশ্যের সামনে পড়তে হবে ভাবতেই পারিনি ।

‘তবে একটা কথা বলে রাখি’—হঠাতে তড়াক করে দাঢ়িয়ে উঠে ঘস্থসে ধারালো গলায় বলল প্রসেনজিৎ । তারপর তার জীনসের পকেট থেকে একটা প্লিক নাইফ বার করে খাঁচ করে বোতাম টিপে ফলাটা বার করে সেটা আমাদের দিকে বাঢ়িয়ে বলল, ‘আজকের কথা যদি ধুণাকরেও কেউ জানতে পারে তা হলে বুঝব সেটা আপনাদের কীর্তি । তখন বুঝবেন এই ছুরির ধার কত । নাউ ক্লিয়ার আউট ফ্রম হিয়ার !’

বেগতিক বাপার । এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আর কোনও প্রয়োজনও নেই । যা দেখার তা দেখে নিয়েছি, আর এ দৃশ্য শুধু আমরাই দেখেছি, আর কেউ দেখেনি । আমরা দুজনে আবার টাঙ্গা করে হোটেলে ফিরে এলাম । সারা পথ দুজনের মুখে একটিও কথা নেই ।

হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের ঘরে শীলা বসে আছে, তার হাতে অট্টোঞ্চায় খাত্তি । আমাদের দেখে শীলা উঠে পড়ল । বলল, ‘আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করে গোলাম । এনিওয়ে, সই-এর জন্য ধন্যবাদ । আশা করি আপনার ডিটেকশন সফল হবে ।’

শীলা চলে গেলে পর লালমোহনবাবুকেই বলতে দিলাম ফেলুদাকে দিলখুশার ঘটনাটা । ফেলুদা সব শুনে বলল, ‘আমার ওর চোখের চাহনি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল ও ড্রাগ ব্যবহার করে । ও ছেলের ভবিষ্যৎ অঙ্ককার ।’

‘কিন্তু তা হলে ওই কি কষ্টহার চোর ?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন । ফেলুদা কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, ‘ভাল কথা, আপনাদের আরেকবার একটু বেরোতে হবে ।’

‘হোয়াই স্যার ?’

‘সুকিয়াসের টেলিফোন খারাপ । অ্যাপ্রেস্টমেন্ট হয়নি । আমিই বেরোতাম, কিন্তু শীলা এসে পড়ল । ওর বাড়িতে গিয়ে অ্যাপ্রেস্টমেন্ট করতে হবে । চট করে বেরিয়ে পড়লে এখনও ওকে বাড়িতে পাবার চাহ । আমার মাথায় একটা জিনিস দানা বাঁধছে তাই আমি বেরোতে চাচ্ছি না । যা তোপ্সে, ট্যাঙ্কি নিয়ে

বেরিয়ে পড় ।'

লালমোহনবাবু একটা দ্বন্দ্বির নিষ্কাস ফেলে বললেন, 'জেরা শুনতে শুনতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল, এবার তবু একটা কাজ পাওয়া গেল ।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সাত নম্বর লাট্টুশ রোড বলতেই ট্যাক্সি আমাদের সোজা গত্তব্যস্থলে নিয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সিটাকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বললাম।

বেশ বড় একতলা বাড়ি, গেটের পায়ে মার্বল ফলকে লেখা 'এস. সুকিয়াস'। গেট দিয়ে চুকে দুদিকে বাগান। তাতে ফুল নানা রকমের। বাগানের মধ্যে দিয়ে পথ গাড়িবারান্দায় পৌঁছেছে। বাড়ির বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই।

আমরা কলিং বেল টিপতে একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ সুকিয়াস হ্যায় ?'

'জি হ্যাঁ হজুর—আপকা সুভনাম ?'

'জারা বেলিয়ে মিঃ মিটারকে পাস সে দো অদুমি আয়ে হ্যায় এক মিনিট রাখচিলকে লিনোঁ।'

হিন্দতে কটা ভুল হল জানি না, কিন্তু বেয়ারা ব্যাপারটা বুঝে নিল। আমাদের এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে সে ভিতরে চলে গেল।

এক মিনিট পরে যে বেয়ারা বেরিয়ে এল তার চেহারাই পালটে গেছে। দৃষ্টি বিশ্ফারিত, হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

'কেয়া হ্যাঁ ?' রুক্ষস্বাসে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'আপলোগ...অন্দর আইয়ে...' কোনও রকমে বলল বেয়ারা। আমরা বেয়ারার পিছন পিছন ভিতরে চুকলাম। বেয়ারা সেইভাবেই কাঁপতে কাঁপতে বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল আমাদের।

ঘরটা হল যাকে বলে স্টাডি। চারিদিকে নানারকম শিল্পব্যাপার বইয়ে ঠাসা আলমারি। ঘরের মাঝাখানে একটা বড় টেবিল। তার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন মিঃ সুকিয়াস, পরনে সাদা শার্ট,

‘তার পিঠ রক্তে লাল। এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি কমই দেখেছি।

‘কী হরিব্ল বাপার! বললেন লালমোহনবাবু। তারপর বেয়ারার দিকে ফিরে বললেন, ‘তুমি শেষ কথন দেখেছ তোমার মনিবকে?’

বেয়ারা আমতা আমতা করে যা বলল তাতে বুঝলাম মিঃ সুকিয়াস সকালে ব্রেকফাস্ট করে এই ঘরে চলে আসেন কাজ করতে। তিনি নিজেই সব করেন, তাঁর সেক্রেটারি নেই, বা বাড়িতে অন্য কোনও লোক নেই। বেয়ারা এই সময়টা প্রয়োজন না হলে তাঁকে ডিস্টাৰ্ব করে না। আজও সেই একই নিয়ম মানা হয়েছে।

‘সকালে কোনও লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি?’ আমি জিজেস কৱলাম।

বেয়ারা মাথা নাড়ল।

‘নেহি হজুৱ। কোই নেহি আয়া।’

আমি বুঝতেই পারছিলাম যে বাইরে থেকে সামনের দরজা দিয়ে লোক আসার কোনও দরকার নেই, কারণ সুকিয়াসের চেয়ারের পিছনেই হাট করে থেলা একটা জানালা, তাতে শিক নেই। খুনি যে সেই জানালা দিয়েই তুকেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

‘তোমাদের টেলিফোন তো খারাপ, তাই না?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন কৱলেন।

‘তা হজুৱ—দো রোজসে খারাপ হ্যায়।’

‘কিন্তু—’

আমি বললাম, ‘পুলিশের কথা ভুলে গিয়ে চলুন ট্যাঙ্কি নিয়ে হোটেলে ফিরে গিয়ে ফেলুদাকে নিয়ে আসি। যা করার ওই করবে।’

‘তাই চলো।’

॥ ৮ ॥

আমরা দশ মিনিটে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

ফেলুদাকে খবরটা দিতেই সে তার খাতাটা ফেলে দিয়ে কোনও কিছু না বলে জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার ভুক্ত ভীষণ ঝুঁচকে গেছে।



সুকিয়াসের বাড়ি পৌছে সে অথবেই বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল,
'তোমাদের ড্রাইভার আছে ?'

'হ্যায হ্যায়, গাড়ি ভি হ্যায় ।'

'ড্রাইভারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ।'

ড্রাইভার আসতে ফেলুন। তাকে তৎক্ষণাত্ম থানায় খবর দিতে
বলল। ড্রাইভার চলে গেল।

এবার আমরা গিয়ে স্টাডিতে চুক্সাম।

'ছুরি মেরেছে ভদ্রলোককে,' বলল ফেলুন, 'অন্তো নিয়ে
গেছে ।'

তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ভদ্রলোক চিঠি
লিখছিলেন ।'

সেটা অবশ্য আমিও দেখেছিলাম। ইংরিজি চিঠির বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেছিল যখন কিছুরিটা মারে।

‘একী—এ যে আমাকেই লেখা চিঠি?’ বলে উঠল ফেলুদা। তারপর বলল, ‘যদিও পুলিশ আসার আগে এখানে কিছু নড়চড় ফরা উচিত না, চিঠিটা যখন আমার তখন সেটার উপর আমার নিশ্চয়ই একটা ক্রম আছে।’

এই বলে ফেলুদা চিঠিটা প্যাড থেকে ছিড়ে ভাজ করে পকেটে পুরে নিল।

তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরে ঝুকে দেখল।

জানালার বাইরে একটা হাত চারেক চওড়া প্যাসেজ, তার পরেই বাড়ির পাঁচিল। সেই পাঁচিল টপকে লোক আসা খুব কঠিন নয়।

‘বোঝাই যাচ্ছে খুনটা কোনও ভদ্রলোক করেননি।’

ফেলুদা প্রায় আপনমনেই কথাটা বলল। তারপর বলল, ‘যতদূর মনে হয় এ হল লখনৌয়া ভাড়াটে গুণার কাজ। আর এখানে ডাকাতির কোনও প্রশ্ন আসছে না, কারণ এই একটা ঘরেই অন্তত লাখ টাকার জিনিস রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই শয়তানটিকে কিনি এমন্দায় করেছিলেন? অর্থাৎ জোকটি কার অ্যাকাউন্টিস? ’

‘সেটা অবশ্য মিঃ সুকিয়াসের ব্যক্তিগত ইতিহাস না জানলে বোঝা যাবে না’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘তাই নয় কি?’

ফেলুদা বলল, ‘ভদ্রলোকের বিষয় যে আমরা একেবারেই কিছু জানি না তা নয়। অন্তত লোক ছিলেন সেটা তো জানি। চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার সঙ্গে উচু দরের শিল্পব্যের সংগ্রহ গড়ে তোলা সাধারণ লোকের ক্ষম নয়। আমরা ধারণা চিঠিতেও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।’

‘সেটা একবার পড়বেন না?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘চিঠিটার উপরে “কনফিডেনশিয়াল” লেখা ছিল সেটা বোধহয় আপনি দেখেননি। ওটা পড়ব যথাস্থানে যথা সময়ে। আততায়ীকে সুকিয়াস দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। কাজেই তার আইডেন্টিটি তো আর চিঠিতে থাকবে না।’

দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। আবার ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। ফেলুদার সঙ্গে কর্মদণ্ড করে বললেন, ‘আপনি তো আমাদের টেকা দিয়েছেন দেখছি।’

‘তা দিয়েছি, কিন্তু এখন থেকে এ কেসের ভাব সম্পূর্ণ আপনাদের উপর। আমি আর এতে নাক গলাতে চাই না, কারণ তাতে কোনও প্রভু হবে না। তবু আততায়ীকে ধরলে পরে আমার একটা অবর দেবেন।’

‘আপনি তার মাঝে চলালেন?’

‘হ্যাঁ। তবে আপনার সঙ্গে হয়তো দু একদিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে। কারণ আমি সেই চুরির মামলাটা মোটামুটি সংশ্লিষ্ট করে এনেছি।’

‘বলেন কী?’

‘তাই তে মনে হচ্ছে।’

‘আমরা কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের হেলেকে সন্দেহ করছি। আপনিও কি তাই?’

‘সেটা এখনও বলতে পারছি না। আমায় মাপ করবেন।’

‘আমরা ডেফিনিটি প্রফ পেয়েছি ও ড্রাগসের থার্মে পড়েছে। ওর পিছনে একজন লোকও লাগিয়ে দিছি আমরা।’

‘ডয়েল, কেসট অফ লাক। এখন তো আপনাদের হাতে আবেকাটি ক্রাইম পড়ল। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আছে। কৃত্তা লাগায়ে খুন সবাখানেই সন্তু এবং সেটা লখনৌতেও সন্তু বোধহয়।’

‘শুরু বেশি মাত্রায়।’

‘থ্যাক্স।’

॥ ৯ ॥

কোনও একটা মামলার মাখানে ফেলুদাকে এত নিষ্কর্ষ হয়ে পড়তে দেখিনি কখনও। আমরা পর পর দুদিন লালমোহনবাবুকে নিয়ে লখনৌ শহর দেখিয়ে বেড়ালাম। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘ফেলুদা, কী বাপার বলো তো? তুমি এত চুপচাপ বসে আছ কেন?’

ফেলুদা বলল, ‘অর্ধেক মামলার সমাধান হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক পুলিশের সাহায্য ছাড়া হবে না। আমি এর মধ্যে পাঁচের কাছ থেকে দুবার ফোন পেয়েছি। মনে হয় পাকা অবর আর দুদিনের মধ্যেই পেষে ফাব।’

‘পুলিশ’র বাপারটা কি সুকিয়াসের খনের সঙ্গে জড়িত ?’

‘ইয়েস, বলল ফেলুন’।

‘আর হার চুরি ?’

‘সেটা নিয়ে আর ডাববাৰ কিছু নেই।’

‘আর সুকিয়াসের খন সবকে তোমার কি কোনও ধারণা হৈ বেঁধু ?’

‘আচ্ছ, কিন্তু প্রমাণ চাই ? সেটা প্রমাণটা পুলিশ গুপ্তি’কে ধরতে পারলেও পেয়ে যাব। কে খন কৰিয়েছে সে সবকে অমার একটা পরিকার ধারণা আছু।’

আরও একটা দিন এই ভাবে কেটে গেল। আমরা তাঁকে নিয়ে মিউকিয়াম দেখিবে আনলাম। এইন জাতুর লাগানী দেখা দেব বললেও চলে। আমাদের কল্পকাত্তয় ফিরত আর দুদিন বাবি আচ্ছে।

দুপুরকেলা ফেলুন যে ‘ফেন্ট’ আশা করছিল সেটা এল। যিঃ পাতের কাছ থেকে। কথা বলার পর ওকে জিজেস করে ফেলুন। বলল, ‘বেস বেস।’ ওরা গুপ্তাটাকে ধরেচে। শহু সিং বলে এক পেঁচাকি। তাসে আসলতে দেব বৰীকাৰ কৰেছে, আসল লোককে ‘পেঁচাইয়ে’ দেবে বিজেছে। যে ভুক্তি নিিৰ্ব দুবট কৰা হৰেছিল সেটাও পঞ্চয়া গোছে।

‘তা হলে এখন কী হবে ?’

‘রংসা উদ্বাচন। আৰু সকা সাতটায় ক্ষয়ক্ষতি বিশ্বাসের বাড়িত।’

এব পুর ফেলুনকে পুর পুর অন্তকণ্ঠে কোন কৰাত হল। প্রথমে অবশ্য ক্ষয়ক্ষতিবৃক। ভদ্রলোক রঞ্জি হয়ে গোলেন। বললেন, ‘বাকি সবাটুক তা হলে অপনিই বৰু দিয়ে দিন। আপনি তো সকলেৰ টেলিফোন নম্বৰই জাবেন।’

তীব্র উৎকষ্টা নিয়ে পৌনে সাতটাৰ সময় হেটেৰ ক্ষয়ক্ষতি বিশ্বাসের বাড়িত গিয়ে হাঁকিৰ ইলাম। ইনস্পেক্টর পাতেও এসে পড়লেন সাতটাৰ পাঁচ মিনিট আগে—সঙ্গে দুজন কনস্টেবল, আৰ আৱেকটি লোক থার হাতে হাতকড়া। বুৰুলৰ সেই হচ্ছে যুনি গুণ।

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটেৰ মধ্যেই সকলে এসে পড়ল। সকলে বলতে বালিকটা দিয়ে দিই—ক্ষয়ক্ষতিবৃক বাড়িৰ পাঁচজন,

সাল্ভান্থর বাড়ির দুজন আর রত্নলাল ব্যানার্জি। প্রশ্ন বৈঠকখানায় সকলে চেয়ার আর সোফাতে ছড়িয়ে বসলেন। রত্নলাল আগেই প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ইজ দিস ফার্ম?' ফেলুন্দা বলল, 'আপনি এটাকে প্রহসন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু আর সকলের কাছে ব্যাপারটা বোধহয় খুবই সিরিয়াস।'

'হারটা পাওয়া গেছে কি?' চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন সুনীলা দেবী।

'যথাসময়েই তার উত্তর পাবেন', বলল ফেলুন্দা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'রহস্যের সমাধান হয়েছে। কলাই বাহুল্য, এটা পুলিশের মাহাত্ম্য ছাড়া হত না। আমি আপনাদের এখন ঘটনাটা বলতে চাই। আশ্চর্য করি আপনাদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে তাৰ জবাবত আমার কথায় পেয়ে যাবেন।'

'আই হোপ খুব বেশি সময় নেবেন না,' বললেন রত্নলাল ব্যানার্জি, 'আমার একটা ডিনার আছে।'

'যতটুন দুরকার তার এক মুহূর্ত বেশি নেব না,' বলল ফেলুন্দা।
শব্দিত চুপ।

'তা হলো এবার শুরু কৰা?'

'কৰুন', বললেন রহস্যবাবু।

'গোড়াতেই বলে আবি যে এখানে দুটো তদন্তের ব্যাপার নিয়ে আমাদের কারবার। এক হল শকুন্তলা দেবীর হার চুরি, আর দ্বিতীয় হল মিঃ সুকিয়াসের মার্ডারি।

'এই তদন্তের ব্যাপারে আমি সকলকে জেরা কৰি। তাৰ মধ্যে সকলেই যে সব সময় সত্তি কথা বলেছেন তা নয়। তাদেৱ যিথে কিছু ধৰা পড়েছে অনোৱা জেৱাতে। কেউ কেউ কিছু কিছু জিনিস লুকোতে চেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আমার প্রশ্নেৱ জবাবই দেলনি। হারেৱ ব্যাপারে অনেককে সন্দেহ কৰা চলতে পাৰত। তাৰ মধ্যে ছিলেন শ্রীমান প্ৰসেনজিৎ, যিনি ড্রাগেৱ নেশা ধৰেছেন এবং সে ড্রাগ কেনাৰ জন্য তাৰ প্ৰায়ই টাকাৰ দৰকাৰ হয়। সে টাকা তিনি এৱ-ওৱ কাছ থকে ধাৰ কৰেন এবং জুয়া খেলেও জোগাড় কৰেন। তারপৰ আৱেকজনকে সন্দেহ কৰা চলতে পাৰে; তিনি হুলেন সুদৰ্শন সোম। পৱেৱ আশ্চৰিত তিনি, অভাবী লোক,

হয়তো সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি হারটা চুরি করেছিলেন। তা ছাড়া আছেন মিঃ সালভান্স। তাঁর দোকান ভাল চলছে না, তিনি নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য হারটা চুরি করতে পারেন। এক জনের উপর সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না, তিনি হলেন জয়স্তবাবু। কারণ তাঁর জবানিতে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর ব্যবসা ভালই চলছে, তাঁর টাকার কোনও অভাব নেই। কিন্তু আরেকজনের জবানিতে আমি শুনি যে তাঁর ব্যবসা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, তিনি ফ্রান্সেন বশত তাঁর মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবিশ্য এই জবানি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না, এটা ভুলও হতে পারে।

‘এখানে সুকিয়াসের খুনের বাপারে আমাকে আসতে হচ্ছে। তিনি যখন খুন হন তখন একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। এই চিঠি লেখার কারণ হল—তাকে হঠাতে কানপুর চলে যেতে হচ্ছিল সেই সকালেই, তাই আমাকে তিনি কোয়েশনিং-এর জন্য সময় দিতে পারছিলেন না। কিন্তু কানপুর যাবার আগেই তিনি খুন হন।

‘এই চিঠি থেকে আমি দুটো জ্ঞান আবশ্যিক পাই : এক হল এই যে শঙ্কুস্তুলা দেৰীর হারটা অবশ্যেই জয়স্তবাবু তাঁকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন দু লাখ টাকায়। এই হারটা আর তিনদিনের মধ্যেই সুকিয়াসের হস্তগত হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই হারটা চুরি হয়ে যায়।

‘দ্বিতীয় তথ্য হল, এই ঘরে সমবেত সকলের মধ্যে একজন আছেন যিনি মিঃ সুকিয়াসের কাছে পঞ্জাশ হাজার টাকা ধার করেন দেড় মাস আগে। তিনি বলেছিলেন টাকাটা এক মাসের মধ্যে সুদসমেত ফেরত দিয়ে দেবেন, কিন্তু দেননি। সুকিয়াস তাঁকে অনেক অনুরোধ করেও টাকাটা আদায় করতে পারেননি। তখন তিনি বলেন আইনের আশ্রয় নেবেন। এইসব তথ্য আমার জেরায় প্রকাশ পেয়ে যেত বলেই তাঁকে খুন করা হয়। অবিশ্য যিনি খুনটা করিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে সুকিয়াসের চিঠির কথা জানার কোনও উপায় ছিল না, কারণ খুনের সময় তিনি সেবানে উপস্থিত ছিলেন না। যিনি উপস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ এই ভদ্রলোকের অ্যাকম্প্লিম, তাকে পুলিশ ধরেছে এবং সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। আর



মুক্তিপ্রাপ্তি

এটাও সে বলেছে যে, যে তাকে এমপ্লাই করেছিল তাকে সে দেখিয়ে
দেবে ।'

ফেলুদা এবার পাশের দিকে ফিরল ।

'মিঃ পাণ্ডে—আপনি আপনার লোককে আনান তো ।'

দুজন কনস্টেবল গিয়ে শন্তু সিংকে নিয়ে এল ।

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে যে খুন্টা করতে বলেছিল সে লোক
কি এখানে রয়েছে ?'

শন্তু সিং এদিক ওদিক দেখে বলল, 'হ্যাঁ হজুর ।'

'তাকে দেখাতে পারবে ?'

'ওই যে সেই লোক', বলে একজন বিশেষ ব্যক্তির দিকে শন্তু সিং
তার হাতকড়া পরা দুটো হাত একসঙ্গে তুলে দেখাল ।

সকলে অবাক হয়ে দেখল, যে রতনলাল ব্যানার্জির মুখ থেকে
তাঁর পাইপটা খসে ঠক্কাস শব্দে মাটিতে পড়ল ।

'হোয়াট ননসেপ ইজ দিস ?' বলে উঠলেন রতনলাল
ব্যানার্জি ।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ননসেঙ্গই বলুন, আর ফাসই বলুন, ইয়োর গেম ইং আপ, মিঃ ব্যানার্জি ।'

সমস্ত ঘরে একটা থমথমে ভাব, তার মধ্যে ফেলুদা কথা বলে চলল ।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিস্টার অ্যালবার্ট রতনলাল ব্যানার্জি । আপনার কীসের জন্য পক্ষাশ হাজার টাকা ধার করার প্রয়োজন হয়েছিল সেটা বলবেন কি ?'

'আই ডেইল নট', এখনও তেজের সঙ্গে বললেন রতনলাল ।

'তা হলে আমিই বলি', বলল ফেলুদা । 'আপনি যা রোজগার করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৰচ করতেন । সুকিয়াস লিখেছে আপনি বান্দিজিদের পিছনে অচেল টাকা ঢালতেন । আমরা যেদিন আপনার ঘরে গিয়েছিলাম সেদিন আতরের গঞ্জ পেয়েছিলাম । আমার ধারণা আমরা আসার আগে আপনার ঘরে একজন বান্দিজি ছিলেন, তাঁকে আপনি ভিতরে পাঠিয়ে দেন । আপনি নিজে আতর ব্যবহার করলে পার্টির দিনেও নিশ্চয়ই করতেন, কিন্তু সেদিন কোনও গঞ্জ পাইনি । আমার মনে হংস আপনি আপনার পিতামহের বড়াব পেয়েছিলেন । তাঁরও শেষ জীবনে অর্থস্তোষ হয়েছিল । আপনিও সেই একই কারণে সুকিয়াসের দ্বারা হয়েছিলেন ।'

'ও মাই গড !' মাথা হেঁটে করে রুক্ষস্বরে বললেন রতনলাল । 'আই আ্যাম ফিনিশ্চড ।'

ইনস্পেক্টর পাণ্ডি ও একজন কলস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ।

ফেলুদা বলল, 'আমার বক্তব্য অবিশ্যি এখনও শেষ হয়নি । এখনও একটা রহস্য উদঘাটন হতে বাকি আছে, সেটা হল শকুন্তলা দেবীর কষ্টহার । সেটা জয়স্তবাবু নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, কারণ সেটা তার আগেই অন্য একজনের হাতে যায় ।'

'কার ?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুনীলা দেবী ।

'এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই', বলল ফেলুদা । 'একটা ধারণা হয়েছিল যে সেদিন পার্টিতে যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছিল সেই অঙ্ককার অবস্থাতেই বুঝি কেউ গিয়ে হারটা নিয়ে আসে । কিন্তু আসলে ফিল্ম যখন চলে তখন পর্দা থেকে প্রতিফলিত আলোয় ঘর আর সম্পূর্ণ অঙ্ককার থাকে না । আমি সেদিন

প্রোজেক্টরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম । আমার দৃষ্টি শুধু পদরি দিকে ছিল না । ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে আমি নিশ্চয় দেখতে পেতাম । কেউ বেরোয়নি । প্রসেনজিৎ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সোফায় বসে আর ছবি চলার মধ্যে সুকিয়াস প্রবেশ করেন । ঘরে আর কোনও নড়াচড়া হয়নি ।'

‘তা হলে ?’ সুনীলা দেবী হতভস্ব ।

‘তা হলে এই যে ছবি শুরু হবার আগেই হারটা সিন্দুক থেকে বার করে আনা হয়েছিল ।’

‘সে তো হয়েইছিল,’ বললেন সুনীলা দেবী । ‘শীলা এনেছিল আপনাকে দেখানোর জন্য এবং শীলাই সেটা আবার তুলে রাখে ।’

‘না । সেখানেই ভুল । শীলা হারটাকে আবার সিন্দুকে তোলেনি । সে সেটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল । এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু কারণটা বুঝিনি । পরে রাত্রে সে সেটাকে একটা ঘুলের টবে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখে । এ কথা শীলা নিজে আমাকে বলেছে । এই যে সেই হার ।’

ফেলুন। তাঙ্গ কোটেজ প্রক্ট থেকে হারটা কাল করে ঘরের মাঝখানে টেলিফোনের ডেস্কে রাখল । ঘুরে সকালের মুখ থেকে একটা বিশ্বাসৃচক শব্দ বেরিয়ে এল ।

সুনীলা দেবী বললেন, ‘কিন্তু...কিন্তু সে এরকম করল কেন ?’

‘কারণ সে তার ঘর থেকে আপনার এবং আপনার স্বামীর মধ্যে কথোপকথন শুনে ফেলেছিল । তার শোবার ঘর তো আপনাদের শোবার ঘরের পাশেই এবং মাঝখানের দরজা খোলাই থাকে । মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায় । তখন আপনি আপনার স্বামীকে বলছিলেন যে হারটা আপনি সুকিয়াসকে বিক্রি করতে রাজি আছেন । এই সিন্দান্তে পৌছতে অবিশ্যি আপনার অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আপনি রাজি হয়েছিলেন সেটা তো ঠিক । এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই শীলা হারটা সরিয়ে রেখেছিল, এবং সে এটা করেছিল বলেই আজও হারটা আপনাদের কাছে রয়েছে এবং আশা করা যায় থাকবে । এমন জিনিস হাতছাড়া করাও একটা জাইম ।’



হোটেলে ফিরে এসে লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'মশাই, লাক্নাউ মানে তো ভাগ্য এখনই। তা এখানে ভাগ্যটা কার সেটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'কেন পারছেন না? ভাগ্য আপনার, কারণ আপনি আবার ফেলু মিঞ্চিরের একটা তারাবাজি দেখতে পেলেন বিনে পয়সায়।'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া সুনীলা দেবীদেরই ভাগ্য ভাল যে হারটা তাদেরই রয়ে গেল। থ্যাংকস্ টু মেরি শীলা।'

'যা বলেছ তপেশ ভাই', বললেন লালমোহনবাবু। 'শীলার মতো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না—তাই না ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'শকুন্তলা দেবীর হারটা যদি সত্ত্ব করে কেউ কদর করে, সে হল মেরি শীলা বিশ্বাস।'

ପଞ୍ଜାବୀ ଲେଖକୀ

ଶତମନେ ଫେରୁଦୀ

সত্যজিৎ রায়

କାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲା
କାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲା
କାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲା
କାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲା



লক্ষনে ফেলুদা

॥১॥

‘টেলিভিশনটা বিনে কোনও খাত হল না মশাই’, বললেন লালমোহনবাবু।
‘দেখাৰ মতো কিম্বু থাকে না। রামায়ণ মহাভাৰত দুটোই দেখতে চেষ্টা কৰেছি।
পাঁচ মিনিটোৱে বেশি ট্যাঙ্ক কৰা যায় না।’

‘আপনি যে খেলাখুলোয় ইন্টাৰেটেড মন’, বলল ফেলুদা ‘তা হলো দেখতেন
মাঝে মাঝে বেশ ভাৰ প্ৰেৰণ থাকে টেনিস, ক্ৰিকেট, ফুটবল—কোনওটাই বাদ
নেই। যেমন দেশেৰ খেলা, তেমনি বিদেশেৰ খেলা।’

‘তবে ওৱা আমাৰ একটা গল্প থেকে তি তি সিৱিয়াল কৰতে চানছে।’

‘য়াই, এ তো ভাল অবৰ।’

‘ভাল মানে? প্ৰথাৰ কৰ্ত্তৃ কৰবে এমন কোনও অ্যাকটোৱা আছে বাংলাদেশে?
অৰ্থাৎ ও দেশে দেখুন—সুপাৰম্যানেৰ জন্য পৰ্যন্ত লোক পেয়ে গেল। মনে হয়
একেবাৰে বইয়েৰ পাতা থেকে উঠে এসেছে।’

আমদেৱৰ পাড়াৰ কোনও বড় পুজো নেই। তবে একটু দূৰেই আছে, সেখান
থেকে মাঝে মাঝে লাউজিপ্সিকাৰে হিন্দি গান তেসে আসছে। লালমোহনবাবু তাৰ
সঙ্গে গলা মেলাতে চেষ্টা কৰে পাৱছেন না; গানটা ভদ্ৰলোকেৰ একেবাৰেই আসে
না, যদিও বলেন ওৱা দাদামশাই নাকি খাল ত্ৰিশেক গুৰুদি ধান রেকৰ্ড
কৰেছিলৈন।

চা এক প্ৰস্তু হয়ে গেছে, আৱেকবাৰ হবে কি না ভাৰহি, এমন সময় বাইৱে
গাড়ি থামাৰ শব্দ পেলাম; আৱ তাৰ পৱেই ভোৱবেল।

দৱজা খুলে দেখি এক লোক ওড়ো ধৰ্মধৰে ফুৰসা ভদ্ৰলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

‘এটা কি প্ৰদোষ ঘিৱেৰ বাড়ি?’

‘আজ্ঞে হ্যা—আমুন তিতৰে।’ ফেলুদা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্ৰলোক ঘৰে চুকলেন; ধূতি, পঞ্জাৰি আৱ কঁধে সাদা চাদৰ। পাশে সন্দা
পাঞ্চ তু। আভিজান্তা যুটো বেৱেছে সহজ শৰীৰ থেকে।

‘বসুন’, বলল ফেলুদা।

ভদ্ৰলোক একটা সোফাৰ বসে লালমোহনবাবুৰ দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।
‘ইনি আমাৰ বকু লালমোহন গামুদী’, বলল ফেলুদা। লালমোহনবাবু একটা
নয়নার কৱলেন, কিন্তু ভদ্ৰলোক যেন সেটা দেখেও দেখলেন না। পায়েৰ উপৰ পা

তুলে গিলে কলা খুতির কোচ্চোকে সবচেয়ে কোশের উপর রেখে বললেন, 'আপনার
কথা আমায় থমে পাইকপাড়ার সাধন চক্রবর্তী ।'

'ওর একটা তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম', বলল ফেলুদা ।

'তদন্তেক আপনার সুস্থানি করলেন, তবে ডিটেক্স কিছু দেবনি । আপনি
কদিন ধরে 'করছেন এ কাজ?'

'বছর দশেক হল ।'

'সিসটেমটা দিলি না বিলিভি?'

'যে কেসে থেমনটা দরকার হয় আর কী ।'

'আই সি...'



‘আপনার সমস্যাটা কী সেটা যদি বলেন...

‘সেটাকে সমস্যা বলা চলে কি না জানি না। সেটা আপনিই বিচার করবেন।’

জনপ্রোক্ত পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। তারপর তার থেকে স্থানে একটা ছবি ধার করে ফেলুন্দাকে দিলেন। আমি ফেলুন্দার কাঁধের উপর দিয়ে দেবলাভ ফিকে হয়ে যাওয়া পুরনো একটা ফোটোগ্রাফ, তাতে রয়েছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরম্পরার কাঁধ হাত দিয়ে দুঁজনে প্যান্ট শার্ট পরা হেসে। তাদের বয়স বোলো-সতেরোর বেশি নয়।

‘এর মধ্যে কাউকে চিনছেন কি?’ জনপ্রোক্ত প্রশ্ন করলেন।

‘বাঁ দিকের জন তো আপনি’, বলল ফেলুন্দা।

‘হ্যা, ওই একজনকেই আমিও চিনতে পারছি।’

‘অন্যটি আপনার বন্ধু অবশ্যই।’

‘দেখে তো তাই মনে হয়, তবে তার পরিচয় ধরতে পারিনি। ছবিটা আমি সম্পূর্ণ পেয়েছি। একটা দেরজের কাগজপত্রের তলায় ছিল। আপনাকে আমি একটিমাত্র কাজ দিতে এসেছি। তবে দেশুন সেটা নেবেন কি না।’

‘কী কাজ?’

‘আমার সঙ্গে ওই ছেলেটি কে সেটা আমার জানা চাই। এর পরিচয় আপনাকে অনুসন্ধান করে উদ্যাটন করতে হবে। এ কোথায় আছে, কী করে, আমার সঙ্গে পরিচয় হল কবে, কী করে—সে সব আমার জানা চাই। সেটা করলেই আপনার কাজ শেষ। এর জন্য আপনার পুরো পারিশ্রমিক আমি দেব।’

‘আমার আগে জানা দরকার, আপনি নিজে কোনও বৌজ করেছেন কি না।’

‘ত্রুটি আমার ক্লু-কলেজের কয়েকজন সহপাঠী আছে, আমি তাদের দেখিয়েছি। তারা কেউ চিনতে পারেনি। আপনি লক্ষ্য করবেন ছেলেটি খাতালি কি না তা ও বোবা শুভ।’

‘চুলটা তো কালো, তবে তোর দুটো যেন একটু কটা। আপনার সাহেব বন্ধু ছিল কখনও?’

‘আমি ইংল্যান্ডে চার বছর ছুলে আর এক বছর কলেজে পড়ি। বাবা ওখানে ডাক্তারি করতে গিয়েছিলেন। তারপর অবিশ্বা আমরা সবাই দেশে ফিরে আসি। ফিরে আসার আগে ইংল্যান্ডের কোনও কথা আমার মনে নেই, কারণ ওখানে থাকতে বাইসিকল থেকে পড়ে গিয়ে আমার কাল ক্র্যাকচার হয়ে যায়। তার ফলে পাচ-সাত বছরের শুরু আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে।’

‘কোন ক্লুপ আর কলেজে পড়েছিসেন সেটা মনে নেই?’

‘বাধা বলেছিলেন। সে-ও অনেক বছর আগে। কলেজ বোধ হয় কেম্ব্ৰিজ। ক্লুপের নাম মনে নেই।’

‘শুরু ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও উন্নত-ট্ৰুধ থাক্কেন না?’

‘অ্যালোপ্যাথিক খেয়েছি। তাতে কোনও কাজ হয়নি। এখন একটা কবিতাই শুধু কাজি।’

‘ইংল্যান্ড থেকে কিরে কী হয়?’

‘সেক্ট জেন্টিলমার্সে ভর্তি হই। বাবাই সব ব্যবস্থা করে দেশ, কানুন তথনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি।’

‘সেটা কোন ব্যবস্থা?’

‘ফিফটি টু। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই।’

‘হ্যাঁ।’

ফেলুন্দা ছবিটা হাতে নিয়ে মিনিটব্যানেক ভাবল। তারপর প্রশ্ন করল, ‘আপনার কি মনে হয় এই ছেলের সঙ্গে কোনও একটা বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে?’

‘সেরকম মনে হয়েছে। এক-এক সময় আবজা আবজা স্মৃতি ফিরে আসে, অবু তখন হেন এসে দেখতে পাই। কিন্তু এর পরিচয় অজ্ঞানাই থেকে যায়। অত্যন্ত অস্বত্ত্বার ব্যাপার। যার সঙ্গে এত ব্যুৎ ছিল সে কে, সে এখন কোথায় আছে, কী করে, আমাকে মনে রেখেছে কি না, এ সব জ্ঞানার জন্য প্রবল কৌতুহল হয়। কাজটা সহজ না বুঝতে পারছি, কিন্তু সেই কারণেই হয়তো আপনি ইন্টারেন্টেড হতে পারেন।’

‘ঠিক আছে। কাজটা আমি নিষিদ্ধি। তবে এত কত সময় লাগবে তা আমি বলতে পারছি না। আবু ধরন যদি বিলেত যেতে হয়?’

‘তা হলে আপনার এবং আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টের পেন তাড়া আধি দেব, ওখানে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা আমি দেব, যে পাঁচশো ডলার আপনাদের প্রাপ্ত তার টাকাটা আমি দেব। বুঝতেই পারছেন আমি এর পরিচয় পাবার জন্য কতটা আগ্রহী।’

‘আপনার বাবা কি—?’

‘মারা গেছেন। বিলেত থেকে ফেরার পাঁচ বছরের মধ্যেই মা-ও আরা গেছেন দশ বছর হল। আমার স্ত্রী কর্তৃমান। একটিই সন্তান আছে—আমার মেয়ে। সে বিয়ে করে দিল্লিতে রয়েছে। স্বামী আই. এ. এস.। এই হল আমার কার্ড; এতে আমার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সবই পাদেন।’

কার্ডটি দেখলাম, মার-রঞ্জন কে, মজুমদার; ঠিকানা—১৩ বোল্যান্ড রোড; ফোন—২৮-৭৪০১।

ফেলুন্দা বলল, ‘আমি আপনার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রাখব। কোনও প্রয়োজন হলে আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।’

‘সত্ত্ব হলে নিশ্চয়ই করব।’

জ্বরোক উঠে পড়ে বললেন, ‘ছবিটা তা হলে আপনার কাছেই রইল।’

‘হ্যা। ওটাৰ একটা কপি কৰে ওৱিজিনালটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব। ভাল কপা—আপনি কী কৰেন সেটা তো জানা হল না।’

‘সৱি। আমাৰই বলা উচিত হিল আমি চার্টাৰ্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্ট। বি. ক্ষম পাখ কৰি সেট জেভিয়াৰ্স খেকেই। শী অ্যান্ড ওয়াটকিনস্ হচ্ছে আমাৰ আফিসেৰ নাম।’

‘প্রাক ইউ।’

‘আমি তা হলে। ওভ ডে।’

‘অভিনৰ মামলা’, অন্দুলোকেৱ গাড়ি চলে যাবাৰ পৰি বললেন লালমোহনবাবু।

‘সে বিষয়ে সন্দেহ নেই’, বলল ফেলুন। ‘এমন কেস আৱ পেয়েছি বলে তো ঘনে পড়ে না।’

‘একবাৰ হৃষিটা দেখতে পাৰি কি?’

ফেলুন। হৃষিটা জটাবুকে দিল। অন্দুলোক ভুঁক কুঁচকে সেটাৰ দিকে কিছুক্ষণ তেয়ে থেকে বললেন, ‘সাহেব না ইভিয়ান তা বোৱাৰ কোনও উপায় নেই। এ কেস আপনি কীভাৱে কলডাট কৰবেন তা আমাৰ মাথায় আসছে না।’

‘আপনাৰ মাথাৰ প্ৰয়োজন নেই। কেবল মিস্টিনেৱ মাথাৰ এলেই হল।’

॥ ২ ॥

ফেলুনৰ একজন চার্টাৰ্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্ট বকেল হিল, নাম ধৰণী মুখৰ্জি। ফেলুনা টেলিফোনে তাৰ সঙ্গেই যোগাযোগ কৰল। অন্দুলোক বললেন, রঞ্জন মজুমদাৰকে খুব ভাল কৰে চেনেন, কাৰণ দু’জনেই শ্যাটার্টে ঢাকেৰ মেঘাব। রঞ্জনবাবু কীৰকম লোক জিজ্ঞেস কৰাতে ধৰণীবাবু বললেন যে, তিনি একটু চাপা ধৰনেৰ লোক, বিশেষ মিথকে মম, বেশিৰভাগ লহয় ঢাকে ছুচাপ একী বলে থাকেন। ড্রিংক কৰেন—তবে মাত্রাতিৰিক্ত নয়। রঞ্জনবাবু যে ছেলেবেলায় কিছুকল বিলেতে ছিলেন সে কথাও ধৰণীবাবু জানেন, কিন্তু তাৰ বাইৱে আৱ কিছুই বিশেষ জানেন না।

১৯৫২-তে সেট জেভিয়াৰ্স ইন্টাৱিডিয়েটে কে কে ছাত্ৰ হিল তাৰ ইদিস পেতে ফেলুনৰ বিশেষ বেগ পেতে হল না। সেই ছাত্রদেৱ তালিকায় খুব ভাল কৰে চোখ বুলিয়ে ফেলুনা বলল, ‘এৱ মধ্যে একজনেৰ নাম চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যদু’ৰ নামে হয় অন্দুলোক হোমিওপাথি কৰেন।’ বাড়ি ফিরে এসে বলল, ‘তোপসে, ডাক্তাৰ হীনেন বসাকেৱ নামটা ডি঱েষ্টিয়েতে বাব কৰে অন্দুলোকেৱ টেলিফোন নামাৰটা আমায় দে তো।’

আহি দু’ খিনিটো কাণ্ডা সেবে দিবাম। ফেলুনা সেই নথৰে ফেন কৰে

একটা আপহেন্টিমেন্ট চাইল। ভাঙ্গার ফেলুদার নাম ঘনেই হয়তো পরদিন
সকালেই সময় দিয়ে দিলেন—সাড়ে এগারোটা।

কেস কেমন যাচ্ছে ব্যবহুত নিতে পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসেছিলেন
আমরা তাঁর গাড়িতে ভাঙ্গারের চেষ্টারে সেলাম।

ওয়েইটি কলমে ভিড় দেখেই বোৰা যায় ভাঙ্গারের পসার তাল। ভাঙ্গারের
সহকারী 'আসুন, আসুন' বলে ফেলুদাকে একেবারে আসল ঘরে নিয়ে গিয়ে
জোকাল; পিছন পিছন অবশ্য আমরা দু'জনও চুকলাম।

ভাঙ্গার বসাক ফেলুদাকে দেবে হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'কী ব্যাপার? আপনার তো বড় একটা ব্যাকাম-ট্যাকাম ইয়ে না।'

'ব্যাকাম না', ফেলুদা হেসে বলল। 'একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে
একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।'

'কী প্রশ্ন?'

'আপনি কি সেন্ট জেভিয়ার্সের ছবি ছিলেন?'

'হ্যা, তা ছিলাম।'

'আমার আসল অনুষ্টা হল—এই দুটি ছেলেকে কি চিনতে পারছেন?'

ফেলুদা পকেট থেকে সেলোফেনে মোড়া ছবিটা বাঁচ করে ভাঙ্গার বসাকের
হাতে দিল। এক দিনের মধ্যেই ছবিটার কপি করিয়ে নিয়ে আসল ছবিটা ফেলুদা
রজ্জুবৰুকে ফেরত দিয়ে এসেছে। ভাঙ্গার কুরু কুচকে ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ
চেয়ে থেকে বললেন, 'এদের মধ্যে একজন তো মনে ইয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত।
রঞ্জন। হ্যা, রঞ্জনই তো নাম।'

'আমি বিশেষ করে অনাজনের সবকে জানতে চাইছি।'

ভাঙ্গার ছবিটা ফেরত দিয়ে যাবা নেড়ে বললেন, 'অন্যটিকে কম্পিনকালেও
দেখিনি আমি।'

'আপনাদের সামে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত না?'

'ডেফিনিটিলি না।'

ফেলুদা ছবিটা আবার সেলোফেনে মুড়ে পকেটে থেকে দিল।

আপনি তা হলে বলছেন আপনার ক্লাসের কলা ছেলেদের জিজেস করেও
খুব একটা লাভ নেই?

'আমার তো মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট।'

'ভাও, আপনি একটা কাজ করে দিসে আমি খুব উপকৃত হব।'

'কী?' ফেলুদা পকেট থেকে সেন্ট সেভিয়ার্সের ছাত্রদের তালিকাটা বাঁচ করে
ভাঙ্গার বসাককে দেবাল।

'এব মধ্যে থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের তালিকাটা বাঁচ করে ভাঙ্গার
বসাককে দেবাল।

'এব মধ্যে কারুর বর্তমান খবর আনেন?''

আমি বুকলাই কেন্দু। সহজে হাতে না।

ডাক্তার কাঞ্চনাটা উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'একজনের ঘৰৰ জ্ঞানি। জ্যোতির্য সেন। ইনিও ডাক্তার, তবে অ্যালোপ্যাথ।'

'কোথায় আকেন বলতে পাবেন?'

'হেটিংস, টিকানাটা আপনি টেলিফোনের বইয়েতেই পেয়ে আবেন।'



'খ্যাক ইউ, স্যার।'

গাড়িতে উঠে লালমোহনবাবু বললেন, 'কুল-কলেজের বাইরেও তো বক্তু হয় যশাই। আট প্রেজেন্ট আমার যে ক'জন বক্তু আছে তাদের কেউই আমার সহপাঠী ছিল না।'

'এটা ঠিকই বলতেন', বলল কেন্দু। 'আমার মনে তয় শোধ পর্যন্ত ব্যবরেঞ্চ কাগজে ছবি দিয়ে অনকোয়ারি করতে হবে। তবে আগে এই হেটিংসের ডাক্তারকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক।'

জ্যোতির্য সেন আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন তিন দিন পরে, সকাল সাড়ে নটায় ফেন্দুদার নাম শনেছেন, যথেষ্ট সজ্জমের সঙ্গে কথা বললেন, আর বললেন উনি দশটায় চেতাবে বান, তার আগেই আমাদের সঙ্গে কাঞ্চনা সেবে নিতে চান। কেন্দু বলল, 'আর এটা ও জানিয়ে রাখি যে এর সঙ্গে ব্যাবাহের কোনও সম্পর্ক নেই; ক্যাপারটা আমার একটা তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

লালমোহনবাবুও অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা জেনে নিয়েছিলেন; তাঁর

গাড়িতেই আমরা শক্রবার সকালে টিক সাড়ে নটায় হেটিখে জ্যোতির্ময় সেনের
বাড়ি পৌছে গেলাম।

‘এর পিসার যে ভাল সেটা বাড়ি দেখেই বোবা যাব। বেয়াবা এসে সেলাম
ঠুকে আমাদের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলল, ‘ডাক্তারবাবু পাঁচ মিনিটের
মধ্যেই আসবেন।’

শাশমোহনবাবু গল্প করিয়ে ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কাব বিষয়
জ্ঞানতে চাইবেন—বঙ্গ মজুমদার, না ছবির অন্য ছেলেটি?’

ফেলুদা বলল, ‘বঙ্গ মজুমদার লোকটাকে একটু ভাল করে জানা সুরক্ষার।
এখন পর্যন্ত খুবই সামান্য জানি। তাঁর বন্ধুর বিষয় এই ডাক্তার কিছু বলতে
পারবেন বলে মনে হয় না।’

ফেলুদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতির্ময়বাবু এসে গেলেন।

‘আপনি তো অদোব মিতি’, বললেন তদনোক সোফায় বসে। ‘অবিশ্যি
ফেলুদা নাহেই বেশি প্রসিদ্ধ। ইনি তো তোপসে, বুঝতেই পারছি, আব ইনি
গিচ্ছয়ই জটায়ু আপনির তদন্তের সব কাহিনী আমার বাড়ির ছেলে বুড়ে সবাই
পড়ে, তাই আপনাকে একরকম আঝীয় বলেই মনে হয়। বনুন, কী অয়োজন
আপনার।’

‘এই ছবির দু’জনের একজনকেও চেনেন?’

‘এ তো দেখছি বঙ্গ মজুমদার। পরিষার মনে পড়ছে এ চেহারা। এই
ছিতীয় ছেলেটাকে চিনলাম না।’

‘কলেজে আপনাদের ক্লাসে ছিল না?’

‘উহ—তা হলে মনে হ্যাকত।’

‘তা হলে এই বঙ্গ মজুমদার সংস্কে দু-একটা প্রশ্ন করব।’

কলেজে বঙ্গ আমার ইতিমেট বন্ধু ছিল। আমরা দু’জনে এক বেঁকে
বসতাম, একসঙ্গে সিনেমা দেখতাম। ও আমার হয়ে প্রেরি দিত, আমি ওর হয়ে
দিতাম। অবিশ্যি এখন আর কেনও যোগাযোগ নেই।

‘কীরকম হেলে ছিলেন তিনি? অর্থাৎ মানুষ হিসেবে কীরকম?’

জ্যোতির্ময় সেন ভুক্ত কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘একটু
ব্যাপটে গোহের অবিশ্যি সেটা আমি মাইক করতাম না।’

‘ব্যাপটে কেন নথেন?’

‘কারণ ওই বহসে অত স্ট্রং নাশনালিট ফিল্ম আমি কাবুর মধ্যে দেখিলি।
এটা ঘনে ইয় ওর ঠাকুরবাবুদার কাহ থেকে পাওয়া। রঘুনাথ মজুমদার। ইয়াঁ
বয়সে টেরেরিস্ট দলে ছিলেন, শোয়া-তোয়া তৈরি করতেন। বঙ্গনের বাবার মধ্যেও
বোধ হয় এ জিনিসটা ছিল। বিলেতে ডাক্তারি করতেন। কোন এক সাহেবের
সঙ্গে বনেনি বলে আবার দেশে ফিরে আসেন।’

‘বিলেতে ধাকার সময় বঙ্গনবাবু তো ওখানকাৰ ক্লানে পড়তেন।’

‘তা পড়ত হয়তো, কিন্তু সে সফরে ও নিজে কিছুই বলেনি। ওর তো ওখানে একটা বিস্তী অ্যাক্সিডেন্ট হয়—সে বিষয় জানেন বোধ হয়?’

‘হ্যাঁ। উনি নিজেই বলেছিলেন।’

‘তার ফলে ও পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা একদম ভুলে যায়। অর্থাৎ বিশেষের সব ঘটনাই ওর মন থেকে ল্যোগ পেয়ে যায়।’

‘তা হলে ওখানে কার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল না-হয়েছিল সেটাপর জানবার কোনও উপায় নেই?’

‘না। যদি না ঘটনাটকে স্মৃতি আবার ফিরে আসে। তবে এটা বলে রাখি— রঞ্জন খুব সাধারণ হেলে ছিল না। অসুবৰ্দ্ধে ওর কী স্মৃতি করেছিল জানি না—বা ইংল্যান্ডের ছাত্র অবস্থা ওর কীরকমভাবে কেটেছে জানি না, কিন্তু ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেটা এই বয়সেও বোঝা যেত।’

প্রদিন সকালে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমি আব ফেলুদা রঞ্জন মজুমদারের বাড়ি গেলাম। ‘কন্দুর এগোলেন্স’ অন্তর্লোক বিজ্ঞেস বরলেন।

‘এই ছেলেটি যে কলকাতায় আপনার সহপাঠী ছিল না সেটা জানতে পেরেছি। এবার একটা টেপ নেব ভাবছি যেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এবং আপনার অনুমতি চাই।’

‘কী টেপ?’

‘এই ছবি থেকে আচেনা হেলের ছবিটা অবাবের কাগজে ছাপতে চাই—একটা বিজ্ঞাপনে। কলকাতা আর দিল্লির কাগজে দিলেই হবে।’

অন্তর্লোক একটু ভেবে বললেন, ‘আমার নামের কোনও উল্লেখ থাকবে না তো।’

‘মোটেই না’, বলল ফেলুদা ‘আমি শুধু জানতে চাই এই ছেলের পরিচয় কেউ জানে কি না। যদি জানে তা হলে আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে। আমার নাম-ঠিকানা থাকবে।’

‘ঠিক আছে। আপনার ইনভেন্টিগেশনের জন্য যা যা করার দরকার সে তো আপনাকে করতে হবে। আমার কোনও আপত্তি নেই।’

॥ ৬ ॥

পাঁচ দিন পরে রবিবারের কলকাতা আর দিল্লির টেক্সম্যানে বিজ্ঞাপনটা ঘোষণা করে দেল।

প্রথম দিন কোনও ফলাফল নেই, কেউ যোগাযোগ করল না। ‘বোঝাই যাচ্ছে কলকাতার কেউ নয়; তা হলে এর মধ্যে টেলিফোন এসে যেত’, কলে ফেলুদা।

শুধুবার সকালে ফেলুদার একটা ফোন এল। প্র্যান্ড হোটেল থেকে। জন

ডেঅটাৰ বনে একজন টুরিষ্ট। তিনি একটা অটোলিয়ান দলের সঙ্গে ভাৰতৰ পৰ্যটন মহানে বেৰিয়েছেন, দিনিতে এসে আচমকা কাগজে ছবিটা দেখেই হিৱ কৱেছিলেন কলকাতায় এসে ফেলুদাৰ সঙ্গে মোগাযোগ কৱবেন। বললেন আজই বিকেলে কাঠমাণু চলে যাচ্ছেন, দুপুৰ একটা নাগাদ আমাদেৱ বাড়ি অসমতে পাৱেন।

ফেলুদা অবশ্যই হ্যাঁ বলল। সে বেশ উৎসুকিত। বিজ্ঞাপনেৰ হে কেনও ফল হবে সেটা ও অশ্যা কৱেনি।

একটাৰ কাহাকৰিছি একটা ট্যাক্সি এসে আমাদেৱ বাড়িৰ সামনে দৰ্জাল। ফেলুদা দৱজা পুলল। ট্যাক্সি হেকে নেমে এক বছৰ পঞ্চাশেৰ সাহেব ফেলুদাৰ দিকে এগিয়ে এল।



‘মিষ্টাৰ মিটাৰ?’

‘ইয়েস—প্ৰিজ কাম ইন।’

ভদ্ৰলোক ভিতৱে এসে দুকলেন। গাড়ীৰ চামড়া রোগে পুড়ে একটা বাদামি রঙে এসে দাঢ়িয়েছে। বোৰাই যায় ভদ্ৰলোক বেশ কিন্তু দিন হল ভাৰত দৰ্শন কৱে বেড়াচ্ছেন।

ভদ্ৰলোক ধসাৰ পৱে ফেলুদা জিজ্ঞেস কৱল, ‘আপনি কাগজেৰ ছবিটা দেখেছেন?’

‘সেটা দেখেছি বলেই তো আসছি। অ্যান্টিন পৱে আমাৰ খুড়ভুতো ভাই পিটাৰ ডেঅটাৰেৱ ছবি কাগজেৰ বিজ্ঞাপনে দেখে অব্যাক লাগল।’

‘এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত যে এটা আপনার খুড়ভুতো ভাইয়ের ছবি?’

‘স্ত্রী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমি খুব অল্প ব্যসে অফ্টেলিয়া চলে যাই। তারপরে আর পিটারের খবর রাখিনি। ইন ক্যাষ্ট, আমার ফ্যামিলির সঙ্গেও আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। তাই শুরা এখন কে কী অবস্থায় আছে তা বলতে পারব না। এইটুকু মনে আছে যে পিটারের বাবা—আমার কাকা—মাইকেল ডেন্টের ইতিয়ান আর্মিতে হিসেন। আমার মনে হয় ইনভিপেনডেন্সের পরে উনি আবার দেশে ফিরে যান।’

‘পিটারই কি তার একমাত্র ছেলে ছিল?’

‘ওঁ নো। সবসুক্ষ সাতজন সন্তান ছিল মাইকেল ডেন্টেরে। পিটার ছিল ষষ্ঠ। বড় ছেলে জর্জও ইতিয়ান আর্মিতে ছিল।’

‘মাইকেল ডেন্টের বিলেতে কোথায় থাকতেন?’

‘কাউন্টিটা মনে আছে। নবগোক। শহরের মাঝ মনে নেই।’

‘এতেও অনেক কাজ হল।’

জন ডেন্টের উঠে পড়লেন। তাকে হোটেলে গিয়ে লাঙ্ক খেতে হবে—তার দলের লোক সব অপেক্ষা করছে। ফেলুদা অন্দরোককে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সিতে সুলে দিল।

পরদিন আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমিরা রঞ্জন মঙ্গুমদারের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

‘বিজ্ঞাপনের কোনও ফল পেলেন?’ ভেন্ডোক জিজ্ঞেস করলেন।

‘সেইটে জানতেই আপনার কাছে আসা’, বলল ফেলুদা ‘ ছেলেটি ব্রিটিশ, নাম পিটার ডেন্টের।’

‘কী করে জানলেন।’

ফেলুদা জন ডেন্টেরের ঘটনাটা বলল।

রঞ্জনবাবু কেমন যেন অন্যমন্ত্র হয়ে গেলেন। তাহপর বিড়বিড় করে দু'বার বললেন, ‘পিটার ডেন্টের...পিটার ডেন্টের...’

‘কিছু মনে পড়ছে কি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘আবছা আবছা। একটা দুঃটিনা...না, এই সৃতির ওপর নির্ভর করা চালে না।’

‘আপনি যে-সময়ের কথা ভুলে গেছেন, সেই সময়ের ঘটনা কি মাঝে থাকে মনে পড়ে যায়?’

‘যা মনে পড়ে সেটা সত্যি কি না কী করে বিচার করব? এমন তো কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করে যাচাই করতে পারি। ধারা-মা দু'জনেই থাবা গেছেন। আবার বিলেতের ঘটনা ওঁবাই জানতেন।’

‘একটা জিনিস বোধ হয় বুবতে পারছেন, যে কলকাতার বসে এই পিটার ডেন্টের সমস্কে আর কিছু জানা যাবে না।’

‘হ্যা...হ্যা...তা তো বুক্তেই পারছি...’

ভদ্রলোক আবার অন্যমনক্ষ।

‘না কি ব্যাপারটা এখানেই ইতি দেবেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক হঠাত ঘেন সজাগ হয়ে উঠলেন।

‘মোটেই না—মোটেই না।’ হাঁটুর চপড় থেরে বললেন রঞ্জন মজুমদার।

‘সে কোথায় আছে, কী করছে, আমাকে মনে আছে কি ন?—সব আমি জানতে চাই। আপনি কবে ঘেতে পারবেন।’

হঠাতে এই প্রশ্ন যেন ফেলুদা একটু হকচিয়ে গেল। বলল, ‘কোথায়?’

‘লক্ষন—আবার কোথায়? লক্ষন তো আপনাকে ঘেতেই হবে।’

‘হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি।’

‘কবে যাবেন?’

‘আমার তো অন্য কোনও কাজ নেই। এটাই একমাত্র কেন।’

‘আপনাদের পাসপ্রোট-টাসপ্রোট হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ। আমরা কয়েক বছর আগে হংকং যাই; তখনই করিয়ে নিয়েছিলাম।’

‘তা হলে আর কী—বেরিয়ে পড়ুন। আমি টিকিয়ে ধ্বনিশূন্য করছি।’

‘আমাদের সঙ্গে এক বক্তু যাবেন—নিজের খরচে জব্য।’

‘ঠিক আছে—তাঁর মাঝে আমার সেক্রেটারি পত্তপত্তিকে দিয়ে দেবেন। পত্তপত্তিই আমার ট্রাভেল এজেন্টের প্রা দিয়ে আপনাদের যাবার এবং ওখানে থাকার সব ধ্বনিশূন্য করে দেবে। তা ছাড়া করেন একজেন্জের ব্যাপারটা তো আছে; সেটাও তা করে দেবে।’

‘ওখানে কদিন থাকার?’

রঞ্জনবাবু একটু ভেবে বললেন, ‘সাত দিনে যদি হল তো হল, না হলে চলে আসবেন। আমি রিটার্ন বুকিংটও সেইভাবেই করব।’

‘আমি যদি সাকসেসফুল না হই, তা হলে কিন্তু আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে প্রস্তুত নই।’

‘আপনি কোনও কেসে বিকল হয়েছেন?’

‘তা ইইনি।’

‘তা হলে এটাত্তেও হবেন না।’

॥ ৪ ॥

‘ইউ, কে?’

লাগমোহনবাবুর চেখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ফেলুদা ভদ্রলোককে কলকাতার ঘটনা সব বলে দিয়ে তরাপর শব্দনের ব্যাপারটা বলল। ভদ্রলোক এটাত ভাল্য এবেবায়েই তৈরি ছিলেন না।

‘আপনি গেলে কিন্তু আপনার নিজের খবরে থেকে হবে। আমাদের খবর মিষ্টার মজুমদার দিচ্ছেন।’

‘কুছ পরোয়া নেই। খবরের ভয় আমাকে দেখাবেন না, মিষ্টার হোমস। আপনার পক্ষার বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও আমার রোজগার আপনার চেয়ে বেশি। তবু বালে দিন কী করতে হবে।’

‘দিন সাতকের ঘড়ে গবাঘ কাপড় নেবেন : পাসপোর্টটা হারাননি তো?’

‘নো স্যার—কেয়ারফুলি কেপট ইন মাই অ্যালব ইরা।’

‘তা হলে আর আপনার করণীয় কিন্তু নেই। শাবার ভারিখটা যথাসময়ে জানতে পারবেন। যদুর মনে হয়—এখান থেকে বয়ে, বয়ে থেকে স্কুল।’

‘ওখনে থার্ফটি কোথায়?’

‘সেটা বঙ্গনকাবুর ট্র্যাক্স এজেন্ট ব্যবস্থা করবে। একটা প্রি-স্টার হোটেল হবে আর কী।’

‘হোশাই ওনলি প্রি স্টারস?’

‘তার চেয়ে বেশি চড়তে গেলে মজুমদার মশাহের পকেট ঝাঁক হয়ে যাবে। লজের খরচ সমন্বে কোনও ধারণা আছে আপনারা?’

‘তা অবিশ্য নেই; তবে একটা কথা বলে রাখি—গুড়পাইর এক ভদ্রলোক থাকেন, আমার খুব চেন। চন্দেশের বোস। বাষসাদার। বছরে দুবার করে বিলেত যান। তাঁর কাছ থেকে কিন্তু তলার ম্যালেজ করব—কী বলেন?’

‘বাষপাইটা কিন্তু বেআইনি। অতএব মীতিবিকুন্দ।’

‘আরে মশাই আপনি অত সাধুগিরি করবেন না তো। আজকল মীতির ডেফিনিশন চেজ করে গেছে।’

‘ঠিক আছে। অনিষ্ট্য সঙ্গেও আপনার করাচুপিতে সাহ দিলি।’

আমাদের মসলিন এমার ইলিয়াতে শাওয়া ঠিক হস। প্রেন ছাড়বে রাত তিমটেয়, ভারপুর বয়ে হয়ে লক্ষণ পৌছাবে মসলিন সকাল সাড়ে এগ্যরোটাস। হোটেলের ফেলুদা বলল, ‘খুব ভাল লোকেশন। একেবারে শহরের মাঝারী।’ ফেলুদা ক’দিন থেকে লক্ষণ সংক্রান্ত গাইড দুকে ভুবে আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরের ম্যাপ দেখছে।

যাবার আগের দিন মিষ্টার মজুমদারকে ফোন করা হল। মিনিট দুয়েক কথা বলে ফোন নামিয়ে দেবে ফেলুদা বলল, ‘জানতে চেরেছিলেন তুঁর বাবা কোনও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হিসেবে কি না। বঙ্গলেন তুঁর মনে নেই: তুঁরা কোথায় থাকতেন জিজ্ঞেস করাতেও একই উত্তর পেলাম। বললেন তুঁর বাবা তুঁকে বলেছিলেন কিন্তু এখন আর ঘনে নেই। আমার মনে হয় আকসিডেন্ট। তুঁর শৃঙ্খলাকেই দুর্বল করে দিয়েছে। লক্ষণে আমার কলেজের এক সহপাঠী আছে, সে-ও ডাক্তার। দেখব তুঁর কাছ থেকে কোনও খবর পা-ওয়া যায় কি না।’

দেখতে দেখতে যাবার দিন চলে এল; ফেলুদার মৌলতে কত জায়গাই

না দেখলাম, কিন্তু ক্ষম যাওয়া হবে এটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। লালমোহনবাবু বললেন, 'বিলেত অঞ্জিকাল রাখ শায় যদু যধু সকলেই যাচ্ছে, সেই ভেবে মনটাকে একটু ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছিলাম—ও যা, কাল রাত্তিরে দেখি পালস রেট বেড়ে একশো দশে উঠেছে। এমনিতে আশির বেশি কদাচিং উঠে।'

এখানে বশে রাখি, লালমোহনবাবু তাঁর পড়পারের বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিন্তু জ্ঞান ম্যানেজ করেছেন।

ফেলুনকে ক'দিন থেকে একটু চুপচাপ দেখছি, বদিও কাজ যা করার সবই করছে। কেসটা যে সহজ নয় সেটাই বোধ হয় মাধার মধ্যে ঘূরছে। আমি তো কল্পনাই করতে পারছি না ও কীভাবে এগোবে। তথ্য এত কম। তার ওপরে রঞ্জনবাবুর স্মৃতিলোপ। যে ক'টা বছর ওই ছেলেটির সঙে ওর বন্ধুত্ব ছিল, সেই ক'টা বছরের কথাই উনি তুলে বসে আছেন। লালমোহনবাবু সোজাসুজি বললেন, 'আপনি আনেক রহস্যের সমাধান করেছেন, কিন্তু এটার মতো কঠিন কেস আর কখনও আপনার হাতে এসেছে বলে তো মনে হয় না। আপনি যে কেসটা কেন নিলেন তা বুঝতে পারছি না।'

'এটা নিলাম বলেই কিন্তু আপনার বিস্তৃত যাওয়া হচ্ছে।'

'তা বটে, তা বটে।'

যাবত্তর দিন এবং তারপর যাবার সময়ও এসে পড়ল। লালমোহনবাবুর গাড়িতেই এয়ারপোর্ট গেলাম। ভদ্রলোক পুরোদস্তুর সাহেব সেজেছেন। এই টাইটা অংগে দেখিনি, বুঝলাম নতুন নিম্নেছেন।

কল্টমদের আমেলা এখানেই চুকিয়ে দিব্বে বসে পৌছে লাগেজজমা দিয়ে সাউথে কিন্তু সময় অপেক্ষা করে, লাউডস্পিকারের ঘোষণা আনে আমরা প্লেনে পিয়ে উঠলাম। আশ্চর্য—এখন বিহুনায় শুয়ে শুয়োনোর কথা, কিন্তু ধাবার উত্তেজনায় একটুও ঘুম পাইছে না। লালমোহনবাবু নাকি দুপুরে এক দফা শুমিয়ে নিয়েছেন, তাই বললেন প্লেনে আর শুয়োনোর দরকার হবে না। ভদ্রলোক নিম্নের জায়গায় বসে বেল্ট বেঁধে বললেন, 'সেই পঞ্চালের গঁজে পড়েছিলাম না। তিনি মাছের পেটে চুকেছিল পঞ্চ—এব ধেন সেই তিনি মাছের পেট। এত লোক সমতে প্রেনটা মাটি থেকে উঠে কী করে সেটাই আশ্চর্য।'

সেই আশ্চর্য ঘটিলাটাও ধটে গেল। বান্ধয়ে দিয়ে যখন প্লেন কান-ফ্লাটানো শব্দ করে ছুটে চলেছে, লালমোহনবাবুর মোখ ক্ষম বন্ধু টোটো একধার খড়ে ডঁঠল, আর বুঝলাম যে উনি বললেন 'দুঃখ দুঃখ', আর সেই মুহূর্তে প্রেনটা জমি হেডে আকাশে উঠে পড়ল, জানালা দিয়ে দেখলাম বসের আলো দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর প্রেনটা ক্রমে নাক উঠ অবস্থা থেকে সোজা হল, শব্দ করে গেল, আর লাউডস্পিকার এয়ার হোষ্টেসকে বলতে শোনা গেল আমরা এখন বেল্ট পুলতে পারি, তবে আগদা করে পরে থাকাই ভাল। তারপর এক দিকে-একজন

হেলে আর অন্য দিকে একজন মেয়ে দাঢ়িয়ে শাইফ জ্যাকেট আর অঙ্গীজেনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

আমরা নন-যোকিং এরিয়াতে বসেছি। ফেলুদা সিগারেট খায় বটে, কিন্তু দরকার পড়লে অন্যায়সে নশ-বারো ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পাবে। সিনেমা দেখাবে না।' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'সচরাচর তো দেখায় বললাই আবেছি।'

সিনেমা দেখাল ঠিকই, সেই সঙ্গে কথা শোনার জন্য একটা কারে হেডফোন দিল, কিন্তু এত বাজে ছবি যে আমি দশ মিনিট দেখে হেডফোন খুলে রেখে খুঁত দিলাম।

শুন্টা ঘৰন ভাঙল তখন জানালা দিয়ে রোদ আসছে। ফেলুদাও বলল ও ঘণ্টা দুরেক ঘুঁঁটিয়ে নিয়েছে। কেবল লালমোহনবাবুই নাকি একটানা জেগে আছেন। বললেন, 'হোটেল সুমিয়ে পুমিয়ে নেব।'

বৰফে ঢাকা আলপসের উপর দিয়ে প্রেন্টা না উড়ে গেলে প্রায় কিছুই দেখার থাকত না। পাহাড়টার নাম জেনে লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি হট ব্ল্যাক দেখতে পাব?' ফেলুদা বলল, 'তা পাব, তবে ঘন্টা ব্ল্যাক নয়, লালমোহনবাবু। এখন ইউরোপ এসেছেন, এখানকার মুঠোগুলোর নামের উচ্চারণ ঠিক করে করতে শিখুন। ওটা হল ম ক্লা।'

'তার মানে অনেকগুলো অক্ষরের কোনও উচ্চারণই নেই।'

'ফরাসিতে সেটা খুব স্বাভাবিক।'

লালমোহনবাবু বেশ কয়েকবার ম ক্লা ম ক্লা বলে নিলেন।

'আর আমাদের হোটেল যেখানে', বলল ফেলুদা, 'সেটাৰ বানান দেখে পিকাড়িলি বলতে ইচ্ছা কৱলেও আপনি যদি পিক্লি বলেন তা হলে উখানকার সাধারণ লোকে বুঝবে আৰুও সহজে। পিক্লি সার্কাস।'

'পিক্লি সার্কাস। খ্যাক ইউ।'

আধ ঘণ্টা দেটে আমাদের প্রেন লক্ষণের হিথেরে এয়ারপোর্ট পৌছে গেল। ফেলুদা বলল, 'এখান থেকে সেন্ট্রাল লক্ষণ তিনৰকমে যাওয়া যায়। এক হল বাস, দুই হল ট্যাক্সি আৰু তিন টিউব। ট্যাক্সিতে দেদাৰ বৰচা, অকে বাসেৰ চেয়ে টিউবে কম সময় ধাগে। আমাৰ শ্যাপ বলছে একেবাবে পিকাড়িলি সার্কাস পৰ্যন্ত টিউব যায়, কাজেই তাতেই যাওয়া ভাগ।'

'টিউবটা কী ব্যাপৰ মশাই?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস কৱলেন।

'টিউব হল কলকাতায় আমরা যাকে হেট্টো বলি, সেই। অৰ্ধাং পাতাল রেল। লক্ষণের মৌচ দিয়ে কিলবিল কৱে ছড়ানো রয়েছে এই টিউবেৰ লাইন। একবাবে বুঝে নিলে টিউবে যাতায়াতেৰ মতো সহজ জিনিস আৰু নেই। শ্যাপ গাওয়া যায়; একটা আপনাকে এনে দেব।'

আমাদের হোটেলটা বেশ বড় আর পরিষ্কৃত, অর্থাৎ ভাঙ্গা খুব বেশি নয়। ট্র্যাভেল এজেন্ট ভালই চয়েস করেছিস মশাই', বললেন লালমোহনকুমাৰ। টিউব থেকে বেঁৰিয়ে 'শহরের চেহার' দেখে প্রথমে ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথাই বেরোছিল না। শেষে বললেন, 'আজ্ঞা মশাই, আমাদেরও লাল ড্রবল ডেকার, আর একসেও দেখছি লাল ড্রবল ডেকার, এতেও কেমন ছিমছায়, আর আমাদেরগুলো এমন ছিবড়ে চেহারা দেন বলুন তো?'

লাল হোটেলে সেবে ফেলুনা কুন্তল, 'তোরা যদি খুব টায়ার্ড না বোধ করিস তা হলে একবার অক্সফোর্ড ট্রিটেটা ওৱে দেখে আয়। যত্ন লক্ষণের এমন চেহারা আর কোথাও পাবি না।'

'আর তুমি কী করবে?'

'বলছিলাম না—আমির এক কলেজের বক্স—বিকাশ সন্ত—এখানে ডাক্তার। তাকে একবার শোন করে জানিয়ে দিই আমি এসেছি, আর দেখি যদি ও কোনও ইন্ফুরেশন দিতে পারে।'

আমরা অবিশ্বিত তেমন কিছু ক্ষান্ত হইনি, তাই বেরোনোই হিঁক কৰলাম।

কোন করে তার বক্সকে পেয়ে গেল ফেলুনা। মিনিটখানেক কথা বলে ফেন রেখে বঙ্গল, 'বিকাশ আমার গলা তনে একেবারে থ! একটা ধামলা যে কোনও দিন আমাকে লভনে এনে ফেলবে সেটা ও তা বতেই পারেনি। তা ছাড়া ওর কাছ থেকে একটা ষষ্ঠৰও পাওয়া গেল।'

'কী খবর?'

লক্ষণ এক বৃক্ষ বাঙালি ডাক্তার আছেন, তিনি নাকি ছিতীর মহাযুক্ত শেষ হৰাব কিছু পরেই এখানে আসেন ডাক্তারির ছাত্র হয়ে। তারপর লক্ষণে প্র্যাকটিস করেন। নাম নিশানাথ সেন। খুব হিঁড়কে লোক। বিকাশের ধারণা, উনি হয়তো বজ্জননবুর ব্যাবাকে চিল্ডেন। ওর চেষ্টারের ঠিকানাটা দিয়ে দিল। আমি একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ফেলুনা উঠে পড়ল।

'অক্ষকুমাৰ চিল ধনি ছুঁড়তেই হয়, তা হলে সেটা এখনই আৱণ্ড করে দেওয়া জাই।'

আমরা একসঙ্গেই বেরোলাম। ফেলুনা টিউব টেশনের দিকে গেল, আমরা ওৱ কাছ থেকে ডিয়েকশন নিয়ে অক্সফোর্ড ট্রিটেটের দিকে হাঁটা দিলাম।

অক্ষেবুর মাস, তাই বেশ ঠাণ্ডা। আমরা দু'জনেই গলায় মাঝলার জড়িয়ে নিয়েছি।

পথে অন্বরত ভারতীয় দেখে পড়ছে, তাই বোধ হয় জটায়ু বললেন, 'বেশ

আট-ছোখ কিল করছি তাই তপেশ। অবিশ্ব বাজার মসৃণ চেহারা মোটেই হোমের কথা মনে পড়া� না।

অব্রাহোর্ড স্ট্রিটে পৌছে কোথ টেরিয়ে গেল। ওরু যে দোকানের বাহার তা নয়; এরকম ভিড় আর কোনও বাজার কাখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

‘জনসমুদ্র! ওশন অফ ইউয়ালিটি, তপেশ, ওশন অফ ইউয়ালিটি।’

এই জনসমুদ্রের সঙে তাল বেথে চলতে হচ্ছে, তাই আজে হাটার উপায় নেই। সমস্ত ঝাতাটাই যেন একটা অবিরাম বাত্তার ছবি। আর দোকানের কথা কী আর বলব! বলবলে লোভ লাগানো চেহারা নিয়ে পাশাপাশি দাঢ়িয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর। নামগুলো পড়ছি—ডেবনহ্যাম, মার্কিন অ্যান্ড স্পেনসরস বুটস ডি এইচ এভারস



একটা বড় দোকানের কথা আমি আগেই জানতাম—সেল্ফিজেস—আর এটা জানতাম বে সেটা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একেবারে শেষ প্রান্তে। দোকানটা যে এত বড় সেটা আমি ভাবতেই পারিনি। 'চলুন, একটা জিনিস বেখাই' বলে লালমোহনবাবুকে হাত ধরে রাঙ্গা পাত্র করে সেল্ফিজেসের সামনে এসে দাঁড়ান্ম। তারপর ঘূরপাক খাওয়া দরজা দিয়ে দু'জনে দোকানের ডিভৱ চুকলাম। আমাদের মুখ হী হয়ে গেল। রাজ্যের সবরকম জিনিস এই এক দোকানে পাওয়া যায়, তাই ক্রেতানের ভিড়ও দেখবার যতো। সেই ভিড়ের চাপে এদিকে ওদিকে টকছি, এক পা এগোছি তো দু' পা পেছেছি। জট যাতে হারিয়ে না থান তাই তাঁর হাতটা তেপে ধরে আছি।

'মানুষেরও যে ট্র্যাফিক জাম হয় তা এই প্রথম দেখলাম', বললেন—
ভদ্রলোক।

আমিক দূর এগিয়ে একটা মোটাঘুটি কম ভিড়ের আয়গায় পৌছলাম।

'এমন জায়গায় এসে কিছু না কিসে ফিরে যাব?' বললেন লালমোহনবাবু।

'কী কিনতে চাইছেন আপনি?'

চারিদিকে তো দেখছি কলম পেনসিল নোটবুকের সংগ্রহ। একটা মাঝারি দামের ফাউন্টেন পেনসিল নোটবুকের সংগ্রহ। একটা খাবারি দামের ফাউন্টেন পেনও যদি কিনতে পারতাম। সামনের উপন্যাসটা লড়নে কেনা কলমে লিখতে পারলে...

'বেশ তো, আপনি দেবে বেছে নিন।'

মিনিট পাঁচেক দেবার পর তদুলোক একটা মনের যতো কলম খুঁজে পেলেন। 'শ্রী প্রাইভেট ফার্ট পেস। তার মানে আমাদের দেশের হিসেবে কত হলা?'

'তা প্রায় পঁচাশের টাকা।'

'গুড়। এই জিনিসের কলকাতায় দাম হত দুশো।'

'আর কী—পেমেন্ট করে দিন।'

'কী বলব বলো তো? মানে, প্রথম দিন তো, একটু গাইডেস না পেলে...।'

'আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। কলমটা বিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে দিন আর একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট দিন। ওরা চেজ ফেরত দেবে, আর কলমটা ওদের একটা ঘামে পুরে দেবে। ব্যাস, ব্যতম।'

'তুমি প্রথম দিন এত কী করে জামলে বলো তো?'

'আমি তো এসে অবধি চতুর্দিকে দেখছি। আপনি ও দেখছেন, কিন্তু আপনি অবজ্ঞার্ত করছেন না।'

'দু' মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক তার নতুন কেনা কলম নিয়ে হাসতে ক্রিয়ে এলেন। আমি বললাম, 'চা খাবেন?'

'কোথায়?' 'আমি যত দূর জানি, ওপরে একটা রোটুরেন্ট আছে।'

‘বেশ তো, চলো যাওয়া থাক।’

চলত মিডি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে চার তলায় খাবার জারগাটা আধিকর করলাম, আর সেই সঙ্গে ভাগ্যতামে একটা খালি টেবিলও পেরে গেলাম।

চা যাওয়া শেষ করে আবার অক্সফোর্ড হিটের জনসমূহ পেরিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সাড়ে চারটা ঘেঁজে গেছে। অবৈ গিয়ে দেখি ফেলুন্দা হাজির।

‘বিলেত ব্যাপারটা কী ভাব কিছু আস্বার পেলেন?’

লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুন্দা।

‘কেমন লাগল বলার ভাষা কুঁজে পাপ্রি না।’

‘কেন, আপনার বই পড়ে তো মনে হয় আপনার বিশেষণের টক অফুরন্ট।’

‘বাংলায় বোকাতে পারব না। বলতে হয় সুপার-সেন্সেশন্যাল! এখনও মাথা ভোঁ করছে। বিশ্বী দেটালার মধ্যে পড়ে গেছি।’

‘কেন?’

‘লভন দেখব, না আপনার তদন্তের প্রোত্ত্বে দেখব।’

‘তদন্ত তো সবে কর। তেমন জন্মে উঠলে আবি নিজে খেকেই বসব; আপাতত লভন দেখে নিন।’

‘মেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ইল?’ আবি জিজ্ঞেস করলাম।

‘হল, তবে কথা প্রায় কিছুই হল না। ভদ্রলোক গোঁটি নিয়ে ব্যস্ত হিলেস। কাল সকালে তুর বাড়ি যেতে বদেছেন। রিচমন্ডে থাকেন।’

‘সেটা যেওয়ার?’

‘পিকাডিলি আভারঘাটতি পেকে রওনা হয়ে সাউথ কেনসিংটনে চেঙ্গ করে ফিল লাইন ধরে সোজা রিচমন্ড। এ ধরনের জাতপাও তো দেখা দরকার। ভদ্রলোক টেশনের বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন আয়াদের জন।। বেশ অহাস্যিক লোক রঞ্জনবাবুর বাবাকে চিনতেন এটুকু জেনেছি।’

হোটেলের ঘরে ঘরে টেলিভিশন, তাই দেখেই সকেটা দিব্যি কেটে গেল। কাড়াতাড়ি ডিনার সেবে শয়ে পড়লাম আর বালিশে মাথা রাখতেই চোখ ঘুঁষে ছুপে এল।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে উঠে দেবি আকাশ মেঘলা, টিপ টিপ করে বৃংশ পড়ে। আমার একটা গ্যাটারপ্রফ জ্যাকেট ছিল, সেটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। ফেলুন্দা আর লালমোহনবাবু দু’জনেই ম্যাকিনটিপ চাপিয়েছে।

ক্রেকফাস্ট সেবে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ফেলুন্দা বলল, ‘মিস্টার জটায়

আপনাকে বলে রাখি যে এটাই হল জননের সামাজিক চেহারা। কাল যে খটখটে দিন আর ঝলমলে রোদ পেয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম।'

'এখানে কলকাতার সত্ত্বে ভল জমে না নিশ্চয়ই।'

'তা জমে না। আর বুব যে মুসলিমের বৃষ্টি হয় তাও নয়।'

আভারগ্রাউন্ডে দেখি সকলেই তাড়া, কেউ আগে হাঁটেছে না। আমরাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলায়।

'এই স্পিডটা দেখছি ছেয়াচে', বললেন লালমোহনবাবু। 'কলকাতায় এমন কলকাতাসে ইঁটবাতু কথা কল্পনাই করতে পারি না।'

চেঞ্চ করার সময়ও সেই একই তাড়া। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে যেতে হচ্ছে মিলিটে ট্রেন আসছে যাচ্ছে, সময় যাতে নষ্ট না হব তার জন্য লোকে উঠে পড়ে লেগেছে।

বিচমন পৌছলাম এগারোটা বেজে পাঁচে। নিশানাথবাবু বলে দিয়েছিলেন হাতে কত সময় বাথতে হবে, তাই কোনও অসুবিধা হল না।

ক্ষেপনের বাইরে বেরোতেই একজন ঘাট-বাষ্পি বছরের সৌম্যদর্শন অন্দরোক হাসিমুরে ফেলুদার দিকে এগিয়ে আলেন। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, যদিও আকাশে মেঘ।

'ওয়েলকাম টু বিচমন।'

ফেলুদা অন্দরোককে সঞ্চারণ আনিয়ে আমাদের দুঃজনের পরিচয় দিয়ে দিল।

'আপনি রাইটার।' লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞাস করলেন অন্দরোক। 'কতকাল যে বাংলা বই পড়িনি তা হিসেব নেই।'

'আপনি দেশে যাব না মাখে মাঝে?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'লাস্ট গোছি সেভেনটি খ্রিতে তারপর আর না। কবর জন্মেই বা যাৰ বলুন। আমার পুরো ফ্যাব্রিলিই তো এখানে। অম্বাৰ বাঁড়িতে অৰিশি আমি আৰ আমাৰ শ্রী ছাড়া কেউ থাকে না, কিন্তু জড়িয়ে ছিটিয়ে এই ইংল্যান্ডেই রয়েছে আমাৰ সুই হেলে দুই মেঘে, মাতি-নাতনি।'

অন্দরোকের গাড়িটা একটু দূৰে পার্ক কৰা ছিল; বললেন, 'এখানে তবু কম; জননে গাড়ি পাৰ্ক হচ্ছে একটা বিৱাট সমস্যা। আপনি হয়তো সিনেমা যাবেন, গাড়ি পার্ক কৰতে হবে সিনেমা হাউস থেকে আধ মাইল দূৰে আমরা গাড়িতে উঠলাম। অন্দরোক নিজেই ছাইত কৰেন, ফেলুদা ওঁৰ পাশে বসে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিল। ব্যাগারটা দেখে একটু অবাক হয়ে লালমোহনবাবু আমাৰ দিকে চাইতে বললাম, 'এখানে গাড়িতে সামনের সিটে বসলে স্ট্র্যাপ লাগানো নিৰম।'

'কেন?'

'যাতে অ্যাঞ্জিলেটি হলে লোকে মুখ ধূঢ়ে না পড়ে।'

নিশানাথবাবু গাড়ি চালু কৰে দিয়ে বললেন, 'আমাৰ বাড়ি এখান থেকে দেড়

মাইল। এখানে এখনও মাইল চলে। দেশে তো কিলোমিটার, কিমোগাম হয়ে গেছে, তাই না।'

রিচমন্ডয়ে খুব ছোট জায়গা তা মনে হল না, কারণ দোকানগাটি সবই রয়েছে। অস্ক্রফট প্রিটে যে সব দোকানের নাম দেখেছিমাম, তার কিছু কিছু এখানেও দেখলাম।

নিশানাথ সেনের বাড়ি একটা সুন্দর নিরিবিলি জায়গায়, চারিদিকে, গাছপালা, গাছের পাতায় শব্দকোলের হলদে আর বাসামি রাখ। দোকান বাড়িটাও সুন্দর, সামনের বাপানে ফুল—একেবারে পোষ্টকার্ডের ছবি।

আমরা একাতলার বসবার ঘরে বসলাম। আজ বেশ ঠঁঝা আর স্যাতসেতে, তাই ফাঁপার প্রেসে আগুন জুলছে।

আমরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয়স্ক মেঘসাহেব এসে চুকলেন, মুখে ইপি।

'আমার শ্রী এমিলি', বললেন নিশানাথবাবু। আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলাম।

'আপনাদের অন্য একটু কষি করু।' যাইলা জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা স্থান জানিবে ধন্যবাদ দিয়ে দিল। এবার নিশানাথবাবুও ফেলুদার সামনে একটা কাউচে বসে বলছেন, 'কী জানতে চান বলুন।'



‘আপনি কাল বলছিলেন রঞ্জন মজুমদারের বাবাকে চিনতেন। আমি রঞ্জন মজুমদার সহজে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি।’

‘রঞ্জনের বাপ বজনী আর আমি প্রায় একই সম্পর্ক কর্তৃ এইটে বিলেতে আসি। ও আমার চেয়ে মোল-সতেরো বছরের বড় ছিল। আলাপটা হয় পরে। তত দিনে আমি এচিন বরায় ভাঙ্গারি পাশ করে লক্ষনে প্র্যাকটিস পুরা করেছি, আর বজনী মজুমদার সেক্ট প্রেরিজ হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচড রয়েছেন। একটা খিয়েটারে আমাদের পাশ্চাপাশি সিট পড়েছিল। কী নাটক তাও মনে আছে—মেজব ব্যারবো। ইন্টারমিশনে পরাপ্রবের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওই সঙ্গে ওর স্ত্রীও ছিলেন। ও খাকত গোলডার্স ছিলে, আর আমি—তখনও আমার বিয়ে হয়নি—হ্যাপ্টেডে।’

‘আর তুর ছেলে?’

‘ছেলেও এখনে এসে কিছু দিনের মধ্যেই কুলে ভর্তি হয়।’

‘কী কুল মনে আছে?’

‘আছে বইকী—ওয়ারেনডেল। এপি-এ। তারপর কেম্ব্ৰিজে যায়।’

‘কোন কলেজ?’

‘মদুর মনে পড়ে—ত্রিনিটি। সেই সময়ই আমার সঙ্গে বজনী মজুমদারের আলাপ।’

লিশানাখবাবু একটু ভেবে বললেন, ‘পিকিউলিয়ার।’

‘কেন—পিকিউলিয়ার বলছেন কেল?’

‘আমার মনে হয় তুমের পুরো ফ্যারিসিটাই একটু অসুস্থ ধরনের ছিল। বজনী মজুমদারের বাবা রঞ্জন মজুমদার ইয়াঁ বজসে টেরবিট ছিলেন, বোমা-টোমা তৈরি করেছেন। পরে উনি নামকরা হার্ট স্পেশালিষ্ট হন। তখন আর সাহেবদের পুত্র কোনও বিদ্যে নেই। এমনকী তিনিই জোর করে বজনীকে বিশেষ পাঠান। তার শৰ্থ তাঁর সাহেব ইস্কুলে পড়বে আর ছেলে লক্ষনে প্র্যাকটিস করবে। এরকম ক্লাপাত্তির বড় একট মেখা যাব না। আর বজনী যে তাবে দেশে ফিরে দেল সেও অসুস্থ। ওর একটা থার্মা ছিল যে ইংরেজরা এবনও ভারতীয়দের ঘৃণন কোরে দেখে। আমি তেকে অনেক বোঝতে চেষ্টা করেছি যে ব্যাপারটা সত্য নয়। এই বিদ্যের দু-একটা আইসোলেটেড ঘটনা হয়তো ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু এখানে বহু ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে, দুই জাতের মধ্যে কোনও ঝ্যাশ নেই।

‘কিছু বজনী মজুমদার আমার কথা মনতে রাখি হয়নি। একটা সামাজিক ব্যাপারে—ওই এক ব্রিটিশ পেশেন্টের একটা কথায়—ও হঠাত ক্ষির করে দেশে ফিরে যাবে।’

‘ততদিনে তো তুর ছেলের অ্যাপ্রিলেট ঘটে গেছে?’

‘তা গেছে। সেই ছেলে এখন কী করছে তা তো পঞ্চাশের ওপর বসস
হওয়া উচিত।’

‘হ্যা। উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।’

‘তার মানে এখনকার পড়াশনা ওর কোমওই কাজে লাগেনি। কলকাতায়
ফিরে গিয়ে নতুন করে পড়াশনা করতে হয়।’

‘তাই তো হলো হয়। ইয়ে—রঞ্জনের বস্তুবাক্স সহজে কিছু জানতেন কি?’

‘না। নার্থিং অ্যাট অল।’

ইতিমধ্যে কফি এসে গিয়েছিল, আর আমাদের বাওয়াও হয়ে গিয়েছিল,
তাই আমরা উঠে পড়লাম। অন্দরোক ফেরার পথেই একরকম জোর করেই
আমাদের টেশনে পৌছে দিসেন।

॥ ৭ ॥

আমরা পরদিন টিউবে করে এপিং গিয়ে পৌছাম বিকেল সাড়ে তিনটে
মাগাদ। টেশন থেকে হেঁটে ওয়ারেন্ডেল স্কুলে পৌছতে লাগল কুড়ি মিনিট।
বিশাল খেলার মাঠের পিছনে দোড়িয়ে আছে স্কুল বিড়িং। অন্তত দুশো বছরের
পুরানো তো হবেই। ফেন্সদার উচ্চেশা হল রঞ্জন মজুমদার ওখানে ছাত্র ছিল কি না
এবং পিটার ডেল্টার ওর সঙ্গে পড়ত কি না সেইটে জানা।



ইঙ্গলের সদর দরজায় পোর্টার দাঢ়িয়ে আছে, সে জিঙ্গেস করল আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কেলুদা বলল সে চাহিলের দশকের শেষ দিকের একজন ছাত্র সহকে কিন্তু তথ্য জন্মতে চায় : পোর্টার আমাদের একটা লাইব্রেরি জাতীয় হলে চুকিয়ে দিয়ে বলল, 'মিটার ম্যানিং দেয়ার উইল হেল্প ইউ।'

ম্যানিং ভদ্রলোকটি একটা ভেক্ষে বসে পুরু কাচের চশমা পরে একটা খাতায় কী জানি শিখছিলেন, মেলুদা জ্যোতি কাছাকাছি দাঢ়িয়ে একটা মৃদু গলা খারাবানি দিল : ভদ্রলোক মেঘা খালিয়ে চোখ তুলে বললেন, 'ইয়েস ?'

কেলুদা স্বাপারটা বুঁচিয়ে দিল :

'ইইচ ইয়ার ডিড ইউ সে ?'

'নাইনচিন ফার্টি এইট ?'

মিটার ম্যানিং তাঁর জায়গা হেডে উঠে পিছন দিকে গিয়ে একটা বইয়ের তাক থেকে বেশ বড় এবং খোটা একটা খাতা ধার করলেন। তারপর সেটাকে এনে ফেললেন তাঁর ডেকে।

আমরা চুপ করে দাঢ়িয়ে আছি, ভদ্রলোক খাতার পাতা উলটিয়ে একটা বিশেষ প্যান্ডা এসে চশমার ওপর দিয়ে কেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'হোয়াট নেন ডিড ইউ সে ?'

'আই হ্যান্ডেট কোঙ্গ ইউ ইয়েট', বলল মেলুদা। 'দ্য মেম ইঞ্জ ম্যান্মদার, অ্যান্ড দ্যা ফার্স্ট নেম ইঞ্জ রাজন।'

'ম্যাঞ্জুমডা, ম্যাঞ্জুমডা', নামের তালিকার ওপর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বিড়বিড় করতে লাগলেন মিটার ম্যানিং।

হঠাৎ আঙুলটা এক জায়গার এসে থেমে গেল।

'ইয়েস আর, ম্যাঞ্জুমডা', বললেন মিটার ম্যানিং।

'ওর সঙে কি পিটার ডেক্সট্রের বলে কেউ পড়ত ?'

'ডেক্সট্র...ডেক্সট্র...নো, নো ডেক্সট্র ইন দ্য সেম ক্লাস।'

'আই সি।' কেলুদার বুক্স স্কুচকে গেছে। বলল, 'যদি অনুগ্রহ করে ফার্ট নাইনচিন একটু দেখে দাও। হ্যাতো পিটার ডেক্সট্রের পরের বছর এসেছে।'

দুঃখের বিষয় ফার্ট নাইনের খাতাতেও পিটার ডেক্সট্রের নাম পাওয়া গেল না। অর্থাৎ এখানে আর আমাদের ধাকার কোনও মানে হয় না।

'খ্যাক ইউ ভেরি ডেরি মাচ', বলল কেলুদা। 'ইউ হ্যাত বিন মোস্ট হেল্পযুল।'

ট্রেনে আসতে আসতে কেলুদা বলল, 'কেন্দ্রিয়ে গিরে খোজ করলেই ডেক্সট্রের নাম পাওয়া যাবে। কিন্তু তা ও আমাত মনে হজিল যে এখানেও কাগজে একটা কিন্তাপন দিলে মন হত না।'

'কী বিজ্ঞাপন ?' জিঙ্গেস করলেন জাটায়।

'টাইমসের পার্সেন্যাল কলামে দেব। নরফেসকের পিটার ডেক্সট্রের সহকে

কানও কোনও ইনকরামশন থাকলে সে যেন অমুক হোটেলের অমুক ঘরের অমুক ব্যক্তির সঙে যোগাযোগ করে ?

‘এতে কী ক্ষম হতে পারে বলে আপনি অশা করছেন ?’

‘কীসে ফল হল আব কীসে না হল সেটা তো সব সব আগে থেকে বলা যাবে না ; কেমনিজের তালিকায় নাম পেলে তো কখু নামটাই পাওয়া যাবে ; লোকটা সবকে তো কিছু জানা যাবে না । নিয়েই দেখি না একটা বিজ্ঞাপন ।’

‘কিন্তু সে তো বেরোতে বেরোতে তিন-চার দিন লেগে যাবে ?’

‘দু দিনের বেশি সময় লাগাব কথা না । একটা দিন যদি কাঁক পাই তা হলে সেদিন আমরা খণ্ডন দেখব । এনামে দেখাব জিনিসের কি অভাব আছে ? মাদাম তুমোর নাম বলেছেন ?’

‘ম্যাডাম ট্রিস্ট ?’

‘আপনার উচ্চারণে তাই ।’

‘যেখানে বিখ্যাত লোকদের গোমের প্রতিকৃতি আছে তো ?’

‘ইন্স স্যার । অবশ্য স্মৃতিব্য । তারপর আর্ট প্যালেসিভলো আছে, পার্লামেন্ট হাউসে বিগ বেন আছে, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল আছে—কত চাই ? হেঁটে হেঁটে আপনার পায়ের গোড়ালিভে ফোকা পড়ে যাবে । অথচ এঙ্গলো না দেখলে দেখা হল বল্য চলে না ।’

‘আপনার বিজ্ঞাপনটা কবে দিবেন ?’

‘আজই এক ঘণ্টার মধ্যেই । পরত বেরিয়ে যাবে ।’

‘তা হলে কালকের দিনটা আমরা শহর দেখছি ?’

‘ইং ।’

মাদাম তুমো (ফেলুদার উচ্চারণে) দেখে তাক লেপে গেল তিকই । অত্যেকটা হরের দরজার সামনে পোর্টের দাঢ়িয়ে আছে এমনভাবে যে সেগুলোকেও দেখলে মনে হয় হোমের তৈরি । তারপর চেম্বার অফ ইন্সেন্স—সত্ত্বিহ গায়ে কাঁটা দেয় ।

মিউক্সিয়ম দেখাব পর বাইরে বেরিয়ে আমরা ফেলুদাকে অনুসরণ করে চললাম । এবারে কোথায় যাচ্ছে সেটা আছে থেকে কিছুই বলল না ।

ওখানকার অনেক রাস্তার নাম বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে । একটুক্ষণ চলার পর সেইরকম একটা ফলক চোখে পড়ার ব্যাপারটা এক ঝালকে বুঝে নিলাম । রাস্তার নাম বেকার প্রিট । ২২১ বি বেকার প্রিটে যে শার্লক হোমসের বাড়ি সে কে না জানে ? ওই নথরে যদিও সত্তি) করে কোনও বাড়ি নেই । কিন্তু কাছাকাছি নথরে তো আছে । ফেলুদা সেইরকম একটা বাড়ির সামনে দাঢ়িয়ে গঁথীর গলায় বললে, ‘তুম, তুম ছিলেই আমরা আছি । আজ আমার জন্ম আসা সার্থক হল ।’

বিশেষ গাঁথ সাহিত্য যত চরিত্র সঞ্চি হায়েছে, তাৰ মধ্যে খ্যাতিতে যে শার্লক

হোমস মারার ওরাম সেটা ফেলুন্দা অনেকবার বলেছে। কল্যাণ ডয়েল একটী গল্প তিনি হোমসকে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাবলিক অ্যায়সা হন্দা করে যে ডয়েল বাধা হয়ে হোমসকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

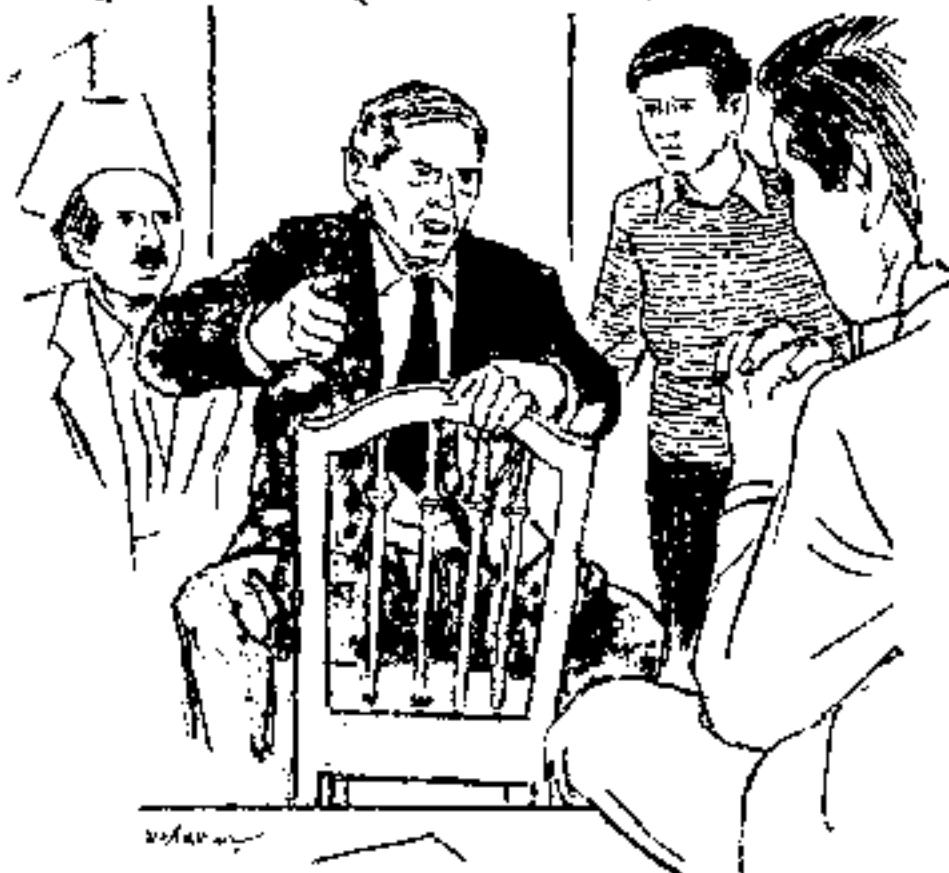
বেকার দ্রিটে না এলে লক্ষ দেকা সম্পূর্ণ হত না এটা বুঝতে প্যারলাম।

॥ ৮ ॥

মুদ্দিন পরে অর্ধাং রবিবার, টাইমসে ফেলুন্দার বিজ্ঞাপন বেরোল। আর আন্তর্য ব্যাপার—তার প্রদিনই বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া গেল। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ফেলুন্দার ফোন বেজে উঠল। মিনিটব্যনেক কঢ়া কলে ফেলুন্দা ফোনটা রেখে বলল, 'অত্যান্ত রুক্ষ মেজাজের লোক। নাম আর্চিবল্ড ক্রিপস। বলল ওর কাছে পিটার ডেজ্ঞাটেরের ব্বব আছে। আধ মণ্টোর মধ্যেই এসে যাচ্ছে শোকটা। বগড় হতে পারে। তুই লাগমোহনবাবুকে ব্বব দে।'

লালমোহনবাবু তৈরি ছিলেন, এসে বললেন এত ভাড়াতাড়ি যেজান্তি পাওয়া যাবে সেটা উনি ভাবতেই পারেননি।

সোমা নটার সময় দুরজায় টোকা পড়ল। যদু নয়, বেশ জোরে। আমি দুরজা খুললাম। রুক্ষ গলার সঙ্গে মাননেসই রুক্ষ চেহারাওয়ালা একজন অদুলোক তুকে এলেন। তার দৃষ্টি প্রথমে গেল জটিয়ুর দিকে।



‘আর ইউ মিটার মিটার?’

‘মো না। হি, হি।’

শালয়োহন্দারু ফেলুদার দিকে দেখিয়ে দিলেন। ক্রিপস সাহেব একটা চেমার টেবে এনে তাতে বসে ফেলুদার দিকে কঠোর দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘হোমাট ভু ইউ ওয়াট টু নো আবাইটি পিটার ডেজ্বটর?’

‘প্রথমত, সে এখন কোথায়?’

‘হি ইজ ইন হেলন।’

‘তার মৃত্যু হয়েছে তবে আমি দুঃখিত। করে হল?’

‘আজ নয়। অনেক বল আগে। হোমেন হি ওয়াজ ইন কেম্প্রিজ।’

‘তিনি কেম্প্রিজে পড়তেন?’

‘হ্যাঁ, আর মূর্খের মতো ক্যাম নদীতে নৌকো চালাতে গিয়েছিল।’

‘মূর্খের মতো কেন?’

‘কারণ ও সাঁতার খানত না। নৌকো উলটে গিয়ে জলে পড়ে তার মৃত্যু হয়।’

‘তোমা তানেছি অনেক ভাইবান ছিলেন।’

‘ফাইভ ক্রার্ড অ্যান্ড টু সিস্টারস। তার মধ্যে তিনি দু’জনের খবর জানি—
বড় ছেলে জর্জ ও’ব্রে ছেট ছেলে রেজিন্যার্ড। জর্জ অর্মিতে ছিল, ইন্ডিপেন্ডেন্সের
পুর এবানে চলে আসে। বলত শিখ আর ওর্ধা ছাড়া ও দেশের সবাই হয়
বদ্যাইশ না হয় অকর্মণ। ডেজ্বটরদের কেউ-ই ইন্ডিয়ান নিগারদের পছন্দ করে
না।’

‘নিগার, নিগার তো ক্ষারতবর্ষে নেই। ইন ফ্যাটি, অমেরিকাতেও আজকাল
নিয়েদের আর কেউ নিগার বলে না।’

ফেলুদার মুখ গঞ্জির : বলল, ‘আপনার কথা তবে মনে হচ্ছে ভাবতীয়দের
স্বরকে আপনার খারগাও ডেজ্বটরদের মতোই।’

‘তা তো বটেই। একশোবার।’

‘তা হলে আপনার কাছ থেকে আর কোনও ইনকরিমেশন আবি চাই না।
যেটুকু দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।’

এই গরম কথাগুলো তবে ক্রিপস সাহেব যেন একটু নরম হলেন। বললেন,
‘আই অ্যাম সরি ইফ আই হ্যাত অফেভেড ইউ। রেজিন্যার্ডের কথাটা বলেই
আমি উঠেছি। রেজিন্যার্ড তদের ছেট ভাই। সে ইন্ডিয়াতে একটা চা বাগানে
আছে, কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।’

ফেলুদা তেজেই রয়েছে ক্লিনেকের দিকে, মুখে কিছু বলেছে না।

‘বিকজি হি হ্যাজ ক্যানসার’, বলে চললেন ক্রিপস। ‘ও গিয়েছিল তিনি পয়সা
রোজগারের জন্য। জারতবর্ষের খপর ওর কোনও অমতা নেই।’

ফেলুদা উঠে দৌড়াল।

‘খাস্ত ইউ মিটার ক্রিপস। আমার আব কিন্তু জানাব প্রয়োজন নেই।’

ক্রিপসও কেহন যেন বোকা-বোকা ভাব করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ ‘গত ডে’ বলে স্টোন ধর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

‘কী জবন্য লোক হশাই’, দুরজা বক্স হবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন লালমোহনবাবু। ‘তবে আপনি লকনে বসে একজন সাহেবকে যেভাবে দাবড়ানি দিলেন, তার কোনও ফোবা নেই।’

‘ফাইছোক’, বলল ফেলুদা, ‘এর কাছ থেকে অন্তত একটা জরুরি তথ্য পাওয়া গেল। পিটার ডেঙ্গুটির কেম্ব্রিজে ছিলেন এবং মৌকাভুবি হয়ে মারা যায়।’

‘এখন কী করা?’

‘সময় হ’ব করে বেরিয়ে যাচ্ছে’, বলল ফেলুদা। ‘পরবর্ত জামাদের কেরান দিন, ভুলবেন না। আজই দুপুরে তাড়াতাড়ি লাঙ সেবে কেম্ব্রিজ যাও।’

আমরা দেঙ্গুটির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

পিকাডিলি সার্কাস থেকে প্রথম লিভারপুল ট্রিটে পিয়ে সেখানকার রেল স্টেশন থেকে সাধারণ ট্রেন ধরে দেখতে হয় কেম্ব্রিজে। পৌছতে পাঁচে এক ঘণ্টা। এখানে ট্রেন খুব স্বচ্ছ চলে, আর চড়েও আরাম কারণ কান্দাগো। অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।

সুন্দর শহর কেম্ব্রিজ, তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি দার্জিয়ে আছে তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে। পাশাপাশি অনেকগুলো কলেজ আছে—ফেলুদা বলল, আইশোটা—তবে নিশ্চান্তবাবু বলে দিয়েছিলেন রঞ্জন মজুমদার ট্রিনিটি কলেজে পড়তেন, তাই আমরা সেখানেই বেঁজ করলাম; জানা গেল যে ১৯৫১-তে রঞ্জন মজুমদার ইতিহাস পড়তে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং তার সঙ্গে একই ক্লাসে ছিল পিটার ডেঙ্গুটি।

‘এই পিটার ডেঙ্গুটির তো মৌকাভুবি হয়ে মারা যান?’ জিজ্ঞেস করল ফেলুদা। যে জন্মলোক আমাদের সাহচর্য করছিলেন—নাম মিটার টেলর—তিনি বললেন যে তিনি শাশ্বত বছর হল জয়েন করেছেন, কাজেই পরনো ঘটনা কিছুই জনেন না।

‘তবে এখানে একজন খুব পুরনো গার্ডনার আছে, চল্পিশ বছর হল এখানে কাজ করছে, নাম হ্রকিন্স। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।’

ফেলুদা বাগানেই হ্রকিন্সকে পাকড়াও করল। গায়ের চামড়া এখনও বেশ টান-টান, তবে চুল সাদা। তাও নিয়ি কাজ করে চলেছে।

‘তুমি এখানে অনেকদিন আছ, তাই না?’ ফেলুদা মোলায়েদ সুরে অশ্রু করল।

‘ইয়েস’, বলল হ্রকিন্স। ‘তবে আর বেশিদিন নয়, কারণ আমার রিটায়ারমেন্টের সময় এসে পেছে। আমার বয়স ক্ষেত্রে হল, কিন্তু এখনও

পরিশ্রম করতে পারি। আমার বাড়ি চাটাওয়ার্থ ট্র্যাক্ট—এখান থেকে দু' মাইল।
রোজ হেঁটে আসি, হেঁটে কিরি।'

'গাজদের সঙ্গে কোথার কীরকম সংপর্ক?'

'কুল ভাল। মে অল লাভ ছি। আমার সঙ্গে এসে গল্প করে, ঠাণ্ডা তামাল
করে, আমাকে সিগারেট দেয়, বিয়ার দেয়। জাই পেট অ্যালং ভেরি অ্যাল উইথ
সেম।'

'পুরনো ঘটনা মনে আসে তোমার শব্দগুলি কেমন?'

'হালের ঘটনা স্মৃতি যাই, কিন্তু পুরনো কিন্তু কিন্তু মনে আছে: অবিশ্য কল
পুরনো ভার ওপর নির্ভর করে।'

'মনটাকে চলিশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'হোয়াই!'

'তোমাদের এখানে ক্যাম নদীতে নৌকো চালাই না ছেপেরা!'

'ওধু ছেপেরা কেন, মেয়েরাও চালায়।'

'কোনও নৌকোভুবির ঘটনা মনে পড়ছে?'

ইকিমুস শাপা নেড়ে গলাটাকে ভারী করে বলল, 'ইউস এ স্যাড টোরি,
স্যাড টোরি। একটি ইংরেজ ছেলে, নাম মনে নেই। নৌকো উলটিয়ে জলে ডুবে
মারা যায়। সাঁতার জানতে না।'

'সে কি একাই ছিল?'

'একাই না বোধহয়। সবে বোধহয় আরেকজন ছিল।'

'ঠিক করে তেবে বলো তো।'

'অত দিন আগের কথা তো—তাই ভাল মনে পড়ছে না।'

'ওই ইংরেজ ছেলেটির একজন ভারতীয় বন্ধু ছিল না?'

'আই থিংক হি হ্যাত।'

'একটু চেষ্টা করে যদে করে দেখ তো—সেই ভারতীয় ছেলেটি ও নৌকোয়
ছিল কি না।'

'মে বি হি ওয়াজ—মে হি বি ওয়াজ...'

'ওই ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি একটা বোপের ধারে বসে বিশ্রাম করিলাম। হয়তো দিগ্নারেট
খালিসার।'

'ঘটনাটা তুমি দেখেছিলে?'

'হেল্প-হেল্প চিৎকারে উনে আমি, নদীর ধারে যাই। নিয়ে দেবি এই
কাষ।'

'তা হলে তো তোমার মনে থাকা উচিত নৌকোতে আর কেউ ছিল কি
না।'

হাকিন্স মাথা হেঁট করে যেন তাৰুৰ চেটো কুৰজ। তাৰুৰ বলল, 'মাঝ—
এৰ বেশি আৱ যানে কৰতে পাৰছি না। আই আয়ম সৱি। এইটুকু যে যানে আছে
তাৰ একটা কাৰণ ওই একই দিনে আমি বিয়ে কৰি। যাপি। দা বেষ্ট ওফাইফ
ওয়ান কুড় হ্যাত।'

॥ ৯ ॥

টাইমসের বিজ্ঞাপনের ফল যে মিট্টিৰ ক্রিপ্স-এৰ আসাতেই শেষ হয়ে পেল
তা সব। কেম্প্রিজ যাবাবে পৰদিলই কেগুনা টেলিফোন পেল এক ভাৱতীয়
ভদ্ৰলোকেৰ বললেম পিটাৰ ডেক্সট্ৰ সংস্কৰণ কিছু তথ্য তিনি দিতে পাৰেন। 'আমি
এগাবোটা নাগাদেৰ হোটেলে পৌছতে পাৰি।'

'পুৰু ভাল কথা', বলল কেগুনা, 'চলে আসুন।'

সত্যনাবন কথা মাত্তে ওলেন। বেশ গাঢ় কালো রঙ, মাথাৰ চুল একেবাৰে
সাদা একটা চেৱাবে বসে বললেন, 'বিজ্ঞাপনটা পঞ্জীয় আপনাৰ সঙ্গে থেগোযোগ
কৰব ভেবেছিলাম, কিছু কয়েকটা কাজে একটু আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি জন্মনেই থাকেন?'

'না। কিলবাৰ্নে। এখান থেকে বেশি দূৰ নহ। ওখালে একটা ইঞ্জুলে মাটোৱি
কৰি। পিটাৰ ডেক্সট্ৰেৰ সঙ্গে একসঙ্গে আমি কেম্প্রিজে ছিলাম।'

'তাৰ মানে বন্ধন মজুমদাৰও আপনাৰ সহপাঠী ছিল?'

'তা তো বটেই।'

'তাকে যানে আছে?'

'স্পষ্ট। পিটাৰেৰ দুব বন্ধু ছিল। অবিশ্য দুজনেৰ মধ্যে বংগড়াও হত
পায়ই।'

'কী নিয়ে?'

পিটাৰ ভাৱতীয়দেৱ একেবাৰে পছন্দ কৰত নহ। বন্ধনকে দেখে একেবাৰে
সাহেব বলে মনে হত, তাই পিটাৰ তাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নৈয়। বলত— ইউ
আৱ নট ইংলিয়ান, ইউ আৱ হফ ইংলিশ।'

'আপনাৰ সঙ্গে পিটাৰেৰ কীৰকদ সংস্কৰ্ক ছিল?'

'আমাৰ নায়েৰ রঙ তো দেখতেই পাইছেন। আমাকে লে দহৰাৰ ডার্টি নিগাৰ
বলে সংৰোধন কৰেছে। আমি দ্যাপাৰটা হজার কৰে নিভাই।'

'পিটাৰেৰ মৃত্যুৰ কথা মনে আছে?'

'তা থাকবে নাঃ এমন কী দিনটাৰ মনে আছে—হাইট-সন্দেৱ আগেৰ দিন।
পিটাৰ যখন সাঁতাৰ জানত না তখন ওৱ লৌকোয় চড়া অত্যন্ত ভুল হয়েছিল।'

'ওৱ সঙ্গে আৱ কে ছিল?'

'জন।'

‘সে বিষয় আপনি নিশ্চিত?’

‘অ্যাবসোলিউটলি। রঞ্জনের সর্বাঙ্গে অলে ভেজা চেহারাটিৎ এখনও আমার চেবের সামনে ভাসে। আমি শখন আমার মুখে ছিলাম। আমাদের মালি হকিলসের চেচামেচিতে বাইরে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপারটা জানতে পারি। রঞ্জন তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে জলে বাঁপিয়ে পড়ে। বাই ইট ওয়জ টু সেট। রেজিনাল্ডও চেষ্টা করেছিল দাদাকে বাঁচাতে, কিন্তু পারেনি।’

‘পিটারের পরের ভাই?’

‘হ্যাঁ। সে আমাদের পরের বছরই কেম্ব্ৰিজে ভর্তি হয়। সেই একই ছাতে ঢালা। ভাৰতীয়দের সঙ্গে আয়ই হাতাহাতি লেগে যেত। অনেকবাব ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। রেজিন্যাসের ধারণা হিস রঞ্জন ইচ্ছা করলে পিটারকে বাঁচাতে পারত। এই কথা সে সারা কলেজে বলে বেড়াত—“হি ডেলিবাৰেটলি লেট হিম স্নাইন।”

‘রঞ্জন মনুমদার তো এক বছরের বেশি কেম্ব্ৰিজে পড়েনি?’

‘না। একটা বাইসিক্স অ্যাঞ্জিলেটের পৰ সে দেশে ফিরে যায়।’

কথা শেষ, তাই সত্যনাথন উঠে পড়লেন। তাঁর কাজ থেকে একটা মৃগ্যবান তথ্য জানা গেল—নৌকোতে পিটারের সঙ্গে রঞ্জন ছিলেন, আৱ তিনি বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা করে পারেননি।

সত্যনাথন চলে যাবার পৰ থেকেই লক্ষ্য কুলুম ফেলুদার ভুক্টা কুঁচকে গেল। লাঙু খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনাকে যেন ডিস্ট্রিক্টসফারেড বলে মনে হচ্ছে। কাৰণটা জানতে পারি কি?’

‘একটা ব্যাপারে বটকা লাগছে।’

‘কী?’

‘মনে হচ্ছে হকিলস যা বলেছে তাৰ চেৱে বেশি ও জানে এবং তাৰ মনে আছে: কোনও একটা কাৰণে তথ্য চূকিয়ে যাচ্ছে।’

‘তাৰ হলো কী কৰবেন?’

‘আৱেকবাৰ কেম্ব্ৰিজ যাওয়া দুৰকাৰ। এবাৱে হকিলসেৱ বাড়ি যান্তাৰ নামটা ও বলেছিল। মনে আছে, তোপসো।’

‘হলে ছিল। বলগাম, ‘চ্যাটওয়ার্থ ট্ৰাইট।’

‘ভেবি ওড। কেম্ব্ৰিজ গিয়ে যান্তাৰ একটা পুলিশকে জিজেস কৱলেই নাজলিয়ে দেবে। এটাও জেনে রাখুন, লালমোহনবাবু—এখনকাঠ পুলিশ, যাকে এবাব বলে “বলি”—এদেৱ হেল্পফুল পুলিশ পৰিবীতে আৱ কোথাও নেই।’

লাঙুৱেৰ পৰ ফেলুদা বলল তাৰ একটা কাজ আছে, ও একটু বেৱোবে। এ ফিৱলে তাৱপৰ আমৰা কেম্ব্ৰিজ যাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেম্ব্ৰিজেৱ ট্ৰেন হাজুড়—কোনও অসুবিধা নেই।

সাড়ে তাৰটায় রওনা হয়ে আমৰা ধৰন কেম্ব্ৰিজে পৌছলাম, তৰন বান্তাৰ

বাতি ভুলে গেছে। আবরা একটা বড় রাত্তা ধরে এগিয়ে একটা পুলিশের কাছে গিয়ে হাতির হলাম।

‘চ্যাটওয়ার্থ ট্রিট কোথায় বলতে পার?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। পুলিশ আয় কাগজে নকশা আঁকার মতো করে বুঝিয়ে দিল।

আগলে চ্যাটওয়ার্থ ট্রিট পৌছতে। এটাকে গলি বললেই চলে, দেখে বোবা যায় যে খুব অবস্থাসম্পর্ক লোকদের পাড়া নয়। একটা বাতির সামনে একজন লোক রাত্তা থেকে একটা বেড়ালকে তুলে তোলে দিল। তাকেই ফেলুদা জিজ্ঞেস করল হকিন্স কোন বাতিতে থাকে।

‘ক্রেড হকিন্স?’ তদন্তোক বললেন। ‘নাথার শিশুটিনি।’

এখানে সব বাতির বাইরেই নম্বর লেখা থাকে, তাই বোলো কুঁজে পেতে সময় লাগল না। এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতে হকিন্স নিজেই দরজা বুলল।

‘গুড ইভিনিং, বলল ফেলুদা।

আমাদের দেখে হকিন্সের মুখ হ্যাঁ হয়ে গেছে। ‘সে কী—তোমরা আবার...?’

‘একটু ভিতরে আসতে পারিঃ’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।’

হকিন্স এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের চেকবার জায়গা করে দিল। আমরা তিনজনে মুক্তলাম। এটাই বসবার ঘর, যদিও আয়তনে খুবই ছেট। আমরা দুটো চেয়ারে আর একটা সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম।

‘ওয়েলা?’

ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি দিলে হকিন্স।

‘তোমাকে দু’ একটা তাৰ বেশি তে আৱ কিন্তু জানি না।’

‘আমি নতুন প্রশ্ন কৰব।’

‘কী?’

‘মিষ্টার হকিন্স, যে নৌকো ধীৰে চলছে, তাতে কেউ নসা অবস্থায় জলে পড়ে যেতে পারে এটা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?’

‘যদি ঘড় থাকে তা হলে নৌকো নিশ্চয়ই উলটে যেতে পারে। সেয়ার ওয়জ এ হাই উইক্স দ্যাটি তে।’

‘আমি আজই দুর্ঘটনার পরের দিনের ঘবরের কাগজ দেখেছি। তাতে পিটার ডেম্বিটারের মৃত্যু সংবাদ আছে, কিন্তু ঘড়ের কোনও ঘবর নেই। ওয়েদার রিপোর্ট বলছে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৩৫ মাইল। সেটাকে কি ভুলি হাই উইক্স বলবে?’

হকিন্স চুপ। আর একটা টেবিল ত্রুকের টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ফেলুদা বলল, ‘আমার ধারণা তুমি একটা কিন্তু লুয়েক্স। সেটা কী দয়া করে বলবে?’

‘এতদিন আগের ঘটনা...’

‘কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে দু’জনকে নিয়ে ঘটনা, তার মধ্যে একজন
তো তোমার বেশ কাছের লোক ছিল বলে মনে হচ্ছে।’

হুকিন্স ফেলুদার দিকে চাইল। বেশ বোকা যালে যে তার দৃষ্টিতে সংশয়
ঘনিয়ে আসছে।

‘হোয়াট ডু ইউ মিম?’

‘তোমার শেলকে আমি অনেকব্যবহার করে জিনিসের মধ্যে একটা পিতলের গণেশ
আর একটা আইভরির বুঁদি দেখতে পাইছি। উভয়ে কী করে পেলে জানতে পারি
কি?’

‘রন দিয়েছিল আমাকে।’

‘রন মানে বোধ করি রঞ্জন।’

‘ইয়েস তুকে আমি রনও বলতাম, জনও বলতাম।’

‘আই সি। এবার একটা কথা বলো—পিটারের হেল্প হেল্প চিকারের
আগে তুমি ওদের কোনও কথা শোনেনি। ইতিয়ান গড়দের সামনে মিথ্যা কথা
বলা কিন্তু মহাপাপ।’

‘কী কথা বলছিল বুঝিনি—আই খনলি হার্ড দেয়ার ভয়েসেস।’

‘তার মানে ওয়া বেশ জোরে কথা বলছিল?’

‘পারহ্যাপস...পারহ্যাপস...’

‘আমার কী বিষ্ণাস জান?’

হুকিন্স আবার ফেলুদার দিকে দেখল।

‘হোয়াট?’

‘অঘাত বিষ্ণাস ওদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। পিটার দাঁড়িয়ে উঠেছিল,
আর—’

‘ইয়েস, ইয়েস।’ হুকিন্স হঠাতে বলে উঠল। ‘আর ও রনকে আক্রমণ করতে
ধায়, আর টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়।’

‘তার মানে পিটার তার মৃত্যুর জন্য নিজেই দায়ী?’

‘অফ কোর্স।’

‘তোমাদের এই যে ক্যাম নদী, আমাদের দেশে এটাকে বলে কেন্যাল। এতে
একটা লোক সার্বভার না জননেও এত সহজে ডুবে যেতে পারে—বিশেষ করে
যখন তাকে একজন বাঁচাকার চেষ্টা করছে।’

‘ডুবল যে সে লো চোরের সামনে দেখলাম।’

তুমি এখনও সত্যি কথা বলছ না, মিটার ইকিন্স। আই ওয়াট দ্য ট্রি-ব।
আমি এত দূর থেকে এসেছি তবু এই ট্রি-থের সম্মান। পিটার কেন এত সহজে
ডুবে গেল?’

হুকিন্সকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে সে জন্মেই কোণ্ঠাসা হচ্ছে।

এবাব সে হঠাৎ পড়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি বলছি কেন পিটার তুবে থায়। তার কারণ ত যখন জনে পড়ে তখন ওর জ্ঞান ছিল না।'

'জ্ঞান ছিল না!'

ফেনুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে হকিন্সের দিকে। তারপর চাপা হতে বলল, 'বুঝেছি। নৌকো বাইছিল রঞ্জন তাই নাঃ'

'ইয়েস।'



'তার মানে তার হাতে দাঁড় ছিল।'

'ইয়েস।'

'অর্থাৎ একটা অস্ত্র ছিল, যেটা দিয়ে সে পিটারকে আঘাত করে। তার ফলে পিটার সংজ্ঞা হারিয়ে ছলে পড়ে থায়। অর্থাৎ সে কোনও স্ট্রাগলই করেনি। আর রঞ্জন যে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল সেটা একটা অভিন্ন। অর্থাৎ রঞ্জনই পিটারের মৃত্যুর জন্ম দায়ী।'

হকিন্স মাথা চাপড়ে বলল, 'আমি তোমাদের আঘাত দিতে চাইনি। তাই সত্য পোপন করছিলাম। রঞ্জনের জায়গায় আমি থাকলে আমিও ওবই যতে করতাম। পিটার ওকে অশ্রুবা ভাবায় গাল দিচ্ছিল। বসছিল তোমার চামড়া স্যান্ডেলে কী হবে, আঁচড় ঝ্যাক লেটিভ। এতে কার মাথা ঠিক থাকে বলো!'

'তুমি হাতুড়া এই ঘটনার সাক্ষী আর কেউ ছিল?'

'ইয়েস। তবলি ওয়াল।'

‘কে?'

‘রেজিনাকে।'

‘রেজিনাকে ডেক্টর?’

‘আমরা দু’জন একসঙ্গেই বসে সিগারেট খাচ্ছিম। সমস্ত ঘটনাই আমরা দু’জন একসঙ্গে দেখি। পরে আমি রনকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম পিটের রনকে আক্রমণ করতে গিয়ে জলে পড়ে যায়। এদিকে রেজিনাকে অনবরত সত্ত্ব ঘটনাটা বলে বেঢ়াচ্ছিল। মৌতাগ্যক্রমে সকলেই জানত যে রেজিনাকে ইতিবাচকন্দের ঘৃণা করে, তাই তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। খ্যাক গড় ফর দ্যাট—জন ওয়জ সাচ এ জাইল বয়, সো জেনারেল, নো কাইভ।'

‘এ ব্যাপারে তদন্ত ইয়নি? ইনকুফেষ্ট ইয়নি?’

‘হয়েছিল বইঝী।'

‘তুমি সাক্ষী দিয়েছিলে?’

‘ইয়েস।'

‘মিথ্যে সাক্ষী তো?’

‘তা বটে। আই ওয়জ ডিউরিনিং টু সেভ রঞ্জন। সেও অবশ্য সাক্ষী দিয়েছিল। আমি যা বলেছিলাম, সেও তাই বলেছিল।'

‘আর রেজিনাকে? সে সাক্ষী দেয়নি?’

‘হ্যাঁ—এবং সে সত্ত্ব ঘটনাই বলেছিল। তবে তাৰ কথায় ভাৱতীয় বিষ্ণুৰ এত প্রকাশ পাচ্ছিল যে জুবি তাৰ কথা বিশ্বাস কৰেনি। তাৰ রায় দিয়েছিল ডেখ বাই অ্যাক্সিজেন্ট।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

‘খ্যাক ইউ মিষ্টার হকিন্স। আমাৰ আৱ কোনও প্ৰশ্ন নেই।

হোটেলে ফিরলাম ডিনারের ঠিক আগে। রিসেপশন থেকে ধৰতে চাৰি নিছি, এবন সহয় একজন কৰ্মচাৰী ফেলুদার দিকে চেয়ে বলল, ‘মিষ্টার মিটার্স।’
‘ইয়েস।’

‘তোমাৰ একটি টেলিগ্ৰাম আছে।’

ফেলুদা টেলিফ্যামটা নিয়ে খুলে পড়ল। পাঠিয়েছেন রঞ্জন মজুমদাৰ। তিনি বলছেন—‘ক্যান রিকল এভৱিভিং: রিটাৰ্ন ইমিডিয়েটলি।’

‘পাৰকেষ্ট টাইমিং’, বলল ফেলুদা। ‘এখানেৰ মামলা শেষ, কাল অমাদেৱ রিটাৰ্ন বুকিং, আৱ মিষ্টার মজুমদাৰেৰ স্থূতি ফিৰে আসেছে।’

প্ৰেনেই ফেলুদা বলেছিল যে দমদম থেকে সোজা মিষ্টার মজুমদাৰেৰ বাড়ি যাব। আমৰা কলকাতায় পৌছাপৰি দুপুৰ একটা পঁচে।

মনে গভীৰ উৎকষ্ট। রঞ্জনবাবু জানেন তিনি খুন কৰেছিলেন, এবন তিনি কী কৰবেন?

আমাদের ক্ষেত্রের ভারিখ আর সময় আগে থেকেই জানা ছিল, তাই শালমোহনবাবুর গাড়ি এয়ারপোর্টে হাজির ছিল ।

বোল্যাভ রেডে পৌছে বুকটা ধরে করে উঠল । রঞ্জনবাবুর বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি কেন ?

গাড়ি থেকে নেহে গেটের ডিতর চুক্তেই আমাদের চেনা ইনস্পেকটর মঙ্গল গঞ্জির মুখে এগিয়ে গেলেন ।

‘আজ সকাল আটটায় ব্যাপারটা ঘটেছে ।’

‘কী ব্যাপার ?’ ফেলুদা জিজেস করল ।

‘মিষ্টের মঙ্গুমদার চুন হয়েছেন । সকালে নাকি একজন সাহেব এসেছিল তার সঙে দেখা করতে । সে কে তা জানা যায়নি । আপনি কোনও এনকোয়ারি করবেন ?’

‘না ।’

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় শালমোহনবাবু এসে হাজির । জনসাক অত্যন্ত উৎসুকিত ।

‘পাঁচ মুহূরের পাত্রে খবরটা দেবেছেন ?’

‘কোন কাগজ ?’ ফেলুদা জিজেস করল ।

‘স্টেলসম্যান—আবার কোন কাগজ ?’

‘না, এখনও দেবেনি ।’

‘প্রথম পাতায় তো মঙ্গুমদারের খবরটা রয়েছে—এবার পাঁচের পাতা দেবুন ?’

ফেলুদা কাগজটা দিয়ে পাঁচের পাতা খুললে । ‘নীচে বাঁ দিকে’, বললেন জটায় ।

খবরটা বাঁ করে ফেলুদা পড়ে শোনাল । তার বাংলা করলে এই দাঢ়ায়—

। হোটেলে আস্তহন্ত্যা ।

সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে গতকাল রাতে কলির আওয়াজ পেয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায় সাত নম্বর ঘরে একটি সাহেব মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন । তার হাতে রিম্বলভার । হোটেলের খাতা থেকে জানা যায় সাহেবের নাম রেজিন্যান্ড ডেন্টের । ইনি এসেছিলেন দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী ধনরাজবাড়ি জা বাগান থেকে ।



ডাঃ মুনসীর ডায়রি

Pradosh C. Mitter

Private Investigator



ডাঃ মুনসীর ডায়রি

আজ চায়ের সঙ্গে চানাচুরের বদলে সিজাড়া। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই বলছেন, 'খাই-খাই' বলে একটা মোকাব হয়েছে মশাদ, আমার বাড়ি থেকে শাফ-এ-মাইল, সেখানে দুর্দান্ত সিজাড়া করে। একদিন নিয়ে আসব।' আজ সেই সিজাড়া এসেছে, আর লালমোহনবাবুর কথা যে সত্যি, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

'সামনের বৈশাখে আপনার যে বইটা বেরোবে তার ছক কাটি হয়ে গেছে?' ভিগোস করল ফেলুন।

'ইয়েস স্যার! কম্পুটিয়ায় কম্পিউন। এখার দেখবেন প্রথম ক্লিয়ের হাবভাব কায়দাকানুন অনেকটা ফেলু মিত্রের মতো হয়ে আসছে।'

'অর্থাৎ সে আরো প্রথম হয়ে উঠেছে এই তো?'

'তা তো বটেই।'

'গোয়েন্দার ইমপ্রুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তাও ইমপ্রুভ করছেন নিশ্চয়ই।'

'এই ক'বছর সমানে যে আপনার আশেপাশে ঘূর ঘূর করছি, তাতে অনেকটা বেনিফিট যে পাওয়া যাবে সেটাতো আপনি অবীকার করবেন না?'

'সেটা মানব যদি আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন।'

'কী পরীক্ষা?'

'পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা। বলুন তো আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছেন কিনা। আপনিতোগতকালও সকালে এসেছিলেন; আজকের আমি আর গতকালের আমির মধ্যে কোনো তফাত দেখছেন কি?'

লালমোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মিনিটখানেক ফেলুন্দাকে আপাদমশুক স্টাডি করে বললেন, 'কই, নাতো! উহ। নো ডিফারেন্স। কোনো

তত্ত্ব নেই।'

'হল না। কেল। অতএব পথের কষণ ফেল। আপনি আসার দশ মিনিট
আগে আমি প্রায় এক মাস পুরো হাত আর পায়ের নব কেটেছি। কিন্তু ইদের
চাঁদের মতো হাতের নব একবার মেঝেতে পড়ে আছে। ওই মেঘুন।'

'ভাও তো!'

লালমোহনবাবু কিন্তু কলের অন্ত বালিকাটা নিষ্পত্তি হয়ে ইঠাং ফেলুনোর দিকে
চেতে বললেন, 'তোরি ওয়েল; এবার আপনি বনুনতোমেরি আধাৰ মধ্যে কী চেষ্ট
লক্ষ কৰছেন।'

'বলব ?'

'বনুন ?'

কেলুনা চাঁদের আলি কাপটা টেবিলে রেখে চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে
বলল, 'নামুর ওঘান, আপনি কাল অবধি লাঙ ট্যালেটি সোপ বাধার করেছেন;
আজ সিংহলের গুৰু পারি। গুৰু সংস্কৃত টি. ডি. র বিজ্ঞাপনের চটকের ফলে।'

'চিক বলেছেন মশাই। এনিধিং এলস ?'

আপনি পাঞ্জাবীর বোতাম সব কটাই লাগিয়ে থাকেন; আজ অনেকদিন পর
মেখছি ওপরেরটা খোলা। নতুন পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগাতে অনেক সময় বেশ
কসরত কৰতে হয়। ওপরেরটায় সেই কসরতে কোনো ফল হয়নি নালে যনে
হচ্ছে।'

'মোকম বলেছেন ?'

'আজো আছে।'

'কী ?'

'আপনি গোজ সকালে একটি করে বনুনের কোয়া চিবিয়ে থান; সেটা আপনি
বরে এলেই বৃক্ষতে পারি। আজ পারছি না।'

'আর বলবেন না। ভুবনেশ্বর এমন কথারলেস। নিয়েই কড়া করে ধমক।
এইটিসির থেকে বনুন ধরিচি মশাই, সকালে ডেইলি এক কোয়া। আমাৰ
সিসটেমেই—'

জটায়ুর বনুনের পুণকীর্তন কমাতে হল, কাৰণ কলিং বেল বেজে উঠেছে।
দৱজা তুলে দেবি কেলুনাৰই বয়সী এক ভদ্রলোক।

কেলুনা উঠে দাঁড়াল।

'আসুন—

'আপনিই তো ?'

'আমাৰ নাম প্ৰদোৰ বিজি।'

ভদ্রলোক সোজায় বসে বললেন, 'আমাৰ নাম শক্তি মূলসী। আমাৰ বাবাৰ

নাম হয়ত আপনি কলে থাকবেন, জানতাম রাজেন মুন্সী।'

'সাইক্যাট্রিপ্ট ?'

আমি জানতাম যারা মনের ব্যাকামের চিকিৎসা করে তাদের বলে সাইক্যাট্রিপ্ট।

'সেদিনই ব্যবরের কাগজে উর বিষয় একটা খবর পড়লাম না ? একটা ষষ্ঠিও তো বেরিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন', বললেন শঙ্কু মুন্সী। 'গত চারিশ বছর ধরে উনি একটা ডায়বি লিখেছেন, সেটা পেন্সুইন ছাপছে। আপনি হয়ত জানেন না। বাবার মনোবিজ্ঞানী হিসাবে সুনাম আছে ঠিকই, কিন্তু আরেকটা ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। সেটা হল শিকারু। পাঁচিশ বছর আগে শিকারু ছাড়লেও, এই ডায়রিতে তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতার বর্ণনাও আছে। পেন্সুইন এখনো লেখাটা পড়েনি; সাইক্যাট্রিপ্ট শিকারীর ডায়বি উনেই ছাপার অস্তাব দেয়। তবে সেখানে হিসেবে যে বাবার সুনাম আছে সেটা তারা জানে। মনোবিজ্ঞান সমষ্টির ইতিহাসিতে সেখা বাবার অনেক প্রবক্ষ নামান পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে।'

'ব্যবরটা কি আপনাবাই কাগজে দেন ?'

'না, ওটা প্রকাশকের তরফ থেকে বেরোয়।'

'আই সী !'

'যাই হোক, এবার আসল ব্যাপারটায় আসি। বাবার গর্ব হচ্ছে যে এ ডায়রিতে তিনি একটিও মিথ্যা কথা লেখেননি। তিনজন লোককে নিয়ে তিনটি ঘটনার উৎস আছে ডায়রিতে। যাদের পুরো নামটা ব্যবহার না করে বাবা নামের প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করেছেন। এই অক্ষর তিনটি হল "এ", "জি", আর "আর"। এবং তিনজনেই আজ সমাজে সম্মানিত, সার্কেসফুল ব্যক্তি। কিন্তু তিনজনেই, বেশ অনেককাল আগে, তিনটি অত্যন্ত গাহিত কাজ করেন, এবং তিনজনেই নামান ফিকিরে আইনের হাত থেকে রেহাই পান। যদিও পুরো নাম ব্যবহার না করার দরকার আইনের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবুও প্রকাশকের কাছ থেকে অকান্ত পাবার পর বাবা তিনজনকেই ব্যাপারটা বলেন। "এ" আর "জি" প্রথমে আপনি তোলে, তারপর বাবা বুঝিয়ে বলার পর খানিকটা অনিষ্ট সত্ত্বেও রাজি হয়। "আর" নাকি কোনোরকম আপনি তোলেনি।'

'গতকাল দুপুরে খেতে গিয়েছি, এমন সময় চাকর এসে বাবাকে একটা চিঠি দেয়। সেটা পড়ে বাবার মুখ গঁথীর হয়ে যায়। কারণ জিগ্যেস করাতে বাবার মুখে প্রথম "এ", "জি" আর "আর"-এর দিষ্য শব্দ, আগে কিছুই জানতাম না।'

'কেন ?'

'বাবা লোকটা একটু পিকিউলিয়ার। উনি পেশা আর পেশেট ছাড়া আর কিছু

কানেন না । আমি, মা, সংসার—এসব সম্পর্কেই কাবা সম্পূর্ণ উদাসীন । মা মানে
আমার বিশ্বাস না । আমার বিশ্ব তিনি বছর বয়স তখন আমার মা মাদা
আমার বিশ্বাস, স্টেপমাদার । আমার বিশ্ব তিনি বছর বয়স তখন আমার মা মাদা
যান । তার দু বছর পায়ে কাবা আবার বিয়ে করেন । এই নতুন মা যে আমকে পুরু
কাহে টেনে নিয়েছিলেন তা বলতে পারি না । আমাদের বাড়ির এক অনেক দিনের
পুরুনো চাকর আমার দেখানো করত । সেই বাবধান এখনো রকে গেছে । যদিও
এটা বলব যে বাবার রেহ যেমন পাইনি, তেমনি তাঁর শাসনও ভোগ করিনি ।

‘କ୍ରବ୍ରେ ତୀର ଡାୟରିଓ ପଡ଼େନନ୍ତି ?’

କୁହା ତାର ଜାଗରିତିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ।

‘আমি আমার না, কেবল আমার একটু পুরু সবে এসেছি। ওই চিঠি কি এই
‘আমল প্রসঙ্গ খেল আমরা একটু পুরু সবে এসেছি। ওই চিঠি কি এই
তিনিজনের একচেম লিখেছেন ?’

‘ইয়েস, ইয়েস। এই মেয়েটা।’

শহীদ, শহীদ। এই শব্দটা একটা খার করে ফেলুনকে দিলেন। তা থেকে যে চিঠিটা শুনবলে একটা খার করে ফেলুনকে দিলেন। আমি আর লালমোহনব্বুও পড়লাম। বেদোল সেটা ফেলুনর পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আর লালমোহনব্বুও পড়লাম। প্রথমেই তার দেখসাম 'এ'। তার উপর লেখা 'আই টেক ব্যাক খাই খাই'। আশুরের ছাপতে হলে আমার অংশ নাম দিয়ে ছাপতে হবে। এটা অশুরের নাম, ভাগ্যরি ছাপতে হলে আমার অংশ নাম দিয়ে ছাপতে হবে।' আসেন। অমান্য করলে তার ফস ভোগ করতে হবে।

‘একটা প্রশ্ন আছে, বলল ফেলুন। ‘এই তিনি ব্যক্তির অপরাধের কথা আপনার বাবা জানলেন নি কৰুন?’

‘সেও বুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কৌশলে আইনের কবল থেকে মুক্তি পেবে “গ্ৰ” “ড্রি” আৰু “আৱ” হুনে শান্তি পাবনি। গভীৰ অনুশোচনা, শেষটাই ঘটনা “গ্ৰ” ধৰা পড়ে যাবাব তাৰ ক্ষমে মানসিক ব্যাবামে পৌঢ়াখ। ব্যাবার তথনই দেশ মানে ভাক, এৱা ভিনজনেই ব্যাবায কাহে আসে চিকিৎসাৰ জন। সাইকায়াটিক্সেটুৰ কাতে তো আৱ কিছু দৃঢ়েগালো চলে না; সব প্ৰেৰে সঠিক ভ্যাব মা দিলে চিকিৎসাই হবে না। এই ভাবে ব্যাবা এলোৱা ঘটনাগুলো জানতে পাৱেন।’

‘ରମକି କି ତୁମୁ “ଏ”-ଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ?’

‘এখন পর্যন্ত গাই, তবে “তি” স্বরকেও বাধার সংশয় আছে।’

‘এই স্বিধারে অপরাধ কী তা আপনি জানেন?’

‘না । তখু তাই না ; এদের আসল নাম, এখন এরা কী করছে, এসব বিহুই
বলেননি বুঝা । তবে আপনাকে নিষ্ঠয়ই বলবেন ।’

‘ऊनि कि आसान खीज कराउन ?’

‘সেই জনোইতো এলাম ! বাবা তুর এক পেশেন্টের কাছ থেকে আপনার নাম শুনেছেন ! আমাকে জিগ্যেস করাতে আমি বললাম গোয়েন্দা হিসেবে আপনার বৃধেষ্ঠ খাতি আছে । তাতে বাবা বললেন “মানুষের মনের চারিকাঠি হাতে না



খালে ভালো গোড়েন্দৰ হওয়া যায় না । উকে একটা কল দিতে পারলে ভালো হত । এইসব ভূম্বি-ভূম্বিতে শান্তিতন্ত্র হয় । ফলে কাজের ব্যাহাত হয় । সেটা আমি একেবারেই চাই না ।” আমি তখনই বাবাকে ভিগোস করি মিনিরকে কবল আসতে বলব । বাবা বসলেন, বিবিবার সকাল দশটা । এখন আপনি যদি...’

‘বেশ তো, আমার দিক দেকে আপনি কবার তোকোলো কাবণই নেই ।’

‘তাহলে এই কথা বইল । বিবিবার সকাল দশটা, নাথৰ সেভন সুইনহো স্টীট ।’

সাত নম্বর সুইনহো ট্রিট ডাক্তারের ধার্ডি বলে মনেই ইয় না : তার সব দ্বজা দিয়ে চুকে প্রথমেই তোবে পড়ে একটা পীজানো বফেল বেক্সেল টাইগার, আর তার পিছনের দেয়ালে উপর দিকে একটা বাইসনের মাথা ।

শক্তরবায়ু নিচেই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বৈঠকখালায় বসলাব। এবরেও চতুর্দিকে শিকারের চিহ্ন। উত্তরোক ডাক্তার কর্তৃ এত জ্বালায়ার মাঝার সময় কী করে পেলেন তাই তাৰহিলাব ।

বিনিট খানেকের মধ্যেই ডাঃ মুনসী এসে পড়লেন। আমাৰ চূল মৰ সামা হৰে দোজে, তবে এখনো বে বেশ শক্ত সমৰ্থ সেটা দেখলেই বোৰা যায়। উত্তরোক কেলুমার সঙ্গে হ্যাভশেক কৰে বললেন, 'আপনাৰ তো ব্যায়াম কৰা শৰীৰ বলে ঘনে হচ্ছে। তেৰি শুড়। আপনাৰ কাজ অধাৰত মাথাৰ হলেও আপনি যে শৰীৰেৰ অতি দৃঢ়ি বেৰেছেন সেটা মেৰে ভালো লাগল ।'

এবাৰ তত্ত্বোক জটায়ু ও আমাৰ দিকে চাইতে ফেলুন্দা আমাদেৱ পৰিচয় কৰিবলৈ দিল ।

'ঞ্জা ট্রাস্টওয়ার্ডি কি ?' ডাঃ মুনসী প্ৰশ্ন কৰলেন ।

'সম্পূৰ্ণ, বলল কেলুন, 'তপেল আমাৰ শুড়ভুতো ভাই এবং আমাৰ সহকাৰী, আৱ মি: গাজুলী আমাৰ অস্তৰজ বকু ।'

'এই জনো ডিগ্যুস কৰাহি কাৰণ আজ সেই তিন বাটিৰ আসল পৰিচয় আমাৰক দিতে হৰে, না হচ্ছে আপনি কাজ কৰতে পাৰবেন না। এই পৰিচয় শুধু আপনাৰা তিনজনই জানবেন, আৱ কেউ জানে না, আৱ কাউকে বলিবি ।'

'আপনি নিৰ্ভৰ্তৱ বলতে পাৰেন, ডাঃ মুনসী, বললেন জটায়ু। 'আমি অন্তত আৱ কাউকে বলব না ।'

'তেৰি শুড়েল ।'

'তাহলে বলুন কী কৰতে পাৰি। হৰ্মকি চিঠিৰ কথা আপনাৰ হেলে গলেছেন ।'

'শুধু হৰ্মকি চিঠি নহু, বললেন ডাঃ মুনসী, 'হৰ্মকি টেলিফোনও বটে। এটা কাজ কৰ্তৃৰ ঘটলা। তখন সাড়ে এগাৰোটা বোৰাই যাব মন অনঙ্গায় ফেন কৰতে। হিগিনস। জৰি হিগিনস।'

'আপনাৰ ডায়ারিৰ "জি" ?'

'ইয়েস। বলে কী—' সেদিন টেলিফোনে আমি অত্যন্ত বোকাৰ মডো কথা বলেছি। বখন তোমাৰ কাছে ট্রাইবেল্টেৰ জন্য যাই, তখন আমাৰ যে বাবসা ছিল, এখনও সেই ব্যবসাই রয়েছে। একজোটিৱা ব্যবসা আমাৰ, সুতৰাং 'জি' পেকে অনেকেই আমাৰ আসল পৰিচয় অনুমান কৰতে পাৰবে। সো কাট যি আউট।'

মাতালকে তো আর যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যায় না। ফলে ঘোন রেখে দিতে হল। দুর্বলতেই পাবছেন, আমি কুনী নিয়ে এত ব্যক্ত থাকি যে এসের বাড়ি নিয়ে সামনাসামনি কথা বলে যে কিছু বোঝাবো তার সময় বা সামর্থ্য আমার নেই। এ কাজের ভারটা আমি আপনাকে দিতে চাই। “এ” এবং “জি”, “আর”-কে নিয়ে চিনার কারণ নেই। কারণ তার সঙ্গে কথা বলে কেনেছি যে নামের আবাসকর থেকে তাকে কেউ চিনে ফেলবে এ আশঙ্কা তার নেই।

‘কিন্তু এই তিনজনের আসল পরিচয়টা—?’

‘কাগজ পেনসিল আছে?’

ফেল্পুদা পকেট থেকে নেটিবুক আব ডট পেন ব্যার করল।

‘লিখুন, “এ” হল অরুণ সেনগুপ্ত। ম্যাকনীল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, রেটারি ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বাসস্থান এগারো মিলি রোল্যান্ড ব্রোড। ঘোন নথির ডিব্রেক্টরিতে দেখে নেবেন।’

ফেল্পুদা চটপটি ব্যাপারটা লিখে নিল।

‘এবার লিখুন, বলে চলালন ডাঃ মুনসী “জি” হল জর্জ হিম্মস। টেলিভিশনের অন্য বিদেশী জানোয়ার চালান দেবার ব্যবসা এর। বাড়ির নথির নথুই রিপুন স্ট্রিট। বাস্তুর নাম থেকে দুর্বলতে পাবছেন ডিনি পুরো সাহেব মন, আংশো ইভিয়ান। তৃতীয় বাড়ির আসল পরিচয় প্রয়োগে হল দেব, নচেৎ নঘ।’

‘এসের অপরাধগুলো?’

‘শুনুন, আমার পাশুলিপি আজ আপনি নিয়ে যাবেন। মন দিয়ে পড়ে আপনার বৃক্ষি বিবেচনা প্রয়োগ করে আমাকে বলবেন এতে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা যাব ফলে বইটা বাজারে বেরোলে আমার ক্ষতি হতে পারে।’

‘চিক আছে। তাহলে—’

ফেল্পুদাকে খাবতে হল, কারণ ঘরে তিনজন লোকের প্রবেশ ঘটেছে। ডাঃ মুনসী তাদের দিকে দেখিয়ে বলালেন, ‘আপনি আসছেন শুনে এবা সকলেই আপনাকে দেখাব ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার স্ত্রী ছাড়া এই কজন এবং আমার ছেলেই এখন আমার বাড়ির বাসিন্দা। আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে সুব্যবহ্য আমার সেক্রেটারি।’

একজন চশমা-পরা বছর চাইলোকের ভস্তুলোকের দিকে দেখালেন ডাঃ মুনসী।

‘আর ইনি হচ্ছেন আমার শালক চন্দ্রনাথ।’

ঠিক বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখে কেন জানি মনে হয় ইনি বিশেষ কিছু করেন-টুরেন না, এ বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রয়েছেন।

‘আর ইনি আমার পেশেষ রাখাকান্ত মরিক। ঠিক চিকিৎসা দেব না হওয়া

পর্যবেক্ষণেই আছেন।

ত্রিক দেশে মনে হচ্ছে ত্রি অসুখ এখনো সাবেনি : হাত কচলাছেন, চোখ পিটি পিটি করছেন, আর একটানা সুন্দর হয়ে দাঢ়িয়ে থাকতে পারছেন না। বয়স আন্দজ চাইশ-পায়তালিশ।

পরিচয়ের পরে একমাত্র সুব্যবস্থাবুং ছাড়া আর সকলেই চলে গেলেন। তাঃ মূলসী সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, 'সুখমুক্ত, যাও, আমার সেখাটা এনে অদোখিয়াযুক্ত দাও।'

ভদ্রলোক দু মিনিটের মধ্যে একটা বড়, যেটা থার এনে ফেলুন্দাকে দিলেন।

'শুর কিন্তু আর কপি নেই', বললেন তাঃ মূলসী। 'পার্লিশাবকে দেবার আগে ওটা সুখমুক্ত টাইপ করে দেবে।'

'আপনি কেনো চিন্তা করবেন না', বলল ফেলুন্দা, 'আমি এটার মূল্য খুব ভালোভাবেই জানি।'

আমরা উঠে পড়লাম। শক্তব্যবাবু পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। এবার এসে আমাদের সদর দরজা অবধি পৌছে দিলেন। তারপর লালমেহনবাবুর সবুজ অ্যাবাসারে চড়ে আমরা বাড়িভুঁরো গুণনা দিলাম।

'একটা রিকুয়েস্ট আছে মশাই', লালমেহনবাবু হঠাতে বললেন।

'কী ?'

'আপনার পড়া হৃলে পর আমি একবার দু দিনের জন্য পার্লিশিপটা নেবো। এটা রিফিউজ করবেন না, মীজ ?'

'আপনার না পড়লেই নয় ?'

'না-পড়লেই নয় ; বিশেষ করে শিকার কাহিনী পড়তে আমার দুর্দশ লাগে।'

'বেশ, দেবো। তবে দু মিন নয় ; আপনি যে সকালে নেবেন, তার পরের মিন সকালেই ফেরত দিতে হবে। তার মধ্যে শিকারের অংশ আপনার নিশ্চয়ই পড়া হয়ে যাবে। কারণ ১৯৬৫-এর পরতো আর ভদ্রলোক শিকার করেননি।'

'তাই সই।'

৩৩

তাঃ মূলসীর হাতের সেখা বেশ পরিষ্কার হলেও, তিনশো পাঁচাশের পাতার পার্লিশিপটা পড়তে ফেলুন্দার লাগল তিন মিন। এন্ত সবয়ে সাধারণ একটা কারণ অবিপি এই যে ফেলুন্দা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক বিছু নিজের খাতায় নোট করে নিছিল।

তিন দিনের পরের দিন রবিবার সকালে যথান্নিতি জটায় এসে দৃঢ়ির। প্রথম প্রঙ্গই হল, 'কী স্যার, হস ?'

‘হয়েছে।’

‘আপনি কী সিক্কাটে এলেন খনি। এ ডায়রি নির্ভিত্তে ছাপার ঘোগা?’

‘সম্পূর্ণ। তবে তাতে তো হমকি বল করা যায় না। এই তিনভজনের একজনও সনি ধরে বসে থাকে যে নামের অন্দরের খেকেই লোকে বুঝে ফেলতে কাজ করা বলা হচ্ছে তাহলে সে এ বই ছাপা বল করার জন্য কী যে না করতে পারে তার ঠিক নেই।’

‘ইত্তুন ভার্ডারি?’

‘তা তো বটেই। একজনের কথাই ধরা যাক। “এ”। অক্ষণ সেনগুপ্ত। পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বংশের ছেলে। যুবা বয়সে ছিলেন এক বাক্সের মধ্য পরস্থ কর্মচারী। কিন্তু বন্দের মধ্যে হিল চূড়ান্ত সৌখিনতা। ফলে প্রতি মাসেই আয়ের চেয়ে ধ্যায় দেশি। শেষে কাবুলিওয়ালার শরণাপত্র হওয়া।’

এই ফাঁকে বলে বাখি, ফেল্দুদা একবার বলেছিল যে আক্তকাল আর দেখা যায় না বটে কিন্তু এছুর কুড়ি আগেও রাঞ্জের মোড়ে মোড়ে দেখা যেত লাগিএ হাতে কাবুলিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এসের বাবসা হিল মোটা মুখে টাকা ধরে দেওয়া।

ফেল্দুদা বলে চলল, ‘একটা সময় আসে যখন দেনান অফটা এফন ফুলে ফেপে ওঠে যে মরিয়া হয়ে অক্ষণ সেনগুপ্তকে বাক্সের তহবিল থেকে চালিশ হাজার টাকা চুরি করতে হয়। কিন্তু সেটা সে এফন কৌশলে করে যে দোষটা গিয়ে পড়ে একজন নির্দেশ কর্মচারীর উপর। ফলে সে বেচারিকে ক্ষেত্র খাটিতে হয়।’

‘বুঝেছি,’ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন জটায়ু। ‘তারপর অনুশোচনা, তারপর মাথার ব্যারাম, তারপর মনোবিজ্ঞানী। ...কিন্তু ভস্তুলোক যে একম একেবারে সমাজের উপর তলায় বাস করছেন। তার মানে মুনসীর চিকিৎসার কাজ দিয়েছিল?’

‘তা তো বটেই। সে কথা মুনসী তার ডায়রিতে লিখেওছেন—যদিও তারপরে আর কিছু লেখেননি। কিন্তু আমরা বেশ অনুমান করতে পারি যে এই খটনাব পর সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই তার জীবনের ধারা পালটে ফেলে ত্রিশ বছুর ধরে দীরে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আজকের অবস্থায় পৌছেছেন। বুঝতেই পারেন সেখান থেকে আবার পিছলে পড়ার আশঙ্কা যদি দেখা দেয়, যতই অমূলক হ্যেক, তাহলে সেনগুপ্ত সাহেব মাথা ঠিক রাখেন কী করে?’

‘বুঝলাম,’ বললেন জটায়ু, ‘আর অন্য দুজন?’

“আর” ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তার কোনো কারণ নেই সে তো সেদিন মুনসীর মুখেই শুনলেন। এর আসল নামটা উনি বলেননি, তাই আমিও বলতে পারছি না। ইনি এককালে একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মারেন, তারপর এদিকে ওদিকে মোটা ধূঁধ দিয়ে আইনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। ইনিও ডাঃ মুনসীর হাতে

নিজেকে সমর্পণ করে বিবেকবন্ধুর ধোকে স্বাই পান ।—ইটারেটিং হল “কি” এবং “ঘটনা ।”

‘কী করব ?’

‘ইনি গে ফিলিং সে তো জানেন । আর তার ব্যবসার কথাও জানেন । নেওয়া সহব রিপন স্টুটে একটি বড় মোতলা বাড়িতে থাকতেন তাঁর ডিগিনস : ১৯৪০-এ এক সুইভিল ফিল্ম পরিচালক কলকাতায় আসেন ওপেরের বাবুটাইকে একটা জৰি করবেন বলে । তাঁর গঁজের কল্য একটি লেপার্টের প্রয়োজন ছিল । তখন হিপিলসের ক্ষেত্র পেয়ে তার সকে গিয়ে দেখা করেন । ডিগিনসের একটা লেপার্ট ছিল কটে, কিন্তু সেটা বন্ধনীর কল্য নই ; সেটা তার পোতা । অনেক টাঙ্গা দিয়া সুইভিল পরিচালক একমাসের কল্য লেপার্টটাকে ভাড়া করবেন । এখন তিনি একমাস পরে তিনি অক্ষত অবস্থায় দেবত দেখেন । আসালে ফিল্ম পরিচালক মিথ্যা কথা বলেন, কাবণ্ড তাঁর গঁজে তিনি প্রামাণ্যীয় স্বাই খিলে লেপার্টটাকে দেরে দেলে । এক মাস পরে পরিচালক এসে হিপিলসকে আসল হটেলটা বলে । হিপিলস প্রচণ্ড রেগে কাউন্টান হারিয়ে তখনই পরিচালকের ট্রিটি টিপে তাকে দেরে দেলে । পরবর্তুরে গাগ চলে গিয়ে তার ভায়গার আসে আবেদন । হিপ মেট অবস্থাতেও পুলিশের কাঁধে ধূলো দেবার ফলি হিপিলস বাতি করে । নে প্রথমে তুরি দিয়ে দৃশ্য পরিচালকের স্বাস্থ ক্ষতিক্রমে ভরিয়ে দেয় । এবলে তার কালেকশনের একটা হিপ্প বনবেড়ালকে খীচের স্বজ্ঞ ধূলো ধাইবে এবং এক সেটাকে শুলি করে আবেদন করে । যালে ব্যাপারটা নাভায়, খীচা ভাড়া বনবেড়াল পরিচালককে হত্যা করে এবং বনবেড়ালকে হত্যা করে ডিগিনস । ফিলিস্টী ক্ষয়ক্ষত দেয়, হিপিলস আইনের হাত ধেকে বাঁচে । কিন্তু তারপর একমাস ধরে ক্ষয়ক্ষত দেখে নিজেকে ফাসিকাট ফুলতে দেখে অগত্যা বন্ধনীর চেহারে গিয়া উঠিব হত ।

‘ই...’ বললেন জটায়ু । ‘তাহলে এখন কি করব ?’

‘মুঠো করব ?’ বলল মেলুদা । ‘এক হল পাতুলিপিটা আপনাকে দেওয়া, আর মুই—“এ”কে একটা টেলিফোন করা ।’

জটায়ু হাসিমুখে মেলুদার হাত ধেকে পাতুলিপি ভরা মোটা খানটা নিয়ে বললেন, ‘ফোন করবেন কি অ্যাপ্পেলিমেট করার কল্য ?’

‘ন্যাচারেলি,’ বলল মেলুদা । ‘আর মেরি করার কোনো মানে হয় না । তোপসে—এসেনশন, ১১ ওল্ড রোড, নবরটা বার করতো ।’

‘আমি ভাইকেটরিটা হাতে নিতেই ফোনটা ধেকে উঠল । আমিই ধরলাম । ডাঃ মুসুমী । মেলুদাকে বলতেই ও আমার হাত ধেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিল ।

ব্যাপার আব কিছুই নয়—সেনগুপ্ত আবেকটী হৃত্কি ছিঠি পিত্তেজেন। তাতে কী কলা ইয়েহে সেটা ফেলুন আব খাতায় লিখে দিল। তারপর ফেলুন। তার শেষ কথটা বলে ফেনটা রেখে দিল।

সেনগুপ্তের বিটীয় হৃত্কিটা হচ্ছে এই—'সাঁদিন সময়। তার অশো কলকাতার প্রশ়েক বালো ও ইংরিজি কাগজে বিজ্ঞাপ্তি মেখতে চাই যে অনিবার্য কারণে কারবি জাপা সঁত্ব হচ্ছে না। সাঁত্বিন। তারপরে আব হৃত্কি নয়—কাজ, এবং কাজটা আপনার পক্ষে প্রীতিকর হবে না বলাই বাত্সল্য।'

আমি সেনগুপ্তের ফোন নম্বৰ বাব করে ভায়াল করে একবাবেই লাইন পেরে গেলাম : ফেলুনৰ হাতে ফেনটা চালান দিয়ে আমি আব জটায় কেবল ফেলুনৰ কথটাই শুনলুম : সেটা কুন যা দৌড়াল তা এই—

'হ্যালো—মি: সেনগুপ্তের মনে একটু কথা বলতে পারি কি—আরপ সেনগুপ্ত ?'

'—'

'মি: সেনগুপ্ত ? আমার নাম প্রদোব মির্ব।'

'—'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেজেন। ইয়ে—আমায় একদিন পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারেন ?'

'—'

'তাই বুঝি ? আক্ষর্যতো :কী ব্যাপার ?'

'—'

'আ পারি বৈকি। কটিয় গেলে আপনার সুবিধে ?'

'—'

'ঠিক আছে। তাই কথা রইল।'

'ভাবতে পারিস ?' ফেনটা বেখে কলুল ফেলুন, 'ভপ্রলোক নাকি আব পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাকে ফেন করতেন।'

'কেন, কেন ?' প্রশ্ন করলেন কটায়।

'সেটা ফোনে বললেন না, সামনা সামনি বললেন।'

'কখন আ্যাপয়টেমেন্ট ?'

'আধ হাঁটা বাবে।'

৪.৪.১

এগাড়ো নম্বৰ রোল্যান্ড গোড় সাহেবী আমলের মোতলা বাড়ি। দরজার বেল টিপতে একজন উদ্দিপ্তা বেয়াদার আবিভূতি হল। দে কাপেটি ঢকা কাঠে শিঁড়ি দিয়ে আমাদের দোতলায় নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানার বসালো। মিনিট দুয়েকের



মধ্যেই যিঃ সেনগুপ্ত অবেশ করলেন। বাড়ির সঙ্গে মানানসই সাহেবী মেজাজ ;
পরনে জ্বেসিং গাউন, পায়ে বেডকম টিপার, হাতে চুক্টি।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে পর ভদ্রলোক ছিগেস করলেন, 'আপনারা ডিঃক
করেন ?'

'আজ্জে না', বলল ফেলুদা।

'আমি যদি বিয়ার বাই আপা করি আপনারা মাইড করবেন না ?'

'যোটেই না।'

ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য বিয়ার আর আমাদের ডিনকনের
জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি
আমাকে কেন ফোন করতে যাচ্ছিলেন সেটা আগে বলতে আপনার কোনো
আপত্তি আছে ? তাৰপৰ আমি আমাৰ দিকটা বলব।'

'বেশতো ! জে. পি. চাওলাৰ নাম শুনেছেন ?'

'ক্ষুবসাদাৰ ? কঢ়িপ্রসাদ চাওলা ? যার নামে চাওলা ম্যানসনস ?'

'হ্যা।'

‘তোর এক নাতি তো – ?’

‘হ্যাঁ। মিসিং। সম্ভবত বিড়ন্যাপ্তি।’

‘কাগজে মেঝেছিলাম নাটে।’

‘ওরুপ্রসাদ আমার অনেকদিনের বক্তু। পুলিশ তদন্ত করতে নাটে, কিন্তু আমি ওকে আপনার নাম সাক্ষেত্র করি। কুণ্ড সেহানবিশের কাছে আপনার খুব মুখ্যাতি হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে ওকে আমি হেল্প করি।’

‘তাহলে চাওলাকে কী বলব ?’

‘মিঃ সেনগুপ্ত, দুঃখের বিষয় আমি অল্পেও একটা কেস হাতে নিয়ে ফেলেছি।’

‘আই সী !’

‘আর সেই ব্যাপারেই আমি আপনার কাছে এসেছি।’

‘কী ব্যাপারে শুনি ?’

‘আমি ডাঃ মুনসীর কাছ থেকে আসছি।’

‘হোচ্ছি !’

ভদ্রলোক সোফা থেকে আঘ লাফিয়ে উঠলেন।—‘মুনসী আপনাকে আমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছে ? তার মানেতো আম কানিনে রংকিস্যুক লোক জেনে যাবে মুনসীর ডায়রির “এ” ব্যক্তিটি আসলে কে ?’

‘মিঃ সেনগুপ্ত, আমি অত্যন্ত স্বল্পান্বী লোক। গোপন ব্যাপার কী করে গোপন করতে হয় তা আমি জানি। আমার উপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন। তবে আপনি যদি যন যন ডাঃ মুনসীকে দুর্বকি চিঠি দেন, তার ফল কী হবে সেটা আমি জানি।’

‘আমি দুর্বকি চিঠি দেব না কেন ? আপনি ডায়রিটা পড়েছেন ?’

‘পড়েছি।’

‘আপনার কী মনে হয়েছে ?’

‘তিশ বছরের পুরানো ঘটনা। এর অধো অন্তর্ভুক্ত পীঁচেক ব্যাক্সে তহবিল ওফিস হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে ইয়ত তাদের অনেকেরই নামের প্রথম অক্ষর “এ”। সুতরাং আপনার তা সম্পূর্ণ অবৃলক।’

‘মুনসী কি ব্যাক্সের নাম করেছে ?’

‘না।’

‘আমার ব্যাক্সে দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল যারা চুরির ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে, কারণ টেকায় পড়ে আমি দুজনের কাছে টাকা খর চেয়েছিলাম। দুজনেই অবিশ্বি রিফিউজ করে।’

‘মিঃ সেনগুপ্ত, আমি আবার বলছি—আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর এই ধরনের চিঠি নিয়ে আপনার লাভটা কী হচ্ছে ? তাঁর মুনশী আইনের দিন বিয়ে সম্পূর্ণ নির্বাচিত। অর্থাৎ আপনি কোনো লিঙ্গাল স্টেপ নিতে পারছেন না। তা হলে কি আপনি আইনের বাইরে কোনো রাখা ভাবছেন ?’

‘আমার বিপদের আশঙ্কা দেখলে আমি আইন-টাইন খানব না মিঃ মির্জে। আমার অভীজের ইতিহাস থেকেই আপনি বুঝছেন যে প্রয়োজনে বেপরোয়া কাজ করতে আমি ছিদ্র করি না।’

‘আপনার যাখা আরাপ হয়ে গেছে, মিঃ সেনগুপ্ত। তখনকার আপনি আদ এবনক্যাব আপনি কি এক ? আজ আপনি সমাজে সশ্রান্তি ব্যক্তি। এই অবস্থায় আপনি এমন একটা ঝুকি নেবেন ?’

মিঃ সেনগুপ্ত মিনিট আনেক কিছু না বলে কেবল চুক্ত করে বিয়ার দেখলেন। তারপর তাঁর চাউলির সামাজ পরিবর্তন দেখা গেল। তারপর ‘মির্জে একটা নীরব্ধাস ফেলে এক চুম্বন বাকি বিয়ারটা শেষ করে গেলাসটা রেখলে রেখে বললেন, ‘ঠিক আছে—জাম ইট ! সেট হিম গো অ্যাহেড !’

‘আপনি তাহলে দুর্বকির ব্যাপারে ইতি দিচ্ছেন ?’

‘ইয়েস ইয়েস ইয়েস !—তবে বিপদের বিন্দুভাব আশঙ্কা দেখলেই কিন্ত—‘আর বলতে হবে না’, বলল ফেলুদা, ‘বুরেছি।’

॥ ৫ ॥

লালচোছনবাদু কঢ়ায়তা পদদিন সকালেই পাতুলিপিটা ফেরত নিয়ে এলেন। ফেলুদা বলল, ‘এখন আর চা খাওয়া হবে না। কারণ আশ ছটাব ঘণ্টেই “ইট”-এ সকে অ্যাপার্টমেন্টে।’

নব্যট নধর রিপন স্ট্রাটে সরতায় কেল টিপতে যৌব আবিভাব হল তাঁর মাথায় টাক, কানের পাশের চুল সাল, আর এক জোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ, তাও সাপা।

‘মিঃ মির্জার, আই অ্যাম জর্জ হিগিনস !’

তিসজনের সঙ্গেই করমসিনেতে পৱ হিগিনস আস্বাদের নিয়ে সোতলায় চলল। গেট নিয়ে বাজিতে চুক্তেই দুটো বেশ বড় বাচা দেখেছি, তাঁর একটায় বাদ, অন্যটায় দুটো হায়না। সোতলায় উঠে বায়ে একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেবলাই তাঁতে গোটা পীচেক কোঁচালা ভাঙ্গুক বসে আছে যেবেতে।

বসবার ঘরে পৌঁছে সোফায় বসে হিগিনস ফেলুদাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, ‘ইট আর এ ডিটেকটিভ ?’



‘এ প্রাইভেট ওয়ান’, বলল ফেলুন।

বাকি কথাও ইঁরিজিতেই ইস, যদিও হিমিন্স আকে মাকে হিমিও বলে ফেলছিলেন, বিশেষ করে কাকুর উদ্দেশে গালি দেবার স্বয়। অনেকের উপরেই ভদ্রলোকের রাগ। যদিও কারণটা যোৱা গেল না। অবশ্যে বললেন, ‘হাম্সি তাহলে এখনো প্র্যাকটিস করে ? আই মাস্ট সে, সে আবার বিপদের স্বষ্টি অনেক উপকার করেছিল।’

‘তাহলে আর আপনি তাকে শাসাঞ্চল কেন ?’ প্রশ্ন করল ফেলুন।

হিমিন্স একটুক্ষণ চূপ থেকে বলল, ‘সেটাৰ একটা কাবণ হচ্ছে সেমিন বাবো

বেশোর মাঝাটা একটু বেশি হয়েছিল। তবে মনুষের কি ভয় করে না? আমার বাবা কী ছিলেন জান? স্টেশন মাস্টার। আব আমি নিজের চেটাই আজ কোথায় এসে পৌছেছি দেখ। এ অসোর একচেটিয়া ব্যবসা। মানসিক ভাষার ছাপা হলে যদি আমাকে কেউ চিনে ফেলে তাহলে আমার আমার বাবসাব কী দশা হবে করতে পার?

ফেলুদাকে আবার বোঝাতে হল যে হিগিন্স আইন বাচিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। তাই আবার দৌকা রাখায় যেতে হবে। 'সেটাই কি তুমি চাইছ?' বেশ কোজের সঙে জিজেস করল ফেলুদা। 'তাতে কি তোমার প্রেসচুর আরো বেশি বিপর হবে না?'

হিগিন্স কিছুক্ষণ চুপ করে বিড়বিড় করে বললেন, 'একবার কেন, শুধুবাব কুন করতে শাবতাম ও পাকি সুইতিশ্টোকে। বাহসূর, আমার সাথে মেপার্ড, শাশ চার বছব যেস, তাকে কিনা লোকটা মেরে ফেললে!...'

আবার ফল সেকেন্ডের জন্য কথা বল; তাঁরপর ইঠাই সোফা র ইতিল চাপড়ে গলা ঢুলে হিগিন্স বললেন, 'ঠিক আছে; মানসিকে বলো আমি কোনো পরোয়া করি না। ও যা করছে করুক, বই বেবোলে শোকে আমাকে চিনে ফেললেও আই ডেট কেজার। আমার ব্যবসা কেউ টিলাতে পারবে না।'

'থাক ইউ, মি, হিগিন্স, থাক ইউ।'

অরুণ সেমন্তুর ব্যবটা ফেলুদা আগেই দেনে ডাঃ মুনসীকে গোনয়ে দিয়েছিল। হিগিন্সের ব্যবটা দিতে আমরা মুনসীর বাড়িতে গেলাম, কাবণ পাতুলিপিটা ফেরত দেবার একটা বাপাব হিল। ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা বড় বকুল ধনাবাদ দিয়ে বললেন, 'তাহলে তো আপনার কর্তব্য সাব হয়েগেল। এবাবে আপনার কুটি!'

'আপনি ঠিক বলছেন? 'আব' মখকে কিছু করার নেই তো?'

'নাবিং!... আপনি আপনার বিল পাঠিয়ে দেবেন, আমি ইমিডিয়েটলি প্রেরেট করে দেব।'

'থাক ইউ, স্যার।'

'এটাকে কি মানলা বলা চলে?' বাড়ি ফিরে এসে বলল জটায়।

'মিনি মানলা বলতে পারেন। অথবা মানলাণু।'

'যা বলেছেন।'

'আশ্চর্য এই যে এমন গাহিত কাজ করার মিচিশ ত্রিশ বছর পরে শেকগুলো শুধু বেঁচে নেই, দিবি সূর্য দ্বার্ষে জালিয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ কথা', বললেন জটায়। 'কালই বাড়িতে কসে ভাবছিলুম ত্রিশ বছর আগে

যাদের চিনত্ব তাদের কাকর সহে আজও যোগাযোগ আছে কিনা, বা তারা এখন কে কী করছে সেটা জানি কিনা। বিচাস করল আজই আব এটা ভেবে তথ্য একটা বন্দ মনে পড়ল, অপরেশ চাটুজো, যাব সঙ্গে একসঙ্গে বসে বাষ্পকোশ দেখিচি, ফুটবল খেল দেখিচি, সাক্ষুভ্যালিঙ্গে বসে তা দেখিচি।

‘সে এখন কী করে জানেন?’

‘উৎ। আউট অব টাচ। কথপাটিলি। কবে কীভাবে যে জাহাজড়িটা হল, সেটা অনেক ভেবেও মনে করতে পারলুম না।’

পরদিন সকালে পালমোহনবাবু এসে ফেলুনৰ দিকে ঢেয়ে বললেন, ‘আপনাকে একটা ডাউন বলে মনে হচ্ছে? কেকারত ভাবে পাগজু না খুবি।’

ফেলুনী মাথা নেড়ে বলল, ‘নো সাব, তা নয়, একটা বাপাবে কৌতুহল নিবৃত্তি হল না বলে অসোখাণি পাগছে।’

‘কী বাপাবে?’

‘আব’ বাপিটির আসল পরিচয়। ইনি একটা অফিসিয়ালি লিলে এক হত না।’

‘রেন্ট, বাবিল, বিডিকুলাস’, বললেন জটায়। ‘আব’ কাহারামে থাক। আপনি আপনার যা প্রাপ্ত তা তো পাচ্ছেনই।’

‘তো পাচ্ছি।’

ফেনটা বেকে উঠল। আমিই ধরলাম। ‘হ্যালো’ বলতে ওলিক থেকে কথা এল, ‘আমি শত্রু খেছি।’ আমি ফেনটা ফেলুনৰ যাতে চালান দিলাম।

‘বলুন সাব।’

উভয়টা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুনীর কপালে গভীর ঘৰি পড়ল। তিন-চারটে ‘ই’ বলেই ফেলুনী ফেনটা রেখে দিয়ে বলল, ‘সাধেতিক খবর। জাঃ মুনসী খুন হয়েছেন, আব সেই সঙ্গে ডায়রিও উধাও।’

‘বলেন কী?’ চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন জটায়।

‘ভেবেছিলাম শেখ। অসেলে এই সবে জরু।’

আমরা আব এক খুরুত অপেক্ষা না করে পালমোহনবাবুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম।

সুইনহো স্ট্রাটে পৌছে দেখি পুলিশ আগেই ইজিব। ইনলেশনের সোম ফেলুনীর কেনা, বললেন, ‘আব রাস্তিরে খুনটা হয়েছে, মাথার পিছন দিকে ভাবী কিছু নিয়ে যেরেছে।’

‘কে প্রথম জানল?’

‘উব বেয়ারা। ভুটালোক ভোব ছটার তা খেতেন। সেই সময়ই বেয়ারা

ব্যাপারটা জানতে পারে । ডাঃ মুনসীর হেলে বাড়ি ছিলেন না । পুলিশে ব্যবর দেন ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারি ।

‘আপনাদের জেরা হয়ে গেছে ?’

‘তা হয়েছে ; তবে আপনি নিজের মতো করুন না । আপনি যে আমাদের কাজে ব্যাধাত করবেন না সেটা আমি পূর্ব অভিজ্ঞাতা থেকে জানি । আর চাবটি তো প্রাণী, ভঙ্গলোকের হেলে, সেক্রেটারি, শ্যালক আর প্রেশেট । অবিশ্বাস হিসেব মুনসী আছেন । তাকে কিছু জিগ্যেস করিনি এখনো ।’

আমরা তিনভজন শক্তরবাবুর সঙে দোতলায় রওনা দিলাম । সিডি ওঠার সময় ভঙ্গলোক একটা দীর্ঘ মিথাস ফেলে বললেন, ‘অনেক কিছুই আশঙ্কা করছিলাম, কিন্তু এটা করিনি ।’

বাবার ঘরে পৌছে ফেলুন। বলল, ‘আপনি যখন বয়েছেন তখন আপনাকে দিয়েই শুরু করি ।’

‘বেশকো কী জানতে চান বলুন ।’

আমরা সকলে বসলাম । চারিটিকে জন্ম জানোয়ারের ছাল, মাথা ইত্যাদি দেখে অনে হচ্ছিল, এতক্ষণ শিকারী, আর এইভাবে তার মৃত্যু হল ।

ফেলুন জেরা আরম্ভ করে দিল ।

‘আপনার ঘর কি দোতলায় ?’

‘হ্যাঁ ! আমারটা উভয় প্রান্তে, বাবারটা দক্ষিণ প্রান্তে ।’

‘আপনি আজ সকালে বেরিয়েছিলেন ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘কোথায় ?’

আমাদের ডাক্তারের ফোন আলাপ । উনি রোজ শোরে সেকের ধারে হাঁটেন, তাই খুকে ধরতে গিয়েছিলাম । কিনিং থেকেই মাথাটা ভার-ভার লাগছে । মনে হচ্ছিল প্রেশারটা বেড়েছে ।

‘প্রেশার কি আপনার বাবা দেখে দিতে পারতেন না ?’

‘এটা বাবার আরক্ষটা পিকিউলারিটির উদাহরণ । উনি বলেই দিয়েছিলেন আমাদের বাড়ির সাধারণ বাবামের চিকিৎসা উনি করবেন না । সেটা করেন ডাঃ অশুব কর ।’

‘আই সী... একটা কথা আপনাকে বলি শক্তরবাবু, আপনি যে বলেছিলেন ডাঃ মুনসী আপনার সহজে উদাসীন, ডায়রি পড়ে কিন্তু সেরকম মনে হয় না । ডায়রিতে অনেকবার আপনার উন্নেব আছে ।’

‘ভেরি মারপ্রাইজিং !’

‘আপনার ডায়রিটা পড়ার ইচ্ছা হয় না ?’

‘অত বড় হাতে সেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ার বৈর্য আমার নেই।’

‘এটা অবশ্য আশা করা যায় যে আপনার বিষয় যেটা সত্যি সেটাই উনি লিখেছেন।’

‘বাবার মৃষ্টিতে যেটা সত্যি বলে মনে হয়েছে সেটাই উনি লিখেছেন। সে মৃষ্টির সঙ্গে আব শীঁচুনের দৃষ্টি নাও ছিলতে পারে। আমার বলা ইচ্ছা এই, যে বাবা আমাকে চিনলেন কী করে ? তিনি তো সর্বক্ষণ কুণ্ঠী নিরেই পড়ে পারতেন।’

‘আপনার বাবার মাসিক রোজগার কত ছিল সে সমস্তে আপনার কোনো ধারণা আছে ?’

‘সঠিক নেই, তবে উনি যে ভাবে খুচ করতেন তাতে মনে হয় ত্রিশ-শতাব্দী
হাজার হওয়া কিছুই আচর্য নয়।’

‘উনি যে উইল করে গিয়েছিলেন সেটা আপনি জানেন ?’

‘না।’

‘গত বছর পয়লা ডিসেম্বর। উর সকারের একটা অংশ ব্যবহার হবে
মনোবিজ্ঞানের উন্নতিকরণে।’

‘আই সী।’

‘আর, আপনার প্রতি উদাসীন হওয়া সম্বেদ আপনিও কিন্তু বাদ পড়েননি।’

শক্তব্যাবৃ আবার বললেন, ‘আই সী।’

‘এই খনের ব্যাপারে আপনি কোনো আলোকপাত্র করতে পারেন ?’

‘একেবারেই না। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।’

‘আব ডায়রিটা যে লোপাট হল ?’

‘সেটা শুই তিনজনের একজন লোক লাগিয়ে করতে পারে। বাবার পেশেট
হিসাবে এরা এ বাড়িতে এসেছে। বাবা যে ঘরে কুণ্ঠী দেখেন, তার পাশেই তো
আপিস ঘর। সেখানেই ধাকত বাবার লেখাটা।’

‘আপনাদের সদর দরজা রাতে বজ থাকে নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ, তবে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কমাদার ওঠার জন্য একটা ঘোরানো
সিঁড়ি আছে।’

‘ঠিক আছে ! থ্যাক ইউ ! আপনি এবার যদি সুখময়বাবুকে একটু পাঠিয়ে
দিতে পারেন ?’

মিনিট খানকের মধ্যেই সেক্ষেত্রে সুখময় চক্রবর্তী এন্দে শুরু হলেন।
ভদ্রলোক আমাদের থেকে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসতে ফেলুন। কেরা আরভ
করল।

‘আমি প্রথমেই জানতে চাই, পাতুলিপিটা যে চুরি হল, সেটা কি বাইরে পড়ে

10

‘না। দেৱাজে ; তবে দেৱাজে চাবি থাকত না। তসু কাৰণ আমি বা ডাঃ
কুমুৰী কেৱল তাৰতে পারিলি বে সেজ এই তাৰে চুৰি হতে পাৰে।’

‘ओ ते आव द्योते नहे सों। कथम कोठारे जानलेन ?

‘आह श्री... आपल्या कल्पित इल डाः मुनीर सेनेटाऱ्याचा काळ करावून ?’

४४८

‘वास्तु प्राप्ति की जरूरे ?

‘यह जल्दी जापान विजयान मिलेगा ।’

‘‘मेरी जाति का लोड हुआ आपनाके ?’’

‘କେବେଳା କେବେଳା ନୋଟ କରେ ରାଖିବାସ, ଆର ଚିଠିଗୁଲୋର ଜ୍ବାବ ଟାଇପ କରିବାସ ।’

किसी के अनुकूल आसन है

‘ତା ହୁବୁ ନା । ବିଭିନ୍ନ ଫେଲେର ମନେବିଳାନ ମଧ୍ୟା, ଥେବେ ନିଯାସିତ ଚିଠି ଆମରୁ । ବାହୀରେ କଳକାରୀରେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଚାବିର ଅନ୍ତର ଏକବାର ବିଦେଶ ଯେତେବେ ।’

‘आपनि विजे कर्त्तव्यनि ?

१८

‘आतीश्वरम् याव के आछ ?’

জাহিনেন নেই। বাবা মারা গেছেন। আছেন শুধু আমার বিধবা যা আম
আমার এক বিধবা খুড়িয়া।'

‘ଆଜା ଏକ ମହେତ୍ତି ଥାରିଲା ?’

10

‘আপনি প্রদেশ সঙ্গে আকেন না ?’

‘आमितो ए वाडिलेई वाकि । जाः मूलसी आमाके एकटा घर देन एकडलाय । अथव घेकोई एशाने आहि । यावे यावे गिये वाडिर खवर निये आणि ।’

‘বাড়ি কোথায় ?’

‘କେତେବେଳେ କ୍ରୋଡ ଲ୍ୟାନ୍ଡର୍ ଡାଇନ୍ସ ଥେବେ ?’

‘ଆଖନି ଏହି ଖଣ ଦୟକେ କୋଣେ ଆଶୋକପାତ କ୍ରାତ ପାରେନ ?’

‘একেবারেই না । জানবি বেছাত হতে পারে কম্বকি ঠিঠি থেকেই বোকা যায় ;
কিন্তু শুনটা আমার কাছে একেবারে অধিনীন বলে মনে ভাঙ্গ ।’

‘आः मूलगी वस हिसाबे केस्तु लोक हिलेन् ?’

‘ପୁଣ୍ୟ କାଳୀ । ଆମଙ୍କ ଡିନି ଭାବାର କେବୁ କବାଳୁଳ ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିରେ

ছিলেন, এবং তালো যাইছেন দিতেন।'

'আপনি কি জানেন ডাঃ মুনসীর বই বেজেলে তীর অবর্তনানে বইজের অস্থাধিকারী হতেন আপনি ?'

'আনি। ডাঃ মুনসী আহাকে বলেছিলেন।'

'বই হেসে বেজেলে তার কাটিতি কেমন হবে বলে আপনার মনে হয় ?'

'প্রকাশকদের ধারণা খুব ভালো হবে।'

'তার মানে যোটা বলেলাটি, তাই নয় কি ?'

'আপনি কি ইঙ্গিত করছেন এই বলেলাটির লোভে আমি ডাঃ মুনসীকে খুন করেছি ?'

'এখানে যে একটা জোরালো ঘোটিতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি আপনি অঙ্গীকার করবেন ?'

'আমার যেখানে টাকার অভাব নেই সেখানে শুধু বলেলাটির লোভে আমি খুন করব, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য ?'

'এর সঠিক উত্তর দিতে যতটা চিন্তার প্রয়োজন, তার সময় এখনো পাইনি। যাই হোক এখন আপনার খুটি।'

'কাউকে পাঠিয়ে দেবো কি ?'

'আমি ডাঃ মুনসীর শাশার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

সুশময়বাবু চলে যাবার পর জটায়ু বললেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন তো, ডায়রি লোপাট আব খুন্টা সেপারেট ইস্যু, না পরম্পরার সঙ্গে জড়িত ?'

'আগে গাছে কাঠাল দেবি, তারপর তো গোফে তেল দেব।'

'বোবো !'

॥ ৬ ॥

শানা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন। কপালের ঘাম মুছতে দেখে মনে হল ভদ্রলোক একটু নার্ভসি দোধ করছেন।

'আপনার নাম তো চন্দননাথ, পদবী কী ?' ভদ্রলোক বসার পর ফেলুন প্রশ্ন করল।

'বোস।'

'আপনি এখানে রয়েছেন পনেরো বছর, তাই তো ?'

'হাঁ, কিন্তু আপনি কী করে... ?'

'আমি ডাঃ মুনসীর ডায়রিটা পড়েছি। আপনার বিষয় অনেক কিছু আনি, তবু আপনার খুব থেকে কলফার্মেশনের জন্য কতকগুলো প্রয় করছি।'

চন্দনাধ বোন আবার ধাম শুনলেন ।
‘তাঃ মুনসী আশ্পনাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেন ?’
‘না । আমার বোন ডাঃ মুনসীকে অনুরোধ করেন ।’
‘তুনি এক কথার রাজি হয়ে থান ?’
‘না ।’
‘তাহলে ?’
‘আমার বোন... পীড়াপীড়ি করলে পর... রাজি হন ।’
‘আপনিতোকোনোচাকরি-চাকরি করেন না ।’
‘না ।’
‘হ্যাত বরঠা পান যাসে যাসে ?’
‘হ্যাঁ ।’
‘কত ?’
‘পাঁচশো ।’
‘তাতে চলে বার ?’
চন্দনাধবাস্তু উত্তর না দিয়ে যাবা হৈট করলেন । বুবালাম হাতবরচটা যথেষ্ট
নয় ।
‘আপনিতো ইন্টারবিডিয়েট অবধি পড়েছেন ?’
‘হ্যাঁ ।’
‘ছাত্র হিসেবে কীরকম ছিলেন ?’
‘সাধারণ ।’
‘নাকি তার তেজেও নিতে ?’
চন্দনাধবাস্তু চুপ ।
‘প্রথমবার অই, এ-তে ফেল করেননি ? সেই কারণেই তো আশ্পনার কোনো
চাকরি কোটেনি, তাই নয় কি ?’
পৃষ্ঠি মত করে যাবা মেজে হ্যাঁ বসলেন চন্দনাধবাস্তু ।
‘এ বাড়িরকোনো কাজ আপনি করেন কি ?’
‘হ্যাঁ ।’
‘কী ।’
‘বাজার করি, ওযুধপুর আনি...’
‘শুবেছি... আপনার শেবার ঘর মোতালায় ?’
‘হ্যাঁ ।’
‘কোনখানে ? ডাঃ মুনসীর ঘর থেকে কতদূরে ?’
‘গালে ।’

‘একেবারে পাখে ? লাগালাপি ?’

‘ই-ইয়েস।’

‘বাত্রে সুযোন কখন ?’

‘দশটা সাড়ে দশটা।’

‘আব ওঠেন ?’

‘চ-টা।’

‘এই খুন সখকে আপনার কিছু বলার আছে ?’

‘নো-নো স্যার। নাথিং।’

‘ঠিক আছে। আপনি এবার অনুগ্রহ করে রাধাকান্ত মরিককে একটু পাঠিয়ে দিন।’

রাধাকান্ত মরিক এসে সোফায় বসেই এক সঙে হাত আর হাথা নেড়ে বললেন, ‘আমি খুন সখকে কিছু জানি না, কিছু না...’

‘আমি কি বলেছি আপনি জানেন ?’

‘বলেননি, কিন্তু বলবেন। আই নো ইউ ডিটেকটিভস। এসব জেরা-টেরা আমার ভালো লাগে না। যা বলার আমি বলে যাচ্ছি। আপনি খুন। আমি যে ব্যারাম নিয়ে এখানে আসি তাৰ নাম আমি জানতাম না। মুনসী বলেন। পাসিকিউলন ম্যানিয়া। তাৰ লক্ষণ হল, চাবপালেৰ সব লোককে হঠাৎ শত্রু বলে মনে হওয়া। বাবা, দাদা, পড়শী, আপিসেৰ কোলীগ কেউ বাদ নেই। সবাই যেন ৰে পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়বে। আগে এটা ছিল না ; ঠিক কখন যে তক হল তাৰ বলতে পাৰি না। তখু এটা বলতে পাৰি যে শেখ দিকে এমন হয়েছিল যে বাতিৰে সুযোগে পারতাম না, পাছে ঘুমোলে কেউ এসে শুকে ছুরি মাৰে ?’

‘ভাঃ মুনসীৰ দেখে কাজ দেয় ?’

‘দিচ্ছিল, তবে সময় লাগছিল। কথা ছিল আৱ দু'ইঞ্চা পৰে ছুটি পাৰ। কিন্তু তাৰ আগেই... ছুটি হৰে গেল...’

‘আপনি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবেন ?’

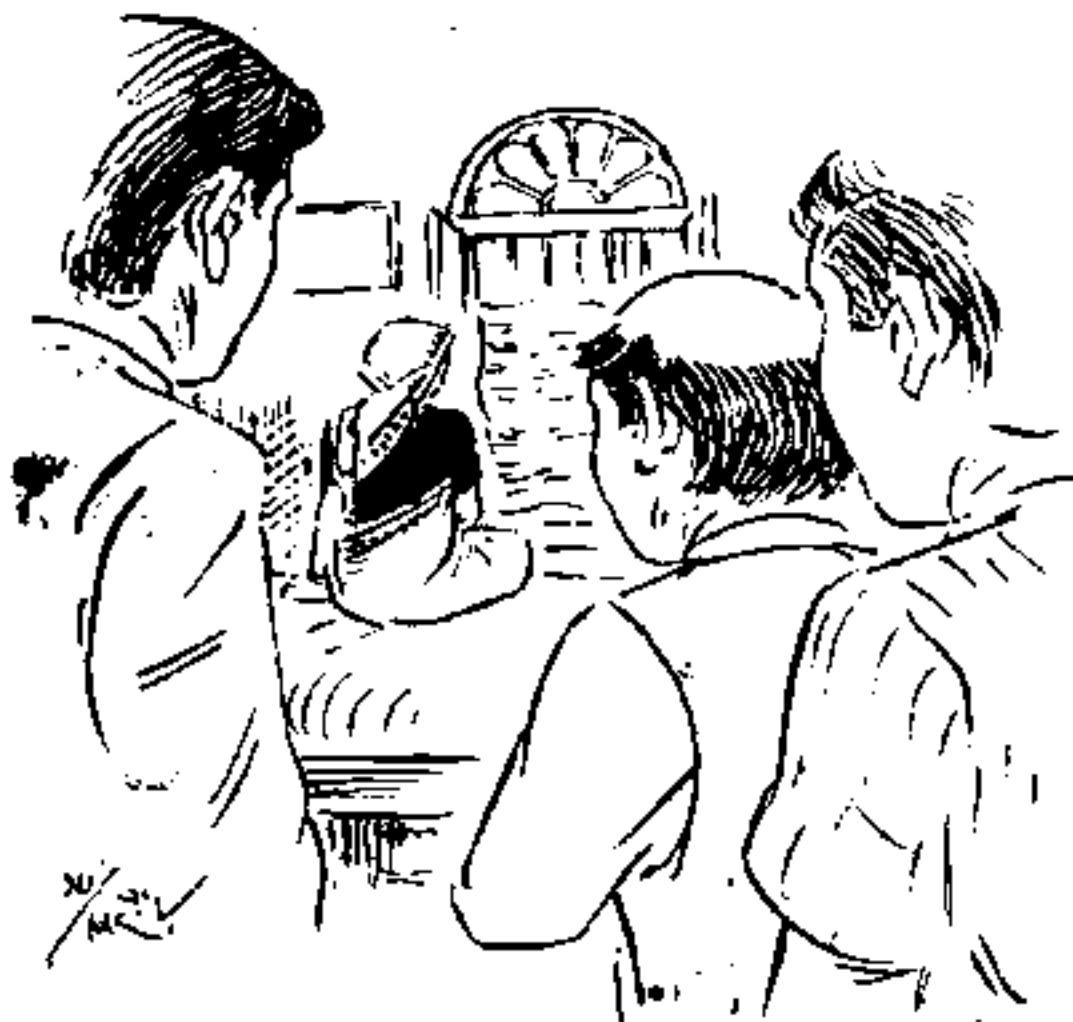
‘পুলিশ ঘেতে দিলেই যাৰ !’

‘আপনাৰ চাকৰিতো একটা আছে নিশ্চয়ই !’

‘পপুলাৰ ইনশিওৰেন !’

‘ঠিক আছে। আপনি এবার আসতে পাৱেন।’

রাধাকান্ত মরিক চলে যাবার পৰি ফেলুন্দা একবাৰ খুনেৰ জায়গা আৱ লাশটা দেখে এল। যে ছিনিস্টা দিয়ে বাড়ি ঘৰে খুন কৰা হৰেছে, সেটা এখনো কুঞ্জে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পুলিশেৰ ডাক্ষণ্য এসে দেখে বলে গোছে খুনটা হৰেছে



ডোর ঢাক্টা থেকে পাঁচটাৰ মধ্যে। পাতুলিপিটা এখনে পাওয়া যায়নি। ইন্স্পেক্টুৱ সোম বলেছেন সেটা বেৰোলেই ফেলুনকে জানিয়ে দেবেন।

মিসেস মূলসীৰ সঙে কি এখন কথা বলা যাবে ?' ফেলুন ডিগ্রাম কৰল সোমকে।

'তা যাবে। তুনি দেখলাব মোটামুটি শক্তই আছেন।'

আমুৱা তিনজন মিসেস মূলসীৰ ঘৰে গেলাব। ভদ্ৰমহিলা জানালাৰ দিকে মুখ কৰে খাটে বসে আছেন। ফেলুন দৱজায় টোকা মারতে আমাদেৱ দিকে দিয়লেন।

আমি চমকে উঠলাম। ইনি কৰছ ত্রি ভাইয়েৰ মতো দেখতে। যৰজ নাকি ?

নথকাতেৰ পৰি ফেলুন বলল, 'আমাৰ নাম প্ৰদোষ মিতি। আমি একজন আইভেট ডিটেকটিভ। আপলাৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ ব্যাপারে তদন্ত কৰতে এসেছি।'

‘আপনি কিছু জিগ্যেস করবেন কি ?’

দেখে অবাক হলাম যে তত্ত্বাত্ত্বিক কথার বিশ্বাস্ত্র কাজার মেশ নেই।

ফেলুনা বলল, ‘শামান্য মু-একটা প্রশ্ন।’

তত্ত্বাত্ত্বিক আবার জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘করুন।’

‘এই ইত্যাস সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি ?’

‘ওর ডায়রিই হল ওর তাল। আমি ওকে কথার বলেছি, তুমি লিখছ সেখ, কিন্তু এ জিনিস ছাপিও না। আমাদের দেশের সোকেরা এত সত্তি কথা প্রচল করতে পারবে না। অনেকে বাধা পাবে, অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, আর আজ...’

‘আমি কিন্তু ডায়রিটা পড়েছি। আমার মনে হত না এটা পড়লে মনে কেউ বাধা পেতো।’

‘তবে বুধি হলাম।’

‘আপনি আর চন্দনাধৰাবু যাইজ ভাইবোন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি যখন ডাঃ মুনসীকে প্রস্তাব করেন আপনার তাইকে এ বাড়িতে এনে রাখা হোক, তখন উনি কী বলেন ?’

‘অনিষ্ট সর্বেও যত দেন।’

‘অনিষ্ট কেন ?’

‘আমার ভাই কোনো চাকরি করে না সেটা উনি মেনে নিতে পারছিলেন না। উনি নিজে ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। কাজ ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।’

‘অনেক ধন্যবাদ, মিসেস মুনসী। আমার আব কিছু জানাব নেই।’

১৭১

মাড়ি ফিরতে বাবোটা হয়ে গেল। লালমোহনবাবু সকালে সান সোর বেরোন, কাজেই সে সমস্যাটা নেই। তাঁকে বঙ্গলাম দুপুরের খাওয়াটা আজ এখানেই সারতে। ভস্তুলোক রাজি হয়ে গেলেন।

‘মহীয়সী মহিলা !’ পাথাটা বুলে ফুল স্পীড করে তাঁর প্রিয় কাউচটায় বসে বললেন লালমোহনবাবু, ‘এত বড় একটা ট্রাঙ্গিভিতে এতটুকু টিসকার্নি ! অগচ ভাইটা একেবারে গোবর গুগেশ !’

‘সেই জনোই মহিলার তাইয়ের উপর এত টান’, বলল ফেলুনা, ‘এ বড় জটিল মনোভাব, লালমোহনবাবু। সেহ, অনুকূল্পা, এসবতো আছেই ; তার মধ্যে কেোপায় যেন একটা মাতৃত্বের রেশ রয়েছে। তত্ত্বাত্ত্বিক নিজের কোনো ছেলেপিলে নেই, এবং ডাঃ মুনসীর প্রথম পাক্ষের শ্রীর হোলের প্রতি ও টান নেই, এসব কথা ভুলবেন

না ।'

'তার উপরে বমজ ।'

'তা তো বটেই ।'

'আপনার কি মনে হয় তদ্বিতীয় ডাঃ মুনসীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না ?'

'সেটা মুনসী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না থাকলে বলা মুশকিল ।

গোরেকাকে যা বোবার বুকতে হয় দুটি ইন্সিয়ে সাহায্যে, কান আর ঢোব ।'

'একেতে ক্যান কী বলছে ?'

'মনে একটা খটকা জাগাছে ।'

'কী সেটা ?'

'সেটা আপনারা কেন বোকেননি তা জানি না ।'

এবাবে আরি একটা কথা না বলে শারলাম না ।

'তুমি বলতে চাও তুর কথা তুমে মনে হল উনি ডায়রিটা পড়েছেন ?'

'সাবাস, তোপসে, সাবাস ।'

'কেন মশাই, ডায়রিতে কী ধরনের ভিনিস আছে সেটা তো মুনসী দুখেও বলতে পারেন ।'

'একই হল, লালমোহনবাবু একই হল ।'

মুনসীর কথায় মনে হয়েছিল এই তিনি দ্যন্তিম ঘটনা ছাড়া ডায়রিতে কী আছে তা কেউ জানে না । এখন মনে হচ্ছে কথাটা হয়ত ঠিক না ।'

'তবে এটা তো যোৰাই যাচ্ছে ডাঃ মুনসীর শ্রীর প্রতি যোটেই বিজ্ঞপ্তাব পোৰণ কৰতেন না । ডায়রিতে প্রথম পাতা বুললেই সেটা প্রয়োগ হয় । যে শ্রীর সকল বনিবনা নেই, তাকে কেউ বই উৎসর্গ করে না ।'

'আপনি মেঝে ফার্ম আছেন । ভেবি শুড় ।'

'আরেকটা ব্যাপারে আমি কানকে কাজে লাগিয়েছি মশাই । আপনি নিশ্চয়ই আপ্রিশিয়েট করবেন । ডাঃ মুনসীর বিজ্ঞপ্তি হেলের প্রতি যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে তাকে শুভ কাউঁ বলে মনে ইওয়া আশ্চর্য নয় । কিন্তু সেইখনে দেখুন, তার সেক্রেটারির প্রতি তাঁর কত দরদ ।'

'শুড় । শুড় ।' ফেলুন্দা যে অন্যমনস্ক ভাবে তারিফটা করে সোজা হেড়ে উঠে পাহচারি আরম্ভ করে দিল ।

'কী ভাবছেন মশাই ?' প্রায় এক মিনিট চুপ থেকে প্রাপ্ত করলেন ডাঃটাবু ।

তাবছি যে তিনি উহু নামের মধ্যে একজনই রায়ে গেল যার আসল পরিচয়টা পোওয়া গেল না । ফলে ফামলাটার মধ্যে একটা ফাঁক রায়ে গেল যেটা আর পূরণ হবে না ।'

'আপনার কি মনে হয় ডাঃ মুনসী কেনো তথ্য—'

৫১-১-১

আমাদের এই নতুন নীল টেলিফোনটার আওয়াজ আগেরটার চেয়ে অনেক
বেশি জোর। ফেলুন রিসিভারটা ভুলে 'হ্যালো' বলল।

অবিষ্কাস। টেলিফোন। যাকে ফেলুন টেলিপ্যারি বলে এ হল খেল আনা
তাই। কার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল সেটা ফেলুন ফোন নামিয়ে রেখেই বলেছিল: আমি যখন টটোটি লিখতে যাব, তখন ও বলল, 'যদিও তুই ফোনটার সময় ক্ষু
আমার কথাগুলোই তুমেছিলি, সেখার সময় এমন জাবে সেখ মেন দুই তরফের
কথাই ক্ষমতে পাচ্ছিস। তাহলে পাঠক মজা পাবে।'

আমি ওর কথাগুলোই লিখছি।

'হ্যালো।'

'মিঃ মিশির ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি "আর" কথা বলছি।'

"আর" ?

'মুনসীর ডায়রিয়ে "আর"।'

'ও। তা হঠাৎ আমাকে ফোন কেন? মুনসীর সঙ্গে আমার মশ্পর্কের কথা
আপনি জানলেন কী করে ?'

'আপনি আজ সকালে মুনসীর বাড়ি যাননি ?'

'তা তো যাবই। মুনসী আজ ভোর রাত্রে খুন হয়েছেন। সেই কারণেই যেতে
হয়েছিল।'

'আপনার চেহারা অনেকেব কাছেই পরিচিত। সেটা আপনি জানেন বোধহয়।
মুনসীর বাড়ির সামনে ভিড় এবং পুলিশ দেখে প্রতিক্রিয়াদের অনেকেই বারান্দায়
এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরই একজন আপনাকে চিনে ফেলে আমার এক
পেশেন্ট। আমিও ডাক্তার সেটা জানেন কি? এই পেশেন্টের বাড়ি গেস্লাই
খণ্টাবানেক আগে। তারই কাছে শুনি মুনসীর মৃত্যু ও আপনার উপস্থিতির খবর।
দুইয়ে দুইয়ে চার কারে বুঝি মুনসী আপনাকে এমন্ত্র করেছিল।'

'আপনার আসল নামটা জানতে পারি কি?'

'না, পারেন না। ওটা উহাই থাকবে। আমি জানতে চাই মুসী আপনাকে
আমার স্বরক্ষে কী বলে।'

'উনি বলেন, আপনাকে উনি যথেষ্ট চেনেন এবং আপনাকে নিয়ে চিন্তা করার
কোনো কারণ নেই। ডায়রিটা বেরছে এবং তাতে আপনার অতীতের বটো
থাকছে জেনেও নাকি আপনি কোনো আপত্তি করেননি।'

'ননসেস! সম্পূর্ণ মিথ্যা। ও আমাকে জানাবে কী করে? আমি তো পন্তে নিন

বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরেছি সবে পর্ণ রাতে। বাড়িতে এসে পুরানো স্টেটসম্যান বাটতে মুনসীর ভায়রি পেঙ্গুইন ছাপছে এ ব্বরটা দেখি। মুনসী সাইকায়াট্রিস্ট হওয়াতে অনেক ব্বরটা পড়ে আমার অস্তি লাগে। মুনসী সাইকায়াট্রিস্ট হওয়াতে অনেক অনোবিকারজন্ত ব্যক্তিক হাঁড়ির ব্বর সে জানে; আমারতো বটেই। সে সব কথা কি সে ভায়রিতে লিখেছে?

‘আমি মুনসীকে ফোন করি। সে শীকার করে যে আমার ঘটনা তার ভায়রিতে স্থান পেয়েছে, তবে আমার নাকি চিনার কোনো কারণ নেই এই জন্মে যে আমার নামের শুধু প্রথম অক্ষরটা ব্ববহার করা হয়েছে। ...কিন্তু তাতে আমি অস্তি হব কেন? আমি চরিবিশ বছর আগেও ডাক্তার ছিলাম, এখনও আছি। তখনকার অনেক পেশেন্ট এখনও আমার পেশেন্ট। ভায়রি থেকে তারা আমার চিনে ফেলবে না তার কী গ্যারান্টি?’

‘আমি কিন্তু ভায়রিটা পড়েছি। আমার মনে হয় আপনার চিনার কোনো কারণ নেই।’

‘আপনি যখন পড়েছেন তখন আমি পড়ব। সে কপটা আমি মুনসীকে বলি। আমি বলি যে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে তোমার সেখা পড়ে বিচার করব সেটা ছাপলে আমার কোনো ক্ষতি হবে কিনা। তুমি আমাকে সেখাটা দাও। যদি না দাও তাহলে তোমার অতীতের ঘটনা আমি ফাঁস করে দেব।’

‘এ আবার কী বলছেন আপনি?’

‘মিস্টার মিস্টির, আমি আর মুনসী একই বছর লওনে যাই ডাক্তারি পড়তে। আমার বিষয় যদিও মনোবিজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমাদের দুজনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আমি মুনসীর যে চেহারা দেখেছি সে চেহারা কলকাতার কেউ দেখেনি। সে সেখানে উচ্ছবে যেতে চলেছিল, আমি তাকে সামলাই, তাকে সোজা পথে নিয়ে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে প্রাকটিস শুরু করার পর সে এখন এখন নিজেকে সংস্কার করে।’

‘আপনি মুনসীর বাড়ি গিয়ে তার কাছ থেকে সেখাটা চেয়ে আনেন?’

‘আজো হ্যাঁ। গতকাল রাত এগারোটায়। বলেছিলাম দুদিন পরে সেখাটা কেরত দেব। এখন অবিশ্ব তার কোনো প্রয়োজন নেই।’

‘নেই নানে! আপনি পাতুলিপি কেরত দিলেই সেটা ছাপা হবে। সেখকের মৃত্যুর পর তার বই ছাপা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। একে ইংরিজিতে পসখ্যদাম পাবলিকেশন বলে সেটা আপনি জানেন না?’

‘জ্ঞানি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হবে না। সেখাটা আমি পড়েছি। সেটা আমার কাছেই থাকবে। বই হয়ে বেরোবে না। আসি।’

ফেলুন্দা রিসিভারটা নাখিয়ে রেখে দিল, তার মুখ গঁড়ীও ।

‘লোকটা এমন করে আমার উপর টেক্কা দিল ?’ খপ করে সোমন্দা বসে বলল ফেলুন্দা । ‘এ সহ্য করা যায় না, সহ্য করা যায় না ! ... আব এমন একটা চমৎকার লেখা—এইভাবে বেহাত হয়ে গেল ?’

‘লেখাটা নিয়ে ভাববেন না, ফেলুন্দা !’ একটু যেন রাগত ভাবেই বললেন ফেলুন্দা । ‘দা খুন ইচ্ছ মাচ মোর ইঘপটাটি দ্যাম দা সেখা ।’

‘আপনি লেখাটা পড়েও একথা বলছেন ?’

‘বলছি । যেখানে মার্ডির হ্যাজ বিন কমিটেড, সেখানে আব ওসব কিছু তার কাছে দৃঢ় ।’

ত্রৈমাস এসে ববর দিল ভাত বাড়া হয়েছে । আমরা ভিনজনে খাবার ঘরে খেতে বসলাম । লালমোহনবাবু যদিও কেশ কঢ়িয়ে সঙ্গে খেলেন । এমন কি চিংড়ি মাছের মালাই করিটা খেতে খেতে বসলেন, ‘আপনাদের জগাজাপের দামার তারের কুলনা দেই ;’ ফেলুন্দা শুক্রতো থেকে দই পর্যন্ত একবারও মুখ খুলঙ্গ না ।

খাবার পর ভিনজনে ভিনটে পান মুখে পুরে বসবার ঘরে বসতেই ফোনটা বেজে উঠল । আমিই ধরলাম । ইলস্পেক্টর সোম ! আমি ফেলুন্দার হাতে ফোনটা চালান দিলাম । ‘বজুন স্যার’-এর পর ফেলুন্দা কেবল দুটো কথা বলল । প্রথমে মিনিট খানেক কথা শনে বলল, ‘তাহিসেতো খুনটা বাড়ির লোকে করেছে বলেই মনে হচ্ছে’ আব ফোনটা বাষ্পবান্ধ আগে বলল—‘তোরি ইন্টারেস্টিং আমি আসছি ।’

‘কোথায় যাচ্ছ ?’ আমি জিগ্যেস করলাম ।

‘মুনসী প্যালেস’, টেবিল থেকে চার মিনারের প্যাকেটে আব লাইটারটা তুলে পাকেটে পুরে বলল ফেলুন্দা ।

‘খুনটা বাড়ির লোকে করেছে কেন বললেন ?’ জটায়ুর অংশ ।

‘কাবণ নিস্তারিণী কি আবিষ্কার করেছে যে একটা হামানদিকা মিলি । এ প্রারম্ভেষ্ট মার্ডির ওয়েপন ।’

‘আব ইন্টারেস্টিংটা কী ?’

‘মুনসীর একটা ডায়ারি পাওয়া গেছে যাতে এ বছরের প্রথম দিন থেকে মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত এন্ট্রি আছে । ... চলুন বেরিয়ে পড়ি ।’

এলটি আছে ১৯৯০ পঞ্জলা জানুয়ারি থেকে মুনসী মাঝা যাবার আগের রাত, অথবা ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ডায়রিটা সম্পত্তি খাটের পাশের টেবিলে রাখা ছিল। সেখান থেকে যাটিতে পড়ে যায়। পুলিশ সেটকে মাটিতেই পায়।

ডায়রিটা সোমের কাছ থেকে নিয়ে প্রথম পাতা খুলেই ফেলুনোর কোথা কিসে আটকে গেল। কিছুক্ষণ দ্রুতি করে পাতাটির দিকে চেয়ে থেকে আবার যেন সন্তুষ্ট ফিরে পেয়ে পাশে দাঁড়ানো শক্তরবাবুকে ভিগেস করল। 'আপনি জানতেন যে আপনার বাবা ডায়রি রাখার অভ্যন্তর শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন ?'

'একবারেই না। তবে তার যে অবাক হচ্ছি তা নয়, কারণ চালিশ বছর একটানা লিখে হঠাৎ বন্ধ করার তো কোনো কারণ নেই।'

'সুখময়বাবু জানতেন এই ডায়রির কথা ?'

'সেটা ওকেই ভিজেস করলুম।'

আমরা সকলে বসবার ঘরে জমায়েত হয়ে ছিলাম। মিনিট ধানেকের মধ্যেই সুখময় চতুর্বৰ্তী এলোন। ফেলুন প্রথম করাতে সুখময়বাবু বললেন, 'ডাঃ মুনসী ডায়রি লিখতেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু উনি কাজটা করতেন দিনের শেষে শুভে যাবার আগে। ডায়রি শোবার ধরেই পাকত নিশ্চয়ই, এই লাল বই আমি কোনোদিনই দেখিনি।'

'বসুন।'

সুখময়বাবু দাঁড়িয়ে কথা বলাছিলেন, ফেলুন বলতে যেন একটু অবাক হয়েই বসলেন। আমি বুঝলাম ফেলুন আরো কিছু ভিগেস করতে চায়।

'সুখময়বাবু', বলল ফেলুন, 'আপনি নিশ্চয়ই চান যে ডাঃ মুনসীর আততায়ীর উপযুক্ত শাস্তি হোক। তাই নয় কি ?'

'আমার দায়িত্ব', বলে চলল ফেলুন, 'হল সেই আততায়ীকে খুজে বাব করা। একটা কারণে এখন আমরা বুবতে পারছি যে আততায়ী এই বাড়িতেই রয়েছেন। সেদিন আমি এই বাড়িতে যাবা থাকেন তাদের প্রত্যেককে জেরা করেছি। তার ফলে আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। হয়ত আমার তবক থেকেই যথেষ্ট প্রশ্ন করা হবিনি, এবং যাদের প্রশ্ন করেছি তারা আমার সব প্রশ্নের উত্তৰ দেননি। একটা অরু আমি সেদিন করিনি, আজ করতে চাই।'

'বলুন।'

'একটা ব্যাপারে আমাদের মনে ঘট্টকা জেগেছে।'

'কী ?'

'শক্তরবাবুর মতে ডাঃ মুনসী তাঁর সেবা এবং পেশেন্ট ছাড়া আব সবকিছু সহজে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আপনিতো তাঁর পেশেন্টও নন, তাহলে আপনার

প্রতি তিনি এতটা ব্রহ্মবর্ণ করবেন কেন? ভাস্যিতে পড়েছি পীচ বছর আসে আপনার আপেক্ষিসাইটিস অপারেশন হয়; তার সমস্ত বরচ মুন্সী বহন করেন। অপারেশনের পর আপনি দল দিলের জন্য পূরী যান; সে খরচও তিনি বহন করেন। কেন? এর কোনো কারণ আপনি দেখাতে পারেন? এই পক্ষপাতিক্ষ কিসের জন্য?’

‘জানি না।’

উত্তরটা আসতে যে যৎসূচিত দেবি হল সেটা নিশ্চয়ই ফেলুন। লক্ষ করেছে। সেটা তার পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

‘আমি আবার বলছি সুখময়বাবু, আপনি সত্যি কথা বললে, বা গোপন না করলে, আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।’

এবাবে উত্তরে দেবি হল না।

‘আমি সত্যি বলছি।’

পালঘোহনবাবু আমাদের শামিয়ে দিয়ে ‘তুমরো মর্নিং’ এলে গড়পার ফিরে গেলেন। ফেলুন। সোজা তার শোবার ঘরে চুকে দরজাটা ভেঙ্গিয়ে দিল। বুকল্যাঘ সে ভাস্যিতে ঘনেনিবেশ করবে; ঘড়িতে এখন তিনটে পঁচিশ।

পাখাটা খুল স্পীড করে দিয়ে সোফায় গা ছড়িয়ে শুয়ে আমি একটা ন্যাশনাল ভিউগ্রাফিক ম্যাগাজিন খুলে অ্যানটার্কটিকার বিষয় চমৎকার সব ছবি সমেত একট লেখা পড়তে লাগলাম।

সাতে চারটায় শ্রীনগু জা আনল। আবারটা টেবিলের উপর রেখে ফেলুন। ঘরের দরজায় টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুন। বেরিয়ে এসে বলল, ‘এ ঘরেই জা দাও।’

বুঝতেই পারছি ভাস্যিটা পড়া হয়ে গেছে, তাই জিগোস করলাম, ‘কিন্তু পেলে?’

ফেলুন কাউচে বসে পকেট থেকে ডায়রি আর চারমিনারের প্যাকেটটা ধার করে টেবিলের উপর রেখে গরম চায়ে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বলল, ‘তোকে কয়েকটা আইটেম পড়ে শোনাচ্ছি। আমার মনে হয় চিন্তার খোরাক পাবি।’

আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম। ডায়রির মাথার দিকটা দিয়ে কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ উকি মারছে। ফেলুন কোনোরকম তাড়াচড়ো না করে একটা চারমিনার ধরিয়ে প্রথম টুকরো মার্কে ডায়রিটা খুলল।

‘শোন, এটা তিন সপ্তাহ আগের এন্ট্রি। আমি ইংবিজি থেকে বাসা করছি। ‘আজ একটি নতুন পেশেন্ট। রাধানাথ মলিক। আমার ঘরে চুকে চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ ধার করে হ্যাতের তেলোয় রেখে সেটা দিকে আর আমার দিকে বাঁকয়েক দেবে কাগজটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার

বাবেটো ফেলে দিল। ওটা কী ফেললেন জিয়োস করাতে ভঙ্গলোক বললেন। টেলিভারের কবর আপনার ছবি সম্মেত। আমি বললাম, আপনি কি যাচাই করে নিলেন তিক সোকের কাছে এসেছেন কিনা? এবাবে একটা হোটেল বিশেষবৎ ছিল। “আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, কাউকে না! যাচাই করে নিতে হবে বৈকি।”
...সাসিকিউরিটি মেনিয়া।

চার পাতা পরে ছিঠীয় এন্টি।

‘শেন—আর, এম-কে, নিয়ে সমস্যা। মে নিজের বাড়িতে একদণ্ড টিকতে পারে না। তার দাদা, তার পড়ালী সকলেই তার মনে আতঙ্গের সংয়োগ করছে। ডিফিকল্ট কেস। আমি বলেছি কাল থেকে যেন সে আমার এখানে চলে আসে। দুটো হর ত্রো খালি পড়ে আছে দোতলায়; তার একটাতেই থাকবে।’

ভুট্টায় এন্টি, এটাও দিন চারেক পরে।

‘আর, এম-কে নিয়ে সমস্যা ছিটকে না। আজ একে কাউচে শোয়ানোর আগে ও আমার আশিসে এসে বসেছিল। আমি তখন বিলেত থেকে সদা আসা একটা জুকুরী চিঠি পড়ছি। পড়া শেষ করে ওর সিনে চেয়ে একটা আশ্চর্য দাপ্তার দেখলাম। আমার ভারী কৌচের পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে ও কেমন যেন অঙ্কুর ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও যদি আমাকেও ওর শত্রুপক্ষ মনে করে তাহলেতো মুশকিল।’

চার নম্বর এন্টি।

‘আমার ওযুক্তের শিশিটা ভুল করে আপিস ঘরে ফেলে এসেছিলাম, বাবে শোবার আগে সেটা আনতে গিয়ে প্যাসেজ থেকেই বুঝলাম ঘরে বাতি ঝুঁটু! ভেবেছিলাম হয়ে সুব্যবহৃত কোনো কাজ করছে, কিন্তু গিয়ে দেখি শুভ। সে আমার দিকে পিঠ করে ধূকে পড়ে টেবিলের নীচের দেখাজটা বক করছে। আমার দেখে গায়া অপ্রকৃত হয়ে থাম ওর এয়ার মেল থাম ফুরিয়ে গেছে তাই এখানে আছে কিনা দেখতে এসেছিল। আমি ওকে দুটো খাম দিয়েছিলাম।...ওই দেরাতেই ধাকে আমার পাতুলিপি।’

এরপরে একেবারে শেষ পাতায় শেষ এন্টি। এর সঙ্গে বাধাকান্ত মিলকের কোনো যোগ নেই, আর এটা সত্তিই রহস্যজনক।

‘কী ভুলই করেছিলাম!...যাক, তবু কে ভুলটা ভেঙেছে! কিন্তু “আর” এর ক্ষেত্রে কি অহলে অনিদিষ্টকাল ঘরে চলবে? নাকি ওটা নিয়ে অথবা চিন্তা করছি?’

ফেলুন্দা ডায়রিটা বক করে একটা দীর্ঘাস ফেলে বলল, ‘অঙ্কুর কেস।’

‘তাৰ মানে রহস্যের জট এখনো ছাড়াতে পাৰনি?’

‘না, তবে কীভাৱে প্ৰোসীম কৰতে হবে তাৰ একটা ইঙ্গিত পেয়েছি। এবাৰ

কিছু সৈহিক পরিক্রম আছে। কৃটিন এমকোয়ারি। তুই জটায়ুকে যোন করে যাবে না কাল যেন সকালে না এসে বিকেলে আসেন। সকালে আমি ধাক্কি না।

॥ ৯ ॥

ফেলুনা পরদিন সকাল অট্টোয় বেরিয়ে আড়াইটোয় ফিরল। এ নাকি বাইরেই লাখ সেবে নিয়েছে। কাজ হল কিনা জিজেস করতে ঠিক ভবসা পাঞ্জিসাম না। কাবণ ওর অধো একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করেছিলাম; তার মানে সারেস না ফেইলণ্ডের সেটা বৃথাতে পারছিলাম না।

ফেলুনা সোফায় বসাব আগে দুটো যোন করল, একটা শুরু মুনসীকে, অন্যটা ইনস্পেক্টর সোমকে। দুজনকেই একই ইন্স্ট্রাকশন, আগামীকাল সকাল দশটায় সুইনহো স্ট্রিট বৈঠকে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

এখাব একটা চারিমিনাৰ ধৰিয়ে ফেলুনা সোফায় বসে সামনেৰ টেবিলেৰ উপৰ পাটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমাৰও মুনসীৰ মতো বলতে ইচ্ছা কৰছে, তী ভুলই কৰেছিলাম!... রহস্য উদ্ঘাটনেৰ চাৰি সবকটা চোখেৰ সামনে পাঢ় আছে, অখচ দেখতে পাঞ্জিসাম না।'

আমি একটা কথা না জিজেস কৰে পারলাম না।

'অপৰাধীকে আমৰা চিনি তো ?'

'নিচয়ই', বলল ফেলুনা। 'তোৱ ব্যবন এত কৌতুহল, তবন আমি তোকে কয়েকটা প্ৰশ্ন কৰছি যেগুলোৱ উভৰ ঠিকমতো দিতে পাৱলে হয়ত তুই নিজেই সমস্যাৰ সমাধান কৰতে পাৰিবি।'

আমি চুপ, ধূক তিপ তিপ।

'এক, নতুন ভায়িটোয় লক্ষ কৰাৰ মতো বিশেষ বিছু মেখলি ?'

'একটা ব্যাপারে খটকা লাগল।'

'কী ?'

'খনেক আগেৰ বাত পৰ্যন্ত ভায়ি লিখে গেছেন ভদ্ৰলোক, কিন্তু "আৱ" আসাৰ কোনো উৎসৱ নেই।'

'এক্সেলেট ! দুই বিসজ্জন কথাটা বলতে প্ৰথমেই কী হনে হয় ?'

'নাটক। ব্ৰৰীপুনাথ।'

'হল না।'

'দীড়াও দীড়াও ! জল...জলে কিছু ফেলে দেওয়া।'

'গড় ! তিন, সেমেসিস কাকে বলে জানিস ?'

'জেবেসিস ?'

‘হাঁ।’

‘ইঁরিজি কথা ?’

‘উহু। গ্রীক।’

‘ওরে বাবা, সে কী করে জানব ?’

‘তাহলে শিখে নে। অপরাধ করে যে শাস্তি সাধ্যিকভাবে এড়িয়ে গেলেও একমিন-সা-একমিন তোম করতেই হয়, তাকে বলে নেমেসিস। এই নেমেসিস এবই তয় পাছিল “এ”, “জি” আৰ “আৱ”।’

আমাৰ ব্যাপারটা বুবই ইটোৱেন্টিং লাগছিল, তাই ফেলুন্দা চূপ কৰে আছে দেখে বললাম, ‘আৱো আছে ?’

‘আৱ একটা বলব। বেশি বললে কালকেৰ নাটকটা জমবৰ না।’

‘ঠিক আছে।’

‘ফিজিশিয়ান হীল দাইসেলফ, মানে জানিস।’

‘এডে। ইঁরিজি প্ৰবাদ, ডাঙুৰ, আগে নিজেৰ দাবাব সাৰাব।’

‘আৱেকটা শেষ কথা বলে দিছি তোৱে, “দাঙুৰ” কথাটাৰ অনেক গুলু মানে পাৰি অভিধানে, তাৰ বধো দুটো মানে নিয়ে আমাজেৰ কাৰবাৰ।’

‘বৃঞ্জি।’

চা দেবাৰ মিনিট দশক আগে ভটায় এসে হাজিৰ। কাউচে বসেই প্ৰথম প্ৰশ্ন হল, ‘আমৰা কোন স্টেজে আছি ?’

উত্তৰে ফেলুন্দা ‘মিনার্ভা’ বলে লালমোহনবাবুকে অস্পৰ ঘৃণি কৰতে দেখে বলল, ‘পেনালটিমেট।’

‘পেনালটি, কী বসলৈন ?’

‘আপনাৰ ইঁৰিজিটা আৱ রল্প হল মা কিছুতেই। পেনালটিমেট মান লাস্ট বাট ওয়ান।’

‘লাস্ট স্টেজে পৌছাওছি কৰে ?’

‘কাল সকাল দশটায় মূলসী প্যালেসে সৰ্বসমক্ষে যৰনিকা উভোলন।’

‘আৱ পতন ?’

‘ধৰন, তাৰ আধ ঘটা বাদে।’

‘চাৰজনেৰ উপৰ তো সন্দেহ—’

‘হাঁ, ইনি, মিনি, মাইনি, মো।’

‘উঁ, কথায় কথায় আপনাৰ এই প্ৰগল্ভতা অসহ্য। এইটো অন্তু বলুন যে শকুন, সুশময়, রাধাকান্ত—’

ফেলুন্দা হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, ‘আৱ স্পিক-টি-নট। এইখানেই দাঁড়ি।’

‘আপনি দিন দাঁড়ি। আমাৰ বসা শেষ হয়নি। নটকেৰ ক্ষাইমান্দা আমাৰ

হাতে, আপনার হাতে নয়। এটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিলুয়।'

'আপনি যে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।'

'ডয়ের কিম্বু নেই। আপনার সিংহাসন কেউ টোলতে পারবে না। আর তারিফের সিংহভাগ আপনিই পাবেন তাতে সাদেহ নেই। কিন্তু সিংহাসনের পাশে একটি ছোট প্রস্থাল আসন, আর তারিফের পাশে একটি মিনি-তারিফ, এ দুটো আমার ব্যবাদ থাকবেই।'

পরদিন তোরে এক পশলা বষ্টি হওয়াতে আমাদের পাড়াতে কিছুটা জল জমেছিল, তাও ঠিক সাড়ে নটার সময় বগলে ছাতা, কাঁধে ঝোলা আর মুখে হাসি নিয়ে লালমোহনবাবু এসে হাজির। 'তপেশ তাই', কাউচে বসে বললেন ভট্টোক, 'জগঘাথকে বোলো যেন আজি খিচুড়ি করে। নাটকের পর মধ্যাহ্নে তোক্ষনটা এখানেই সাবব।'

১। যেযে দশটার পৌঁচ মিনিট আগেই আমরা সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। আমাদের আগেই পুলিশ হাজির; ইন্সেপ্টর সোম ফেলুন্দাকে গুড মর্নিং করে বললেন, 'আমি আপনার ব্যেপড়তোজানি। তাই সকলকেই বৈঠকখানায় জমায়েত হতে বলে দিয়েছি, বেয়ারা বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কেবল মিসেস মুনসীরও থাকার দরকার কিনা সেটা জানার ছিল।'

ফেলুন্দা মাথা নেড়ে বলল, 'উনি না থাকাটাই বাস্তুনীয়।'

সবাই যে যার জায়গা নিয়ে বসতে না বসতে এক জ্বাল বড় ঘড়িতে ২ঁ টঁ করে দশটা বাজল। ফেলুন্দা উঠে ধৰ্তিয়ে একবার ঢারদিকে দেখে নিয়ে ধড়ির শেষ চেঞ্চের রেশটা মিলিয়ে যেতেই কথা আরম্ভ করে দিল।

'আমি প্রথমেই শক্রবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

শক্রবাবু ঘরের উল্টোদিকে বসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ফেলুন্দার নিকে ঘুরল। ফেলুন্দা বলল, 'আমি সেদিন যখন বললাম যে ডাঃ মুনসী তাঁর ডায়বিতে অনেকবার আপনার উজ্জ্বেল করেছেন, তা শুনে আপনি বিশ্বিত হন। এবং আমি যখন বললাম যে তিনি আপনার সহশ্রেণী নিশ্চয় সত্যি কথাই বলেছেন। তখন আপনি বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, 'বাবা আমাকে চিনলেন করে, তীব্রভাবে তিনিতো তাঁর কগী নিয়েই পড়ে থাকতেন।' শক্রবাবু আপনি কেন ধরে নিলেন যে বাবা আপনার স্বরক্ষে অগ্রিয় কথাই বলেছেন? আমিতো কিছুই বলিনি।'

'কারণ বাবা সামনা-সামনি আমার কথনো প্রশংসন করেননি।'

'নিন্দে করেছেন কি?'

'না, তাও করেননি।'

'তাহলে আপনিই বা আপনার স্বরক্ষে ডাঃ মুনসীর প্রকৃত মনোভাব কী করে

জানলেন ?

‘ছেলে তার বাবার মন জানবে না কেন ? সে তো অনুমান করতে পারে ।’

‘বেশ, এবার আরেকটা কথায় আসি । আমি গতকাল দৃশ্যের একবার আপনাদের এখানে এসেছিলাম । এ বাড়িতে ভৃত্যহনীয় যাবা আছে তাদের ডেকে ডেকে আঁচি কয়েকটা প্রশ্ন করি । একটা প্রশ্ন আপনাকে দিয়ে : সেটাৰ উত্তব দেয় আপনাদের মালি গিরিধারী । প্রশ্নটা ছিল, আপনার বাবার দুনীৰ দিন সে আপনাকে তোৱে বেরোতে দেখেছিল কিনা । মালি বলে, হ্যাঁ দেখেছিল । তখন আমি জিগ্যাস করি আপনি মালি হাতে বেরোন কিনা । উত্তবে মালি ধলে, না । আপনার হাতে একটা কালো চামড়াৰ ব্যাগ ছিল । বর্ণনায় দুটি সেটা শ্রীফকেস বা পোটফোলিও ভাতীয় বাগ । এই ব্যাগে কী ছিল সেটা বলবেন কি ?’

শক্রবাবু চুপ । তাঁৰ নিরাস জোৱে জোৱে পড়তে শুরু করেছে ।

‘আমি বলব কী ছিল ?’ বলল ফেলুদা । শক্রবাবু নিচৰ্তব । ফেলুদা বলল, ‘ব্যাগে ছিল আপনার বাবার ডায়বিৰ পাণুলিপি । তাজাতেৰ সঙ্গে দেখা কৰে, বা কৰার আগে, আপনি সেটা লেকেৰ জলে বিসর্জন দেন তবে তাৰ কৰণ’, ফেলুদার গলা চড়ে ওঠে, ‘আপনি ভায়িটা পড়ে দেখেছেন যে আপনার বাবা আপনার সহজে একটিও প্রশংসনোচক কথা বলেননি । তিনি—’

ফেলুদার গলা ছাপিয়ে শক্রবাবু বলে উঠলেন, ইয়েস, ইয়েস ! এই বই ছাপা হলে আমাৰ বোজগাঁওৰ বাজা চিৰকালোৱে জন্ম বৰ্ত হয়ে যেত । অলস, উদ্যমহীন, ইয়েসপনসিবল, অস্তিৰহতি, কী না বলেননি উনি আমাকে !’

‘রাইট, বলল ফেলুদা । ‘তাহলে এটাও স্বীকাৰ কৰুন যে সেদিন গলাৰ দ্বাৰা পালটিয়ে “আৰ”-এৰ কুমিকা নিয়ে আপনিই আমাকে কোনটা কৰে আপনার বাবা সহজে কৃড়ি কৃড়ি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, সন্দেহ যাতে আপনার উপৰ না পড়ে ?’

শক্রবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, এবার ধপ্ কৰে বসে পড়লেন ।

“‘আৰ’-এৰ কথাই ব্যবহ উঠল’, বলল ফেলুদা, ‘তখন ব্যাপারটা আরেকটা তলিয়ে দেখা যাক ।’

ফেলুদার দৃষ্টি এবার ধীয়ে বসা সুখময়বাবুৰ দিকে মুৱল ।

‘আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন কৰতে চাই ।’

‘কৰুন ।’

‘ইংৰিজিতে যাকে হাঁক বলা হয়, সেই হাঁকেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে আমি গতকাল সকালে একবার সীইঞ্জিল নথৰ বেলতলা রোডে যাই । সকলোৱ অবগতিৰ জন্ম বলাই । এটা হল সুখময়বাবুৰ বাড়িৰ নথৰ । আমাৰ যনে হচ্ছিল উনি কিছু তথ্য গোপন কৰে যাচ্ছেন, এবং হয়ত ওৱে বাড়িৰ লোকেৰ সঙ্গে কথা

বললে কিছুটা আলোর সঞ্চাল পাওয়া যেতে পারে।'

কেলুদার দৃষ্টি ধূরে গিয়েছিল, এখন আবার ফিল এল সুখময়বাবুর দিকে।

'আপনার মা-র সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি আপনার বাবার মৃত্যু হয় চক্রিশ বছর আগে, গাড়ি চাপা পড়ে।...এই তথ্যটি কি ডাঃ মুনসী জানতেন ?'

দৃষ্টি যেখে থেকে না তুলেই উঠের দিলেন সুখময়বাবু।

'জানতেন। ইন্টারভিউ-এর সময়, আমার বাবা পাইক্রিশ বছর যখনে আরা যান জেনে ডাঃ মুনসী জিগোস করেন কিসে তাঁর মৃত্যু হয়।'

'শূর সড়ক লোকেরও কেমন ভুল হয় তার একটা উদ্বাহন দিই। শক্তি মুনসী যখন আমার বাড়িতে আসেন তখন তিনি নিজের পরিচয় দিতে বলেন যে তিনি ডাঃ বাকেম মুনসীর ছেলে। এই গাজেন নামটা আমার মাপা পেকে বেয়ালুম লোপ পেয়ে যায় ; যেটা থেকে যায় সেটা হল "ডাঃ মুনসী"। কাল উর লাল ডায়রি খুলে প্রথম পাতাতেই "আর মুনসী" দেখে আমি চমকে উঠি। তাহলে কি ডাঃ মুনসী নিজেই তাঁর ডায়রির "আর", এবং তিনিই গাড়ি চাপা দিয়ে লোক হেরে চতুর্দিকে ঘুম দিয়ে আইনের কবল থেকে নিজেকে বীচান, আর সেই মৃত ব্যক্তিই হেলে তাঁরই কাছে আসে চক্রিশ বছর পরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ?'

'ভুল, ভুল, ভুল !' টেলিয়ে উঠলেন সুখময়বাবু। 'আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর উপর্যুক্ত শাস্তি হয়।'

'সে কথা কি ডাঃ মুনসী জানতেন ?'

'না। তাঁর ধরণা ছিল তিনিই আমার বাবার মৃত্যুর জন্ম দায়ী। আসল ঘটনা তিনি জানতে পারেন মৃত্যুর আগের দিন।'

'কীভাবে ?'

'উনি আমাকে ভেকে বলেন যে উর একটা স্বীকারোক্তি করার আছে যেটা না করলে উনি শাস্তি পাবেন না। স্বীকারোক্তি কী জানতে পেতে আমি বলি, ডাঃ মুনসী, আপনি ভুল করছেন ; আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর শাস্তি হয়েছিল। কথটা শনে উনি স্পষ্টভাবে হয়ে যান। আর আহিও বুঝতে পারি কেন তিনি আমার উপর এত সদয় ছিলেন।'

ঘরের উলটোদিক থেকে একটা হোট, উক্কেলো হিসি শোনা গোল। শক্তরবায়ু।

'কিছু বলবেন ?' কেলুদা জিগোস করল।

'না বললে আপনি আরো বেশি ভুল পথে গিয়ে পড়বেন।'

'মানে ?'

'আমার বাবা জীবনে কখনো গাড়ি চালাননি।'

'সে তথ্য আমার অজ্ঞান নয়, শক্তরবায়ু। মালির সঙ্গে কথা বলার পর আপনার দ্রুতিভাবের সঙ্গে আমার কথা হল।'

‘সে কী বলে ?’

‘তিথি এক্ষে সে আপনাদের ড্রাইভারি করছে, তার মধ্যে সে মাত্র একটা অ্যারিভেট করেছে। তাতে আপনার বাবার তাড়া ছিল বলে অনিষ্টা সর্বেও জনবহুল গ্রাম্য তাকে জোরে গাড়ি চালাতে ইচ্ছিল। তাই এখন দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন ডাঃ মুনসী খানিকটা নিজেকেই দায়ী করেন। ড্রাইভারের খাতে দও না হয় তার জন্য তিনি যা করবার সবই করেছিলেন। তা সব্যেও ড্রাইভারের অনুত্তুপ আর আতঙ্ক কিছুতেই যাচ্ছিল না। তখন ডাঃ মুনসী তার চিকিৎসা কারে তাকে ভালো করে তোলেন। অর্থাৎ আপনার বাবা ডায়রিতে একটু ওমিথো লেপেন্সনি। এবং “আর” হচ্ছে নট কাজেন মুনসী, বাট ড্রাইভার রহনন্দন তেওয়ারি।’

‘বাট কিল্ড মাই ফাদার !’ অসহিষ্ণুভাবে টেচিয়ে উঠলেন শক্তির মুনসী।

‘এসব ব্যাপারে একটু দৈর্ঘ্য ধরতে হয়, মিঃ মুনসী।’ গাত্তীর স্বরে বলল ফেলুদা। তারপর মুনসীর দিক থেকে তার দৃষ্টি মূরে একটি অনা বাত্তির উপর গিয়ে পড়ল। ‘এ সবে একজন ব্যক্তি আছেন যাকে আমরা অসুস্থ বলে জানি,’ বলল ফেলুদা। ‘এর আগে তিনি দুবার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এবং দুবারই নানান অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে নিজেকে অসুস্থ বলে প্রতিপন্থ করার চেষ্টা করেছেন। আজ তাকে দেখছি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের চেহারা নিয়ে আবার ভাসণ করছেন। মিঃ মাস্টিক—আপনি কি আপনা থেকেই সেরে গেজেন ?’

বাথাকান্ত মার্জিক হঠাৎ ফেন শক থাওয়া মানুষের মতো চমকে উঠলেন।—‘কী—কী বলছেন ধজুন !’

‘বলছি যে আমার ক্ষেত্রায় সকলেই অস্বাভিস্তুর মিথ্যা বলেছেন বা মতা গোপন করে গেছেন, কিন্তু আপনি সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন।’

মার্জিক এখনো এক দৃষ্টি ফেলুদার দিকে তেয়ে, তার মনের ভাব গোঁথার কোনো উপায় নেই। ফেলুদা বলল, ‘আপনি বলেছিলেন পপুলার টার্মিনালে গোপন কাজ করেন। আমি সেটা ভেরিফাই করতে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে ওনলাইন আপনি আর সেখানে নেই, চার মাস হল ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি কি তাহলে বেকার ! না অন্য কোথাও কাজ করছেন ? ইনশিওরেন্সি অফিসে এ প্রয়োজনবাব কেউ দিতে পারল না বলে আপিস থেকেই আপনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সতীশ মুখাজী সোজ, তাই না ?’

মার্জিক এখনো চুপ, তার দৃষ্টি সামনের দিকে।

‘সত্তা, এ মামলায় বিশ্বায়ের শেব নেই,’ বলে চলল ফেলুদা। ‘আপনি ডাঃ মুনসীকে বলেছিলেন আপনার বাবা, আপনার দাদা, সকলেই আপনার মনে আতঙ্কের সংক্ষার করেছে। অপ্ত আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনার বাবা দাদা, কেউই নেই। বাবা মারা গেজেন প্রায় পাঁচিশ বছর হল, আর দাদা বলে কেউ

কোনোদিন ছিলই না । আপনার বিধুরা মার কাছ থেকে জানি যে আপনি একটা যাত্রা কোম্পানিতে যোগ দিবেছেন এবং বর্তমানে টুরে আছেন ।"

এবাবে রাধাকান্ত মর্জিক মুখ বুললেন ।

'আমি যে সত্যবাদী ঘুধিটির এটা আমি কোনোদিনই ক্ষেম করিনি । কিন্তু আপনি কী বলতে চান ? আমি খুন করেছি ?'

'আমি ধাপে ধাপে এগোই, মর্জিক মশাই, লাকে লাফে নয় । আপনি খুনী কিনা সে ব্যাপারে পরে আসছি ; অথবে দেখছি আপনি প্রবণতা । মনোবিকারের অভিনয় করে আপনি মুনসীর কাছে এসেছিসেন চিকিৎসার জন্ম । আপনি—'

'কেন এসেছিলাম সেটা জানেন আপনি ?' ফেল্ডসাকে বাবা দিয়ে জোরালো গলায় বললেন মর্জিক ।

'এটা আপনার মা-র কাছ থেকে জানি যে আপনার বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান, যিনি চাপা দেন তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি, এবং গাড়ির মর্জিক এসে আপনার মা-র হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে ।'

'ইয়েস !' চেচিয়ে উঠলেন রাধাকান্ত মর্জিক । 'তবনই দেবি আমি ভদ্রলোককে, আর তারপরে ছবি দেখি কাগজে এই সেদিন । সেই একই চেহারা, আব দেশেই ছিল করি যে একে বাঁচতে দেওয়া চলে না । করুনা করতে পারেন ? একটি বারো বছরের ছেলে, বাবার পিছনে পিছনে ট্রাম থেকে নামছে । ঢোকের সামনে বাবা মোটরের তলায় তলিয়ে গেল । ওঁ, কী ভয়েকর দৃশ্য ! হাজার মনে পড়লে শরীর শিউরে ওঠে । হাসের পর মাস ধরে মা-কে ঝিগেস করেছি, যে সোকটা বাবাকে চাপা দিল তাঁর শাস্তি হবে না । 'বড় সোকদের শাস্তি হয় না ! বাবু, বড় লোকেরা পার পেয়ে যায় ।'...আব তারপর হঠাতে খবরের কাগজে ছবি ! এক মুহূর্তে মন্ত্রিক করে ফেলি । এর শাস্তি হবে । আব সে শাস্তি দেব আমি !'

'তারপরেই মনোবিকারের অভিনয় করার সিদ্ধান্ত ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু খুন করা যে এত কঠিন কে জানত ? বুঝতে পারছিলাম এ জিনিস চট করে হ্যার নয় ; সময় লাগবে আমার মনকে শক্ত করতে । শেষকালে মন শক্ত হল, অস্ত জোগাড় হল...মুনসীরই আপিস ঘরের একটা পেপার নাইফ । বাবার দেহ থেকে যে রক্ত বেরোতে দেখেছি । তাঁর হত্যাকাণ্ডের সেহ থেকেও রক্তপাত না হলে উপযুক্ত শাস্তি হবে না । তারপর—'

'তারপর কী, মর্জিকমশাই ?'

'আকুত ব্যাপার, অস্তুত ব্যাপার ! ছেরা হাতে নিয়ে ঘরে চুকেছি । পশ্চিমের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে মুনসীর উপর পড়েছে । মুখ হী, আধ বোলা চোখে নিষ্ঠাণ চাউনি । নিষ্ঠাস-প্রস্থাসের শব্দ নেই ! আমি খুন করব কি ? সে

লোক তো অলরেডি, ডেড, ডেড, ডেড !'

তত্ত্বীয় 'ডেড' কথাটা বলার সঙ্গে ধরে একটা ধূপ করে শব্দ ইল।

সেটার কারণ হচ্ছে ডাঃ মুনসীর শালা চক্রনাথবাবু। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে কেঁচার থেকে উচ্চে মেবেডে পড়েছেন।

সোম তাঁর লিকে মৌড়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে ফেলুনা বলে উঠল, 'সেইবে নিম, মিঃ মুনসী। আপনার মাঝা, আপনার মা-র যমজ তাই। হি কিল্ড ইওর কানার !'

'জানে !' হঠাৎ ধাকতে না পেরে টেচিয়ে উঠলেন জটায়ু 'মোটিভ ?'

ফেলুনা দৃষ্টি আবার শক্রবাবুর দিকে পেল। 'আপনি বলতে পারেন না, শক্রবাবু ? আপনি তো ভায়রিটা পড়েছেন ?'

শক্রবাবু ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'মানুষকে জেনা অত সহজ নয়, শক্রবাবু', বলল ফেলুনা। 'জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের আসল তফাত, জানোয়ার ভাব করতে জানে না, অভিনয় জানে না, অনের ভাব লুকোতে জানে না। ... ডাঃ মুনসী আপনার মা সবক্ষে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। ধাকলে ভায়রিটা তাঁকে কখনই পড়তে দিতেন না। কখনই সে ভায়রিটা তাঁকে উৎসর্গ করতেন না। ব্যাপারটা আসলে উচ্চে। উদাসীনা যদি কাজের তরফ থেকে হয়ে থাকে তিনি হলেন আপনার বিমাঞ্জা, যিনি তাঁর সমস্ত সেহ, ভালোবাসা, চিজা, ভাবনা, ত্যে দিয়েছিলেন তাঁর গুরুর্মণ্ড ভাইয়ের উপর।'

...এবার শুনের মোটিভটা কী ? সেটা কি একবার সমবেত সকলকে বলবেন ?' প্রায় ধার্মিক মানুষের মতো কথা বেরোল শক্রবাবুর মুখ থেকে।

'বাবার উইলে চার ভাগ পাবে ধনভাণিক সংহা, চার ভাগ আমি, আর আট ভাগ আমার মা !'

ইতিমধ্যে মিঃ সোমের পরিচর্যায় চক্রনাথবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। ফেলুনা তাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল, 'শুন করাত্ম সিঙ্কান্ত কি আপনার ?'

চক্রনাথবাবু মাথা নাড়ালেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে। একটা দীর্ঘস্থানের পর কথা বেরোল, এত শ্রীণ, যে বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়।

'না ! সিঙ্কান্ত... ডগিন ! ডগিন আধা-র হাতে... হামানদিক্কা তুলে দেয় !'

'ই, বুঝেছি।' ফেলুনা যেন বেশ ঝাউভাবেই কেঁচারে বসে পড়ল। 'শুধু একটা আপসোস, গভীর আপসোস... ভায়রিটা বেরোলে নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক হিসাবে ডাঃ মুনসীর সুনাম হত। সেই ভায়রিটা এখন সলিলগৰ্ভে !'

'অ্যাটেনশন ! প্রটোটাইট !'

অর কীপিয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে টেচিয়ে উঠলেন জটায়ু। সবাই তাঁর দিকে



দেখছে দেখে একটা অঙ্গু হাসি হিসে কৌথের বোলা থেকে একটানে একটা ফাইল গর করে সেটাকে মাধ্যার উপর তুলে গাঢ়ার মতো নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'জলে যায়নি ! জলে ধায়নি ! হিয়ার ইত্য ইত্য !'

'জাঃ মুনসীর পাঞ্জলিপি ?' অবক্ষ হয়ে প্রশ্ন করল মেলুদা। 'সেটা কী করে হয় ?'

'ইয়েস স্যার ! ধ্যাক্স টু লিজান্ডের অঞ্চগতি ! একদিনে পড়া হলে না বলে এটা জিনজ করিয়ে রেখেছিলাম, জিনজ ! এখ ই আব ও এখ ... নিন মুখময়বালু ঢাইপিং শুক করে দিন, শেষ হলে পর সোজা নর্প পোল !'

এখানে অবিশ্ব একটা জটায়ু মার্ক ভুল হল, পেঙ্গুইন নর্প পোলে থাকে না, থাকে সাউথ পোলে ।

গোলাপী মুক্তা রহস্য

Pradosh C. Mitter
Private Investigator



গোলাপী মুক্তা রহস্য

‘সোনাহাটিতে দেখবার কী আছে মশাই?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

“বাংলায় ভৰণ”-এ যা বলছে, তাতে একটা পুরনো শিবমন্দির থাকা উচিত, আর একটা বড় দিঘি থাকা উচিত। নাম বোধহয় মঙ্গলদিঘি। ওখানকার এককালের জমিদার চৌধুরীদের কীর্তি। সোনাহাটি বিশ বছর আগে অবধি ছিল একটা গাঁ। এখন ইকুল, হাসপাতাল, হোটেল সবই হয়েছে।’

লালমোহনবাবু ঘড়ি দেখলেন। এটা সম্প্রতি কেনা একটা কোয়ার্টজ ঘড়ি। বললেন, ‘সাধ্যাতিক অ্যাকিউরেট টেইচ বার্কেন।’

‘আর দশ মিনিট?’ ঘড়ি দেখে বললেন ভদ্রলোক।

আমরা তিনজন এবং আরেকটি ভদ্রলোক—নাম নবজীবন হালদার—সোনাহাটি যাচ্ছি ওখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে নেমস্তন পেয়ে। ওরা ফেলুদা আর নবজীবনবাবুকে সংবর্ধনা দেবে ওদের বাংসরিক অনুষ্ঠানে। নবজীবনবাবু ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক, বই-টইও আছে দু-তিনটে। আমরা থাকব দু’দিন, ওখানকার সবচেয়ে নামকরা বড়লোক পঞ্চানন মল্লিকের গ্রেস্ট হয়ে। মল্লিক হলেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তাঁর নাকি নানারকম পুরনো জিনিসের সংগ্রহ আছে।

‘আপনি যে এই নেমস্তন অ্যাক্সেপ্ট করবেন সেটা কিন্তু আমি ভাবিনি,’ ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, ‘আর কিছু না—দু’দিনের জন্য যদি কলকাতার বিশাক্ত বায়ু থেকে রেহাই পাওয়া যায় তো মন্দ কী? তা ছাড়া ওখানে আমার এক কলেজের সহপাঠী আছে, নাম সোমেশ্বর।

সাহা । ওকালতি করে ।'

আমাদের ট্রেন ঘোটামুটি ঠিক সময়ই সোনাহাটি পৌছে গেল । আমরা নামতেই একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে এল—তাদের মধ্যে দু'জনের হাতে ফুলের মালা । একজন ফেলুদার গলায় মালা পরিয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি ক্লাবের সেক্রেটারি—নরেশ সেন । আমিই আপনাকে চিঠিটা লিখেছিলাম ।'

নবজীবনবাবুকেও মালা পরানো হয়েছিল । এবার একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক—সিক্কের পাঞ্চাবিতে সোনার বোতাম—এগিয়ে এলেন । নরেশ সেন বলল, 'ইনিই হচ্ছেন আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদ্ধানন মল্লিক ।'

মল্লিকমশাইয়ের মুখে স্বাগতম হাসি । বললেন, 'আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় । আমার বাড়িতে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে । আশাকরি কোনও অসুবিধা হবে না । বড় শহরের সব ফ্যাসিলিটিজ তো এখানে পাবেন ন্তু ।'

'শুনিয়ে আপনি ক্ষেমও চিঞ্চা করবেন নাকি বলল ফেলুদা ।

'আপনিও তো শুনিচি খ্যাতিমান ব্যক্তি,' লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক ।

'আমি লিখি-টিখি আর কী,' বিনয়ী হাসি হেসে বললেন জটায় ।

মল্লিকমশাইয়ের নীল আস্বাসাড়র স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, আমরা পাঁচজন তাতে উঠে পড়সাম—আমি আর জটায় সামনে ।

'আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি' গাড়ি রওনা হবার পর বলল ফেলুদা । 'বোধহয় কাগজেও দেখেছি ।'

'হ্যাঁ—ওটা আমার অনেকদিনের শখ । অনেক রকম জিনিস আছে আমার কাছে । হালদারমশাইও ইন্টারেস্ট পাবেন, কারণ বেশ কিছু জিনিসের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে । আমার লেটেস্ট সংগ্রহ হল মহর্ষির জুতো ।'

'মহর্ষির জুতো ? সেটা কী ব্যাপার ?' ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু ।

‘সে ঘটনা জানেন না ? হালদারমশাই নিশ্চয়ই জানেন।’

‘কী ব্যাপার ?’

‘মহর্বি দেবেন্দ্রনাথ । তখন যুবা বয়স, খুব শৌখিন লোক । ঐশ্বর্যে ভূবে আছেন । একবার এক জায়গা থেকে নেমস্তর এল, সেখানে কলকাতার সব রাইস আদ্মিরা ফাবেন । মহর্বি গেলেন । কলকাতার বিখ্যাত বাবুমশাইরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহামূল্য পোশাক আর অলঙ্কারে ঢেকে এসেছেন । কাশ্মিরি দোরোখা আর জামিয়ার শালে চতুর্দিক ঝলমল করছে । তারই মধ্যে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ এলেন, পরনে সাদা চোগা, সাদা চাপকান, তার উপরে নকশাহীন সাদা শাল জড়ানো । সকলে তো অবাক । এ কী ব্যাপার ? মহর্বির এই দৈন্যদশা কেন ? তারপর সকলের চোখ গেল মহর্বির পায়ের দিকে । এক জোড়া সাদা নাগরা, তাতে দুটি বিশাল বিশাল হিরে ঝলমল করছে ।’

‘সেই জুতো আপনি পেয়েছেন ?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন লালমোহনব্যাবু ।

‘একটি । একটি । পেয়েছি—হিরে । সমেত । দেখা আপনাদের ।’

পঞ্চাননব্যাবুর বাগানে ঘেরা বিশাল দোতলা বাড়ি দেখলেই বোৰা যায় তিনি বড়লোক । গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে গাড়ি থামল । আমরা সবাই নামলাম । সদর দরজায় দুজন বেয়ারা আর একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, মল্লিকমশাই একজন বেয়ারাকে বললেন, ‘বৈকুঠ, যাও এদের ঘর দেখিয়ে দাও । আর এখন তো সোয়া বারোটা ; একটার মধ্যে যাবার ব্যবস্থা হয় সেটা দেখো ।’

আমরা খেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম । মল্লিকমশাই বললেন, ‘আপনাদের ঘটনা তো সেই সম্ভায় । ও সময়টা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা ; আশাকরি গরম কাপড় আছে সঙ্গে ।’

‘পৌষ মাসে গ্রামাঙ্গলে ঠাণ্ডা হবে সেটা আমরা জানতাম,’ বলল ফেলুন্দা ।

একটা প্যাসেজের দুদিকে তিনটে ঘর আমাদের জন্য রাখা

হয়েছে। হালদারমশাই তাঁর ঘরে চলে গেলেন, আমরা তিনজন দিয়ে চুকলাম ফেলুদার আর আমার ঘরে। চীনেষ্ঠাটির টুকরো দিয়ে টাকা মেঝে, যাকে ইংরাজিতে বলে Crazy China। এককালে টানা-পাখার বাবস্থা ছিল সেটা দেয়ালের উপর দিকে ফুটো দেখলেই বোঝা যায়।

‘এর টাকা হচ্ছে তামার খনির টাকা,’ বলল ফেলুদা। ‘আমার এক মকেল একে ভাঙ করেই চেনেন।’

‘আবহাওঁটা যে কলকাতার তুলনায় নির্মল সেটা এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে,’ বললেন লালমোহনবাবু।

আমিও সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তা ছাড়া কানটাও আরাম পাচ্ছে। ট্রাফিক বলে কোনও ব্যাপার নেই; এখনও পর্যন্ত একটাও হৰ্ণ শুনিনি।

একজন বেয়ারা একটা থালায় তিন গোলাস সরবত দিয়ে গেল। সেই সরবত খেতে না খেতেই খবর এল যে নীচে খাবার ঘরে পাত পড়েছে।

॥ ২ ॥

আতিথেয়তায় মল্লিকমশাই যে একবারে পয়লা নম্বর সেটা খাবার বহর দেখেই বোঝা গেল। মাছের যে এতরকম জিনিস রাখা হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। ফেলুদা অল্প খায়, কিন্তু লালমোহনবাবু ভোজনরসিক—যুব তৃপ্তি করে খেলেন। ওঁর খুশির আয়েকটা কারণ হচ্ছে যে পঞ্জাননবাবু ওঁর লেখা সমস্কে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করছিলেন তাই ভদ্রলোক নিজের ঢাক পেটাবার একটা সুযোগ পেলেন।

খাবার পর মল্লিকমশাই বললেন, ‘এবার আপনাদের একটু এন্টারটেন করব। চলুন আমার সংগ্রহের কিছু জিনিস দেখাই।’

আমরা আবার দোতলায় ফিরে এলাম। এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে না ধুরে বাঁদিকে ঘুরলাম। এদিকেই পঞ্জাননবাবুর ঘর আর তাঁর সংগ্রহশালা।



জিনিসপত্র অনেকরকম জোগাড় করেছেন ভদ্রলোক তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রত্যেকটারই আবার একটা কাহুর পরিচয় আছে। মহর্ষির নাগরাটা প্রথমেই দেখা হল, তারপর ত্রয়োত্তমে টিপুর নস্যির কৌটো, ক্লাইভের ট্যাংকঘড়ি, সিরাজদ্দৌলার কুমাল, রানি রাসমণির পানবাটা—এ সবই দেখলাম। আমরা সকলেই অবিশ্য খুবই তারিফ করলাম, কিন্তু আমার যেন কেমন-কেমন লাগছিল। কেন জিনিসটা কার ছিল সেটা জানা গেল কী করে? ক্লাইভের ঘড়িতে তো আর ক্লাইভের নাম লেখা নেই। বা সিরাজদ্দৌলার কুমালেও নেই।

সব দেখেটোকে চারজনে ঘরে ফেরার পথে নবজীবনবাবু ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন মনে হল?’

ফেলুদা বলল, ‘খুব কনভিনিসিং লাগল না।’

‘কনভিনিসিং? ওর মধ্যে একটা জিনিসও জেনুইন নেই। লোকটা বোগাস, হামবাগ। মহর্ষির নাগরা থেকে তো শ্রীতিমত্তো নতুন চামড়ার গন্ধ বেরোছিল।’

ঘটা তিনেক বিশ্বামৈর সময় ছিল, তারপর অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা ধূতি-পাঞ্জাবি পুরল বোধহয় আজ দশ

বছর পর। ওকে পোশ্যাকটা যে দারণ মানায় সেটা স্বীকার করতেই হয়। লালমোহনবাবু একটা নকশাদার কাশ্মিরি শাল চাপিয়েছিলেন, বললেন সেটা ওর ঠাকুরদার ছিল।

ঠিক পৌনে ছটায় বেয়ারা পাঠিয়ে আমাদের ডেকে নিলেন পঞ্জাননবাবু। শীতকাল, তাই এর মধ্যেই বেশ অঙ্ককার হয়ে এসেছে! অনুষ্ঠানের জায়গায় পৌঁছে দেখি আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। স্পটলাইট, ফুরোরেসেন্ট লাইট, রঙিন বাল্ব—কিছুরই অভাব নেই।

আমরা মধ্যে গিয়ে বসলাম। সংবর্ধনার ব্যাপারটা একেবারে শেষে—অর্থাৎ ফ্লাইম্যাজন। তার আগে নাচ, গান, আবৃত্তি, নটিকের অংশের দৃশ্য—সবই হল। সকলেই আজ জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছে ফেলুদাকে ইমপ্রেস করার জন্য, ফেলুদাও হাততালিতে কার্পণ্য করছে না।

সংবর্ধনার ব্যাপারটা কুড়ি মিনিটে সারা হয়ে গেল। সময় একটু লাগল, মানপত্রটা পড়তে। এটা বলতেই হবে যে মানপত্র দুটো দেখতে বেশ ভাল হয়েছে, আর যে লিখেছে তার হাতের জেখা খুব ভাল। সব শেষে কয়েকজন সাংবাদিক ফেলুদাকে ঘিরে ধরল, আর তাদের কিছু প্রশ্নের জবাবও দিতে হল ফেলুদাকে। সে বলল এখন তার অবসর—হাতে কোনও ক্ষেস নেই।

নবজীবনবাবু অনুষ্ঠানের শেষে পঞ্জাননবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন, আমরা রয়ে গেলাম কারণ আমাদের নেমন্তন্ত্র আছে ফেলুদার সহপাঠী সোমেশ্বর সাহার বাড়িতে। ভিড় কমবার পরেই ভদ্রলোক হাসিমুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন।

‘চিনতে পারছিস?’

‘অনায়াসে,’ বলল ফেলুদা। ‘গোঁফটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই বদলায়নি।’

‘তুইও মেটামুটি একই রকম আছিস, তবে চোবে একটা দীপ্তি দেখছি যেটা বুদ্ধি পাকবার ফলে হয়েছে। কটা কেস হ্যান্ডল করলি এ পর্যন্ত?’

‘হিসেব নেই,’ বলল ফেলুদা। ‘গোড়ার দিকে হিসেব রাখতাম,

আজকাল ছেড়ে দিয়েছি।'

'তোর সঙ্গে একজন আলাপ করতে ভীষণ আগ্রহী'—সোমেশ্বর সাহা তাঁর পিছনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে পিঠে হাত দিয়ে সামনে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।—'ঁর নাম জয়চাঁদ বড়াল। এখানকারই বাসিন্দা। ইনিই মানপত্রটা ডিজাইন করেছেন।'

'তাই বুঝি?' বলল ফেলুন। 'খুব ভাল হয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম।'

জয়চাঁদবাবু লজ্জায় ঘাড় নিচু করে বললেন, 'আপনার কাছ থেকে প্রশংসা পাব এ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আপনার একজন গুণমুক্ত ভক্ত।'

'আজ ইনিও আমাদের বাড়িতেই থাচ্ছেন,' বললেন সোমেশ্বরবাবু। 'চ—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে গেজিয়ে কোনও লাভ নেই। আমার বাড়ি বেশি দূর নয়। মিনিট দশক পা চালাতে পারবি তো?'

'জরুর।'

সোমেশ্বরবাবুর বাড়ি বড় না ছিলো, কিন্তু শুনেনোঁ সেটা বোধহয় ওঁর ক্ষীর জন্য। স্বী ছাড়া একটি দশ বছরের ছেলেও আছে ভদ্রলোকের। জয়চাঁদবাবু সমেত আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসার দশ মিনিটের মধ্যেই সরবত এসে গেল। স্বী উমাদেবী বললেন, 'আগে সরবতটা বান—সাড়ে নটার মধ্যে আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

মিনিট পাঁচক এটা-সেটা নিয়ে কথা হ্বার পর সোমেশ্বরবাবু জয়চাঁদ বড়ালকে দেখিয়ে বললেন, 'ঁর একটা বিশেষ কিছু বলার আছে তোকে। আমার মনে হয় তুই ইন্টারেস্ট পাবি।'

'কটে?' বলল ফেলুন। 'কী ব্যাপার শুনি।'

'কিছুই না,' সলজ্জ হাসি হেসে বললেন জয়চাঁদবাবু, 'আমাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত একটা ব্যাপার।'

লালমোহনবাবু আগ্রহের সঙ্গে একটু এগিয়ে বসলেন। 'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?'—গর্ভের গন্ধ পেলেই ভদ্রলোক চনমনিয়ে ওঠেন।

জয়চাঁদবাবু হাত থেকে সরবত্তের গেলাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমি নিজে এখন ইন্দুল মাস্টারি করি, কিন্তু আমার প্রেতুক ব্যবসা ছিল হিরে-জহরতের। কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে আমাদের একটা গয়নার দোকান এখনও আছে; সেটা দেখেন আমার এক কন্কা। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা—নাম ছিল অভয়চরণ বড়াল। তিনিই এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। জাহাজে করে ভারতবর্ষের উপকূলে সব শহরে গিয়ে হিরে পানা কেনাবেচা করতেন। মাদ্রাজের কাছাকাছি কোনও একটা শহরে তিনি একবার একটা রত্ন পান। সেটা তিনি যত্ন করে জমিয়ে রেখেছিলেন। সে রত্ন এখনও আমার কাছে রয়েছে। সেটা আমি আপনাদের দেখাতে চাই।'

'সঙ্গে এনেছেন?' জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'আজ্জে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক পকেটি থেকে একটা খয়েরি আঙুলের ঝুমাল বার করলেন, তাতে গেঁঠো দিয়ে ঝীঝী একটা ছোট লাল ভেলভেটের বাঞ্চা। বাঞ্চা খুলে তার থেকে একটা মুক্তা বার করে ভদ্রলোক আমাদের সামনে ধরলেন।

ফেলুদা উজ্জেব্জায় ভরা চাপা স্বরে বলে উঠল—

'একী—এ যে পিংক পার্ল!'

'আজ্জে হ্যাঁ,' বললেন জয়চাঁদ বড়াল। 'অবিশ্য গোলাপী হওয়ায় এর কোনও বিশেষত্ব আছে কি না জানি না।'

'কী বলছেন আপনি?' বলল ফেলুদা। 'ভারতবর্ষে ধতরকম মুক্তা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে দুপ্রাপ্য আর সবচেয়ে মূল্যবান হল গোলাপী মুক্তা।'

'মুক্তা সাদা ছাড়া হয় তাই তো জনতাম না,' বললেন লালমোহনবাবু।

'সাদা লাল কালো হলদে নীল—সবরকম হয়,' বলল ফেলুদা। তারপর জয়চাঁদবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'শুনুন—আপনি ও জিনিস ওভাবে পকেটে নিয়ে যুরে বেড়াবেন না। বাড়িতে সিন্দুক থাকলে



তাতে রেঁকে দেবেন” ॥

‘আজ্জে এটা আমি ধার করি না বললেই চলে । আজ আপনাকে
দেখাৰ বলে নিয়ে এলাম ।’

‘আৱ কাকে দেখিয়েছেন ওটা ?’

‘মাত্র একজন । গত সপ্তাহে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন,
তিনি উনবিংশ শতাব্দীৰ বাঙালি বণিকদেৱ নিয়ে একটা বই
লিখছেন—তাঁকে দেখিয়েছিলাম ।’

‘এ ছাড়া আৱ কেউ জানে না তো ?’

‘কী আৱ বলৰ বলুন—এই ভদ্রলোক, যিনি বই লিখছেন—তিনি
আৰাব ঘটনাটা এক সাংবাদিককে বলেন । ফলে পঞ্জিনই সেটা
কাগজে বেরিয়ে থায় ।’

‘কলকাতাৰ কাগজে ?’

‘আজ্জে হ্যাঁ । তিনটে বাংলা কাগজে বেরিয়েছে । আপনি ফিরে
গিয়ে সেটা দেখতে পাৰেন ।’

‘গোলাপী মুক্তা বলে বলা আছে তাতে ?’

‘তাই তো বলেছে। একটা কাগজে তো এ-ও বলে দিয়েছে যে মুক্তের মধ্যে গোলাপী মুক্তেই সবচেয়ে ভ্যালুয়েব্ল।’

‘সর্বনাশ !’ কপালে হাত ঠুকে বললে ফেলুন্দা। ‘আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলছি এ জিনিস আপনি কাউকে কথনও দেখাবেন না। এই একটা মুক্তের দাম কত তা আপনি কল্পনা করতে পারেন ? বিক্রি করলে আপনি যা দাম পাবেন তাতে আপনার পরের দুই পুরুষ পর্যন্ত খাওয়া-পরার কোনও ভাবনা থাকবে না।’

‘এটা আপনি আমাকে বলে খুব উপকার করলেন।’

আমরা তিনজনেই একবার করে মুক্তেটা হাতে নিয়ে দেখলাম। নিটোল চেহুরা। ফেলুন্দা বলল যে, শেপের দিক দিয়েও মুক্তেটা অসাধারণ।

জয়চাঁদবাবু তাঁর সম্পত্তি আবার পকেটে পুরে নিলেন। ফেলুন্দা ‘ছিক’ করে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, ‘খবরটা কাগজে বেরোন খুবই আনন্দরচনেট ব্যাপার। আশা করি কোনও গোলমাল হবে না।’

‘সুন্দি হয়ে তা হলে কি আমি আপনাকে জানব ?’

‘নিশ্চয়ই। আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর সবই সোমেশ্বর জানে। আপনি বিনা দ্বিধায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এমন কী দরকার হলে ওটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারেন।’

॥ ৩ ॥

আমরা পরদিন সকালে হাওড়া এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে বিকেলে কলকাতা পৌছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে হালদারমশাইও ফিরলেন। দেখলাম ফেলুন্দা ওঁর সামনে একবারও গোলাপী মুক্তের উল্লেখ করল না।

বাড়িতে এসে ফেলুন্দা শুধু একটা কথাই বলল।

‘মুক্তের খবরটা কাগজে বেরোনটা মারাওক ভুল হয়েছে।’

আসবার তিনি দিন পরে সকালে বসবার ঘরে বসে কথাসরিংসাগর পড়ছি, ফেলুন্দা ক্লিপ দিয়ে নখ কাটছে, এমন সময়

টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফেলুন্দা উঠে ধরল। কথা শেষ হয়ে যাবার পর ফেলুন্দা বলল, 'বড়াল।'

'কলকাতায় এসেছেন ?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে বিশেষ দরকার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আসছে। কথা শুনেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক খুবই উদ্বেগিত।'

আমরা কোন করে লালমোহনবাবুকে ডাকিয়ে নিলাম। কোনও মামলার কোনও জরুরি অংশ থেকে বাদ পড়লে উনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, 'কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারি না। ফলে চিন্তা করে যে আপনাকে হেল্প করব তারও উপায় থাকে না।'

ভদ্রলোক ঠিক পাঁচটায় এসে পড়লেন, আর তার আধঘণ্টা পরে, শ্রীনাথ চা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, এসে পড়লেন জয়চাঁদ বড়াল।

এ চেহারাই আলাদা। এই তিনি দিনে ভদ্রলোকের উপর দিয়ে যে বেশ ধরল গেছে সেটা বোঝাই যায়। ইতিমধ্যে দুটো ইংরিজি কাগজেও পিংক পার্লের খবরটা বেরিয়ে আমাদের উৎকল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

জয়চাঁদবাবু এক গেলাস জল খেয়ে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন, 'একটা খবরের কাগজের খবর থেকে যে এত কিছু ঘটতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। তিনটে ঘটনা আপনাকে বলার আছে। এক হচ্ছে আমার এক খুড়তুঙ্গো ভাই—নাম হচ্ছে মতিলাল বড়াল—তার একটা চিঠি। সে বহুকাল থেকে বেনারসে আছে। একটা সিনেমা হাউস চালায়। সে লিখেছে যে যদি আমি মুক্তেটা বিক্রি করি তা হলে যা পাব তার একটা অংশ তাকে দিতে হবে। মুক্তেটা পরিবারের সম্পত্তি, শুধু আমার একার নয়। চিঠিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে মুক্তের ব্যাপারটা আমি তার কাছ থেকে গোপন করে গেছি।'

'আর দুই নম্বর ?'

'সেটাও একটা চিঠি, এসেছে ধরমপুর বলে উত্তরপ্রদেশের একটা শহর থেকে। আমি ইঙ্গুলের লাইব্রেরির বই ঘেঁটে জেনেছি যে ধরমপুর একটা করদ রাজ্য ছিল। যিনি চিঠিটা লিখেছেন তিনিই যে ধরমপুরের সর্বেসর্ব তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ ঠিকানা হচ্ছে

ধরমপুর প্যালেস। লেখকের নাম সুরয় সিৎ। এর নাকি মুজ্জোর বিবাটি কালেকশন আছে, কিন্তু গোলাপী মুজ্জো নেই! মুজ্জোটা উনি কিনতে চান। আমি কত দাম চাই সেটা অবিলম্বে তাঁকে জ্ঞানাতে হবে।'

‘আর তিনি নম্বর?’

‘সেটাই সবচেয়ে মারায়াক। এক ভদ্রলোক—পশ্চিমা কিংবা মাড়োয়ারি হবে—পরশু আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। তিনি অনেক কিছু কালেক্ট করেন। কথায় বুবলাম সে সব জিনিস তিনি ভাল দামে বিদেশে পাচার করেন। জামাকাপড়, হাতের আঁটি, কানের হিলে ইত্যাদি দেখে মনে হল খুব মালদার লোক।’

‘এরও কি মুজ্জোটা চাই?’

‘হ্যাঁ। তার জন্য তিনি চালিশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন। আমি অবিশ্বি হ্যাঁ না কিছুই বলিনি। তিনি দিন সময় চেয়েছি। ভদ্রলোক এখন কলকাতায়। তাঁর চিন্তরঙ্গন অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। আরাকে কাল সকাল দশটায় তাঁর কাছে গিয়ে একটা কিছু বসতে হবে। আরে হল ভদ্রলোক মুজ্জোটা পেতে বদ্ধপরিকর। হয়তো দাম একটু বাড়াতে পারেন, কিন্তু মুজ্জোটা ওঁর চাই।’

‘এর নাম জানেন নিশ্চয়ই।’

‘জানি।’

‘কী?’

‘মগনলাজ। মগনলাল মেঘরাজ।’

আমরা তিনজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থ মেরে গেলাম। আর কতবার এই লোকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? প্রতিপক্ষ হিসেবে এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। আর ইনিই গিয়ে হাজির হয়েছেন বড়ালমশাইয়ের কাছে? এরও দরকার হয়ে পড়েছে গোলাপী মুজ্জো?

মুখে ফেলুন্দা বলল, ‘আপনি সোজা না করে দেবেন। ওই মুজ্জোর দাম ওর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। ভদ্রলোক এই পাথর মেটা দামে বিদেশে পাচার করবেন। দালালি করাই হচ্ছে ওঁর ব্যবসা।

ওঁকে আমরা পাঁচ বছর ধরে চিনি।'

'কিন্তু তুনি যদি আমার কথা না শোনেন ?'

ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'বেশ কড়া মেজাজে কথা বলছিলেন কি ভদ্রলোক ?'

'তা বলছিলেন বটে,' বললেন জয়চাঁদবাবু 'এমন কী এ-ও বলেছিলেন যে ওর মুক্তেটা পাবার রাস্তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।'

'আপনি একটা কাজ করুন—মুক্তেটা আমাকে দিয়ে যান। আপনি সঙ্গে নিয়ে গেলে ওটা ও আদায় করে ছাড়বে। তার জন্য যদি খুন্দও করতে হয় তাতেও পেছপা হবে না। লোকটা সাংঘাতিক।'

'কিন্তু ওকে আমি কী বলব ?'

'বলবেন আপনি মুক্তেটা বেচবেন না। তাই ওটা আর সঙ্গে করে আনেননি। তরকম একটা প্রেশাস জিনিস তো কলকাতায় পকেটে নিয়ে যাবে কেড়ানো যায় না।'

'বেশ, তা হলে আপনাই কাশুন ?'

ভদ্রলোক আবার কমালের গেরো খুলে বাস্তু থেকে মুক্তেটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা তৎক্ষণাৎ মুক্তেটা নিজের ঘরের গোদরেজের আলমারিতে রেখে দিল। তারপর ফিরে এসে সোফায় বসে বলল, 'আর সেই সূর্য সিংকে কী বলবেন ? তিনিও বেশ নাহোড়বান্দা বলে মনে হচ্ছে।'

'তাঁকেও না করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেড়শো বছরের ওপর জিনিসটা আমাদের কাছে রয়েছে, আর এখন হাতছাড়া হয়ে যাবে ? আমার তো টাকার অভাব নেই, টাকার লোভও নেই। আমার তো চাকরি আছেই, তা ছাড়া বাড়ি আছে। ধান জমি আছে, চাষ করে মোটামুটি ভালই আয় হয়। তিনটি প্রাণী তো সংসারে—আমার দিবি চলে যায়।'

'দেখুন কাল সকালে কী হয়। যাই হোক না কেন, আমাকে জানিয়ে যাবেন। আমাকে জানিয়ে আসারও কোনও দরকার নেই।'

ভদ্রলোক চা খেয়ে উঠে পড়লেন। উনি বেরিয়ে যাবার পর লালমোহনবাবু বললেন, 'এই বাহ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এবাবে আর কী খেল দেখাবে কে জানে !'

ফেলুদা বলল, 'তবে এটা স্মীকার করতেই হবে যে প্রতিবারই আমরা ওকে জব্দ করেছি।'

'সেটি ঠিক। ভাল কথা, আমার এক পড়শী আছে জহুরি, নাম আমময় মল্লিক। বৌবাজারে দেৱান আছে—মল্লিক ব্রাদার্স। ওকে গিয়ে পিংক পার্লের কথাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। উনিও কনফার্ম করলেন যে এত ভ্যালুয়েব্ল মুক্তো আৱ হয় না।'

ফেলুদা বলল, 'কাল সকালে কী হয় তাৰ উপৰ সব নিৰ্ভৰ কৰছে। মগনলাল যদি জেনে ফেলে জয়চাঁদবাবু আমার এখানে এসেছিলেন, তা হলৈই মুশকিল।'

'আপনি মুক্তো নিজেৰ কাছে রেখে একটা বড় রিস্ক নিয়েছেন।'

'ও হ্যাত্তা কোমও বাস্তো ছিল কী মুক্তো আৰু বাস্তো মুক্তো কাল মগনলালেৰ হাতে চলে যেত।'

॥ ৪ ॥

জয়চাঁদ বড়ালেৰ কথা

চিত্তরঞ্জন আভিনিউতে মগনলালেৰ বাড়ি বাব কৰতে বেশি সময় লাগল না। বাড়িৰ বাইরেটা দেখে ভিতৱে চুক্তেই ইচ্ছা কৰে না, কিন্তু একবাৰ চুকে পড়লে দেখা যায় বেশ তক্তকে পৰিচ্ছম।

একজন চাকুৱ এসে জয়চাঁদবাবুকে তিন শলায় নিয়ে গেল। তাৰপৰ একটা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘৱেৰ দৱজাৰ সামনে পৌছে ঘোষণা কৱল যে বড়ালবাবু এসেছেন।

'ভিতৱে আসুন,' মগনলালেৰ গাত্তীৰ গলায় শোনা গেল।

জয়চাঁদ বড়াল ভিতৱে গিয়ে চুকলেন।

মগনলাল এক পাশে গদিতে বসে আছে। অন্য পাশে সোফা
রয়েছে, তারই একটাতে বড়াল বসলেন।

‘কী ডিসাইড করলেন?’ মগনলাল প্রশ্ন করল।

‘ওটা বেচব না।’

মগনলাল কিছুক্ষণের জন্য চুপ। তারপর বলল, ‘আপনি ভুল
করছেন, জয়চাঁদবাবু। আমাকে রিফিউজ করে কোনও লোক
বেহাই পায়নি। আপনি কি দাম বাড়াতে চাচ্ছেন?’

‘না। আমি ওটা ফ্যামিলিতেই রাখতে চাই। চার পুরুষ ধরে
রয়েছে, এখনও থাকুক।’

‘আপনার বাড়ি যা দেখলাম সোনাহাটিতে, তাতে আপনার
মান্থলি ইনকাম দেড়-দু হাজারের বেশি বলে মনে হয় না। আর
এতে আপনি একসঙ্গে ক্যাশ অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। হোয়াই
আর ইউ বিহং সো ফুলিশ?’

‘এটা বংশমর্যাদার ব্যাপার। এটা আমি আপনাকে বোঝাতে
পারব না।’

‘ওই মেজিকোথাপ্য আছে?’

‘আমার কাছে নেই।’

‘ওটা আপনি আনেননি?’

‘বেচবই না যখন ঠিক করলাম তখন আর আনব কেন?’

মগনলাল তার সামনেই রাখা একটা ঘণ্টার উপর চাপড় মারল।
টুং শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর এসে ঘরে দাঁড়াল।

‘গঙ্গা—এই বাবুকে সার্চ করো।’

গঙ্গা বেশ ষণ্ঠা লোক; সে একটানে জয়চাঁদবাবুকে বসা আবস্থা
থেকে দাঁড় করাল। তারপর সর্বস্ব সার্চ করে একটা মানিক্যাগ,
একটা ঝুমাল আর একটা মশলার কৌটো বার করে মগনলালের
সামনে রাখল।

‘ঠিক হ্যায়,’ বলল মগনলাল। ‘ওয়াপিস দে দেনা।’

চাকর জয়চাঁদবাবুকে তার জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

‘বসুন আপনি।’

জয়চাঁদবাবু আবার সোফায় বসলেন। মগনলাল বলল,



‘সোনাহাটিতে জানলাম কি আপনাদের ক্ষম প্রদোষ মিটারকে
রিসেপশন দিয়েছে।’

‘ঠিকই শুনেছেন।’

‘তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?’

‘আপনার সব কথার জবাব দিতে তো আমি বাধ্য নই।’

‘আপনার জবাবের দরকার নেই, বিকজ আই অলরেডি নো।
আপনি যখন হাওড়াতে ট্রেন থেকে নামলেন, তখন থেকে আমার
লোক আপনাকে নজরে রেখেছে। আপনি শিয়ালদায় যোগমায়া

হোটেলে উঠেছেন—রাইট ?

‘ঠিক ।’

‘বিকেল পাঁচটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি ট্যাঙ্কি
করে সাউথে যান। আপনার ডেস্টিনেশন ছিল ফেলু মিটারের
বাড়ি—রাইট ?’

‘আপনি তো সবই জানেন ।’

‘আপনার মোড়ি এখন ফেলু মিটারের জিন্মায় আছে ।’

জয়চাঁদবাবু চুপ করে রাখলেন। মগনলাল বলল, ‘ইউ হ্যাত ডান
সামাখ্য ভেরি স্টুপিড, মিস্টার বড়াল। আপনি পার্লটা আমাকে
দিলে চালিস হাজার টাকা পেতেন। এখন আমি সে পার্ল আদায়
করে নেব, আর আপনি আমার কাছ থেকে একটা পইসাও পাবেন
না ।’

জয়চাঁদবাবু উঠে পড়লেন।

‘আমি তা হলে এখন আসতে পারি ?’

‘পাবেন। আমাদের বিজ্ঞেন খত্তম। তবে আপনার জন্য
আমার আপনোস হচ্ছে।’

॥৫॥

ফোন না করে দুপুর বারোটা নাগাত জয়চাঁদবাবু নিজেই এসে
হাজির। মগনলালের সঙ্গে তাঁর কী ঘটল না ঘটল বর্ণনা দিয়ে
ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনি মুক্তোর ব্যাপারটা কী করবেন ?’

ফেলুদা বলল, ‘যদ্দূর বুঝতে পারছি, মগনলাল আন্দাজ করছে
যে মুক্তোর আমার কাছে রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তুঘোড়।
সোজাসুজি যদি আমার কাছে এসে পড়ে তা হলেও আশ্চর্য হব
না। যে জিনিসটা এতকাল আপনাদের ফ্যামিলিতে ছিল, সেটা
এখন হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে আপনার মন খারাপ লাগবে সেটাও
আমি বুঝি। কিন্তু তাও আমি বলব যে মুক্তোর আমার কাছেই
থাক। আপনার কাছে থাকলে ও যেন-তেন-প্রকারেণ ওটা আদায়
করে নেবে। সেটা ভাল হবে না।’

জয়চাঁদ রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি বিক্রি না করলে তো ও মুক্তেটা এমনিতেই পাবে না। আপন বিদেয় হোক, তারপর ওটা আমার কাছে ফিরে যেতে পারে।'

'ঠিক কথা,' বলল ফেলুন। 'আপনি আজই ফিরছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সঙ্কের গাড়িতে।'

'কোনও খবর থাকলে জানাতে ভুলবেন না।'

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার সময় ফোন এল। সোনাহাটি থেকে। সোমেষ্ঠের সাহা। ফেলুন কথা বলা শেষ করে ফোনটা রেখে গান্ধীর মুখ করে বলল, 'কাল রাত্তিরে টেনে জয়চাঁদ বড়ালের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে কে বা কারা যেন তার বাস্ত করে। জিনিসপত্র সব ছুরাকার হয়ে পড়ে ছিল। অবিশ্য সোনাহাটি আসবার আগেই ভদ্রলোক জ্ঞান ফিরে পান।'

আমি বললাম, 'এ-ও তো মগনলালেরই ব্যাপার।'

'নিশ্চয়ই' বলল ফেলুন। 'সোকটা কোনওরকম সুযোগ ছাড়ে না। জাপিয়ে মুক্তেটা আমার ক্ষমতে রেখে দিয়েছিলাম।'

একটা নতুন কেমের পঞ্চ পেলে জটায়ু যাবে যাবে বিকেলেও এসে হাজির হন। আজও তাই হল। বললেন, 'মন্টা পড়ে রয়েছে এখানে তাই বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।'

ফেলুন সেটেস্ট খবরগুলো লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

'তা হলে তো মনে হচ্ছে উর পায়ের ধুলো এবার এখানে পড়বে। ও তো নিঘতি বুঝে গেছে যে মুক্তেটা আপনার কাছে রয়েছে।'

লালমোহনবাবু কথাটা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরে একটা গাড়ি এসে যাবার শব্দ পেলাম। তারপর দরজার বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি আসল লোক এসে হাজির।

'মে আই কাম ইন, মিস্টার মিটার ?' বললেন মগনলাল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

ভদ্রলোক চুকে এলেন। সেই কালো শেরওয়ানি আর ধূতি, পায়ে মোজা আর পাম্প শু।

'অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল কি আপনার বাড়িতে একবার আসি।'

আমাদের এতদিনের দোষি—হে হে হে ! আঙ্কল কেমন আছেন ?

লালমোহনবাবুকে মগনলাল যা নাস্তানাবুদ করেছে, ভদ্রলোক আর কোনওদিন মগনলালের সামনে স্বাভাবিক হতে পারবেন বলে মনে হয় না । তখনো গলায় জটায়ু উত্তর দিলেন, ‘ভাল আছি ।’

‘চা খাবেন ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ।

‘না স্যার । নো টী । আমি আপনার বেশি সময় নেব না । আমি কেন এসেছি তা বোধহয় আপনি বুঝতে পারছেন ।’

‘তা বোধহয় পারছি ।’

‘তা হলে আর টাইম ওয়েইস্ট করার দরকার নেই । হোয়ার ইজ দ্যাট পার্ল ?’

‘মিস্টার বড়ালের কাছে যে নেই তা তো আপনি জানেন । আপনার লোক তো ট্রেনে তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর বাস্ত সার্চ করে মোতি খুঁজে পায়নি ।’

‘আমার লোক ?’

‘তা ছাড়া আর কিরি লোক হলে বলুন ?’

‘আপনি শুভাবে বলবেন মা, মিস্টার মিটার । আপনার কোনও প্রমাণ নেই যে আমার লোক কাজটা করেছে ।’

‘আপনার ক্ষেত্রে প্রমাণের দরকার হয় না, মগনলালজী । আপনার কাজ মার্কমারা কাজ । সে কাজ আমি দেখলেই বুঝতে পারি ।’

‘আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি—সে পার্ল কোথায় আছে ?’

‘আমার কাছে ।’

‘ওটা আমার দরকার ।’

‘যা দরকার তা কি সব সময়ে পাওয়া যায় ?’

‘মগনলাল মেঘরাজ ক্যান অলওয়েজ গেট ইট । কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, মিস্টার মিটার । আমার ওই পিংক পার্ল চাই । না হলে, আপনি তো জানেন, আমি যেমন করে হোক ওটা আদায় করে নেব ।’

‘তা হলে সেটাই করুন, কারণ মুক্তে আমি আপনাকে দিচ্ছি না ।’



‘দেবেন না ?’

‘ভদ্রলোকের এক কথা এই ?’

‘তা হলে আমি আসি।’ মগনলাল উঠে পড়লেন। ‘গুড বাই, আঙ্কল।’

‘গুড বাই’ ক্ষীণবরে বললেন জটায়ু।

দরজার কাছে গিয়ে মগনলাল নেমে ফেলুদার দিকে ঘূরলেন। তারপর বললেন, ‘আমি তিন দিন সময় দিচ্ছি আপনাকে। আজ সোমবার। সোম, মঙ্গল, বুধ। বুঝেছেন ?’

‘বুঝেছি।’

মগনলাল বেরিয়ে গেলেন।

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ‘ব্যাপারটা আমার ভাল জাগছে না মোটেই। দিয়ে দিন মশাই, দিয়ে দিন। আর আপনি কাছেই বা আর কত দিন রাখতে পারবেন। বড়ালকে তো তাঁর জিনিস ফেরত দিতে হবে—তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এত সাধের জিনিস।’

‘যদিন মুক্তি বেহাত হবার আশঙ্কা আছে ততদিন এটা বড়ালকে

ফেরত দেওয়া যাবে না । সব সংশয় কাটিয়ে উঠলে পর যেখানের
মুক্তো সেখানে যাবে ।'

'কিন্তু বড়ল যে এক মহারাজার কথা বলছিল তার সম্বন্ধেও তো
একটু খোঁজ নেওয়া দরকার ।'

'সে খোঁজ দিতে পারেন সিধু জ্যাঠা । বহুদিন জ্যাঠার সঙ্গে
দেখা হয়নি । চলুন একবার ঘুরে আসি ।'

'জায়গার নামটা মনে আছে ?'

'ধরমপুর ।'

'আর মহারাজার নাম ?'

'সূর্য সিং ।'

আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিধু জ্যাঠার
বাড়িতে পৌছে গেলাম । জ্যাঠা ম্যাগনিফিং প্লাস দিয়ে একটা
পুরনো পুঁথি পরীক্ষা করছিলেন, আমাদের দেখে গভীর হয়ে
গেলেন ।

'তোমরা কে ? তোমাদের তো আমি চিনি না ।'

'কেলুদা হেসে কলল, অপরাধ নেবেন না জ্যাঠা ।' ক্ষমার্পণ একটু
বেড়েছে বলে আর লোকজনের বাড়িতে বিশেষ যাওয়া হয় না ।
আমি যে কাজে উন্নতি করছি তাতে আপনি নিশ্চয়ই খুশি ।'

এবার সিধু জ্যাঠার মুখে হাসি ফুটল ।

'কেলু মিত্র—তোমাকে কি আমি আজ থেকে চিনি ? আট
বছর বয়সে এয়ার গান দিয়ে শালিক মেরে এনে আমায়
দেখিয়েছিলে । আমি বলেছিলাম নিরীহ জীবকে আর কঙ্কনও
মারবে না—কথা দাও । তুমি সেদিন থেকে পাখি মারা বন্ধ
করেছিলে । গোয়েন্দাগিরিতে পসার হচ্ছে বলে আমার কাছে বড়ই
কোরো না । গোয়েন্দা আমিও হতে পারতাম । তার সব গুণই
আমার ছিল । এখনও আছে । তবে কোনওরকম কাজে বাঁধা পড়া
আমার ধাতে সয় না । আমার সময় যদি আমি নিজে ইচ্ছামতো ব্যয়
না করতে পারি তা হলে লাভটা কী ? শার্লক হোমসের এক দাদা
ছিল জানতে ? মাইক্রফট হোমস । জাত কুঁড়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে সত্যিই
শার্লকের দাদা । সেই দাদার কাছে শার্লক মাঝে মাঝে যেত পরামর্শ



নিতে। অয়িশ্বরিকে সেই মাইক্রোফট। যাক গে, এখন বলো কী
অন্যে আপমর বু

‘একজন লোক সবকে আপনার কাছে কোনও ইন্ফরমেশন
আছে কি না জানতে এসেছিলাম।’

‘কে সেই ব্যক্তি?’

‘আপনি ধরমপুরের নাম শনেছেন?’

‘শুনব না কেন? উত্তরপ্রদেশের একটা করদ রাজ্য ছিল।
আলিগড় থেকে সাতাত্তর মাইল দক্ষিণে। ট্রেন নেই, গাড়িতে
যেতে হয়।’

‘তা হলে সুরয় সিৎ-এর সবক্ষেও নিশ্চয়ই জানেন?’

‘ওরে বাবা!—সে কি এখনও বেঁচে আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘সে যে একটি আন্ত বাধ। মালটি যিলিওনেয়ার। হোটেলের
ব্যবসার টাকা। হিরে জহুতের অত ভাল কালেকশন ভারতবর্ষে
আর কারুর নেই।’

‘লোক কেমন জানেন?’

‘তা কী করে জানব ? সে কি আমার এই কুটিরে পদার্পণ করেছে, না আমি তার বাড়ি গেছি ? এ সব লোককে ভাল-খারাপ বলে বর্ণনা করা যায় না । তুমি হয়তো গিয়ে দেখলে তার মতো অতিথিবৎসম লোক আর হয় না—তোমাকে রাজার হালে রেখে দিল । আবার পরদিন হয়তো সেই লোকই তার কালেকশনের জন্য পাথর আদায় করতে একজনকে খুনই করে ফেলল । অবশ্য নিজে হাতে নয় ; এরা সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলে, যদিও তার জন্য ট্যাংক খরচা হয় অনেক ।’

এই খবরই যথেষ্ট বলে আমরা সিধু জ্যাঠাকে আর বিরক্ত করলাম না, যদিও সূর্য সিং-এর সঙ্গে আমাদের কারবার হচ্ছে কীভাবে সেটা এখনও বুঝতে পারলাম না । ফেলুদাকে বলতে ও বলল, ‘তাও এ খবরগুলো জেনে রাখা ভাল । সে লোক যখন বড়ালকে চিঠি লিখেছে তখনই বোধ যাচ্ছে তার মুক্তেটার বিশেষ দরকার । সেটা পাবার জন্য সে কতদুর যেতে পারে সেইটে দেখার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে ।’

॥ ৬ ॥

মগনলাল বিমুদবার পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল ফেলুদা তার মধ্যে ওর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করল না । আর বিস্ফোরণটা হল শুরুবার সকালে ।

আমিও ফেলুদার দেখাদেখি রোজ সকালে যোগব্যায়াম করি । সাড়ে ছ'টায় সে ব্যাপার শেষ হয়েছে । ফেলুদার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না দেখে আমি তার ঘরের দিকে গেলাম । দরজাটা ভেজানো ছিল । ঠিলে খুলতেই একটা দৃশ্য দেখে থে হেরে গেলাম ।

ফেলুদা এখনও ঘুমোচ্ছে । এ যে অভাবনীয় ব্যাপার । এই সময়ের মধ্যে ফেলুদার স্নান ব্যায়াম দাঢ়ি কামানো সব শেষ হয়ে যায় । সে বসবার ঘরে খবরের কাগজ পড়ে । আজ কী হল ?

আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম । বার দু-এক ঠিলা দিয়ে আর নাম ধরে ডেকে বুঝতে পারলাম ওর ইশ নেই ।



আমার দৃষ্টি ঘোড়েরেজের আঙ্গুঘারির দিকে চলে গেলো। দরজা ছাট হয়ে আছে। সামনে মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়ানো।

ফেলুদার পাল্স দেখলাম। দিয়ি চলছে। দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে আমাদের ডাক্তার ভৌমিককে টেলিফোন করে ব্যাপারটা বললাম। ভদ্রলোক দশ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। ফেলুদাকে যথন পরীক্ষা করছেন তখনই ও নড়াচড়া আরম্ভ করেছে। ভৌমিক বললেন, 'ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হয়েছে অজ্ঞান করার জন্য। কিন্তু লোক ঘরে চুকল কী করে ?'

সেটা আমি দু' মিনিটের মধ্যে বার করে দিলাম। বাথরুমের উত্তর দিকে জমাদার ঢোকার দরজাটা খোলা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফেলুদার জ্ঞান হল। ডাক্তার ভৌমিক ভরসা দিয়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। তবে এম্বা কী ক্ষতি করেছে সেটা একবার দেখে নিন। আলমারি তো দেখছি খোলা।'

'তোপ্সে দেরাজটা একবার যুলে দেখ তো !'

দেখলাম, কিন্তু সেই লাল ভেলভেটের কৌটো কোথাও পেলাম না। অর্থাৎ পিংক পার্ল উধাও।

ফেলুদা মাথা নেড়ে আঙ্কেপের সুরে বলল, 'বাথরুমের দরজা বঙ্গ করতে আমার কোনওদিন ভুল হয় না। কালও হয়নি। আমলে ছিটকিনিটা ভাল কাজ করছিল না। কেন যে সারিয়ে নিইনি—কেন যে সারিয়ে নিইনি!'

ডাক্তার ভৌমিক চলে গেলেন।

আমি ফেলুদার অবস্থা দেখেই লালমোহনবাবুকে ফোন করে দিয়েছিলাম। উনি এবার এসে পড়লেন।

'পিংক পার্ল নেই?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, 'না।' ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমাকে হেলাফেলা করার রেজাল্টটা দেখলেন তো? আমি প্রথমেই বলেছিলাম—কাজটা ভাল হচ্ছে না। আপনার যে এই দশ্য করতে পারে সে লোক কী সাংঘাতিক ভেবে দেখুন। এখন কী করা?'

ফেলুদা উঠে বসে চা পায়িল। বেলার সে একন হাতেজ পাসেটি ফিট। 'বড়ালকে দুঃসংবাদটা এখনও দেব না। আগে দেখি মুক্তেটা উদ্ধার করতে পারি কি না।'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি তুলে কথা বলে সেটা ফেলুদার হাতে চালান করে দিলাম। 'তোমার ফোন।'

ফেলুদা মিনিট তিনিক কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, 'সোনাহাটি থেকে সোমেশ্বর। বড়ালের থবর আছে। সূরয় সিং আবার চিঠি লিখেছে। মুক্তো তার চাই। সে সাত দিনের জন্য দিলি যাচ্ছে, সেখান থেকে ফিরে সোনাহাটি গিয়ে বড়ালের সঙ্গে দেখা করবে। সে এক লাখ টাকা অফার করছে। এত টাকা পাবে বড়াল ভাবেন। সে এখন মুক্তেটা বেচে দেবার কথা ভাবছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে মুক্তেটা এখন ওর একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলছে আপদ বিদেয় করাই ভাল। আমি আর বললাম না যে মুক্তেটা মগনলালের হাতে চলে গেছে।'

‘কিন্তু সেটা তো উদ্ধার করতে হবে,’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘তা তো হবেই। সেটাই এখন আমাদের কাজ। তোপ্সে
টেলিফোন ডিব্রেক্টরি থেকে মগনলালের ঠিকানাটা বার কর তো।’

‘সাতষটি নম্বর চিন্তারঞ্জন আভিনিউ,’ বই খুলে নম্বর দেখে
বললাম।

‘চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব,’ বলল ফেলুন্দা।

‘এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করছেন তো?’ জিজ্ঞেস করলেন
জাটায়।

‘ইয়েস স্যার।’

‘পুলিশে থবর দেবেন না?’

‘কী লাভ? তারা তো অনুসন্ধান করে নতুন কিছু বলতে পারবে
না। সবই তো আমার জ্ঞান।’

চিন্তারঞ্জন আভিনিউতে মগনলালের বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন
বেজেছে ন'টা দশ। আমরা ভিতরে চুকছি আর লালমোহনবাবু
বিড়বিড় করছেন—‘আজ আবার কী খেল দেবাবে কে জানে!’

কিন্তু তিনিইয়ার মগনলালের খনিতে পৌঁছে তাকে প্রাওয়া গেল
না। তারই একজন কর্মচারী বলল, মগনলাল সকালে দিল্লি চলে
গেছেন।

‘প্রেনে গেছেন?’ ফেলুন্দা জিজ্ঞেস করল।

‘না, ট্রেন।’

আমরা আবার নীচে মেমে এলাম। লালমোহনবাবু বললেন,
‘আশ্চর্য ব্যাপার ইনিও দিল্লি গেছেন আর ওদিকে সুরয় সিংও দিল্লি
গেছেন।’

‘ব্যাপারটা ভেরিফাই করতে হবে,’ বলল ফেলুন্দা।

চতুর্দিকে ফেলুন্দার চেনা—রেলওয়ে আপিসেও বাদ নেই।
অপরেশবাবু বলে বুকিং-এর এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ফেলুন্দা
জিজ্ঞেস করল, ‘আজ সকালে দিল্লির কী কী ট্রেন আছে?’

‘সোঁয়া ন'টায় আছে—এইটি ওয়ান। পরদিন সকালে দশটা
চালিশে দিল্লি পৌঁছায়।’

‘এ ছাড়া আর কিছু নেই?’

‘না !’

‘এবার রিজার্ভেশন চাটটা দেখে বলুন তো মিস্টার মেঘরাজ বলে এক ভদ্রলোক এই ট্রেনে দিলি গেছেন কি না !’

ভদ্রলোক চাটের নামের উপর চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় খেমে বললেন, ‘মিস্টার এম. মেঘরাজ ! ফার্স্ট ক্লাস এ. সি.। কিন্তু ইনি তো দিলি যাননি !’

‘তা হলে ?’

‘বেনারস ! বেনারস গেছেন। আজ রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছবেন।’

‘বেনারস ?’

কথাটা শুনে আমারও আশ্চর্য লাগছিল, তবে এটা তো জানি যে মগনলালের বেনারসেও একটা বাড়ি রয়েছে। সেখানেই তে আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ।

‘কাল সকালের দিকে বেনারস পৌঁছায় এমন কী কী ট্রেন আছে ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করলে।

আপনি দুটো সুবিধের ট্রেন পাবেন একটা অমৃতসরি মেল, আর একটা ডুন এক্সপ্রেস। প্রথমটা ছাড়ে সক্যা সাতটা কুড়ি আর বেনারস পৌঁছায় পরদিন সকাল দশটা পাঁচ, আর অন্যটা ছাড়ে রাত আটটা পাঁচ আর পৌঁছায় সকাল এগারোটা পনেরো।’

ফেলুদা না হলে অবিশ্য আমাদের রিজার্ভেশন পাবার কোনও সন্তানবাই ছিল না। সঙ্গে টাকা ছিল না। তাই বাড়ি ফিরতে হল। আবার রেল আপিসে ফিরে গিয়ে বারোটার মধ্যে রিজার্ভেশন হয়ে গেল। লালমোহনবাবু চলে গেলেন তাঁর বাড়িতে বাস্তু গুছাতে। ফেলুদা বলে দিল, ‘ক’দিনের জন্য যাচ্ছি কিছু ঠিক নেই মশাই। আপনি এক হণ্টার মতো জামাকাপড় নিয়ে নিন। ওদিকে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা—সেটা ভুলবেন না।’

ট্রেনে বলবার মতো একটা ঘটনাই হল। পরদিন সকালে সাড়ে সাতটায় বজ্জারে খবরের কাগজ কিনে তাতে একটা জরুরি খবর পড়লাম। আমেরিকা থেকে একটা ব্যবসায়ীদের দল এসেছে, তারা যে সব ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে তার মধ্যে সুরক্ষ

সিং একজন। ভদ্রলোকের দিল্লি যাবার কারণটা বোৰা গেল।

মিনিট পনেরো লেট করে আমাদের ট্রেন বেনারস পৌছে গেল।

॥ ৭ ॥

বেনারসে দ্বিতীয়বার এসেও সেই প্রথমবারের মতোই চমক লাগল। এবারও দশাখন্মেধ রোডে ক্যালকাটা লজেই উঠলাম। ঘ্যানেজারও একই রয়েছেন—নিরঞ্জনবাবু। ঘর আছে কি না জিজ্ঞেস করতে বললেন, ‘আপনাদের জন্য ঘর সব সময়ই আছে। ক’দিন থাকবেন?’

‘সেটা আগে থেকে বলতে পারছি না,’ বলল ফেলুন্দা।

আমরা আগেরবারের মতোই একটা চার বেডের ঘর পেয়ে গেলাম।

বেকফাস্ট বক্সেই সারা হয়ে গিয়েছিল, তাই খাবার তাড়া নেইকে ফেলুন্দা বলল, ‘আগে কর্তব্যজ সেবে নিউ তারপর খাবার কথা ভাবা যাবে।’

‘আপনি কি একেবারে বায়ের খাঁচায় গিয়ে ঢোকাব কথা ভাবছেন?’ লালমোহনবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

‘আপনি যদি হোটেলে থাকতে চান তো থাকতে পারেন।’

‘না না, সে কি হয়? শ্রী মাস্কেটিয়ার্স—ভুলে গেলে চলবে কেন?’

মগনলালের বাড়ি বিশ্বনাথের গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা বারোটা নাগাদ রওনা দিয়ে দিলাম। আবার সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই গন্ধ। মনে হল এই ক’বছরে একটুও বদল হয়নি, আর কোনওদিনও হবে না। কয়েকজন দোকানদারের মুখও যেন চিনতে পারলাম।

ক্রমে মন্দির ছাড়িয়ে আমরা গলির একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে পৌছে গেলাম। সব মনে পড়ছে। এর পরে ডাইনে ঘূরতে হবে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়েই আমরা পৌছে যাব মগনলালের

বাড়ির বাস্তায়।

‘আপনি কী বলবেন সেটা ঠিক করে নিয়েছেন?’ লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, ‘আমি যে সব সময় আগে থেকে ভেবে কাজ করি তা নয়। একেকটা বিশেষ মুহূর্তে একেকটা বিশেষ আইডিয়া এসে যায়। তখন সেইটে প্রয়োগ করি।’

‘এর বেলাও তাই করবেন?’

‘সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।’

মগনলালের বাড়ির সদর দরজার দু’পাশে এখনও তলোয়ারধারী দুই প্রহরীর ছবি, এই ক’বছরে রংটা একটু ফিকে হয়ে গেছে।

আমরা দরজা দিয়ে চুকে একতলার উঠোনে পৌছলাম। কেউ কোথাও নেই। দু’বার ‘কোই হ্যাত্ত’ বলেও ফেলুদা জবাব পেল না।

‘চুন উপরে,’ বলল ফেলুদা। ‘লোকটার সঙ্গে যখন দেখা করতেই হচ্ছে, তবে নীচে দাঁড়িয়ে থেকে তো কোনও জাত নেই।’

আবার সেই ছেচেরিশ ধাপ সিঁড়ি আবার সেই তিনি তুলায়।

দরজা দিয়ে বারান্দায় চুক্তে একজন লোক সামনে পড়ল। সে যৈনি ডজছিল, আমাদের দেখে একটু আবাক হয়ে হিন্দিতে প্রশ্ন করল, ‘আপনারা কাকে চাইছেন?’

‘মগনলালজী আছেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘আছেন, তবে উনি এখন থেতে বসেছেন। আপনারা ওঁর ঘরে অপেক্ষা করুন। চুন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।’

আমরা আবার অনেকদিন পরে মগনলালের ঘরে এসে চুকলাম। এই ঘরেই লালমোহনবাবুকে নাকাল করেছিলেন তদ্বলোক। সে ঘটনা কোনওদিনও ভুলব না। লালমোহনবাবুকে নিয়ে রগড় করার একটা বাতিক লোকটার মজ্জাগত।

কাঠমাণুতেও লালমোহনবাবুর চায়ে এল. এস. ডি. মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে অবিশ্য লালমোহনবাবুর খুব ক্ষতি হয়নি, কিন্তু হ্বার সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়।

আমরা তিনজন ‘সোফায় বসার পরেই জটায়ু চাপা স্বরে বললেন,

‘কী বলবেন ঠিক করে ফেলুন মশাই। এইবেলা ঠিক করে ফেলুন। আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।’

‘আপনার মাথা দিয়ে তো আর এ মামলা চালাচ্ছি না আমি। আপনি চুপচাপ দেখে যান।’

‘ইয়েটা সঙ্গে আছে?’

ইয়ে মানে ফেলুদার রিভলভার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

‘আছে। নার্ভটাকে ঠাণ্ডা করুন। এ সব সিচুয়েশনে সঙ্গে একজন নার্ভসি লোক থাকলে বড় অসুবিধা হয়।’

কোথেকে যেন একটা তোলকের শব্দ আসছে, ঘরের দেয়াল-ঘড়ি টিক টিক করছে, নাকে রামার গান্ধ এসে চুকাছে, আমরা চুপচাপ বসেই আছি তো বসেই আছি।

‘একটা লোকের খেতে এত সময় লাগে?’ বিড়বিড় করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা বলার মিনিট খানেকের মধ্যে একজন লোক এসে ঘরে চুকল্প সে যে কুকুর ভাঁজা পালোয়ান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে ফেলুদার সামনে পিয়ে বলল, ‘খাব হো জাহিয়ে।’

‘কিউ?’ ফেলুদার প্রশ্ন।

‘সার্চ হোগা।’

‘কে হকুম দিয়েছে তোমায়?’

‘মালিক।’

‘মগনলালজী?’

‘হ্যাঁ।’

ফেলুদা তবু বসে আছে দেখে লোকটা তার দুঃহাত ধরে হাঁচকা টান দিয়ে অনায়াসে তাকে দাঁড় করাল। ফেলুদা আর কোনও আপত্তি করল না, কসরণ এ লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা পাঁচটা ফেলুদারও সাধ্য নেই।

লোকটা চাপড় মেরে প্রথমেই ফেলুদার রিভলভারটা বার করল। তারপর মানি ব্যাগ আর কুমাল।

এবার ফেলুদাকে ছেড়ে লোকটা লালমোহনবাবুকে ধরল। লালমোহনবাবু অবিশ্বিয় ফেলুদার সার্চ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই

উঠে দাঢ়িয়েছেন হাত মাথার উপর তুলে ।

আমাদের তিনজনের সার্চ শেষ হবার পর লোকটা রিভলভার ছাড়া আর সব কিছু ফেরত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । তারপরেই বাইরে থেকে একটা গুলা খাঁকরানির আওয়াজ পেলাম । এ আমাদের খুব চেনা গুলা ।

‘এ ভাবে আমার পিছে লাগলেন কেন, মিস্টার মিটার ?’ গদিতে বসে মগনলাল প্রশ্ন করলেন । ‘আপনার এখনো শিক্ষা হয়নি ? কী লাভ আছে আমার পিছে পিছে ঘুরে ? আপনি তো সে মোতি আর ফিরত পাবেন না ।’

‘আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন—তাই না, মগনলালজী ?’

‘সে তো আপনিও করেন । বুদ্ধি না থাকলে আর এতদিন বেওসা চালাচ্ছি ? বুদ্ধি না থাকলে আর আপনার ঘর থেকে মোতি বার করে আনতে পারি ?’

‘কী মোতি ?’

‘পিংক পার্ল’ মগনলাল টেলিয়ে উঠলেন । ‘কী মোতি সেও কি আপনাকে বলে দিতে হবে ?’

‘কে বলল পিংক পার্ল ?’ ধীর কঠে বলল ফেলুদা । ‘ইটস এ হোয়াইট পার্ল । তাও খাঁটি মুক্তো নয়, কালচারড পার্ল—যার দাম অনেক কম । আপনাকে ভাঁওতা দেবার জন্য ওতে পিংক রং করা হয়েছে । আসল মুক্তো চলে গেছে যার জিনিস তার কাছে । অত বেশি বুদ্ধিমান ভাববেন না নিজেকে, মগনলালজী ।’

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার কথা শুনছি । ও কী করে এত সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে ? কোথেকে ওর এত সাহস হচ্ছে ? লালমোহনবাবু মেখলাম মাথা হেঁট করে রাখেছেন ।

‘আপনি সচ বলছেন ?’

‘আপনি কীভাবে যাচাই করতে চান করে দেখুন ।’

মগনলাল তার সামনে রাখা একটা ক্লিপেলি কলিং বেলে চাপড় মারল । পর মুহুর্তেই সেই পালোয়ান লোকটা আবার এসে ঢুকল ।

‘সুন্দরলালের দোকান থেকে ওকে ডেকে আনো । বলো

মগনলালজী ডাকছেন। তুরস্ত।' ভূত্য চলে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ। মগনলাল একটা পানের ডিবে থেকে পান নিয়ে মুখে পুরলেন। তারপর ডিবে বন্ধ করার সময় একটা অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন করলেন।

‘রবীন্দ্রনাথ টেগোরের গান আপনি জানেন?’

এবার মগনলালের চাউনি থেকে বুঝলাম প্রশ্নটা করা হয়েছে জটায়ুকে।

‘কী আঙ্কল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনি বাঙালি আর আপনি টেগোর সৎ জানেন না।’

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে না বোঝালেন।

‘সৎ বোলছেন?’

এবারে মাথা নড়ল উপর-নীচে। অর্থাৎ হ্যাঁ। ভদ্রলোক এখনও মাথা তুলতে পারছেন না।

এবার ফেলুদা বলল, ‘উনি পান করেন না, মগনলালজী।’

‘ক্ষমেন, না, তো কী হল? এখন করবেন। দশ মিনিট লাগবে সুন্দরীলালের এয়ানে আসতে। সেই টাইমে টেগোর সৎ হবে। আঙ্কল উইল সিং। আসুন আঙ্কল—গদিপর বসুন। সোফায় বসে কি গান হয়? গেট আপ, গেট আপ! না গাইবেন তো বড় মুশকিল হবে।’

‘আপনি বার বার তেকে নিয়ে এমন তামাসা করেন কেন বলুন তো?’ বেশ রেগে গিয়েই বলল ফেলুদা। ‘উনি আপনার কী ক্ষতি করেছেন?’

‘নাথিৎ। দ্যাট ইজ হোয়াই আই লাইক হিম। উঠুন আঙ্কল। উঠুন, উঠুন।’

নিরূপায় ইয়ে লালমোহনবাবু সোফা ছেড়ে উঠে গদিতে বসলেন।

‘ভেরি গুড। মাউ সিং।’

আর কোনওই রাস্তা নেই। তাই ভদ্রলোক সত্যিই গান ধরলেন। ‘আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।’

মগনলাল তাকিয়ায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে পাশে রাখা



ক্যাশ-বাজের উপর তাল ছুকে তারিফ করতে আগলেন। এই অস্তুত গানের তারিফ হতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আয় পাঁচ মিনিট একটানা গেয়ে লালমোহনবাবু আর আরলেন না। বশ্বলেন, বাকিটা আমি কী?

‘দ্যাট ইজ এনাফ,’ বললেন মগনলাল। ‘এবার সোফায় গিয়ে বসুন।’

লালমোহনবাবু সোফায় বসতেই ঘরে লোকের প্রবেশ হল—সেই পালোয়ান চাকুর, আর একজন পুরু চশমাপরা বুড়ো।

‘আইয়ে সুন্দরলালজী,’ বললেন মগনলাল। ‘আপনি এত বুচ্চা হয়ে গেছেন এই ক'বছরে তা ভাবতে পারিনি। একটা কাজের জন্য আপনাকে ভেকে পাঠিয়েছি।’

সুন্দরলাল গদিতে বসলেন। মগনলাল তাঁর ক্যাশবাজু খুলে তার থেকে ভেসভেটের বাক্সটা বার করলেন। তারপর বাক্স থেকে মোতিটা বার করে সুন্দরলালকে প্রশ্ন করলেন, ‘গুলাবী মোতি হয় সেটা আপনি জানেন?’

‘গুলাবী মোতি?’

‘হ্যা।’

‘সেরকম তো শনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।’

‘আপনি পঞ্জাশ বছৱ হল দোকান চালাচ্ছেন আৱ গুলাবী মোতি
চোখে দেখেননি ? দেখুন এইটে দেখুন । দেখে বলুন তো এটা
সচা না ঝুঁঠা ?’

সুন্দৱলাল মুজেটা হাতে নিলেন । দেখলাম তাঁৰ হাত
কাপছে । চোখের খুব কাছে এনে মুজেটাকে মিনিটখানেক ধৱে
দেবে সুন্দৱলাল বললেন, ‘হ্যাঁ, এটো সত্যিই দেখছি গুলাবী
মোতি । অ্যায়সা কভী মেহি দেখা ।’

‘তা হলে এটা খাঁটি ?’

‘ওইসাই তো মালুম হোতা ।’

‘এবাৰ মোতিটা দিয়ে দিন আমাকে ।’

সুন্দৱলাল মুজেটা ফেরত দিয়ে দিল ।

‘এবাৰ আপনি যেতে পাৱেন ।’

সুন্দৱলাল ধৰ থেকে বেঝোনৰ পৰ মগনলাল ফেলুদাৰ দিকে
চেয়ে বললেন, ‘আপনি ঝুটি বাত বলেছেন, মিস্টাৱ মিটাৱ । এই
পার্ল জেনুইন কি ?’

‘এটো কি আপনি সূৰ্য সিংকে বিক্রি কৰতে চানি কি ?’

‘আমি কী কৰি না-কৰি তাতে আপনাৰ কী ?’

‘আপনি তো এখন থেকে দিয়ি যাবেন ?’

‘হ্যাঁ, যাৰ ।’

‘ওখানে তো সূৰ্য সিং রয়েছেন ।’

‘সে খবৰ আমি পেপোৱে পড়েছি ।’

‘আপনি কি বলতে চান তাঁৰ সঙ্গে আপনাৰ কোনও কাৰবাৰ
নেই ?’

‘আমি কিছুই বলতে চাই না, মিস্টাৱ মিটাৱ । দ্য পিংক পার্ল
চ্যাপ্টাৱ ইজ ক্লোজড । আমি ওই নিয়ে আপনাৰ সঙ্গে আৱ
কোনও কথা বলব না ।’

‘ঠিক আছে, আমি উঠেছি । আমাৱ যে জিনিসটা আপনাৰ কাছে
ৱয়েছে সেটা দয়া কৰে ফেরত দিন ।’

মগনলাল আবাৱ কলিং বেল টিপলেন । পালোয়ান এসে
দাঁড়াল ।

‘একে এর রিভলভার ওয়াপিস দিয়ে দাও।’

পালোয়ান আঞ্জা পালন করল, ফেলুদা আর আমরা দু’জন উঠে
পড়লাম।

মগনলালের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে লালমোহনবাবুকে
জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখন কেমন লাগছে?’

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, ‘সোকটা কী করে যে একটা
মানুষের উইক পয়েন্ট ধরে ফেলে!—পাঁচ মিনিট ধরে একটানা
রবীন্দ্রসংগীত জীবনে এই প্রথম গাইলাম।’

একত্রিয় এসে ফেলুদা বলল, ‘আজকে যে একটা খুব জরুরি
কাজ হয়ে গেল সেটা কি বুঝতে পেরেছেন, লালমোহনবাবু?’

‘জরুরি কাজ?’ ভদ্রলোক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

‘হিয়েস স্যার,’ বলল ফেলুদা। ‘জেনে গোলাম ও মুক্তেটা
কোথায় রাখে।’

‘আপনি কি ওটা আবার আদায় করার তাল করছেন?’

‘ন্যাচারেলিং।’

॥ ৮ ॥

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢোকার আগেই নিরঞ্জনবাবু তাঁর ঘর থেকে
ডাক দিয়ে বললেন, ‘একটি ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করার
জন্য অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন।’

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে দেখি একটি মাঝারি হাইটের কালো
ভদ্রলোক, বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তালিশ, ম্যানেজারের উলটো দিকে
একটা চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের দেখে ভদ্রলোক উঠে
দাঁড়ালেন।

‘আমার নাম মতিলাল বড়াল।’

‘আপনি কি জয়চাঁদবাবুর ভাই?’

‘খুড়তুতো ভাই। এখানে একটা সিনেমা হাউস আছে আমার।’

‘চলুন, আমাদের ঘরে চলুন। কথা হবে।’

আমরা চারজন আমাদের ঘরে এলাম। আটে বসে ভদ্রলোক

প্রশ্ন করলেন, 'মুজেটা এখন কেথায় ? জয়চাঁদের কাছে ?'

'না।'

'তবে ?'

'মগনলাল মেঘরাজের নাম শনেছেন ?'

'বাবা ! তেইশ বছর কাশীতে আছি, আর মগনলালের নাম শনব না ?'

'মুজেটা তাঁরই কাছে আছে।'

'কিন্তু তিনি তো মুজে জমান না। তিনি তো দালাল ; কম দামে জিনিস কিনে বেশি দামে বেচেন।'

'এবাবেও তাই করবেন। ধরমপুরের সূরয় সিংকে উনি মুজেটা বেচবেন।'

'সূরয় সিং এখানে আসছেন ?'

'না। উনি দিল্লিতে। আমার যতদূর ধারণা, মগনলাল দিল্লি যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'আপনি কীভাবে হচ্ছেন ?'

'আজগাঁও দীর্ঘ যাবে—থিয়ে তাঁর আপ্তে মুজেটা আস্তায় করতে পারি।'

'মগনলাল যদি টাকা না পায়, তা হলে আমার তাই পাবে তো ?'

'সূরয় সিং যদি তাঁর কথা রাখেন তা হলে নিশ্চয়ই পাবেন।'

'আশ্চর্য ! এমন একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস ফ্যামিলিতে রয়েছে এতকাল ধরে, আর জয় সে কথা একবারও বলেনি। ও একাই জিনিসটাকে আগলে রেখেছে।'

'আপনি জানতেন না এতে আমার খুব অবাক লাগছে।'

'আমি পনেরো বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া। তারপর আর সোনাহাটি যাইনি। কাগজে মুজের কথাটা পড়ে জয়কে চিঠি লিখেছিলাম, যে বিক্রি যদি হয় তা হলে আমি যেন একটা শেয়ার পাই। ও লিখল আমি বিক্রি করব না। তারপর কাল একটা চিঠি শেয়েছি তাতে লিখেছে ও মাইন্ড চেঞ্জ করেছে, বিক্রি করবে। এই যে সেই চিঠি !'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিলেন। ফেলুদা



সেটা পড়ে ফেরত দিয়ে বলল, 'আপনাকে তো বিশ হাজার অফার করেছে, আপনি তাতে সন্তুষ্ট ?'

'আরেকটু বেশি হলে আরও খুশি হতাম, তবে নেই-মামার চেয়ে কানা মায় ভাল । মুক্তেটা যে ফগনলালের কাছে আছে সে বিষয়ে আপনি শিওর ?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি ।'

মতিলালবাবু একটুকুণ ভাবলেন । তারপর বললেন, 'আপনি যদি মুক্তেটা চান, তা হলে তো আপনিই সেটা সূর্য সিংকে বিক্রি করবেন ?'

'তা তো বটেই, এবং তা হলেই আপনি আপনার শেয়ার

পাবেন।'

‘তা হলে প্রথম কাজ হচ্ছে যগনলালের কাছ থেকে মুক্তেটা আদায় করা।’

‘সে বাপারে আপনি আমাকে হেল্প করতে পারেন?’

‘আপনার কী দরকার?’

‘বেপরোয়া কাজ করতে পারে এমন কিছু লোক।’

মতিলালবাবু কয়েক মুহূর্ত মাথা হেঁটি করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘একটা কথা আপনাকে বলি, মিস্টার মিস্টির—আজকাল শুধু সিনেমা হাউস চালিয়ে সংসার চলে না। সোকেরা সব বাড়িতে বসে ছবি দেখে। তাই কিছু একদ্রোজগারের রাস্তা দেখতে হয়।’

‘মানে গোলমেলে কাজ?’

‘কিন্তু আইন বাঁচিয়ে।’

‘তার মানে আপনার হাতে লোক আছে?’

‘যগনলালের যে রাইট-হ্যার্ড মান—মনোহর—সে আমার দিকে চলে এসেছে। তা ছাড়ি আঁচাও সুশ্রেক্ষণ প্রেরণ আমি দিতে পারি।’

‘ভৱিষ্যত গুড়।’

‘আপনি বলুন কখন কী করতে হবে।’

‘আজ রাত বারোটা। আন-বাপীতে চলে আসুন আপনার সোক নিয়ে। আমরা ওখানে থাকব।’

‘ঠিক আছে। রাত বারোটা।’

‘আপনি আবার গৌয়ার্তুমি করছেন?’ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। সে মতিলালবাবুকে বলল, ‘যগনলালের কিন্তু একটি পালোয়ান তৃত্য আছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা বস্তার কথাটা ভুললে চলবে না।’

মতিলালবাবু হেসে বললেন, ‘আমার মনোহরও পালোয়ান। তার উপরে মাথায় বুদ্ধি রাখে।’

‘তা হলে ওই কথা রইল। রাত বারোটা, আন-বাপী।’

মতিলালবাবু উঠে পড়ে বললেন, ‘একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস

করা হয়নি। মুক্তোটা ও কোথায় রাখে জানেন ?
 ‘আনি। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।’
 ‘অল রাইট।’

ভদ্রলোক চলে গেলে ফেলুদাও বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলল,
 ‘আমার নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দু’ মিনিট দরকার আছে। সেটা সেরে
 দক্ষিণ হত্তের ব্যাপারটা সারা যাবে। বেশ কিম্বে পেয়েছে।’

॥ ৯ ॥

কাশীর মতো থমথমে রাত শুরু করে জায়গাতেই দেখেছি। সেটা
 আরও বেশি মনে হয় এই জন্যে যে দিনের বেলা জায়গাটা লোকে
 জনে গড়ে শব্দে ভরে থাকে। আমরা বারোটাৰ সময় যখন
 জ্যন-বাপী পৌত্রলাম তখন একটা রাস্তার কুকুরের ডাক ছাড়া
 কোনও শব্দ নেই।

মিনিট পাঁচেক আপোকা করাত পর ফেলুদা একটা ক্লোচ-করা
 চারমিনুক পায়ের তলায় কেলে চাপ দিতেই চোপা গলায় শোনা
 গেল, ‘মিস্টার মিস্টির !’ বুঝলাম মতিলাল বড়াল হ্যাজির।

কতগো অক্ষকার মৃতি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ‘আমার
 সঙ্গে তিনজন লোক আছে। আপনি রওনা দেবার জন্য তৈরি ?’

চাপা শব্দে প্রায় ফিস্ফিসিয়ে কথা হচ্ছে। ফেলুদাও সেইভাবেই
 বলল, ‘নিশ্চয়ই। আর, আমাদের গাইড করতে হবে না, আমরা
 রাস্তা জানি।’

‘তা হলে চলুন।’

অক্ষকারের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ফেলুদা আর
 মতিলালবাবু দু’জনেই দেখলাম রাস্তা শুরু ভাল করে জানে, আর এই
 ঘূটঘূটে অক্ষকারেও বেশ ক্রস্তই এগিয়ে চলেছে। এক জ্যায়গায়
 একটা রাস্তার আলো টিপ্পটিম করে ঝলছিল। সেই আলোতে দেখে
 নিয়েছি মতিলালবাবুর তিনজন লোকের মধ্যে একজন ভীষণ
 বজা। বুঝলাম এই হচ্ছে মনোহর।

মগনলালের রাস্তার মুখে এসে সকলে থামল। ফেলুদা



লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমাদের হয়তো মিনিট কুড়ি লাগবে।'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই মতিলালবাবু আর ওই তিনজন লোকের সঙ্গে ফেলুদা মগনলালের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেদের নিষ্পাস ফেলার শব্দ পাচ্ছি। অবশ্যে লালমোহনবাবু হয়তো আর থাকতে না পেরে ফিসফিস করে বললেন, 'ওই পুত্রাদের সঙ্গে তোমার দাদার যাবার কী দরকার ছিল বুঝতে পারলাম না।'

'সেটা যথাসময়ে বুঝবেন।'

'আমার বাপাপারটা ভাল লাগছে না।'

'ঠিক আছে। আমার মনে হয় কথা না বলাই ভাল।'

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। খুব মন দিয়ে শুনলে দূর থেকে হারমোনিয়াম আর ঘুঙ্গুরের শব্দ পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাইলাম। এত ভৱানুকলকাতার আকাশে কোনওদিন দেখিনি। এই তাঙ্গুর আলোকেই ওপর স্থান আবেক্ষণ্যে আছে। যতদূর মনে হয়, আজ আমাবস্যা নাই।

বেশি সময় যায়নি, কিন্তু এখনই মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কল্পনা হল? দশ মিনিট? পনেরো মিনিট? আশ্চর্য! মগনলালের বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে, এখান থেকে ত্রিশ হাত দূরে, কিন্তু তার কোনও শব্দ নেই।

আরও মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর পারের শব্দ পেলাম। একজনের বেশি লোক। এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ফেলুদারাই ফিরছে। কাছে এসে বলল, 'চ।'

'কাজ হল?' রুক্ষস্বাসে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'খতম,' বলল ফেলুদা। তারপর মতিলালবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনার শেয়ারের ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

আমরা আমাদের হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

কথা হল একেবারে ঘরে চুকে।

‘কিছু বলুন, মশাই !’ আর ধাকতে না পেরে বললেন লালমোহনবাবু ।

‘আগে এইটে দেখুন ।’

ফেলুদা পকেট থেকে লাল ভেলভেটের বাজ্জটা বার করে খাটের উপর রাখল ।

‘সারাস !’ বললেন লালমোহনবাবু । ‘কিন্তু কীভাবে হল ব্যাপারটা একটু বলুন । বুন-খারাপি হয়নি তো ?’

‘সেই পালোয়ানটা মাথায় একটু চোট পেয়েছে, সেটা মনোহরের কীর্তি ।’

‘কিন্তু ক্যাশবাস্ক খুললেন কী করে ?’

‘যে ভাবে লোকে খোলে । চাবি দিয়ে ।’

‘একি ম্যাজিক নাকি ?’

‘নো স্যার । মেডিসিন ।’

‘মানে ?’

‘সাপ্লাইজি রাই-নির্বানরুর বন্দু ভাস্কুল টোকুলি ।’

‘কি সুবলছেন আবোস জ্বরেল ? কীসের সাপ্লাই ?’

‘ক্রোরোফর্ম,’ বলল ফেলুদা । ‘শর্টে শাঠ্যম । এবার বুবেছেন ?’

পরদিন রাত সোয়া এগারোটায় দিলি এক্সপ্রেস ধরে তারপর দিন ভোর ছাঁটায় দিলি পৌছলাম । এর আগের বার আমরা জনপথ হোটেলে ছিলাম, এবারও তাই রাইলাম । ফেলুদা ঘরে এসে আর কিছু করার আগে বিভিন্ন হোটেলে ফোন করে খেজি নিতে আরম্ভ করল সূরয় সিং কোথায় আছে । দশ মিনিট চেষ্টা করার পর তাজ হোটেলে বলল, ‘হ্যাঁ, সূরয় সিং এখানেই আছেন । কুম প্রি ফোর সেভন ।’

‘একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?’

সৌভাগ্যক্রমে সূরয় সিং তাঁর ঘরেই ছিলেন । এক মিনিটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল । সঞ্চ্চা ছাঁটি । হোটেলে ওঁর ঘরেই যেতে হবে । কী কারণ জিজ্ঞেস করেছিল, বলল ফেলুদা । ‘আমি তাকে পিংক পার্ল সংক্রান্ত ব্যাপার বলাতে তৎক্ষণাৎ টাইম দিয়ে

দিল ।'

দুপুর বেলাটা কিছু করার নেই। জনপথে একটা চীনে রেস্টোরান্টে যেয়ে দোকানগুলো দেখে তিনটে নাগাত হেঠেলে ফিরে এলাম একটু বিশ্রামের জন্য। পৌনে ছাঁটায় বেরোতে হবে। লালশোহনবাবু ফেলুদাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনার ইয়েটা নিতে ভুলবেন না।'

ছাঁটায় তাজে পেঁচে ফেলুদা প্রথমে নীচ থেকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে আমরা এসেছি।

'আমার ঘরে চলে আসুন,' বললেন ভদ্রলোক।

তিনশো সাতচারিশ গিয়ে বেল টিপতে যে দরজা খুলল তাকে মনে হল সেক্রেটারি জাতীয় কেউ। বললেন, 'আপনারা বসুন, উনি এক্ষুনি আসছেন।'

ঘর বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়; তিনটে ঘর জুড়ে একটা বিশাল সুট্টা। হোটায় চুকেছি সেটা সুট্টি রাখা। আমরাই সোফায় গিয়ে বুস্পসার।

মিনিট পাঁচেক বসতেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন।

ইনি যে অত্যন্ত ধনী সেটা এক বলক দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে চোক্ত সুট, সোনার টাইপিন, পকেটে সোনার কলম। হাতে পাথর বসানো সোনার আংটি। বয়স পঞ্চামির বেশি নয়। কানের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে, বাকি চুল কালো, আর চাড়া দেওয়া গোঁফটাও কালো।

'তুই ইজ মিস্টার মিটার ?'

ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারটা সেরে নিল। ভদ্রলোক দেখলাম দাঁড়িয়েই রাইলেন।

'আপনার সঙ্গে পিংক পার্লের কী কানেকশন ?' ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন মিস্টার সিং।

ফেলুদা বলল, 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। জয়চাঁদ বড়াল মুক্তেটা আমার জিম্মায় রেখেছেন যাতে ওটা নিরাপদ থাকে।'



‘কগটা আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য নই, মিস্টার মিটার। আপনি মালিকের কাছ থেকে যে মুক্তেটা চুরি করেননি তার কী প্রমাণ?’

‘কোনও প্রমাণ নেই। আপনাকে আমার কথা মেনে নিতে হবে।’

‘আমি তাতে রাজি নই।’

‘তা হলে আমার একটা কথাই বলার আছে—আমি মুক্তেটা দেব না। এটা যার জিনিস তাঁর কাছে ফেরত চলে যাবে।’

‘মুক্তেটা দিতে আপনি বাধ্য।’

‘না মিস্টার সিং, আমি বাধ্য নই। নো ওয়ান ক্যান ফোর্স মি।’

চোখের পলকে সূর্য সিং-এর হাতে একটা রিভলভার চলে এল, আর তার পরমুচুতেই একটা কান-ফাটানো গর্জন।

কিন্তু সেটা সূর্য সিং-এর রিভলভার থেকে নয়, ফেলুদার কোণ্ট থেকে। সে সূর্য সিং-এর হাত নামানো দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। আর বিদ্যুদ্ধেগে নিজের রিভলভারটা বার করেছে।

গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সিং-এর হাত থেকে তার রিভলভারটা ছিটকে রেখিয়ে একটা ঠুঠুশব্দ ঝরে যাবের পুঁজিনু দিকের মেঘেতে পড়ল।

সূর্য সিং-এর চেহারা পাল্টে গেছে। তার চাউনিতে ঘুণার বদলে এখন সম্মুখ।

‘আমি চলিশ গজ দূর থেকে বাঘ মেরেছি, কিন্তু তোমার মতো টিপ আমার নেই। ঠিক আছে, আমি তোমার নামেই চেক লিখে দিচ্ছি, তুমি মুক্তেটা আমাকে দাও।’

ফেলুদা পকেট থেকে ভেলভেটের কৌটোটা বার করে সূর্য সিংকে দিল। কৌটোটা থেকে মুক্তেটা বার করে ডান হাতের বুজ্বো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন সূর্য সিং। তাঁর চোখ স্বল্প স্বল্প করছে।

‘আমি এটাকে যাচাই করে নিলে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না। এতগুলো টাকা...’

‘ঠিক আছে।’

‘শক্তরপ্রসাদ! হাঁক দিলেন সূর্য সিং। পাশের ঘর থেকে

একজন ফিটফাট ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, বছর চালিশেক বয়স, চোখে সোনার চশমা ।

‘স্যার ?’

‘একবার দেখো তো এই মুক্তেটা জেনুইন কি না ।’

শক্রপ্রসাদ মিনিটখানেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেই সেটা সুরয় সিংকে ফেরত দিল ।

‘নো স্যার ।’

‘মানে ?’

‘এটা ফলস । সন্তা সাদা কালচারড পার্লের উপর গোলাপী রং করে দেওয়া হয়েছে ।’

‘আর ইউ শিওর ?’

‘অ্যাবমোলিউটলি ।’

সুরয় সিং-এর মুখ লাল । কাঁপতে কাঁপতে ফেলুদার দিকে চাইলেন । তাঁর কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ।

‘ইউ-ইউ—মেরি জিনিস আমাকে পাচার করছিলে ?’

ফেলুদার মুখ হ্রস্ব হয়ে গেছে ।

‘তা হলে বড়ালের বাড়িতেই নিশ্চয়ই ফলস মুক্তে ছিল,’ বলল ফেলুদা ।

‘তোমার রিভলভার নামাও ।’

ফেলুদা নামাল ।

‘এই নাও তোমার ঝুঁঠা মোতি ।’

ফেলুদা বাঞ্চসমেত মুক্তেটা সুরয় সিং-এর হাত থেকে নিল ।

‘নাউ গেট আউট ।’

আমরা তিনজন সুবোধ বালকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম । যখন লিফ্টে উঠছি তখন দেখলাম ফেলুদার কপালে গভীর খাঁজ ।

কলকাতা ফেরার পথে ট্রেনে ফেলুদা একটা কথাও বলল না । এমন অবস্থায় যে সে কোনওদিন পড়েনি সেটা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি ।

আমরা ফিরলাম রাত্রে। পরদিন সকালে আমার ঘর থেকে শুনতে পেলাম ফেলুন্দা শুন শুন করে গান গাইছে।

আমি বসবার ঘরে এসে দেখি ও পায়চারি করছে আর 'আলোকের এই বর্ণালীরায়'-এর সুরটা ভাঁজছে। আমাকে দেখেও সে পায়চারি, গান কোনওটাই থামল না। আমি অবশ্য খুশি। ফেলুন্দাকে ঘনমরা দেখতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।

মিনিট পাঁচকের মধ্যেই লালমোহনবাবুর গাড়ির হর্ণ শোনা গেল। আমি দরজাটা খুলে দিলাম, তদ্বৰোক ঢুকলেন।

'প্রাতঃ প্রশাম !' ঘাড় হেঁট করে হাতজোড় করে বলল ফেলুন্দা। 'আসতে আজ্ঞা হোক !'

লালমোহনবাবু কেমন যেন খতমত খেয়ে একটা বোকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনি কি তা হলে... ?'

'আমি অঙ্ককার পছন্দ করি না, লালমোহনবাবু, তাই সেখানে আমাকে বেশিক্ষণ ফেলে রাখা চলে না। ফলস মুক্তেটা যে আপনার গাড়প্রাণের মেরুরা বন্ধুর কীর্তি মেটা আমি কুরেছি। আর এটা যে আপনার জন্ম আমার আক্ষতার ক্ষয়ের প্রয়াসে মেটা কুরেছি, কিন্তু কবে কখন—'

'বলছি, স্যার, বলছি' বললেন লালমোহনবাবু। 'অপরাধ নেবেন না কাইভলি। আর আপনার ভাইটিকেও মাপ করে দেবেন। আপনি মগনলালের হমকি যেরকম বেপরোয়া ভাবে নিলেন, তাতে আমি অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছিলুম। ও মুক্তেটা পেয়ে যাবে এই চিন্তাটাই আমি বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। ও তিন দিন সময় দিয়েছিল সোম, মঙ্গল, বুধ। মঙ্গলবার আমি সকালে আসি। আপনি চুল ছাঁটাতে গেলেন, মনে আছে তো ? সেই সময় তপেশ আপনার চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মুক্তেটা বার করে আমায় দেয়। এক দিনেই ডুঁপিকেটি হয়ে যায়। বুধবার ওটা তপেশকে এনে দিই, ও সুযোগ বুঝে সেটা আলমারিতে রেখে দেয়। যা করেছি তা শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য, বিশ্বাস করুন।'

'আপনাদের ফন্দি অবিশ্য তারিক করার মতোই।'

'আপনি সেদিন যখন মগনলালকে বললেন মুক্তেটা ফলস,

তখন আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাদের কারসাজি ধরে ফেলেছেন।'

'না ধরিনি। আপনাদের পক্ষে একটা মাথা খাটানো সম্ভব সেটা ভাবতে পারিনি। আসলে আপনারা যে ফেলু মিন্ডিরের এত কাছে থাকেন সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'জয়চাঁদবাবু নিশ্চয়ই আরও ভাল অফার পাবেন।'

'অল্রেডি পেয়েছেন। কাল এসে সোমেশ্বরের একটা চিঠিতে জানলাম। এক আমেরিকান ভদ্রলোক। এক লাখ পঁচিশ অঞ্চার করেছেন।'

'বাঃ, এ তো সতিই সুখবর।'

ফেলুদা এবার আমার দিকে ফিরল। আমি একটা গাঁটা কি রদ্দা এক্সপ্রেস্ট করছিলাম, তার বদলে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'তোকে একটা অ্যাডভাইস দিই। এই ঘটনাটার বিষয় যখন লিখবি, তখন তোদের এই কীভিটার কথা একেবারে শেষে প্রকাশ করবি। নইলে গাঁপ-জল্লব না।'

আমি অক্ষিণ্ণি স্বাই করেছিল। স্নোকে অশ্বা করি আমার এই কারচুপিটা মাইন্ড করবে না।

'তা হলে এবার আসলটা আপনাকে দিয়ে দিই?' বললেন লালমোহনবাবু।

'ইয়েস, ইফ ইউ পিজ, মিস্টার গান্ডুলী।'

জটায়ু পকেট থেকে লাল ভেঙ্গভেটের কৌটেটা বার করে ফেলুদাকে দিল। ফেলুদা বাঞ্চটা খুলে জানালার কাছে গিয়ে আলোতে ধরল।

গোলাপী মুক্তি সংগীরবে বিরাজমান।



ইংরেজাল রহস্য

॥ ১ ॥

অন্য অনেক জিনিসের মতো ম্যাজিক সমস্কেও ফেলুদার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এখনও ফাঁক পেলে তাসের প্যাকেট হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতসাফাই অভ্যাস করতে দেখেছি। সেইজন্যেই কলকাতায় সূর্যকুমারের ম্যাজিক হচ্ছে দেখে, আমরা তিন জনে ঠিক করলাম এক দিন গিয়ে দেখে আসব। তৃতীয় ব্যক্তিটি অবশ্য আমাদের বন্ধু রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গান্ধুলি ওরফে জটায়। যারা ম্যাজিকের আয়োজন করেছে তারা ফেলুদার খুব চেনা, তাই চাইতেই তিনখানা প্রথম সারিয়ে টিকিট পাওয়া গেল।

গিয়ে দেখি হল প্রায় ছ আনা ফাঁকা। ম্যাজিক যা দেখলাম নেহাঁ খারাপ নয়, কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন ঘাটতি আছে। ফ্রেঞ্চ-কাট দাঢ়ির সঙ্গে একটা চুমকি বসানো সিক্কের পাগড়ি, কিন্তু গলার আওয়াজটা পাতলা। গোলমালটা সেখানেই। অথচ ম্যাজিশিয়ানকে অবর্গন কথা বলে ঘেতে হয়।

সামনের সারিতে বসার ফলে হল কী, হিপনোচিজ্ম দেখাতে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে স্টেজে ডেকে নিলেন। এ জিনিসটা ভদ্রলোক ভালই জানেন। লালমোহনবাবুর হাতে পেনসিল দিয়ে, স্টোকে কামড়াতে বলে জিগ্যেস করলেন, ‘চকোলেট কেমন লাগছে?’

লালমোহনবাবু সম্মোহিত অবস্থায় বললেন, ‘খাস্তা’ চিমুকার চকোলেট।’

পাঁচ মিনিট স্টেজে ছিলেন, তার মধ্যে জটায় একেবারে নাজেহাল

হয়ে গিয়েছিলেন, আর লোকেও উপভোগ করল খুব। লালমোহনবাবু
জন ক্ষিরে পাবার পরে হাতগালি আর থামে না।

পরদিন ছিল রবিবার। লালমোহনবাবু তাঁর সবুজ আঘাসাডারে
ঠিক ন-টার সময় চলে এসেছিলেন তাঁর গড়পারের বাড়ি থেকে আড়া
মারতে। তখনও ম্যাজিকের কথা হচ্ছে।

ফেলুন। বলল, ‘ঠিক জমাতে পারছে না লোকটা। কালকেও সিট
খালি ছিল দেখেছিলি?’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘কিন্তু যাই বলুন মশাই, আমাকে যেভাবে
বোকা বানানো, তাতে বলতেই হবে কৃতিত্ব আছে। পেনসিল চিবিয়ে
চকোলেট, পাথর কামড়ে কড়া-পাকের সন্দেশের স্বাদ—এ ভাব যায়
না।’

শ্রীনাথ সবে চা এনেছে, এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ আর
সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টোকা পড়ল। অর্থ কাকুর আসার কথা নেই।
খুলে দেখি, বছর ত্রিশেকের ভদ্রলোক।

‘এটাই প্রদোষ মিস্তিয়ের বাড়ি?’

ফেলুন। বলল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ভেতরে আসুন।’

ভদ্রলোক এসে চুকলেন। ফরসা, রোগা, চোখে চশমা। বেশ
সপ্তিত চেহারা।

সোফার একপাশে বসে বললেন, ‘টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও
আপনার লাইনটা পেলাম না। তাই এমনিই চলে এলাম।’

‘ঠিক আছে।’ বলল ফেলুন। ‘আপনার প্রয়োজনটা যদি বলেন।’

‘আমার নাম নিখিল বর্মন। আমার বাবার নাম হয়তো আপনি শনে
থাকবেন—সোমেশ্বর বর্মন।’

‘যিনি ভারতীয় জাদু দেখাতেন?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘আজকাল তো আর নাম শনি না। রিটায়ার করেছেন বোধহয়?’

‘হ্যাঁ, বছর সাতেক হল আর ম্যাজিক দেখান না।’

‘তিনি তো স্টেজে ম্যাজিক দেখাতেন না বোধহয়?’

‘না। এমনি ফরাসে দেখাতেন। শুরু ছান্দোলোক ঘিরে বসত।

সাধারণত মেটিভ স্টেটগুলোতে খুব খুব নাম ছিল। বহু রাজাদের ম্যাজিক দেখিয়েছেন। তাহাড়া বাবা নানান দেশ ঘুরে ভারতীয় ম্যাজিক সম্বন্ধে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো একটা বড় খাতায় লেখা আছে। বাবা ইংরিজিতে লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান ম্যাজিক'। ওটা এক জন কিনতে চেয়েছেন বাবার কাছে। কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত অফার করেছেন। বাবা চাহিলেন আপনাকে একবার লেখাটি দেখাতে। কারণ বাবা ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না।'

'কুড়ি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে কে জানতে পারি?'

'জাদুকর সুর্যকুমার নন্দী।'

আশ্চর্য! কালই আমরা সুর্যকুমারের ম্যাজিক দেখে এসেছি! একেই ফেন্সুদা বলে টেলিপ্যাথি।

ফেন্সুদা বলল, 'বেশ, আমি লেখাটা নিশ্চয়ই দেখব। তাহাড়া আপনার বাবার সঙ্গে আমার আলাপ করারও যথেষ্ট ইচ্ছে আছে।'

'বাবাও আপনার খুব গুণ্যাহী। বলেন, অমন শার্প বুজি বাঙালিদের বড়-একটা দেখা যায় না। আমার মনে হয়, এর মধ্যেই একদিন এসে পড়ুন না। বাবা সন্ধ্যায় বোজই বাড়ি থাকেন।'

'ঠিক আছে। আমরা আজ সন্ধ্যাতেই তাহলে আসি।'

'বেশ তো। এই সাড়ে ছ-টা মাগাত?'

'তাই কথা রইল।'

॥ ২ ॥

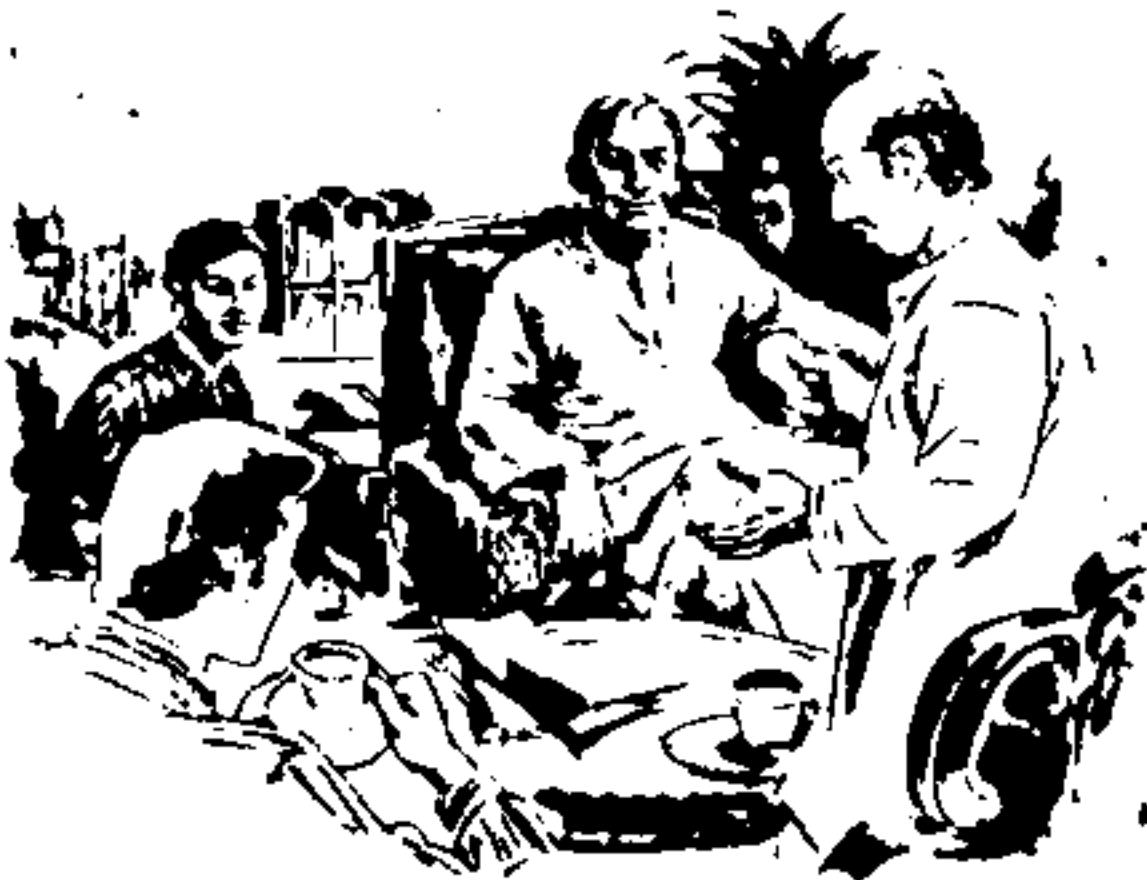
রামমোহন রায় সরণিতে সোমেশ্বর বর্মনের পেলায় বাড়ি। এরা আগে পূর্ববঙ্গের জমিদার ছিলেন, অনেক দিন থেকেই কলকাতায় চলে এসেছেন। এখন বাড়িতে অধিকাংশ ঘরই খালি পড়ে আছে। বাড়িতে চাকর বাদে লোক মাত্র পাঁচজন। সোমেশ্বর বর্মন, তাঁর ছেলে নিখিল, মি. বর্মনের সেক্রেটারি প্রণবেশ রায়, মি. বর্মনের বন্ধু অনিমেষ সেন, আর রণেন তরফদার বলে এক শিল্পী। ইনি নাকি সোমেশ্বরবুর একটা পোত্তুট করছেন। এ সব ব্যবর আমরা সোমেশ্বরবুর কাছ থেকেই পেলাম। ভদ্রলোকের বহু ধরা যায় নাম ক্ষেত্রগুলি এখনও তেমন

পাকেনি, তোখ দুটো উজ্জ্বল, যেমন জাদুকরের হওয়া উচিত। আমরা একত্ত্বায় সোফায় ধসেছিলাম। নিখিলবাবু আমদের জন্য চায়ের অর্ডার দিলেন।

‘আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।’ বললেন সোমেন্দ্রবাবু, ‘ডাল পসার ছিল। আঘি ল’ পড়েছিলাম, কিন্তু সেদিকে আর যাইনি। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন ভাস্তিক। হয়তো তাঁরই কিছুটা প্রভাব আমার চরিত্রে পড়েছিল। আমি হেটবেলা থেকেই ভারতীয় জাদুবিদ্যার দিকে ঝুঁকি। এলাহাবাদে একটা পার্কে এক বুড়োর ম্যাজিক দেখেছিলাম। তার হাত-সাফাইয়ের কেনও তুলন নেই। মঞ্চের ম্যাজিকের অর্ধেকই আজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে হয়, সেই জন্য তাতে আমার কেনও ইন্টারেস্ট নেই। ভারতীয় ম্যাজিক হল আসল ম্যাজিক, যেখানে মানুষের দক্ষতাই সম্পূর্ণ কাজটা করে। তাই আমি কলেজের পড়া শেষ করে, এই সব ম্যাজিক সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ি। সুবিধে ছিল বাবা এ সব বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। আমি একটা নতুন কিছু করছি, এটাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। আসলে আমদের পরিবারে নানান লোকে নানান কাজ করে এসেছে চিরকালই। ডাক্তার, উকিল, গাইয়ে, অভিনেতা, সাহিত্যিক—সব রকমই পাওয়া যাবে আমদের এই বর্মন পরিবারে, আর তাদের মধ্যে অনেকেই বীতিমত্ত সফল হয়েছেন। যেমন আমি হয়েছিলাম জাদুতে। আমার সব রাজা-রাজঢাদের কাছ থেকে ডাক আসত। প্রাসাদের ঘরে ফরাসির উপর বসে ম্যাজিক দেখাতাম—সব লোক হী হয়ে যেত। বোজগারও হয়েছে ডাল। কেনও ধরাবাঁধা কি ছিল না আমার। কিন্তু যা পেতাম, সেটা প্রত্যাশার অনেক বেশি।’

চা এসে গিয়েছিল। ফেলুন একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, ‘এবার আপনার পাশুলিপির কথা বলুন। শুনেছি, ভারতীয় জাদু নিয়ে আপনি একটা বড় কাজ করেছেন।’

‘তা করেছি,’ বললেন সোমেন্দ্রব বর্মন, ‘আমি যা করেছি, তেমন আর কেউ করেছে বলে আমার জন্ম নেই। এনিয়ে আমি প্রবন্ধ-টবন্ধও লিখেছি, এবং তার ফলেই আমার পাশুলিপির ব্যাপারটাও জানাজানি হয়ে গেছে। সেই কারণে সুরক্ষার আমার



কাছে আসে। নইলে তার তো জনর কথা নয়। অবিশ্য জাদুকর হিসেবে সে আমার নামে আগোই জনেছে।'

'সে কি আপনার পাতুলিপিটা কিমতে চায় ?'

'তাই তো বলো। সে সোজা আমার ধার্ডিতে চলে এসেছিল। আমার বেশ ভাল লাগে ছেলেটিকে, দেখেছি কেমন একটা মেই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অফারটার আমি টিক রাখি হতে পারছি না। আমার ধারণা আমার কাছটা যুব জরুরি কাজ, এবং তার মূল্য বিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি। সেই জনেই চাহিলাম পাতুলিপিটা আপনি একটু পড়ে দেখুন। আপনার তো নানান বিষয় পড়াশোনা আছে। সেটা আপনার কেসগুলো সমস্কে পড়ে দেখলেই বোবা যায়।'

'বেশ তো। আমি সাত্ত্বে পড়ব আপনার লেখা।'

সোমেরবাবু তাঁর সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, 'প্রশংসন, যাও তো খাতটা একবার নিয়ে এসো।'

সেক্রেটারি চলে গেলেন আঙ্গাপাঞ্চ করতে।

ফেলুনা বলল, 'আমরা কাল সূর্যকুমারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কেমন লাগল?'

'মোটামুটি।' বলল ফেলুনা, 'তবে ভদ্রলোক হিপ্নোটিজ্মটা বেশ আশ্চর্য করেছেন। আর যা ম্যাজিক, সবই যত্নের কারসাজি।'

সোমেষ্ঠরবাবু হঠাতে সামনের প্রেট থেকে একটা বিস্তুট তুলে নিয়ে, সেটা হাতের মুঠোয় বন্ধ করে, পরমুহুর্তেই হাত খুলে দেখালেন বিস্তুট হাওয়া। তারপর সেটা বেরল লালমোহনবাবুর পকেট থেকে।

ফেলুনা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'আপনি ম্যাজিক বন্ধ করে দিলেন কেন? আপনার তো অঙ্গুত হাত!'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি এখন পাণুলিপিটা নিয়েই কাজ করব। বইটা ছাপাতে পারলে মনে হয়ে কাজ দেবে। এ নিয়ে তো বই আর লেখা হয়নি।'

'তাহলে আমি খাতটা নিলাম।' বলল ফেলুনা, 'আমি পরশু ফেরত দেব। এই রকম সংস্কারেলা।'

'বেশ, তাই কথা রইল।'

ফেলুনা পরদিন সকালেই বলল, তার নাকি পাণুলিপি পড়া শেষ হয়ে গেছে। সে সারারাত পড়েছে। ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তের মতো—আস্ত ইট্স এ গোল্ডমাইন। ছেপে বেরোলে, একটা প্রামাণ্য বই হয়ে থাকবে। বিশ কেন, পঞ্চাশ হাজার দিলগুড় এ পাণুলিপি হাত-ছাড়া করা উচিত নয়।'

সংস্কারেলা সোমেষ্ঠরবাবুকে গিয়ে আমরা সেই কথাটাই বললাম। ভদ্রলোক শুনে যেন অনেকটা আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'আপনি আমার মন থেকে একটা বিরাট চিন্তা দূর করে দিলেন। আমি দোটানার মধ্যে পড়েছিলাম, কিন্তু আপনি যখন পড়ে এত প্রশংসা করলেন, তখনক আবার আমি মনে বল পাচ্ছি। প্রণবেশ পাণুলিপিটাকে টাইপ করছে— এ ও অনেকবার বলেছে যে এতে আশ্চর্য সব কথা আছে। আমার বন্ধু অনিমেষও সেই একই কথা বলেছে। এবার নিশ্চিন্তে সূর্যকুমারকে না

বলে দিতে পারব। তান কথা, কাল আমার ঘরে চোর এসেছিল।’
‘সে কী! ’

‘আমার ঘুর্টা ভোঁড়ে যায়। আমি “কে”? বলতেই পালায়।’

‘এর আগে কখনও চুরি হয়েছে কি?’

‘কচ্ছনো না।’

‘আপনার ঘরে কেনও ভ্যালুয়েবল জিনিস আছে কি?’

‘আছে। কিন্তু সেটা আমার সিন্দুকে থাকে। সিন্দুকের চাবি আমার বালিশের নীচে থাকে। আর সেটা সহজে আমার বাড়ির লোকেরা কেউ জানে না।’

‘আমি জানতে পারি কি? আমার অদম্য কৌতুহল হচ্ছে।’

‘নিশ্চয়ই পারেন।’

তত্ত্বালোক উঠে দোতলায় গেলেন। তাদুর মিনিট তিনেক পরে এসে একটা ছ-ইঞ্জি লস্বা জিনিস আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। সেটা একটা বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি।

‘পঞ্চরত্নের তৈরি।’ বললেন সোমেশ্বরবাবু, ‘তার মানে হিরে, পথরাজ, নীলকান্ত, প্রবাল আর মুক্তে। এর কত দাম জানি না।’

‘অমূল্য’, বলল ফেলুন। ‘এবং অপূর্ব জিনিস। এ জিনিস কবে থেকে আছে?’

‘এটা পাই রচনাথপুরের রাজা দয়াল সিং-এর কাছে। নাইনটিন ফিফটি সির্জে। আমার ম্যাজিক দেখে খুশি হয়ে দেন আমাকে জিনিসটা।’

‘আপনাদের বাড়ি কত দারোয়ান নেই?’

‘তা আছে বইকী। তাছাড়া চারজন চাকর আছে। চোরের মনে হয় চাকরের সঙ্গে যোগাযোগ হিল।’

‘যদি না চোর বাড়ির লোক হয়।’

‘এ যে আপনি সকলনেশে কথা বলছেন।’

‘আমরা গোয়েন্দারা এ বুকম কথা বলে থাকি। স্টেট সিটিভাসিলি নেবার কেনও দরকার নেই।’

‘তাও ভাল।’

‘আপনি বোধহয় বিপন্নীক?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার ওই একটি ছেলে?’

‘না; নিখিল আমার ছেট ছেলে। বড়টি—অধিল—উনিশ বছর
বয়সে বি. এ. পাস করে বিদেশে চলে যায়।’

‘কোথায়?’

‘সেটা বলে যাবনি। আমাদের ফ্যামিলিতে ভবঘূরণেও রয়েছে কিছু
কিছু। অধিল ছিল তাদের মধ্যে একজন। অঙ্গুর চরিত্র। বলল, জামানি
গিয়ে চাকরি করবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল। এ হল নাইনটিন
সেভেনটির কথা। তারপর আর কোনও যোগাযোগ করেনি।
ইউরোপেই কোথাও আছে হয়তো, কিন্তু জলবার কেন্দ্র উপায়
নেই।’

‘আপনার সেক্রেটারি প্রণবেশ এই কৃষ্ণটার কথা জানেন?’

‘হ্যাঁ। সে তো আমার ঘরের ছেলের মতোই। আর তাকে তো
আমার সব কাগজপত্র, করেসপ্লেন্স ঘাঁটিতে হয়।’

‘যাই হোক, এবার এটা তুলে রেখে দিন। এমন চমৎকার জিনিস
আমি কমই দেখেছি।’

‘আমি তাহলে সুর্যকুমারকে না বলে দিই।’

‘নির্দিষ্টায়।’

ফেলুন্দা উঠে পড়ল।

‘আমি একবার বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখতে চাই। তোর কেন্দ্
রে জায়গা দিয়ে আসতে পারে, সেটা একবার দেখা দরকার।’

‘সবচেয়ে সুবিধে বারান্দা দিয়ে। আসলে আমার দারোয়ান একটু
কর্তব্যে তিলে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’

বাড়ির বারান্দা যেদিকে, সেদিকেই একটা বাগান রয়েছে। তবে
সেটাকে খুব যত্ন করা হয় বলে মনে হল না। বাড়ির চারিদিকে বেশ উঁচু
কম্পাউণ্ড ওয়াল, সেটা টপ্কে পেরোনো সহজ নয়। দেয়ালের দু ধাঁকে
গাছপালাও বিশেষ নেই।

ফেলুন্দা মিনিট পনেরো ঘোরাঘুরি করে বলল, ‘তোর সহজে টিক
শিওর হওয়া গেল না। বাড়ির চোর না বাইরের চোর, সে বিষয়ে সংশয়
রয়ে গেল।’

॥ ৩ ॥

পরদিন সোনেহরবাবু টেলিফোনে জানালেন যে সূর্যকুমারের সঙ্গে খুর কথা হচ্ছে গেছে। উনি খাতটা বিক্রি করবেন না বলে দিয়েছেন।

‘ভাল কখন।’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমার জাদুকর নিয়ে একটা ভাল প্লট মাথায় এসেছে। ভাবছিলাম, সূর্যকুমারের সঙ্গে কী করে একটু কথা বলা যায়।’

‘ওকে হোটেলে যোন করোন।’ বলল ফেলুদা, ‘কোন হোটেলে আছে সে তো যারা আমাদের টিকিট দিয়েছিল, তারাই বলে দেবো।’

‘তা বটে।’

পনেরো মিনিটের মধ্যে লালমোহনবাবু সূর্যকুমারের সঙ্গে কথা বলে, তার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিলেন আমাদের বাড়িতেই। ভদ্রলোক আগামীকাজ সকালে সাড়ে ন-টায় আসবেন।

‘আপনি কিন্তু আমাকে দেখলেই চিনবেন।’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমি সেদিন আপনার দ্বারা হিপনোটাইজড হয়েছিলাম।’

পরদিন একটা মাঝি গাড়িতে ঠিক সাড়ে ন টার সময় সূর্যকুমার এসে হাজির। লালমোহনবাবু অবিশ্বি মিনিট কুড়ি আগেই চলে এসেছিলেন। সূর্যকুমার ফেলুদাকে দেখে কেমন হক্কিয়ে গেলেন। বললেন, ‘আপনার পরিচয়টা পেতে পারি কি? আপনাকে কেমন কেন চেনা চেনা লাগছে।’

ফেলুদা বলল, ‘আমার নাম প্রদোষ মিত্র। হয়তো খবরের কাগজে ছবি দেখে থাকবেন।’

‘প্রদোষ মিত্র মানে গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?’

‘আজ্জে হ্যাঁ।’

‘আমার পরম সৌভাগ্য।’

‘সৌভাগ্য তো আমারও। আপনার মতো একজন মৃক্ষ ম্যাজিশিয়ানের পায়ের ধূলো পড়ল আমাদের বাড়িতে, সেও কি কম সৌভাগ্য?’

চাহের পর লালমোহনবাবু প্রশ্ন আরও করলেন।

‘আপনি কদিন ম্যাজিক দেখাচ্ছেন?’

‘তা বারো বছর হল।’

— কাকুর কাছে শিখেছেন কি?’

‘আমি নক্ষত্র সেন এন্ড্রজালিকের সহকারী ছিলাম পাঁচ বছর। তাঁর বয়স হয়েছিল — স্টেজেই ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে ট্রোক হয়ে আরা যান। তাঁর সব ম্যাজিকের সরঞ্জাম আমার হাতে পড়ে। আমি তাই দিয়েই শুরু করি।’

‘আপনাকে কি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেলা দেখাতে হয়?’

‘হ্যাঁ। শুধু ভারতবর্ষ কেন, আমি জাপান আর ইংল্যান্ড গিয়েছি।’

‘বটে?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। আগামী বছর সিঙ্গাপুর থেকে নেহঙ্গন আছে।’

‘আপনার ফ্লামিলি নেই?’

‘না। আমি বাচেলোর।’

‘এখনও ম্যাজিক অভ্যাস করতে হয় আপনাকে, না আর দরকার হয় না।’

‘এখনও সকালে দু ঘন্টা হাত-সাফাই প্রাক্টিস করি। ওটা থামালে চলে না।’

এবার ফেল্দু একটা প্রশ্ন করল।

‘আপনার সঙ্গে সোমেষ্ঠের বর্মনের বোধহয় আসাপ হয়েছে।’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘আপনি তো ভারতীয় জাদুবিদ্যার পান্তিলিপিটা কিনতে চেয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন?’

‘আমি ভেবেছিলাম আমার বিলিতি ম্যাজিকের মধ্যে কয়েকটি দিশি আইটেম ঢেকাতে পারলে অ্যাট্রাকচিভ হবে। কিন্তু ভদ্রলোক বুঝ বিক্রি করলেন না। আমি বিশ হাজার অঞ্চার করেছিলাম। তবে বিক্রি না করলেও, ওঁর সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কারণ আমি ওঁকে সত্যিই অন্ধা করি। উনি অস্থার শেষ শেষ হলে পর ওঁর বাড়িতে গিয়ে আমাকে কয়েক দিন থাকতে বলেছেন।’

‘আপনার শো শেষ হচ্ছে কবে?’

‘এই রবিবার।’

‘এর পর কোথাক যাওয়া?’

‘দিন সাতক বিশ্বামীর পর পাটনা যাব।’

লালমোহনবাবুর আরও দু-একটা প্রশ্ন ছিল, তারপরেই উদ্বলোক বিদায় নিলেন। আমারও উদ্বলোককে খারাপ লাগল না।

ফেলুনা বলল, ‘বিদেশি জামাকাপড় জুতো পরেছে। বোধহয় জাপান কি হংকং-এ কেসা। এমনিতে বেশ সৌখ্যন লোক, সব ম্যাজিশিয়ানরা সাধারণত হয়।’

‘সোমেষ্ঠরবাবুদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন বলুন?’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘নইলে আর বাড়িতে এসে থাকতে বলে।’

॥ ৪ ॥

এ সন্তাহটায় আর কোনও ঘটনা ঘটল না। তারপর যেটা হল, সেটা একেবারে বছপাত! মঙ্গলবার দিন সোমেষ্ঠরবাবু ফোন করে জানালেন যে তাঁর বাড়িতে খুন হয়েছে তাঁর বছদিনের বেয়ারা অবিনাশ, আর সেই সঙ্গে সিন্দুক থেকে পক্ষরত্নের কঢ়ি হাওয়া। একসঙ্গে উবল ঢাঙেড়ি!

ফেলুনা তৎক্ষণাৎ লালমোহনবাবুকে ফোন করে বসে দিল সোমেষ্ঠরবাবুর বাড়িতে আসতে, আর আমরা ট্যাক্সি করে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি, পুলিশকেও ব্বর দেওয়া হয়েছে। ইনস্পেক্টর ঘোষ ফেলুনার চেনা, দেখে বললেন, ‘শ্রেফ ডাকাতির কেস। খুন করার মতলব ছিল না; সামনে বাধা পেতে খুন করেছে। আসল উদ্দেশ্য ছিল সিন্দুক থেকে ওই কৃষ্ণটা নেওয়া। এ বাইরের লোকের কাজ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সে দিন একটা ডাকাতির কেস হয়ে গেছে।’

‘ওই কৃষ্ণের কথা কিন্তু এ বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানত না।’

‘তাহলে এ বাড়ির ভেতর থেকেই ব্যাপারটা হয়েছে। সোমেষ্ঠরবাবুর ছেলে আছেন, সেক্রেটারি আছেন, সঙ্গু আছেন, আটিস্ট রঞ্জেন তরফদার আছেন, সুর্যকুমার বলে সেই ম্যাজিশিয়ান কাল থেকে

এখানে রয়েছেন; এর মধ্যেই কেউ গিলটি। আর যদি তাই হয়, তাহলে তো আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।’

‘খুনটা কখন হয়েছে?’

‘রাত একটা থেকে তিনটোর মধ্যে।’

‘বেয়ারা কি চোরকে বাধা দিতে পেসল?’

‘তাই তো মনে হচ্ছে।’

আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। একতলায় বৈঠকখানায় সোমেশ্বরবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। খবে আর সকলেই রয়েছে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ চেয়ারে বসে।

ফেলুন্দা সোমেশ্বরবাবুকে বলল, ‘ঘটনাটা একটু বলবেন? এই বেয়ারা কি আপনার অনেক দিনের বেয়ারা?’

‘ক্রিশ বছৰ। অবিনাশের মতো ভাল লোক পাওয়া খুব দুঃখ।’

‘খুনটা কোথায় হয়?’

‘একতলায়। চোর সিন্দুক থেকে কৃষ্ণটা নিয়ে পালাছিল, সেই সময় হয়তো অবিনাশের চুম ভেঙে যায়। সে চোরের সামনে পড়ে, ইঘতো তাকে ধরতে যায়; সেই সময় চোর তাকে ছুরি ঘেরে খুন করে।’

‘আপনারা কে কোথায় শোন, জানতে পারি?’

‘আমার ঘর তো আপনি দেখেইছেন। আমি আর অনিমেষ দোকলায় শুই। বাকি সকলে একতলায় শোয়। কাল সূর্যকুমার এখানে এসেছেন ক-দিনের জন্য, তাকে একতলায় একটা গেস্ট-রুম দিই।’

‘কিন্তু আপনার এই কৃষ্ণের কথা তো বাইরের কেউ জানত না?’

‘তা তো না-ই। অথচ বাড়ির কেউ এমন কাজ করে থাকতে পারে, সেটা ভাবা অসম্ভব মনে হচ্ছে।’

‘আপনার বালিশের নীচ থেকে চাবি নিল, আর আপনি টের পেলেন না?’

‘আমি যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোই। সে গভীর ঘুম।’

‘সিন্দুকের চাবিটা কি রেখে গেছে?’

‘হ্যাঁ। সেটা তালাতেই ঝুলছিল।’

‘যে অস্ত্রটা দিয়ে খুন হয়েছিল, সেটা পাওয়া গেছে?’

‘না।’



ইনস্পেক্টর ঘোষ এসে বললেন, তিনি সকলকে জেরা করতে চান।

ফেলুদা বলল, ‘আপনার জেরার পর আমি হাদি একটু জেরা করি, তাহলে আপনার আপত্তি নেই তো?’

‘মোটেই না। আপনার কীর্তিকলাপের সঙ্গে আমি বিলক্ষণ পরিচিত। নহলে প্রাইভেট ডিটেক্টিভকে আমরা বিশেষ প্যান্ডা দিই না।’

ইনস্পেক্টর ঘোষ শোয়া ঘণ্টা ধরে সকলকে জেরা করলেন। আমরা ততক্ষণ চাটা খেলাম। সোমেশ্বরবাবু যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন—
শুনের বাপারেও, চুরির ব্যাপারেও। কিন্তু তাতে আতিথেয়তার কোনওরকম ভূতি হল না।

আমরা চা খেয়ে বাইরে বাগানে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইনস্পেক্টর ঘোষ এসে বললেন, ‘আমার কাজ শেষ। এবার আপনি টেক-ওভার করুন।’

ফেলুদা ভিতরে গিয়ে প্রথমেই সোমেশ্বরবাবুর ছোট ছেলে নিখিলবাবুকে নিয়ে পড়ল। আমরা নিখিলবাবুর ঘরেই বসলাম।

ফেলুদা প্রথমেই জিগ্যাস করল, ‘আপনি কী করেন?’

‘আমার একটা অক্ষম হাউস আছে মিরজা বালিব ট্রিটে।’

‘কী নাম?’

‘মজার্ন সেল্স বুরো।’

‘আমি, দোকানটা দেখেছি।’

‘তা দেখে থাকতে পারেন। ওখানে আমি সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত থাকি।’

‘ব্যবসা কী রকম চলে?’

‘ভালই।’

‘আপনি আট সপ্তাহে ইন্টারেস্টেড?’

‘আমার কাজের মধ্যে দিয়ে তো অনেক ক্লান্স আটের জিনিসপত্র আমাদের ঘটিতে হয়। সেই সুত্রে বেশ কিছু জুমা হয়ে গেছে।’

‘কত বছর হল আপনি এ কাজে কানাহুম?’

‘সাত বছর।’

‘আপনার বয়স কত?’

‘তেক্রিশ চলছে।’

‘আপনার দাদা আপনার চেয়ে কত বড়?’

‘তিনি বছর।’

‘দাদার সঙ্গে আপনার সন্তান ছিল?’

‘দাদা মিশুকে ছিলেন না। কথাও বেশি বলতেন না, এন্দু-বান্দুও বেশি ছিল না। সত্যি বলতে কী, দাদার কারুর উপরেই টাল ছিল না— এমনকী আমার উপরেও না।’

নিখিলবাবুর কথা শুনে আমার কেন যে একটু অসুস্থ লাগছিল, সেটা কিছুতেই ভেবে বের করতে পারলাম না।

‘বিদেশে গিয়ে দাদা আপনাকে চিঠি লেখেননি?’ ফেলুন। জিগ্যেস করল।

‘না। শুধু আমাকে না, কাউকেই লেখেননি।’

‘বাবার ম্যাজিকে আপনার কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না?’

‘নিশ্চয়ই ছিল। তবে বাবা তো বেশির ভাগ ম্যাজিক বাইরে দেখাতেন; সেগুলো আর আমার দেখা হত না।’

‘নিজে ম্যাজিক করার শখ হয়নি?’

‘তা হয়নি। শুধু দেখতেই ভাল লাগত।’

‘এই যে অফিসটা ঘটল, এটার জন্য কে দায়ী, সে সমস্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?’

‘না। একেবারেই নেই। তবে বাবাকে আমি অনেকবার বলেছি কৃষ্ট। বাড়িতে না রেখে ব্যাকে রাখা উচিত। বাবা আমার কথায় কান দেননি।’

নিখিলবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে, আমরা সোমেষ্ঠবাবুর বন্ধু অনিমেষবাবুর কাছে গোলাম।

খাট আর চেয়ার ভাগ করে আমরা বসলাম ভদ্রলোকের ঘরে।

ফেলুন। জিগ্যেস করল, ‘আপনি কী করেন?’

‘আমি কিছুই করি না।’ বললেন অনিমেষবাবু, ‘আমার বাবা ছিলেন উকিল। তিনি অনেক তলার একটা বাড়ি তৈরি করে গোসলেন, সেটার ভাড়া থেকেই আমার চলে যায়।’

সোমেষ্ঠরবাবুর সঙ্গে আপনার বক্তৃত কত দিনের?’

‘তা প্রায় বিশ বছর।’

‘কী করে সৃত্রপাত হয়?’

‘আমি এককালে জ্যোতিষ করতাম। সোমেষ্ঠর আমার কাছে এসেছিল তার ভাগী গণনা করাতে। ও তখন সবে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেছে। আমি ওর ভবিষ্যতের খ্যাতির কথা বলে দিই। এই ঘটনার পীচ বছর পরে ও আমার বাড়িতে আবার আসে, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার বক্তৃত। সোমেষ্ঠরের শ্রী মারা যাবার পর ও আমাকে ওর বাড়িতে এসে থাকতে বলে—বোধহয় একাকীভু খানিকটা কাটবে বলে। তখনই আমি চলে আসি। সে আজ পনেরো বছর হল।’

‘পৰ্যবেক্ষণের কৃক্ষটা আপনি কবে দেখেন?’

‘ওটার কথা তো আমি আমার গণনায় বলি। ওটা পাওয়া মাত্র ও আমাকে দেখায়।’

‘এই চুরি এবং খুন কে করতে পারে, সে বিষয়ে আপনার কোনও ধারণা আছে?’

‘বাড়ির চাকরের সঙ্গে যোগসাঙ্গ আছে, এমন কোনও চোর বলেই আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা, ও সিন্দুক খুলে টাকা নিতে চেসল। তারপর সামনে ওই ঝলমলে কৃক্ষটা দেখে, সেইটে নিয়ে নেয়। বাড়ির কোনও লোক এ ব্যাপারে জড়িত, এ বিশ্বাস করতে আমার মন চায় না।’

॥ ৫ ॥

সোমেষ্ঠরবাবুর সেক্রেটারি প্রণবেশবাবু বললেন, উনি পীচ বক্তৃত থেকে সেক্রেটারির কাজ করছেন। ওর নিজের বাড়ি একটা ছিল ভবানীপুরে, কিন্তু এ বাড়িতে এত দুর আছে নেই, সোমেষ্ঠরবাবুই প্রস্তাব করেন এই বাড়িতে এসে থাক্কার জন্য। প্রণবেশবাবুও আপত্তি করেননি।

‘মনিব হিসেবে সোমেষ্ঠরবাবু কেমন লোক?’

‘চমৎকার। সেদিক দিয়ে আমার কিছু বলার নেই।’

‘কাজটা কেমন লাগে?’

‘সোমেশ্বরবাবু যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো অশ্চিয়। টাইপ করতে করতে আমি যে কত কী নতুন জিনিস জানতে পারছি, তা বলতে পারি না।’

‘আপনি কটা পর্যন্ত করেন?’

‘রাত অট্টা, ন-টা...’

‘আপনি তো একত্ত্বায় শোন্ন।’

‘হ্যাঁ।’

‘মুম কেমন হয়?’

‘ভালই।’

‘কাল কোনও কারণে---কোনও শব্দে বা শুই জাতীয় কিছুতে আপনার মুম ভেঙে যাবনি?’

‘না। আমি ঘটনাটা জেনেছি সকালে উঠে।’

‘এ বাড়ির কাউকে আপনার সন্দেহে হয়? কৃষ্ণটার বিষয় যখন শুন্ন এ বাড়ির লোকেরাই জানত, তখন হয়তো অপরাধীও এ-বাড়িতেই রয়েছে।’

‘সে হতে পারে। আমিও তো সাসপেন্সদের মধ্যে পড়ছি।’

‘তা পড়ছেন বৈকি।’

‘পুলিশ অবিশ্য পুরো বাড়ি সার্চ করবে, কিন্তু অতটুকু জিনিস লুকোনোর জায়গার তো অভাব নেই। তারপর সুযোগ বুঝে বার করে নিলেই হল।’

সোমেশ্বরবাবুর যিনি অয়েল পেট্রিং করছিলেন, তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। অন্তত যতদিন না ছবি শেষ হচ্ছে, ততদিন থাকবেন। এই ভদ্রলোককে আমার কেন জানি একটু অস্তুত লাগে। প্রথমত চেহারাটা অস্তুত---চাপ-দাড়ি, চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। তারপর ভদ্রলোক কথা অত্যন্ত কম বলেন। কাজ অবিশ্য ভালই করেন, কারণ সোমেশ্বরবাবুর যেটুকু ছবি আঁকা হচ্ছে সেটা আমি দেখেছি, আর সেটা ভালই হয়েছে।

ইনিও একত্ত্বায় থাকেন। ফেলুন্ডা আঁকড়ারজায় গিয়ে টোকা মারল।



ভদ্রলোক দরজা খুলে ফেলুন্দার দিকে একটা ভিজ্ঞামু দৃষ্টি দিলেন।
‘আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল।’ বলল ফেলুন্দা।

‘বেশ তো, তেরে আসুন।’

অগোছালো ঘর, যেটা হবে বলে আমি আন্দাজ করেছিলাম। আমরা
মোড়া চেয়ার বিছানা মিলিয়ে বসলাম।

‘আপনার নাম তো রশেন তরফদার?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘আপনি ক-দিন হজ এ বাড়িতে আছেন?’

‘যে দিন থেকে ছবিটা আঁকা শুরু করেছি। তার মানে দেড় মাস।’

‘আপনার একটা পোত্রেট করতে কত সময় লাগে?’

‘ফুল ফিগার হলো, এবং দিনে অন্তত দু ঘণ্টা সিটিং পেলে, মাস
দেড়েকে হয়ে যায়।’

‘তাহলে এখানে এতদিন লাগছে কেন?’

‘এখানে সোমেশ্বরবাবু দিনে এক ঘণ্টার বেশি সিটিং দেন না।
তারপর আমাকে ওর ভাল সেগোছে বলে, উনি চান আমি এখানেই
থাকি। আসলে সোমেশ্বরবাবু বেশ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে থাকতে
তালবাসেন। ওর এক ছেলে বিলেতে। যেয়ের বিত্তে এবং স্তুর মৃত্যুর
পরে, উনি ভয়ান্ক একা হয়ে গেসলেন। এ বাড়িটাকে উনি খানিকটা
ভরাট করতে চান, এটা আমার ধারণা।’

‘আপনি পেটিং কোথায় শিখেছিলেন?’

‘আমি ফ্রান্সে শিখি তিন বছর। তা ছাড়া প্রথমে কলকাতার
গৰ্জমেন্ট কলেজ অফ আর্টে শিখেছি।’

‘পোত্রেট করে রোজগার ভাল হয়?’

‘এখন আর হয় না। ফোটোআফির যুগে আসল-পোত্রেটের কদর
অনেক কমে গেছে। আমিও তাই অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট পেটিং-এ চলে যাই।
সোমেশ্বরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে, আমার অবস্থা খুবই ক্ষমতাল
হত।’

‘আপনি পক্ষরহের কৃক্ষ সম্বন্ধে জানতেন?’

‘হ্যাঁ। ওটা আমাকে সোমেশ্বরবাবু দেখিয়েছিলেন।’ বলেছিলেন,
‘তুমি আটিস্ট, তুমি এর কদর করতে পারবে।’

‘কালকের খুন এবং ডাকাতি সহস্রে আপনার নিজের কোনও খণ্ডি
আছে?’

‘বাড়ির লোক এ কাজ করতে পারে না। আমার মনে হয়, তোর
সিদ্ধুক থেকে টাকা নিতে গিয়ে কৃষ্ণটা দেখে সেটা নিয়ে নেয়। তারপর
নীচে নেমে বেদারার সামনাসামনি পড়ে, ওকে খুন করে। আস্থারক্ষা
ছাড়া খুনের আর কোনও মোটিভ আছে বলে আমার মনে হয় না।’

‘অনেক ধন্যবাদ।’

ফেলুদা উঠে পড়ল।

আর দু জন বাকি রইল—সৃষ্টিমার আর সোমেশ্বরবাবু। আমরা
সৃষ্টিমারের কাছেই আসে গোলাম। ভদ্রলোক কেমন ফেল শুন্দি মেরে
গেছেন। তিনি এ বাড়িতে আসার দিনই ঘটনাটা ঘটল, এই জন্যই
বোধহয়।

ফেলুদা বলল, ‘আপনার ভাগ্যটা খুব খারাপ দেখছি।’

‘আর বলবেন না।’ বললেন ভদ্রলোক, ‘সোমেশ্বরবাবু এত আপ্যায়ন
করে আমায় থাকতে বললেন, আর প্রথম রাত্রেই কী কাও! আমি
একবারে থ মেরে গেছি।’

‘রাত্রে কোনওরকম শক্তি-টেক পাননি?’

‘একেবারেই না। আমি এমনিতে খুব ভাল যুমোই। এক ঘুমে রাত
কাবার হয় আমার। কাজেই আমি কিছুই শুনিনি।’

‘এ বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?’

‘যা হয়েছে, তাকে আলাপ কলা যায় না। একমাত্র সোমেশ্বরবাবু
ছাড়া।’

‘যে জিনিসটা চুরি হয়েছে, সেটা আপনি দেখেননি?’

‘কী করে দেখব? প্রথমত ঠিক করে জানি না জিনিসটা কী। শুধু
কৃষ্ণ শুনেছি, এই পর্যন্ত।’

‘কৃষ্ণই বটে, তবে পঞ্চারত্নের তৈরি। যেমন সুস্মর, তেমন
ড্যালুয়েব্ল। সাধারণেকের উপর দায় হবে। আপনি কি এখনও
এখানেই থাকবেন?’

‘সোমেশ্বরবাবু তো তাই বলছেন। বলছেন, ‘আপনাকে ডেকে এনে,
চলে যেতে বলার কোনও প্রয়োজন নেই না। তবে আপনার থাকাটা

আপনার পক্ষে তেমন সুবকর হতে পারল না, এই যা দুঃখ !”

‘আপনি যখন আছেন, তখন প্রয়োজনে আপনাকে আবার প্রয় করা চলবে তো ?’

‘নিশ্চয়ই। এ নিয়ে তো কেনও কথাই উঠতে পারে না।’

এরপর আমরা সোমেশ্বরবাবুর কাছে গেলাম। ভদ্রলোক এখনও মুহূর্মান অবস্থায় রয়েছেন।

ফেলুনা বলল, আপনি কতটা যা খেয়েছেন, সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি যখন এখানে উপস্থিত রয়েছি, তখন কৌতুহলবশত আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন না করে পারছি না।’

‘তা তো করবেনই। আপনার তো পেশাই এটা।’

‘আপনি কোনওরকম টের পাননি, না ?’

‘টের পাইনি, তবে আঘাত পেয়েছি প্রচণ্ড। প্রথমত আমার অবিনাশ বেয়ারার এই দশা। লোকটা যে কী কাজের ছিল, তা বলতে পারিনা। আর আমাকে কতটা মান্য করত, সেও বলে বোঝাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, আমার পঞ্চরত্নের কৃঝ। দয়াল সিং নিজে হাতে তুলে দিয়েছিলেন জিনিসটা আমায়। বললেন, “তুমি শিশীর দেরা শিশী— তোমাকে এর চেয়ে কম পারিশ্রমিক দেওয়া যায় না।” আর সেই পঞ্চরত্নের কৃঝ চলে গেল। আর তা ছাড়া— সোমেশ্বরবাবু কী মেন বলতে গিয়ে, অন্যমনস্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর করকে মুহূর্ত পরে আয় আপন মনেই বললেন, ‘আমি কি ভুল করলাম ? আশা করি ভুল করেছি। কারণ জিনিসটা সত্যি হলে, আমার পক্ষে আরও দ্বিতীয় বেদনাদায়ক হবে।’

‘আপনি কিসের কথা বলছেন ?’ ফেলুনা জিগোস করল।

‘সে আপনি জানতে চাইবেন না, কারণ আপনাকে বলতে পারব না।’

‘আপনি কিছু টের পাননি ?’

‘টের পেয়েছি, কিন্তু পেয়েও কিছু করতে পারিনি।’

‘আপনার কথায় একটা রহস্যের সূর রয়েছে, সেটা আপনি উদয়াটি করবেন কি ? করলে, আমাদের অনেক শুধুয়ে হত।’

‘সে অনুরোধ আমায় করবেন না, মি. মিত্র। আপনি যদি এবার

আমাকে রেহাই দেন, আমি বাধিত হব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—।'

আমরা তিন জন উঠে পত্তাম।

'তবে আমি নিজের স্বার্থে তদন্ত করতে চাই আপনার বাড়ির এই দুঃটিনার ব্যাপারে। তাতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।'

'মোটেই না, অপরাধী যেই হোক্ত না, তাকে ধরা কর্তব্য।'

॥ ৬ ॥

বাড়ি এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'সোমেশ্বরবাবুর কথাগুলো ভাবি রহস্যাভ্যন্তর মনে হচ্ছিল, তাই না।'

'টিকই বলেছেন।' বঙল ফেলুন।

'আমার মনে হয়, ভদ্রলোক বেশ কিছু কথা লুকিয়ে গেলেন।'

'আমারও সেই রকমই মনে হয়েছে।'

'আপনি নিজে কী বুঝেছেন?'

'একেবারে অঙ্ককারে আছি, তা নয়। তবে ম্যাজিকের জগৎ নিয়ে একটু অনুসন্ধান চালাতে হবে। তাছাড়া অকশন হাউসও একটা ব্যাপার আছে। আমি বরং একটু ঘুরে আসি। আপনারা দু জনে আজড়া মারুন।'

আমি একটা কথা এই বেলা ফেলুনকে না বলে পারলাম না। 'আচ্ছা ফেলুন, নিয়িলবাবুর কথা শুনে কি তোমার কিছু মনে হয়েছিল?'

'সেটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেমন নয়, সেটা অবিশ্য তোকে তেবে বার করতে হবে।'

ফেলুন বেরিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমার কিন্তু এই আটিস্ট ভদ্রলোককে মোটেই ভাল লাগছে না। অবিশ্য চাপ দাঢ়ির বিকল্পে আমার একটু প্রেজুডিস আছে এমনিতেই।'

'সূর্যকুমার ভদ্রলোকটিকে আপনার ভাল লাগছে?'

'ও-ও কেমন যেন পিকিউলিয়ার। তবে প্রথম দিন এসেই ও সিন্দুক খুলবে বলে মনে হয় না। এই বাড়ির সঙ্গে তো ওর বিশেষ পরিচয় নেই। কোনটা কার ঘর, কোথায় সিন্দুক আছে, কোথায় সিন্দুকের চাবি

আছে---এ সব জানা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে এ চোর খুনী-চোর। ওকে যখন বেয়ারা দেখে ফেলল, তখন তো ও ওকে ঘুরি মেরে অজ্ঞান করে দিতে পারত। পালালো নিয়ে তো কথা, আর বেয়ারার বয়সও ঘাটের কাছাকাছি। বোকা যাচ্ছে যে চোর ছুরি হাতে নিয়েই কুকুরিত্তি করতে বেরিয়েছিল।'

'এটা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'সোমেশ্বরবাবুও কী বলতে গিয়ে বললেন না, সেটা জানতে ইচ্ছা করো। আমার মনে হয় শুধুমাত্র একটা ইম্পার্টেড ক্লুকিংয়ে আছে।'

ঠিক এই সময় একটা ফোন এল। তুলে 'হ্যালো' বলতে ওদিক থেকে প্রশ্ন এল, 'মি.মিস্টির আছেন?'

ইনস্পেক্টর ঘোষ। বললাম, 'ফেলুদা একটু বেরিয়েছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁকে বলে দেবেন যে কালপ্রিট খরা পড়েছে। গোপচাঁদ বলে এক চোর—রিসেন্টলি জেল থেকে বেরিয়েছে। অবিশ্বিত লোকটা স্বীকার করেনি এবনও, কিন্তু সে দিন রাত্রে ও বেরিয়েছিল, সে খবর আমরা পেয়েছি। এটা আপনি জানিয়ে দেবেন। আর স্বীকারোভি পেলে, আবার আপনাকে টেলিফোন করব। আপনার দাদাকে নিশ্চিন্ত হতে বলে দেবেন।'

আমি ফোন রেখে দিলাম। মনটা কেমন জানি দয়ে গেল। এ তো ঠিক জমল না।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ফেলুদা আসাতে, আমি প্রথমেই ওকে ইনস্পেক্টরের কথাটা বললাম। ফেলুদা যেন গা-ই করল না। বলল, 'সূর্যকুমারের ম্যাজিক শুব ভাস চলছে না, নিখিলবাবুর দোকানের অবস্থাও ভাল নয়। আর আমাদের আটিস্ট ইশেন তরফদার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টের ছাত্র ছিলেন না। প্যারিসে আঁকা শিখেছিলেন কিমা, সেটা অবিশ্বিত জানতে পারিনি।'

'তাহলে এখন কী করণীয়?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আমার দিক থেকে মেটামুটি কাজ শেষ। এখন স্লাইল শুধু রহস্য উদঘাটন। দাঁড়ান, আগে ইনস্পেক্টর যেমনকে একটা ফোন করি।'

ফেলুদা ফোনে প্রথমেই বলল, 'আপনার সমাখ্য যে মানতে পারছি না, মি. ঘোষ।'

ঘোষের উন্নতের পর ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা খুনী ওই বাড়িরই লোক। আপনি এক কাজ করবন। আমার সমাধান রেওড়ি। আমি আজ বিকলে সেটা ঘোষণা করতে চাই সোমেশ্বরবাবুর শোনাবে। আপনিও আসুন। আমার কথা শুনে আপনার ধনি কিছু বলার ধাকে বশকেন। আমার এ অনুরোধটা আপনাকে রাখতেই হবে। তা ছাড়া আপনাকে খুনিকে ঘেঁপার করার জন্য তৈরি হয়ে আসতে হবে।... থ্যাক ইউ।'

ফেলুদা ফোন রেখে বলল, 'ভদ্রলোক রাতি। গোপচাঁদ—হ্যাঁ! এই জন্যই মাকে মাঝে পুলিশের উপর থেকে ভক্তি চলে যায়।'

এরপর ফেলুদা সোমেশ্বরবাবুকে একটা ফোন করে, বিকেলে ওর শোনাবে যাবার কথাটা বলে দিল। সেই সঙ্গে এ-ও বলে দিল যে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

বিকেল পাঁচটায় আমরা সোমেশ্বরবাবুর নীচের বৈঠকখানায় জমায়েত হলাম। ইনস্পেক্টর ঘোষ আর দু জন কন্স্টেবল এসে গিয়েছিল আগেই।

সকলে যে-হার জায়গায় বসলে পর, ফেলুদা শুরু করল।

'প্রথমেই আমাদের যে প্রস্টার সামনে পড়তে হচ্ছে, সেটা হল চোর বাহিরের লোক না ভেতরের লোক। এখানে প্রথম যে দিন চোর আসে, তার পর দিন আমি এসেছিলাম। বাড়ির চারদিকে খুরে মনে হয়েছিল—এখানে বাহিরে থেকে চোর ঢোকা খুব মুশকিল। বারান্দার থাম বেয়ে উঠলেও, জিনিসপত্র চুরি করে থাম বেয়ে নামার সুবিধে নেই। কাজেই আমার বাড়ির লোকের কথাই বেশি করে মনে হয়েছিল, এবং চোরের দৃষ্টি যে কিসের দিকে, সে সম্বন্ধেও আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

'এবার চুরি এবং খুনের পর আমি সকলকে জেরা করি। সোমেশ্বরবাবুকে জেরা করতে জানতে পারলাম তিনি এটা টের পেয়েছিলেন, কিন্তু বাধা দেবার কোনওরকম চেষ্টা করেননি। এতে মনে হয় তিনি চোরকে দেখে একেবারে ইতচক্ষিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চুরির পর যে খুন হবে, সেটা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

চুরির মোটিভ অনশ্য একটাই হতে পারে; তোরের হঠাতে বেশ কিছু টাকার দরকার পক্ষে গেমন।

‘এ বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের মধ্যে বাগেন তরফদার ছবি একে বোজগার করছিলেন, সামরিকভাবে তাঁর অবস্থা স্বচ্ছই বলা হতে পারে। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে চুরি করাটা অপ্রাভাবিক। অনিষ্টেবাবু ভালই আছেন বন্ধুর অভিযন্তায়, কাজেই তাঁকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

‘এবার নিখিলবাবুতে আসা যাক। নিখিলবাবুর একটা অকশন হাউস আছে। আমি খৌজ নিয়ে ভেনেছি, সে অকশন হাউসের অবস্থা খুব ভাল না। সুতরাং নিখিলবাবুর পক্ষে পঞ্চরত্নের কৃকটা পাওয়া বুবই লাভজনক হবে। কারণ তিনি নিজের অবস্থা সামলে নিতে পারবেন। আমার ধারণা, প্রথম দিন নিখিলবাবুই চুরির চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন।’

নিখিলবাবু বলে উঠলেন, ‘আপনি কিমা প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত করছেন?’

ফেলুদা বলল, ‘এখানে শেষ তো হয়নি—আপনি তো চুরি করতে পারেননি। কাজেই আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি বলছি না যে আমার যুক্তি অকট্য। আমি শুধু অনুমান করছি। আপনি আপত্তি করতে চান তো করতে পারেন, কারণ আসল ঘটনা হল ছিলীয় দিনের।’

‘প্রথম আর ছিলীয় দিনের ঘটনার মধ্যে একটি নতুন লোক এসে এ বাড়িতে উঠেছেন, তিনি হলেন জাদুকর সূর্যকুমার। এটাও আমি খৌজ নিয়ে দেবেছি যে সূর্যকুমার তাঁর প্রদর্শনীতে লোকসান দিচ্ছে। আমরা যেদিন তাঁর ম্যাজিক দেখতে যাই, সে দিনও হল-এ অনেক স্মিট থালি ছিল। এই সূর্যকুমার কি চুরি করে থাকতে পারেন? কারণ তাঁর টাকার দরকার ছিল অবশ্যই।’

সূর্যকুমার বলে উঠলেন, ‘ভুলে যাচ্ছেন মি. মিত্র, আমি সোমেশ্বর বর্মনের সিন্দুক ও তার মধ্যে পঞ্চরত্নের কৃষ সম্বন্ধে কিছুই জনতাম না।’

‘সূর্যকুমারবাবু,’ ফেলুদা বলল, ‘এবারে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন